বাংলাদেশের ছোটগল্প

বাংলা একাডেমী সংকলিত

বাংলাদেশের ছোটগল্প

প্রথম খণ্ড

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৬

পাণ্ডুলিপি
সংকলন বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বী
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
নাসিম বানু
ইছামতী প্রিণ্টার্স
২৯৪, রায়ের বাজার
ঢাকা

প্রচ্ছদ
রফিকুন নবী

BANGLADESHER CHOTO-GALPO (*Short stories of Bangladesh*) compiled and published by the Bangla Academy, Dacca, Bangladesh.

ভূমিকা

শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের ছোটগল্পের সংগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমাদের সাহিত্যিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ছোটগল্পের এরূপ পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ আগে আর প্রকাশিত হয় নি। ১৯৪৭এর আগের ও পরের প্রায় সব প্রধান গল্পকারের গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচনের কাজটি করেছেন একাডেমী নিযুক্ত একটি কমিটি। নিম্ন-ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটিটি গঠিত :

১। আবু জাফর শামসুদ্দীন
২। সরদার জয়েনউদ্দীন
৩। হাসান হাফিজুর রহমান
৪। রাহাত খান
৫। বশীর আল্‌হেলাল
৬। আসাদ চৌধুরী
৭। রশীদ হায়দার
৮। সুব্রত বড়ুয়া
৯। এ. কে. এম. হাবীবুল্লাহ্ খোন্দকার (আহবায়ক)

বলা বাহুল্য, এই নির্বাচনের কাজটি সহজ নয়। কমিটি তাঁদের বিবেচনামত এ-কাজ করেছেন। যতদূর সম্ভব, ব্যাপক নির্বাচনই করা হয়েছে। তা করতে গিয়ে নির্বাচিত গল্পকারের সংখ্যা এত অধিক হয় যে সংকলনটিকে দুই খণ্ডে ভাগ না করে উপায় থাকে না। গল্পগুলিকে মোটামুটি দুই সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে খণ্ড-দুটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। লেখকদের কাল বা তাঁদের সৃষ্টির রীতিপ্রকৃতি এই বিভাজনের মানদণ্ড হয় নি। তবে সামান্য-ভাবে যুগ-লক্ষণের এক বিভাজনরূপেও হয়তো একে মনে করা যায়।

গ্রন্থ-শেষে গল্পকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সন্নিবেশিত হয়েছে। যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে একাডেমীর সংকলন বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব আজহার ইসলাম এই কাজ করেছেন।

বলেছি, ছোটগল্পের বর্তমান সংকলন প্রকাশের ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের এ-কালের সাহিত্যে ছোটগল্পের স্থানটি খুব প্রধান। ছোটগল্প সাহিত্যের নবীন এক শাখা। কালের অগ্রগতির বিচিত্র সব ধাপ অতিক্রম করে সে আজকের এই প্রিয় বাঞ্ছিত শিল্প-স্বরূপটি লাভ করেছে। সভ্যতার কোন্ আদিম পর্বে মানুষ গল্প-রচনায় হাত দিয়েছিল সে-কথা আমরা আজ কল্পনা করতে পারি মাত্র। মানুষের গল্প-ক্ষুধা অতি প্রাচীন। আদিম মানুষ গল্পকে পেয়েছিল আনন্দের এমন এক উপকরণরূপে যাতে তাদের জীবন-সংগ্রামের কল্পনা-দীপ্ত ইতিহাস বিধৃত থাকত। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন-যাপনের ক্রম-জটিল পরিস্থিতিসমূহ গল্পে চিত্রিত হতে থাকে। তারপর নারী-পুরুষের সম্পর্ক-ঘটিত সমস্যা গল্পের এক প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ক্রমে নীতিপ্রচার ও ধর্মের বাহন হয় গল্প। কল্পনা ও গল্প-নির্মাণের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল আমাদের সেই প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে। বিশ্বের নানা স্থানে একের পর এক রচিত হয় রূপক, রোমান্স, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি। ভারতবর্ষে, মিশরে, আরবে, বাগদাদে, পারস্যে, ইয়োরোপে রচিত হয় জাতকের গল্প, বাইবেলের কাহিনীসমূহ, পঞ্চতন্ত্র, জেস্টা রোমানোরাম, হিতোপদেশ, ইশপের গল্প, তুতিনামা, আরব্যোপন্যাস, কালিলা ওয়া দিমনা এবং আরো কত কত গল্পকোষ। তারপর মধ্যযুগের ইয়োরোপে বোকাচ্চিয়ো, চসার ও র‍্যাব্‌লে আধুনিক উপন্যাস, নাটক ও গল্পের পথনির্মাণ করলেন। এই পথ ধরেই শেষে উনবিংশ শতকে আজকের ছোটগল্প রচিত হলো ইয়োরোপে।

ইতালীয় তথা ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের বিরাট সৃষ্টি-উৎসবের দিনেই আধুনিক ছোটগল্পের সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী ফ্রান্সে তার সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতার কালে ছোটগল্পসৃজনের বিরাট উৎসব শুরু হয়। উনবিংশ শতকের ফ্রান্সে একের পর এক ছোটগল্পের স্বনামধন্য পুরুষদের আবির্ভাব হয়। প্রায় একই সঙ্গে ছোটগল্পসৃজনের মহোৎসব শুরু হয় রাশিয়ায়। কাব্যনাটকের মহালীলাভূমি ইংল্যাণ্ডে ছোটগল্পের উন্মেষ ও বিকাশ সেই তুলনায় নগণ্য হলেও আমে-

রিকায় তার বৃহৎ উৎসার সম্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডে ছোটগল্প রচনায় যথেষ্ট বেগ ও আবেগ সৃষ্টি না হওয়ার সেই একই কারণ। ইংল্যাণ্ড তখন তার বিশ্বব্যাপী উপনিবেশসমূহ থেকে আহৃত সম্পদের সাচ্ছল্যে বড় তৃপ্ত, বড় সুখী।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বাংলাদেশেও ইংরেজ শাসকদের কল্যাণে এক-শ্রেণীর মধ্যবিত্ত দেওয়ানী ও বেনিয়ানগিরি করে সুখসম্পদের সৌভাগ্য-লাভ করেছিল। সে-সুযোগ ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসে। উপরন্তু ঔপনি-বেশিক শোষণের নিষ্করুণ প্রহারে জনমানুষের জীবনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ নেমে আসে। দুর্ভিক্ষ দেশকে গ্রাস করে। এই সময় (১৮৭৮) আইন করে দেশী ভাষার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, প্রকাশ্য জনসভার অধিকার খর্ব করা হয়। ব্রিটিশ-বিরোধিতার কালো মেঘও এই সময় দেশের রাজ-নৈতিক আকাশকে ছেয়ে ফেলে।

এই পরিস্থিতিতে উনবিংশ শতকের শেষ পাদে রীতিসম্মত বাংলা ছোট-গল্প রচিত হল। 'অপূর্ণায়ত অথবা প্রাথমিক-অবয়ব-বিশিষ্ট ছোটগল্পরচনার প্রয়াস অবশ্য এর আগেই সূচিত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকৃত ছোটগল্প লিখলেন এই শতকের শেষ দশকে। এঁদের মধ্যে অবশ্য ছোটগল্পের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ছোটগল্প তাঁর হাতেই পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ বহু গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পের বিষয়ও বিভিন্ন। কিন্তু পল্লীবাংলার সহজ মাটি-ঘেঁষা মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দকেই তিনি প্রধানত রূপায়িত করেছেন। বাংলার প্রকৃতির নিবিড় শান্ত লীলা-রাজ্যে তিনি তাঁর চরিত্রসমূহের হাসি-কান্নার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। বাংলার এই প্রকৃতি ও পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাব-স্বরূপের প্রধান পরিমণ্ডল রচনা করেছে। কিন্তু পল্লী-মানবের শান্ত প্রাণ-প্রবাহেও অনিবার্য কারণে জীবনের দুরন্ত অভিঘাত অশান্ত ঢেউ তোলে, এই জিনিসটিকে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর ছোটগল্পে বাঙালির একান্ত জীবন ও প্রাণ-ধর্মকে তার আপন গণ্ডির বাইরে, তার সাজাত্যচিন্তার ঊর্ধ্বে বিশ্বজাগতিক মানবচেতনার চূড়ায় উত্তীর্ণ করেছেন।

এবং পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প প্রধানত এই আদর্শ এবং ঐতিহ্যই অনুসরণ করে। বাংলা ছোটগল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রযত্নে ও চর্চায় নব-দিকমাত্রা অর্জন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বর্তমান শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী নব-চেতনার যে উদ্বেল হাওয়া বয়ে যায় তা আমাদের কাব্য ও কথা উভয় সাহিত্যকেই নিদারুণভাবে প্রভাবিত করে। একদিকে নিগৃহীত শোষিত মানুষের আর্তধ্বনি বাংলা ছোটগল্পকে উচ্চকিত ও চঞ্চল করে তোলে, অন্যদিকে মানুষের জৈববাসনা ও মনোলীন সুপ্ত প্রবৃত্তির দুঃসাহসী উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসে তা সম্পূর্ণ অভিনব স্বাদ লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ফ্রয়েডীয় আবিষ্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত মানব-মনের অন্ধকার লোকের কাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তাঁর মধ্যে আসে পরিপূর্ণ পরিবর্তন। মার্কসীয় দর্শন তাঁকে সমাজের অর্থ-নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে মানব-ভাগ্যের অমোঘ সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষাদান করে। ছোটগল্পে তিনি হয়ে ওঠেন সমাজবাস্তবতার রূপকার। প্রথাগত পদ্ধতির অচল গণ্ডিকে ডিঙিয়ে নব-ভাবনার প্রকাশ-উপযোগী আঙ্গিকের নব-নিরীক্ষার যে প্রয়াস আরো পরে আমাদের ছোটগল্পে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে সেই নিরীক্ষা-প্রয়াস তিরিশের দশকেই সূচিত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রয়াসের পুরোধা।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ হলে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠল। বাঙালি মুসলমান লেখক ও সংস্কৃতি-কর্মীরা কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে এলেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত ধারার উত্তরাধিকারটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এবার তাঁদের নবযাত্রা শুরু হলো।

১৯৪৭ সালে বাঙালি মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় তাঁদের স্বাধীন স্বদেশ-ভূমি লাভ করলেন। তার ফলে জাতিসত্তার এক নতুন বোধ তাঁদের মধ্যে সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো দেখা দিল। ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা পাকিস্তান আন্দোলন এক ব্যাপক মুসলিম জাতীয়তার চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ অবশ্যই ঘটিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান অন্য দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন। সে দ্বন্দ্ব আর কিছুই

নয়, বাঙালি মুসলমানের নব-মধ্য-শ্রেণীরূপে গড়ে ওঠার উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা কতদূর চরিতার্থ হতে পারছে সেই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন ক্রমে অধিক থেকে অধিকতর সন্দেহের সম্মুখীন হয়। বাঙালি মধ্যশ্রেণীর বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া শাসন ও শোষণ। ১৯৫২ সালে এবং তার পূর্বে ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্য শ্রেণী ওই শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এই প্রতিরোধের দ্বারা শোষণের শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করা গেছে এমন নয়। বরং রাজনৈতিক শক্তিগুলি নানা রূপে, নানা পন্থায় দেশে একের পর এক বিচিত্র অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই অনিশ্চিত ও অস্থিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই এই কালে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ভাবনা ও চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ১৯৪৭এর পর পূর্ব বাংলায় এমন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত গড়ে ওঠে নি যেখানে সাহিত্যসৃষ্টির অত্যন্ত মুখর আয়োজন সম্ভব হয়।

এমনতর সামাজিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণেই আমাদের সাহিত্যের যে শাখাগুলিতে তুলনামূলকভাবে অধিক তৎপরতা জেগেছে সেগুলি হচ্ছে গীতিকবিতা ও ছোটগল্প। এই সামাজিক পরিস্থিতিই আমাদের ছোটগল্প ও কবিতার প্রকৃতিও নির্মাণ করেছে।

১৯৪৭এর পর সময় খুব বেশি অতিবাহিত হয় নি। আমাদের হাতে মাত্র সিকি শতাব্দীর সাহিত্য। বহু লেখক বহু ছোটগল্প এই কালে লিখেছেন। পাঠক সেই সব গল্পের নির্বাচিত অংশের স্বাদ বর্তমান সংকলনে লাভ করবেন। আমাদের গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবনের সুযোগও তাঁরা পাবেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে এখানে দু-চার কথা বলা যায়।

আমাদের আজকের প্রবীণ গল্পলেখকরা ১৯৪৭এর পূর্ব থেকে, কেউ কেউ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকে গল্প লিখছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবরাহীম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মাহবুব-উল-আলম, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবু রুশ্‌দ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রবীণ মাহবুব-উল-আলম, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল

ফজল আমাদের ছোটগল্পে সুস্থ জীবনবাদী ধারাটিকে বহন করে এনেছিলেন। মাহবুব-উল-আলম পল্লী-মানবের পরিবার-জীবনের চিত্র অশেষ মায়ায় অঙ্কন করেছেন। মানুষের দুরূহ বাস্তব জীবনকে তিনি কান্নাহাসির মধুর বিধুর রসে সরস করেছেন। আবুল ফজল বলিষ্ঠ সমাজ-সচেতন জীবন-শিল্পী। জীবনপ্রেমী ও জীবনপিয়াসী মানুষের আলেখ্য তিনি শক্তিশালী ভাষায় রচনা করেছেন। আবুল মনসুর আহমদ রস-গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প কৌতুকে সরস, ব্যঙ্গে তীব্র এবং করুণায় বিগলিত। কৌতুক, হাস্যরস ও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ-পতিদের মুখোস-আঁটা চেহারা তিনি উন্মোচন করেছেন। তাঁর গল্পের রাজনৈতিক চিত্রাবলীও আমাদের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্বাদ বহন করে। তাঁর এই ধারা পরবর্তীকালে খুব একটা অনুসৃত হয় নি।

আবু জাফর শামসুদ্দীন উদীয়মান মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থ-ঘটিত সংকটের দ্বন্দ্বটিকে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি এই জীবনের স্বপ্ন ও সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই স্বপ্নভঙ্গের কঠোর বাস্তবতার বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে বুদ্ধির ভূমিকা বেশ প্রবল।

শওকত ওসমানও জীবনবাদী বক্তব্যপ্রধান গল্প লেখেন। তীব্র ও গভীর সব ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর একটি তির্যক ভঙ্গিও রয়েছে। তিনি রয়েছেন শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে।

সরদার জয়েনউদ্দীন আর শামসুদ্দীন আবুল কালাম পল্লী-বাংলার আন্তরিক রূপকার। তাঁরা পল্লীর সহজ জীবনের মতো সহজ ভাষায় গল্প রচনা করেছেন। তাঁরা জীবনবাদী ধারার লেখক এবং ঐতিহ্য-আশ্রয়ী। কাঁচা আবেগের অপরিণতি তাঁদের মধ্যে লক্ষণীয়।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম রোমান্টিক কলমে গ্রামীণ প্রেমের আলেখ্য রচনা করেছেন। কিন্তু এই গ্রামীণ প্রেম আর স্বপ্নের ফোয়ারা দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা আর বঞ্চনার মরুভূমিতে কিভাবে শুকিয়ে যায় তাও তিনি বিশ্বস্ত-ভাবে দেখিয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার লেখক। বাংলা ছোট-গল্পের প্রচলিত ও পরিচিত ধারা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে তিনি আপন স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করেছেন। তাঁর ভাষা তাঁর নিজের। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও স্বতন্ত্র। যেমন তাঁর গল্পের অঙ্গসংস্থানে, তেমনি তাঁর কাহি-

নীর নির্মিতিতে অভাব হচ্ছে প্রাণের। তিনি যেন চোখ বন্ধ রেখে জীবনের দিকে তাকান। ইঙ্গিতে জীবনের বিচিত্র দিকগুলিকে, বিশেষ করে সঙ্গতি-হীন বৈচিত্র্যের দিকগুলিকে অস্ফুটভাবে তুলে ধরা, মানুষের অন্তরের কোনো কোনো গভীর কন্দরে সামান্য আলো ফেলা, জীবনের অবেদ্য বেদনা, অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তির অনুভবগুলিকে খুব যত্ন করে ঈষৎভাবে উদ্ভাসিত করার তাঁর প্রয়াস ছোটগল্পের ফর্মে সার্থক হতে পেরেছে।

আমাদের এই পর্বের গল্পের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি আবু ইসহাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মানবতার যে ভয়ঙ্কর অবমাননা ও বিপর্যয় হয়েছিল তার নিষ্করুণ মর্মজ্বালা তাঁর গল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি ভালো গল্প লিখেছেন। পল্লী-বাংলার প্রাণকে তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। সমাজে প্রাচীন ও অগ্রসর জীবনের, উঠতি নাগরিকতার ও সেকেলে গ্রাম্যতার এবং সেই সঙ্গে ধন ও নির্ধনতার যে দ্বন্দ্ব, তাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অনাচারের কাহিনী তিনি লিখেছেন। সচেতন শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্র তাঁর গল্পে পাওয়া যায়।

এই পর্বের আর এক বিশিষ্ট গল্পকার শাহেদ আলী। তিনি তাঁর অন্তরে রোমান্টিক। জীবনের মমতাময় ও করুণাময় দিকগুলির প্রতি তাঁর আসক্তি। কিন্তু তিনি তাঁর আর এক কৃতিত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। গল্পে তিনি অপ্রাকৃত ও উদ্ভট নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাধ্যমে তাঁর এক পারমার্থিক দর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই দর্শন সম্ভবত এই যে মানুষকে তার আত্মবলের দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে, এই হচ্ছে আল্লার ইচ্ছা। কিন্তু তার এই আত্মবলের স্পর্ধারও সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা করলে বিনাশের সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের আপন গল্পের রূপ ও প্রকৃতি এইভাবে গড়ে উঠেছিল। রূপ বা ফরম এবং প্রকৃতি বা ভাবনা এই দুই দিক থেকেই মোটামুটি-ভাবে দুটি ধারা গড়ে উঠেছিল। একটি হচ্ছে পূর্বাগত প্রচলিত ধারা যা প্রবহমান পরিচিত জীবন থেকে তার বিষয় নির্বাচন করেছে। সুস্থ জীবন-বোধ এবং বলিষ্ঠ মানবচেতনা এই ধারার আদর্শ। প্রচলিত রীতিগত ভাষাকে অবলম্বন করে এই ধারার গল্পের ফরম তার নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত

গতি লাভ করেছে। এই ধারার গল্পকারদের কাছে কাহিনী এবং বক্তব্য থেকেছে প্রধান, অঙ্গপ্রকরণের আড়ম্বর বা চমৎকারিত্বকে এঁরা বাহুল্য বলে মনে করেছেন। দ্বিতীয় ধারা যেটি গড়ে উঠেছিল সেটি বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যের টানকে অস্বীকার ও অবহেলা করে নতুন ভাবনার রূপদানে ব্রতী হয়। কাহিনীর গুরুত্ব এই ধারার গল্পকারদের কাছে কমে যায়। বক্তব্য যা থাকে তা আত্মগত সমস্যা-ঘটিত ও মননাশ্রয়ী। মনস্তাত্ত্বিক বিমূর্ত বিবরণ গল্পের সমগ্র দেহকে আবরিত রাখে। স্বভাবতই জটিল এক শিল্প-ভঙ্গিমা এই ধারার গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ভাষার অপরিচিত এক শৈলীও গড়ে ওঠে, ভাষার আপন স্বভাব থেকে যা স্বতন্ত্র। এখানে উল্লেখ্য যে পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭এর পর ভাষার প্রচলিত রীতিকে অবলম্বন করে গদ্যের যে নিয়মিত ধারাটি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল সেটি পরিণত ও প্রস্তুত রূপ লাভ করার আগেই এই শেষোক্ত গদ্যের চর্চা বা নিরীক্ষায় লেখকরা হাত দেন। এর ফলে এই তথাকথিত আধুনিক গদ্যও দুর্বল ও অব্যবস্থিতই থেকে যায়। আমাদের কবিতার বাধাবন্ধহারা আবেগ-তাড়িত ভাষাও অবশ্য নিকট প্রতিবেশীরূপে এই অব্যবস্থিত গদ্যকে উৎসাহ জুগিয়েছে। এই শেষোক্ত ধারার পথ যিনি দেখিয়েছেন তিনি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ। তাঁর এবং তাঁর অনুসারী লেখকদের গল্প থেকে প্রাণ বা জীবনের উৎসাহ বিদায় নিয়েছে।

আগেই বলেছি, ১৯৪৭এর পরে সময় অল্পই অতিক্রান্ত হয়েছে। আলোচ্য দুই ধারা যে স্পষ্ট দুই খাত কেটে প্রবাহিত হয়েছে তা নয়। বরং এই প্রধান দুই ধারা বহু সংকীর্ণ ও অগভীর জলরেখারূপে চতুর্দিকে সর্পিল গতিতে সঞ্চরমান। এমন হয়েছে যে ঋজু জীবনবাদী ধারার উপর অব্যবস্থিত জটিল ধারার এক বা একাধিক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য প্রভাব ফেলেছে। আমাদের জীবনে যেমন রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিরতা আসে নি, সেইরূপ আমাদের বাংলাদেশীয় ছোটগল্পেরও কোন একটি প্রধান পরিচয় খুব সম্ভব এখনো মূর্ত হয়ে ওঠে নি। সদর্থক নঙর্থকের প্রাথমিক স্তরের দ্বন্দ্বই এখনো চলছে। আমাদের এখনো অপেক্ষা করতে হবে।

আমাদের পঞ্চাশের দশকের গল্পের কোন্ স্বভাবটিকে প্রধান স্বভাব বলব? ঐতিহ্যাগত, জীবনবাদী ও বস্তুমুখী ধারাটি এই দশকে প্রবল থেকেছে

তাতে সন্দেহ নেই। বলা যায়, আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাদের গল্পে এক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিই প্রথম প্রকৃত শ্রমিক-জীবনের আলেখ্য উপহার দিয়েছেন। শ্রেণী-সংগ্রাম ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা তাঁর গল্পে মূর্ত হয়েছে। তিনি সচেতনভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণমুখী কথাসাহিত্যের জীবন্ত ধারাটিকে পূর্ব বাংলার ছোটগল্পে প্রবর্তন করেছিলেন। খুবই বিশিষ্ট তাঁর এই অবদান।

পরে তিনি ক্রমশ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যাগুলিকে তিনি রূপায়িত করতে থাকেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব সমস্যা অপেক্ষা এই জীবনের গভীরতর সমস্যা, মর্মের সমস্যার দিকে তাঁর ঝোঁক বাড়তে থাকে। তিনি অবশ্য মধ্যবিত্তের দীপ্ত বুদ্ধি, চৌকস নগর-ভাব, ধর্মের ভণ্ডামি, বুর্জোয়া সভ্যতার সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বের আঁকা শ্রমিক ও কৃষক-জীবনের চিত্রাবলীতে যে ঐকান্তিকতা ছিল, সেই তুলনায় এই সব গল্পকে কৃত্রিম মনে হয়। তাঁর ভাষা এই সব বিষয়ের উপযুক্ত ছিল না। আমাদের এই পর্বের গল্পকাররা একটা তাড়না এই অনুভব করেছিলেন যে তাঁরা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের তুলনায় এবং বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন; এই পশ্চাদ্বর্তিতার ফাঁক তাঁদের পূরণ করে অগ্রসর হতে হবে। এই তথাকথিত ফাঁক-পূরণের ব্যাপারটা আমাদের কবিতার পক্ষে সহজ ছিল, কারণ কবিতাকে সহজেই বিমূর্ততার শিল্প-রূপায়ণ বলে ধরে নেওয়া গেছে। কিন্তু গল্পের কারবারে বস্তু-জগৎকে বাদ দেওয়া যায় না, এবং গল্পের মাধ্যম গদ্য। অপরিণত গদ্য নিয়ে অকারণে গদ্য-শিল্পের অসম্ভব সব ভুবন-রচনার চেষ্টা করা হয়েছে যার দরকার ছিল না। চলতি সমাজ-দৃশ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রকৃতি ও মানের সম্পর্ক যে অবশ্যম্ভাবী, এই কথাটি ভুলে যাওয়া হয়েছিল। তাই আমাদের ছোটগল্প তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে তার আপন ভুবনকে হারিয়েছে, নতুন ভুবনও তেমন কিছু সৃষ্টি করা যায় নি।

মিন্নাত আলী কিছু হাস্যরসের গল্প লিখেছেন। তাঁর অন্যান্য গল্পেও কৌতুকের ছোঁয়া রয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের, সমাজপতিদের, রাষ্ট্রের অবিচারের কাহিনী বিবৃত করতে বসে তাঁর কৌতুক শেষ পর্যন্ত ভয়ানক

বিদ্রূপ হয়ে উঠেছে। তিনি অত্যন্ত সমাজ-সচেতন লেখক, আপন লেখক-দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এই বলে খেদ করেছিলেন যে তিনি আটপৌরে মনের উপর থেকে পোশাকী মার্জিত মনের অবাঞ্ছিত নির্মোকটিকে খসাতে পারেন নি। তাঁর গল্পে সমাজ-চিত্র পাওয়া যায়, জীবনের প্রকৃত সমস্যাও ছায়াপাত করে। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে এই সমস্যার উপর এবং তাঁর বাস্তব চেতনার উপর ভাবপ্রবণ আবেগের প্রভাবই প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি দক্ষ গল্পকার। সূক্ষ্ম ইঙ্গিতরচনায়, গল্পের পরিবেশরচনায় তিনি পারঙ্গম। এই কালে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে উঠতি বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রভাবাধীন যে বিশেষ নাগরিকতা, নাগরিক শিল্পদৃষ্টি ক্রমে রূপলাভ করেছে, এক সামন্ত-বুর্জোয়া আভিজাত্য গড়ে উঠতে শুরু করেছে, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ছিলেন তার সূচনাকার। তাঁর গল্পে পাওয়া গেছে রহস্য-তৃষ্ণা; রূপের, যৌবনের, প্রেমের, সুন্দরের সমস্যা; মাতৃত্বের, নারিত্বের সমস্যা, দার্শনিকতা ও মনোসমীক্ষায় তাঁর প্রবল আসক্তি। মনের গভীর অন্ধকার প্রদেশে তিনি আলো ফেলেন। জীবনের বস্তুগত সমস্যা নিয়ে কালক্ষেপ করেন না।

হাসান হাফিজুর রহমান সমাজচিন্তামূলক, ইঙ্গিতময়, বক্তব্যপ্রধান গল্প লিখেছেন। সাম্প্রদায়িক হানাহানির ভয়ঙ্কর যূপকাষ্ঠে মানবতার মর্মন্তুদ বলির চিত্র তিনি তাঁর এক গল্পে অঙ্কন করে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু যে গল্প তিনি বেশি লিখেছেন তা হচ্ছে মধ্যবিত্ত জীবনের উচ্চ ভাবের গল্প। এই সব গল্প মানবিকতার উচ্চসুরে বাঁধা। পল্লীর নিরন্ন মানুষের অন্ন-সমস্যার তীব্র গল্পও তিনি লিখেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক বুদ্ধিবাদী গল্পকার। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিবাদী জীবনের মনোভূমি তাঁর প্রধান বিচরণক্ষেত্র। তবে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়, বরং মরমী ভাবুকতা ও দার্শনিকতা তিনি মেশান। সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, চমক, সূক্ষ্ম রসিকতা, পরিশীলিত নাটকীয়তা, আত্মভাব এই সব তাঁর বৈশিষ্ট। গভীর হৃদয়ের গহন ছায়ায় তাঁর গল্প প্রায়শ কোমল। এমনকি দুরন্ত গাঙের মাঝি বা অশিক্ষিত পল্লী-কবির জীবনের জাগতিক সব চিত্রও শেষ পর্যন্ত সেই রহস্যময় লক্ষ্যে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। সাধারণ মানুষের প্রখর

জীবনের সমস্যা নিয়েও গল্প তিনি লিখেছেন, কিন্তু হালকা মেজাজে। তিনি পাশ্চাত্যের বিমর্ষ অবক্ষয় ও নৈরাশ্যকে তাঁর গল্পে চারিয়ে দিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে নাগরিক গল্পকার-রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে কোমল, মরমী ভাবটিই তাঁর গল্পে প্রবল। অবশ্য প্রতীকাশ্রয়ী চেতনা-প্রবাহের নব-নিরীক্ষার ধারা তিনি আমাদের ছোটগল্পে এনেছেন।

আবদুশ শাকুর গভীর ও তীব্র সব ইঙ্গিতবাহী সমাজসচেতন গল্প লিখেছেন। কিন্তু দুটি জিনিস তাঁর বাস্তবমুখী গল্পগুলিকেও ভিন্ন এক চারিত্র্য দান করেছে। তার একটি হচ্ছে তাঁর গল্পের এক অনতিসরল দার্শনিকতার ভাব। অন্যটি মনন-নির্ভর অত্যন্ত জটিল এক ভাষা-প্রকরণ।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাধারণ মানুষের কথা লিখেছেন কিন্তু সাধারণের ভাষায় নয়। তাঁর ভাষা গম্ভীর ও দৃঢ়। পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন জীবনের গল্প তিনি লিখেছেন। জাগতিক সমস্যা-উপস্থাপনের একটি অনতিপ্রকট শিল্প-সুন্দর ভঙ্গি তাঁর রয়েছে। পরের দিকে অদ্ভুত জিনিস যেটি লক্ষ্য করা গেছে, সেটি হচ্ছে এই যে, মধ্যবিত্তের চেয়ে বিত্তহীন কৃষক-মাঝির গল্পই তিনি বেশি লিখেছেন, কিন্তু ক্রমাগত হৃদয়ের ও মনের সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে এবং তিনি শেষ পর্যন্ত মনোবিকলনে গিয়ে পৌঁছেছেন। একজন বড় গল্পকারের তাঁর আপন স্বভাবটিকে তিনি অক্ষুণ্ন রাখেন নি।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ দক্ষ ও শক্তিমান গল্পকার। তিনি প্রকৃত নাগরিক গল্পকার। ভয়ানক নির্লিপ্ত তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলী। অত্যন্ত মার্জিত ও পরিস্রুত। আবেগ, উত্তেজনা বা নাটকীয়তা সেখানে নেই। বুর্জোয়া নগর-জীবনের বুদ্ধিবাদী অনুচিন্তনই তাঁর এলাকা। ভদ্র সমাজের ভেতরের জটিল, ক্লিন্ন এবং ক্লীব পরিচয় তিনি খুব শিল্পসম্মতভাবে উদ্‌ঘাটন করেন। গল্পে তিনি নিপুণভাবে সঙ্কেতের ব্যবহার করেন। জীবনের প্রতি তাঁর তির্যক ও বীতরাগ দৃষ্টি। জনজীবনকে তিনি গড্ডলিকার সঙ্গে এবং উন্মত্ত অন্ধ শক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এই হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্পের পরিচয়। এক কথায় এই পরিচয়ের মূল বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে নির্দেশ করা যায় যে দেশকাল-সম্পৃক্ত পরিচিত জীবনকে ধারণ করে দেশকাল-অতিক্রমী শিল্পের অনন্ত আকাশ-সৃজনের একান্ত প্রয়াস এই কালে হয়। কিন্তু বুদ্ধিবাদী মধ্য শ্রেণীর

বিকাশের যে স্তরে শিল্পের এই প্রকার উদ্ভাসন সম্ভব হয় সেই স্তর তখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি বলে এই শিল্প-সাধনাও আমাদের পরবর্তী ছোটগল্পের পক্ষে তেমন কোনো মজবুত পশ্চাৎভূমি হয়ে উঠতে পারে নি।

পঞ্চাশের দশকে একই সঙ্গে পাশাপাশি জীবন-রূপায়ণ ও জীবন-নিরপেক্ষ শিল্প-সর্বস্বতা দেখা গেছে। প্রথমোক্ত ধারাই প্রবল ছিল। ষাটের দশকেও এই পরিস্থিতিরই অনুবর্তন হলো। তবে শিল্পের গ্রাস আরো বাড়ল। লেখকদের মধ্যে মূল্যচেতনা গড়ে ওঠার খুব সুযোগ এই দশকে ছিল না। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন ছিল স্বৈরাচারী। এই প্রশাসনের সঙ্গে লেখকদের সম্পর্ক ছিল প্রধানত নিস্পৃহ। এই প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্কও ছিল না, আবার দ্বন্দ্বও ছিল না। প্রকৃত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যদি থাকত, তাহলে লেখকদের মধ্যে জাতীয়তার তীব্র বোধ জাগ্রত হতো, দেশের জনমানুষকে খুব নিকটে তাঁরা দেখতে পেতেন। কিছু লেখকের মধ্যে জীবন-সংক্রান্ত এবং দেশের মানুষ-সংক্রান্ত মাত্র অস্পষ্ট এক কেতাবি মূল্যবোধ ছিল। ছোটগল্পে তার রূপায়ণ ঘটেছে। এই কালে জীবনবাদী লেখকদের গল্পেও দেশের জনমানুষের তাজা প্রাণকে পাওয়া যায় না, শিল্পের বা অন্য কোনো বাতিকের বোঝার নিচে তা দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে থাকে। এই দশকের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে সৃষ্টির উৎসাহেই ভাটা পড়া। আগের গল্প-লেখকরা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, নতুন লেখক খুব বেশি আসেন নি। যাঁরা এসেছেন তাঁরাও যে খুব বেশি লিখেছেন তা নয়।

শওকত আলীর বেগবান স্বচ্ছন্দ প্রকাশক্ষমতা রয়েছে। তিনি মাটি-ঘেঁষা মানুষের জীবন-কাহিনী লেখেন। দেশের মাটির গন্ধ তাঁর গল্পগুলিকে সমৃদ্ধি দান করে। শোষিত, বঞ্চিত মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা, তাদের নিষ্ঠুর শোষণের স্বরূপ তাঁর গল্পের প্রধান দিক। আঞ্চলিক লোক-জীবনের কাহিনীকে তিনি বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি প্রদান করেছেন। তাঁর গল্পগুলি মানবিক আবেদনে ভরপুর। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিরোধ-স্পৃহার ঝিলিকও তাঁর গল্পে পাওয়া গেছে। শওকত আলীই হচ্ছেন সেই লেখক যাঁর গল্পে পল্লী-বাংলার সুপ্ত সন্তপ্ত প্রাণকে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত যে-কাজটি করেছেন সেটি এই যে, তিনি পেটের ক্ষুধার প্রহার অপেক্ষা যৌন-ক্ষুধার প্রহারকে মানবজীবনের প্রবলতর নিয়ন্তারূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর

পাত্র-পাত্রীর অপূরণীয় যৌন-বাসনা, উৎক্ষিপ্ত আদিম জৈব ক্ষুধা তাঁর গল্পের সম্ভাবনাকে অন্যায় খাতে প্রবাহিত করেছে।

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর ইতিহাস রূপলাভ করেছে। তিনি যেন ভয়ঙ্করেরই রূপকার। একদিকে আছে তাঁর এই জীবন-রূপায়ণের ভয়ঙ্কর বাস্তব-প্রবণতা, অন্যদিকে আছে এই রূপায়ণের তাঁর এক আপন পদ্ধতি। পদ্ধতিটি তাঁর সম্পূর্ণত আপন নয়। তাঁর ভাষায় ও বিবরণে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র খুব প্রভাব রয়েছে। তবে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র থেকে তাঁর ব্যবধান আবার এই যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র অশেষ বর্ণনাকে কখনো ব্যাপক বলে মনে হয় না, কিন্তু হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পের ঘটনাগুলিকে বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তোলেন। তাঁর গদ্যে রয়েছে কাব্যের অফুরন্ত সৌন্দর্য, পূর্ণিমার চরাচরব্যাপী কোমল জ্যোৎস্নার মতো। ভাষার এই সৌন্দর্য তাঁর গল্পের বিষয় ও বক্তব্যকে আবৃত, আচ্ছন্ন ও বিমোহিত করে। তার ফলে তাঁর হাতে ছোটগল্পরূপ এই গদ্য-শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। তাঁর কালো মাটির ঘনশ্যাম মৃৎপুত্তলিগুলি যেন তাঁর গল্প-দেহের বৃহৎ কারুমণ্ডিত স্বর্ণ-আধারে কোথায় তলিয়ে যায়। তবে স্বীকার করতে হবে বিষয় ও প্রকরণের তাঁর এই বৈপরীত্য, বরং এই বৈপরীত্যের বিচিত্র এক সমন্বয় এক অভিনব শিল্প-চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে এবং সেটা তাঁর পাঠককে কম আকর্ষণ করে না। তিনি জীবনবাদী, সমাজ ও আদর্শ-সচেতন গল্পকার। অনেক গল্পেই তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন, গণমানুষের সংগ্রামের অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বাস রেখেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল শিল্পক্ষুধা। আমাদের মতো অনুন্নত সমাজে ও শিল্প-ঐতিহ্যে বিত্ত-ক্ষুধার মতোই এইরূপ চিত্ত-ক্ষুধা বা শিল্প-ক্ষুধা থাকে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের মনে সুপ্রোথিত, জন্মগত ও আত্মগত বেদনা আছে। এই বেদনার উৎসার নয়, বরং তার লালনেই তিনি খুশি। বিশ্ব নিত্য অবোধ বেদনায় মুহ্যমান, এই বেদনার পরিব্যাপ্ত অন্ধকার ছায়ায় তাঁরও সুখ নেই, শান্তি নেই। এই দুঃখকে প্রস্ফুট করার সাধ্য তাঁর আছে। তাঁর দুঃখ অশেষকে পাওয়ার অসম্ভব বাসনার ব্যর্থতার দুঃখ বলে এর

নিবৃত্তি নয়, বরং মর্মে এর স্থায়ী বসতি রচনায় আত্মরতিতে তিনি মগ্ন। জনজীবন থেকে আত্মনির্বাসিত এই শক্তিশালী লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু সুগ্রথিত, যথাযথ ও গম্ভীর। অনায়াস তাঁর বর্ণনা।

রাহাত খান একান্ত নিজস্ব রীতিতে নিজস্ব ভাবনাকে রূপদান করেন। তিনি আত্মস্থ শিল্পী, নিজেতে নিজে মগ্ন। তিনি আচ্ছন্নভাবে সমাজচিত্রকে যতটা পারেন পরিস্ফুট করেন। ভদ্র পোশাকের নিচে নাগরিক সভ্যতায় যে দগ্‌দগে ক্ষত তা তিনি ক্ষমাহীনভাবেই উদ্‌ঘাটন করেন। এবং হাল-জামানার সমাজচিত্রই তাঁর বিষয়। এবং অপরাধীকে, দুরাচারকে তিনি সমুচিত দণ্ডও দেন। তবে তিনি আসলে নষ্ট পৃথিবীর নষ্ট শিল্পী। যৌনতা ও জৈবিক ক্লিন্নতা নিয়ে তিনি একটু বেশি কারবার করেন। আবার এক ধরনের অতীন্দ্রিয় বৈরাগ্য তাঁর যৌনতাকে সহজ মুক্তি দান করে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ স্বচ্ছন্দ কিন্তু বলিষ্ঠ ভাষায় কতকগুলি ভালো গল্প লিখেছেন। তিনি জীবনবিমুখ শিল্পী। গল্পে তাঁর যে দর্শন উপস্থাপিত হয়েছে সে হচ্ছে পরাজয়ের, অবক্ষয়ের, অবচেতনার, মূল্যহীনতার ও লক্ষ্য-হীনতার দর্শন। লক্ষ্যহীনতার লক্ষ্যকে তিনি উৎসাহের সঙ্গে অর্জনের চেষ্টা করেছেন। অভিনবত্বের চমক সৃষ্টির মোহে আপন ঐতিহ্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তিনি পরকীয় ঐতিহ্যের দিকে মুখ করেছেন। তিনি আমাদের ছোটগল্পে নব-নিরীক্ষার উদ্‌গাতা।

১৯৭১ সালের পর আমাদের ছোটগল্পে এক নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে। সেটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক ছোটগল্প বেশ লেখা হয়েছে। এই সব গল্পের শিল্পমূল্য এবং সাহিত্যে এদের প্রকৃত স্থানটি কী তা নির্ধারণে সময় লাগবে। তবে এই সব গল্প যে আমাদের গল্প-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক রস ও পরিপ্রেক্ষিত যোগ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই হচ্ছে আমাদের ছোটগল্প। অনতিদীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি যা হয়েছে তা কম নয়। বৈচিত্র্যও সামান্য নয়। এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের ভেতর থেকেই আমাদের ছোটগল্পের একটি জাতীয় তথা আপন বৈশিষ্ট্য অদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করবে, এ আশা করা যায়।

বশীর আল্‌হেলাল

নছর প্যায়াদা

ইবরাহিম খাঁ

কোথায় তার বাপের বাড়ী কেউ তা জানত না। কথার ঢং চমৎকার শুনে লোকে মনে করতো, ওর জন্মস্থান বুঝি শান্তিপুর। কেন সে এই তরুণ বয়সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল, তাও কেউ বলতে পারত না। অথচ যারা তাকে দেখত, তারাই ভাবত—এই কান্তিময় সুন্দর যুবক—আহা! না জানি কোন্ মায়ের বুকের খাঁচা খালি করে এ-নিঠুর পাখী পালিয়েছে রে! কিন্তু কেন সে পালায়? পালিয়ে চাকুরি নেয় তো প্যায়াদার চাকুরী কেন? ও কি দেশে খুন করে ভেগেছে? তাই এই প্যায়াদাগিরীর ছদ্মবেশ? হবেও বা। কিন্তু নাও'তো হতে পারে।

এমনি হাজারো প্রশ্ন তার পরিচিতদের চিত্তে দোলা দিত। কিন্তু কেউ তার জবাব পায়নি; জবাব মিলল না বলে কেউ রাগও করেনি। যে পাঁচ মিনিট তার কথা শুনত কিংবা দশ মিনিট তার সোহ্বতে বসত, সেই নিজ মনের কোণে তার জন্য একটু ঠাঁই করে দিত। সে আর তাকে প্যায়াদা বলে ডাকত না, বলত 'খাঁ সাহেব'। সে ডাকে নছর এমন সহজ শান্তভাবে সাড়া দিত যেন অমনভাবে সম্বোধিত হওয়া তার সর্বজনস্বীকৃত জন্মগত অধিকার।

অথচ নছর প্যায়াদার উল্লেখযোগ্য কোন গুণই ছিল না। সে নামাজ পড়ত, কিন্তু খুব নিয়মমত নয়; ফকীর-মিস্কিন সামনে গেলে ভিক্ষা দিত; কিন্তু তার আওয়াজের ধমকে কোন জানাশুনা ফকীর তার কাছে ভিড়ত না। তার মোকাবেলা দুর্বলের উপর জুলুম করে, এমন সাধ্য কারও ছিল না। অথচ সে নিজে কোন দিনই বাজার-দরে মাছ কিনেনি, অল্প পয়সায় তুষ্ট হয়ে রায়তের বাড়ী হতে ফিরেনি; দরকার মোতাবেক ফাঁকি-ফুঁকি দিতেও রেয়াত করেনি।

তবু যে নছর প্যায়াদাকে সবাই কেন ভালবাসত, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারত না। নছর প্যায়াদার চেহারায়, কথায়, ভঙ্গীতে একটা আভিজাত্যের লাবণ্য ছিল; তার জোর-জবরদস্তীর পেছনে একটা সরল অধিকারবোধ ছিল, বোধহয় তাই তাদেরকে মুগ্ধ করতো।

সে যে অল্প দামে জেলেদের কাছ থেকে মাছ নিত, সে যেন তার সনাতন অধিকার-বলে, জালেমের অন্যায় জোরে নয়। সে মহারানী হেমন্ত কুমারীর প্যায়াদা; মহারানী ডালার মাছ পান; ডালার মাছে দেওয়ানের ভাগ মিলে, নায়েব মশাইও বঞ্চিত হন না, একা সে বাদ পড়বে কেন? জমিদারীতে প্যায়াদার জন্য ডালার মাছের দস্তুর নাই; এই জন্য? কিন্তু এ-দস্তুর কর্তারা করলেন না কেন? রানীমার মুখ আছে, তাঁর প্যায়াদার মুখ নাই? দস্তুর যদি না থাকে না থাক; নছর খাঁও তার দস্তুর নিজেই করে নেবে।

নছর প্যায়াদার ফাঁকিতেও কি যেন একটা ছিল। সে ফাঁকিতে পড়ে যার নোকসান হত, সেও টের পেয়ে মনে মনে হাসত, ভাবত, বাপ্‌রে বাপ! ব্যাটা কি ওস্তাদের ওস্তাদ!

জেলেরা গিয়ে একদিন নায়েব মশাইকে সেলাম দিয়ে বলে: কর্তা, রক্ষা করুন, নছর প্যায়াদার জ্বালায় আর বাঁচিনা।

—কেন, মাছের তোলা তোলে বলে?

—না কর্তা। ঐ ফকীরের ভিক্ষায় উঠবে নছর প্যায়াদার মন?

—মানে?

—বাজারের সেরা মাছটা তার চাই-ই।

—বেশ তো তোদের একজন বড় খরিদ্দার জুটে গ্যাছে।

—কিন্তু দাম দেওয়ার বেলায় যে অর্ধেকের বেশী দেয় না, কর্তা?

—এই, কে আছিস্ রে? নছর প্যায়াদাকে ডেকে আন্।

নছর এসে সালাম করে দাঁড়াল।

—কর্তা, ডেকেছেন?

—হ্যাঁ। দেখ, তুমি আর হাটে যেতে পারবে না।

—নছর খাঁর অপরাধ?

—তুমি হাটে গেলেই জোর করে মাছ নেও।

—কিন্তু রানীমার নায়েব যদি হাটে যায়, তবে রানীমার প্যায়াদা সাথে না গিয়ে পারে ?

—তা বেশ পারে ; নায়েব একাই হাটে-বাজারে যেতে পারে।

—হ্যাঁ, নায়েব একা হাটে-বাজারে যেতে পারে, কিন্তু নছর প্যায়াদা তার রানীমার নায়েবকে একা যেতে দিতে পারে না।

—কি ? তুমি জোর করবে ?

—আল্‌বৎ জোর করবো নায়েব মশাই।

—তার মানে ?

—মানে সহজ। রানীমার চাকুরীতে নছর খাঁর চুল পেকে এলো। আপনি তো গতকাল এসেছেন, আসছে কাল চলে যাবেন। কিন্তু আমার রানীমা আছেন, আর তাঁর নছর প্যায়াদা আছে।

—তুমি বলতে চাও কি শুনি ?

—বলতে চাই এই যে, রানীমার নায়েবের একা হাটে-বাজারে যাওয়ার মানে রানীমার' বেইজ্জতী। নছর প্যায়াদা বেঁচে থাকতে সে তার রানী-মাকে অমন বেইজ্জত হতে দেবে না।

—তা বেশ। কাচারীতে অন্য প্যায়াদা আছে, তারা সাথে যাবে।

—হ্যাঁ, তা যেতে পারে। তবে নছর খাঁ কাচারীতে হাজির থাকতে তাকে বাদ দিয়ে কোন্ ব্যাটা প্যায়াদার হাটে যাওয়ার হিম্মৎ হয়, তাও তো বুঝি না।

—বেশ, আমি হাটে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম, তবু তোমার হাটে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে।

—ভাল, ভাল, তাই হবে। আর নছর প্যায়াদা হাটের চৌহদ্দীতে পা দেবে না।

সাতদিন পর। ফের এক জেলে এসে নায়েব মশাইর কাছে হাজির। জোড়হাতে বলে—

—কর্তা ?

—আবার কিরে ?

—আজ্ঞে নছর প্যায়াদা মাছ এনেছে, তার দাম বাকি।

—নছর খাঁ ?

—আজ্ঞে ?

—এধার আও।

—আজ্ঞে এই আস্‌ছি।

—ফের তুমি হাটে গিয়েছ ?

—কখখনো না। নছর খাঁ তার জবানের খেলাফ কাজ করে না।

—ওর মাছ তুমি আননি ?

—আজ্ঞে না।

—কি বলিস্ রে মাঝি ?

—আজ্ঞে, আমি নিজ হাতে পথে একটা মস্ত চিতল নামিয়ে দিয়ে গেছি।

—নছর, এখন কি বলতে চাও ?

—আজ্ঞে কর্তা, শুনলেনই তো সেই মাছটা আমি আনিনি, ঐ-ই দিয়ে গেছে। আর তাও হাটে নয়, পথে।

—তুমি মাছ পথে নামিয়ে দিলে কেন, মাঝির পো ?

—আজ্ঞে, খাঁ সাহেব চাইল, কেমন করে 'না' বলি ?

—ব্যাটা, আমার হুকুম বড়, না নছর খাঁর চাওয়া বড় ?

—আজ্ঞে, কর্তার হুকুমই বড়।

—তবে তোরা ওকে মাছ দিস্ কেন ?

—আজ্ঞে, নছর খাঁর হাঁক শুনলে যে কর্তার হুকুম ভুলে যাই।

—নছর খাঁ ?

—কর্তা ?

—এসব কি হচ্ছে ?

—কৈ, কর্তার কোন হুকুম তো নছর খাঁ অমান্য করেনি।

—কিন্তু পথ থেকেই বা তুমি মাছ নেবে কেন ?

—কর্তা, মৈষাল তার বাথান ঘিরে বেড়া দেয় বলে কি বাঘের শিকার কখনো বন্ধ থাকে ?

—আচ্ছা বাপু, এখন মাছের দামটা দিয়ে দাও দেখি।

—কর্তার অর্ধেক, জমা-নবীস বাবুর সিকি, শুমার-নবীশ বাবুর দুই আনা, এই দামটা দিলে বাকি দুই আনা আমি দিতে পারি।

—অঁা ! আমার আবার অর্ধেক কিরে ?

—আজ্ঞে, ঐ যে বিরাট চিতলটার অর্ধেক অন্দরে দিয়ে এলাম?

—তার আবার দাম দিতে হবে? আমি তো ভেবে রেখেছি, ওটা ডালার মাছ।

—আজ্ঞে, আমিও তো সেই ভেবেই মাছটা এনেছিলাম, তা এতক্ষণে অলক্ষুণে ব্যাটা দামের জন্য ফ্যা ফ্যা শুরু করেছে।

হাঁস-মুরগীর দাম দেওয়া সম্বন্ধে নছর খাঁর নিজস্ব থিওরী ছিল। সে বলত, হাঁস-মুরগী লোকে মেহ্নত করে পালে; তাদের খাবার খোরাক জোগায়, তাদের বাসা করে দেয়, তাদের নানা উপদ্রব সহ্য করে। কাজেই ও জীব দুটির ন্যায্য দাম দেওয়া চলে। কিন্তু মাছের কথা তো আলাদা। ওরা আল্লার দরিয়ায় বাস করে; যা পায় নিজেরা কুড়িয়ে খায়, বিনা যত্নে বড় হয়। এক ব্যাটা জেলে কোথা থেকে একদিন ঘুপ করে এসে সুপ করে একটা জাল ফেলে টুপ করে কতকগুলি রুই-কাতলা ধরে নিয়ে বাজারে চুপ করে বসে পড়বে, আর মাছ চাইলে লাখ টাকা দাম হাঁকবে। একী বরদাশত করা চলে? কাজেই কম দামত ওরা পাবেই।

নছর খাঁ নিজের থিওরী মোতাবেক হাঁস-মুরগীর দিত বাজার দাম, মাছের দিত বাজারের আধা দাম। তবে তার হাতে কোন দিন পয়সা না থাকলে মাছ-মুরগীওয়ালার বিপদ ছিল। সে বলত, পেটে নছর খাঁকে কিছু দিতেই হবে। হাত খালি বলে পেট খালি থাকবে? তবে হাত খালি লোকের পেটে খোদা ক্ষিদে দেয় কেন?

শেষোক্ত ঘটনার আরো সাতদিন পরের কথা। হাটবার। জেলে এসে নায়েব মশাইকে সেলাম করে, তারপর জোড়হাতে নালিশ জানায়:

—কর্তা, নছর প্যায়াদাকে ফের হাটে যাওয়ার হুকুমটা দিয়ে দিন।

—তার মানে?

—কর্তা, হাটে নানান পথে নানান মাঝি মাছ আনে, নছর খাঁ হাটে গেলে আজ এ-দোকান, কাল ও-দোকান হতে মাছ নেয়।

—তারপর?

—কিন্তু হাটে যাওয়া বন্ধ হওয়ায় কেবল এই এক পথের মাঝিকেই সে পাকড়াও করে।

—বটে! কিন্তু দাম দেয় তো?

—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ। তাও আবার সব সময় নয়।

—সে কেমন ?

—যেমন আজ মাছের দাম দিল না।

—হাতে বুঝি পয়সা নাই ?

—আসল কথা তাই-ই, কিন্তু অত বড় শরমের কথা সে এই ঝালোর পুতের কাছে স্বীকার করবে ?

—তা হলে কি করে ?

—সে কয় অন্য কথা।

—যেমন ?

—কাচারীর পুকুর হতে মাছ ধরে নিতে কয়।

—অর্থাৎ ?

—বলে, 'মাঝির পো, তোমার মাছ কেটেকুটে ধোয়ার জন্য নিয়ে গেলাম ঐ পুকুরে। কিন্তু কেমন জাতের মাছই তুমি দিয়েছিলে যে পুকুরে নিতেই সে মাছ লাফিয়ে পুকুরে চলে গেল। তা রানীমার বিলের মাছ রানীমার পুকুরেই যদি যায় তবে নছর খাঁ তাতে বাধা দেয় কি করে ? তা বাবা মাঝির ব্যাটা, তোর যদি পরানে না সয় তবে ঐ পুকুর থেকে মাছটা টপ করে ধরে নিয়ে যা, আর আমাকে জ্বালাতন করিস্‌নে।'

নায়েব মশাই হেসে বললেন: "শয়তান ! আচ্ছা নছর প্যায়াদাকে হাটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে।"

জেলে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে সেলাম দিয়ে চলে যায়, বলে যায়, 'কর্তার বড় দয়া।'

আর এক হাটবার। হাটে নছর খাঁর সাথে আক্কেল শেখের দেখা। আক্কেল বলে:

—খাঁ সাহেব, একটা কথা কব ?

—হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, ভাল কথা মনে করেছ; আমি তোমাকেই সেজন্য খুঁজছিলাম।

—বড় ভাল হল, খাঁ সাব। তাহলে দামটা দিয়ে দিন, নইলে আজ আমার হাট হবে না।

—বেশ। তা ভাই চট করে হিসাবটা করে ফেল তো?

—নয় আনার মুরগী ছয় আনা দিয়েছেন, তিন আনা বাকী, এই তো সহজ হিসাব।

—আচ্ছা, ও তো হলো তোমার পক্ষের হিসাব, আমার পক্ষের তো একটা হিসাব আছে।

—আবার আপনার পক্ষের হিসাব!

—নিশ্চয়, রানীমার কাচারীতে কাজ করি, বাবা, আমরা হিসাব ছাড়া এক পা চলতে পারি? আমাদের নিকাশী সেরেস্তা বলে একটা আলাদা সেরেস্তাই মোকারার আছে।

—সে তো গেলো বড় বড় হিসাব-নিকাশের কথা, আমার একটা তুচ্ছ মুরগী—

—আরে বাবা, হিসাব করে লেনদেন করা যাদের অভ্যাস হয়ে যায়, তারা হাতীর হিসাবও রাখে, চড়ুইর হিসাবও রাখে।

—আচ্ছা, তা হলে বলুন, কি আপনার হিসাব?

—তোমার মুরগীটা রান্না করতে আমার খরচ হল—

গরম মসলা	-	-	/১০
লবণ	-	-	৻৫
ঘি	-	-	।১০
আলু	-	-	৻১০
লাকড়ী	-	-	৵১০

—মোট কত হল বল তো আক্কেল মিয়া?

—মোট হল সোয়া নয় আনা।

—বাঃ ঠিক ধরেছ। এই সোয়া নয় আনা আর দিয়েছি ছয় আনা, মোট সোয়া পনর আনা, এ হতে তোমার পাওনা তিন আনা বাদ দিলে কত না থাকে?

—সোয়া বার আনা।

—আচ্ছা বাবা, এই সোয়া বার আনা পয়সা আমাকে দিয়ে খালাস হয়ে যাও।

—আঁ! আমি দিব? কেন?

—বাবা, পচা মুরগী দিয়েছিলে ; রান্নার পরেই তো দুর্গন্ধে কাচারী ভরে গেল ; সমস্ত নিয়ে রানীমার ঐ পুকুরে ফেলে দিয়ে তবে রক্ষা, এখন গরীব নছর খাঁর ক্ষতিপূরণটা তো বাবা তোমাকে করতেই হয় ।

—আমার কাছে আজ হাট করবার এক গণ্ডা পয়সা নাই, আর আমি এই গুনাগারী দিব ?

—তা বাবা, অমন তো তাড়াহুড়া নাই ; আজ না দিতে পার থাক্ । ফের যখন মুরগী নিয়ে আসবে তখন না হয় একটা ছোট্ট বাচ্চা নছর খাঁর ঘরের মধ্যে ঢিল মেরে ফেলে দিয়ো ।

—আঁ ! এক মুরগী দিয়েছি আসল, আর এক মুরগী তার ফাও ?

—আচ্ছা, যা বাবা, যা, মাফ দিলাম, আর কিছু দিতে হবে না ।

নছর প্যায়াদা মহলে গেছে। কেমন করে আগেই খবর পেয়েছিল, আসামী পলাতক। ভয়ে আসামীর পাড়ার লোকেরা পর্যন্ত সরে পড়েছে। সুতরাং নছর খাঁর ভাগ্যে সেদিন বিদায়-আদায় ভালমানষী কিছুই জোটেনি। এদিকে তার ঘরে চাল বাড়ন্ত। উপায় কি, ভাবতে-ভাবতে নছর খাঁ কাচারীতে ফিরছে ।

আসতে আসতে নছর দেখে, পথের পাশের বিলের পারে মহা ভীড়। নছর এগিয়ে যায়। দেখে বিরাটকায় এক কাছিম বড়শীতে ধরা পড়েছিল, সবাই হল্লা করে সে কাছিম মারছে। নছর খাঁকে দেখে একজন বলল :

—দেখুন—দেখুন, খাঁ সাহেব, কি মস্ত কাছিম ।

—বারে বা: ! একি যার-তার কাছিম যে মস্ত হবে না ?

—ও বাবা, কাছিম তা আবার কার গো ?

—আরে, এ যে আমার রানীমার কাছিম ।

—অ্যাঁ ! তিনি আবার কাছিম পোষেণ নাকি ?

—পোষেণ না ? তাঁর পুটিয়ার বাড়ীর পুকুর ভরা যে ইয়া বড়া বড়া কাছিম।

—কিন্তু এত দূর হতে কাছিম এখানে ?

—চুপ, বেয়াদবের দল কাহার্কা। আমি বলছি রানীমার কাছিম, তার উপর আবার ছওয়াল জওয়াব। এই অপকর্মটি যে করে বসলে, তার কি করবে, এখন তাই আমাকে বল ।

—আমি তো কাছিম মারিনি, মেরেছে ঐ ফজুরালী ।

—না, খাঁ সাব, ঐ-ই আমাকে একটা বাড়ি দিতে বলেছিল তাই, তাই, আস্তে আমার লাঠিটার আগা কাছিমটার গায় ছুঁইয়েছি মাত্র।

—আরে রানীমার কাছিম—পুত্রহীন বিধবা-মানুষ। কোলের বাচ্চার মত আদর করে ঐ কাছিমগুলি তিনি পোষেণ। তাঁর কাছিমের গায় লাঠি ছোঁয়ানো আর তাঁর নিজের গায় লাঠি ছোঁয়ানো যে একই কথা। বাপু, তোমার কয় বছরের যে ফাঁসি হবে আমি ভেবেই অস্থির।

—কিন্তু নজরালী তার বড়শীতে কাছিম ধরে এ বিপদ ডেকে আনে কেন?

—ও ব্যাটা নজরালীও শূলে চড়বে।

—হায়! হায়! আমাদের কি উপায় খাঁ সাব? কি দিলে রেহাই পাব?

—চুপ! বকরীর দল। তোরা চুনোপুঁটি; তোরা আবার নছর খাঁকে দিবি কি রে? তোদের গাঁও-মোড়ল কই?

—ঐ তিনি আসছেন।

—ওগো মোড়লের পো, বলি, তুমি গাঁয়ে থাকতে এ-সব হচ্ছে কি? রানীমার কাছিমকে এম্‌নি করে যেখানে সেখানে লোকে ধরে মারবে?

—রানীমার কাছিম?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, একদম গাছ থেকে পড়লে যে! খবর পাওনি যে, রানীমার একটি আদরের কাছিম পুটিয়া হতে পুখরীয়া পরগণায় চলে এসেছে?

—না, পাইনি তো!

—না পেয়ে থাক, তুই দশ দিনের মধ্যেই পাবে। এই খবর দেশে দেশে পাঠানোর জন্যে রাজধানীতে পঁচিশ জন খোশনবীশ মকাররর হয়েছে, তা জান?

—কি করে জানব, খাঁ সাব, আপনারা না বললে?

—তা বেশ, আমি বলছি, বিশ্বাস কর। আর এই কচ্ছপ হত্যার কি সুরাহা তা আমাকে ঝটপট বলে দাও, আমি এক্ষুনি চলে যাব। কারণ নায়েব মশাই জিজ্ঞাসা করলে এর একটা কৈফিয়ৎ তো আমি না দিয়ে পারবো না।

গাঁয়ের মোড়ল বুদ্ধিমান মানুষ। সে নছর খাঁকে বাড়ি নিয়ে গেলো। সেখানে মোরগ-খিচুড়ীর ব্যবস্থা হল। বৈকালের দিকে দশটা টাকা ট্যাকে গুঁজে নছর খাঁ কাচারীতে ফিরল।

সেবার বড়শীলার রাখ হতে কাচারীতে ডালার মাছ এল। নায়েব মশাই ভাল মানুষ, ডালার মাছ প্যায়াদা-পাইককে না দিয়ে খান না। জমাদার

প্যায়াদার ভাগে পড়ল একটা বড় চিতল। জমাদার নছর খাঁকে ডেকে বললে, খাঁ সাব, মাছটা আর ভাগ করে নিয়ে কি হবে, আমার এখানেই আপনার দাওয়াৎ—নিজ হাতে মাছটা রাঁধুন, এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।

ভাল মাছের নামে নছর খাঁ বরাবরই পাগল। বাবুর্চীটিও বেশ ভাল। এত বড় একটা মাছ, মনের মত করে পাকাতে আর পাঁচজনে বসে খাবে, একথা ভেবে তার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। পরম আনন্দের সঙ্গে সে রান্নায় লেগে গেল।

রান্নাবান্না শেষ। এমন সময় জমাদার সাহেবের তুইজন মেহমান এসে হাজির। জমাদারের মন খুশী হয়ে উঠল। ভাবল, সুন্দর আয়োজন, বেশ করে মেহমানদারী করা যাবে। ডাকল—

—নছর খাঁ?

—জমাদার সাব?

—তুই জন মেহমান এলেন। এঁরা বড় ভালো মানুষ—একজন মুনশী, আর একজন হাজী; তুইজনই নেহায়েত পরহেজগার।

—তবেই তো মুশকিল হল। এখন এঁদের খাওয়াই কি দিয়ে?

—কেন? এত বড় চিতল মাছটা সবই তো আছে?

—একটু বিঘ্ন যে ঘটে গেল, জমাদার সাব?

—আবার কি বিঘ্ন ঘটল?

—জানেন তো কছইরা ব্যাটা শরাব খায়। ওর শরাবের বোতলে কিছু শরাব ছিল। তারই মধ্যে ভুলে তেল ভরে এনেছে, আর সেই তেল দিয়ে তো মাছ পাক করে ফেলেছি।

—আচ্ছা, জমাদার সাব, থাক—থাক—আমরা যাই ও-পাড়ায় বিয়াই-বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করি গিয়ে। আস্সালামু আলাইকুম।

—নছর খাঁ?

—আবার কি হল?

—কেন এই ভাল মানুষ তুটিকে ফাঁকি দিয়ে বিদায় করা হল, শুনি?

—বাঃ রে বাঃ, এত মেহনত করে মাছটা রান্না করেছি; পাঁচটা পেটি পাঁচজনে খাবো, এর মধ্যে আবার হঠাৎ এ সব ভাগী জুটতে চায় কেন?

—কিন্তু এঁরা যে মেহ্‌মান, নছর খাঁ।

—রেখে দিন্ মেহ্‌মান, জমাদার সাব। এ-সব হাজী-গাজী মেহ্‌মান যেখানে যায় সেখানেই মোরগের রান পায়। আজ এদেরকে খাইয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ বেচারা ঘোড়ার ঘাসী দুইটিকে বাদ ফেলতে চান তো? তা নছর খাঁ বাবুর্চীখানায় থাকতে অমন হয় না।

একদিন বিকালে নছর প্যায়াদা নায়েব মশাইর কাছে গিয়ে হাজির। সেলাম দিয়ে বলে :

—কর্তা, আমাকে পাঁচটা টাকা দিন।

—হঠাৎ টাকার কি দরকার হল?

—মহলে গিয়ে পরান মণ্ডলকে ফেরৎ দিব।

—বাবদ?

—সেদিন সে আমাকে পাঁচ টাকা ভালমানষী দিয়েছিল।

—তা আবার ফেরৎ কেন?

—কর্তা স্বয়ং যদি নজর সেলামী আট আনা নেন, তবে তো নছর প্যায়াদা পাঁচ টাকা নিতে পারে না।

—কে তোমাকে বল্ল যে, আমি আট আনা নজর সেলামী নিয়েছি?

—কর্তার সামনের ঐ কাঁঠাল গাছে যে ঘুঘু শালিকেরা বসে আছে, ওরা সবাই দেখেছে।

—তা ও ভক্তি করে দিয়েছে, আমিও নিয়েছি, তাতে এমন কি হল?

—আরে ছ্যা—ছ্যা। রানীমার ইজ্জত গেল—ইজ্জত গেল। মহারানী হেমন্ত কুমারীর নায়েব, সে-ই সেলামী নেয় আট গণ্ডা পয়সা। গলায় কলস বেঁধে ডুবে মরতে ইচ্ছা হয় না?

—কিন্তু ও ব্যাটা তো গরীব মানুষ; ওর কাছ থেকে বেশী নিয়ে ওকে খুন করতে বল?

—যান কেন কর্তা ও সব গরীব মানুষের কাছে? এত বড় জবরদস্ত মনিবের নায়েব, আপনি জগৎ-বেড় জালে দরিয়ার বুকে ধরবেন চিতল, কাতল, শিলিং। তা না করে আপনি গামছা পরে খুইয়া হাতে খল্‌সে-পুঁটি ধরতে পগারে নামেন কেন মশাই?

—তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ নছর খাঁ।

—আজ্ঞে কর্তা, ঐ তো নছর প্যায়াদার দোষ। আর রানীমার ইজ্জতের কথা উঠলে সে দুনিয়ার কাউকে রেয়াত করে কথা বলতে জানে না।

নছর প্যায়াদার কঠিন ব্যারাম। বিছানায় পড়ে গেছে। ভাটি বয়েস, আর বুঝি ফিরবে না।

নায়েব মশাই বললেন, ডাক্তার বাবু, টাকা যত লাগে আমি দিব, আপনি নছরকে ফিরিয়ে দিন। নছর গেলে যে আমার কাচারীর আনন্দের আলো নিভে যাবে।

ডাক্তার বাবু বললেন, নছর খাঁর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ; ও অস্তাচল-শিরে প্রভাত সঞ্চার করা মানুষের সাধ্যের অতীত।

নায়েব মশাই স্কুল হতে মৌলভী সাবকে ডেকে আনলেন। বললেন, মৌলভী সাব, নছর খাঁকে একটু তওবা পড়িয়ে দিলে হয় না ?

—তা তো হয়। কিন্তু ও যে আজ দশদিন যাবৎ গোসল করে না, ওর গায়ে গন্ধ ধরে গেছে ; কাপড়েও হয়তো পেশাব লেগে আছে।

—তা হলে কি করা যায় ?

—হতভাগাকে এতবার বলেছি—বাপু বিয়ে কর। তা কিছুতেই ও সে পথে গেল না। আজ ওর বিবি ছেলেপুলে থাকলে কাজে লাগত না ?

—সে অন্যায় তো নছর করেছেই। কিন্তু এখন উপায় কি ?

—কেউ ওকে না ধুইয়ে দিলে তো এ-গলীজের মধ্যে তওবার কোন ফায়দা হবেনা, নায়েব মশাই।

—টাকা দেই, কাউকে দিয়ে ওকে ধুইয়ে দিন।

—তাতে কেউ রাজী হয় না।

—আচ্ছা মৌলভী সাব, কোন হিন্দু যদি তাকে ধুইয়ে দেয়, তারপর ওকে তওবা পড়ালে শাস্ত্রগত কোন বাধা আছে ?

—না, তা নাই। কিন্তু মুসলমানই কেউ কাছে ঘেঁসে না, হিন্দু কোথায় পাবেন ?

—আমি তবে নছর খাঁকে তার শেষ গোছল করিয়ে দেবো।

তাই হলো। দেখাদেখি মৌলভী সাব এসে নায়েব মশাইর শরীক হলেন। দুইজনে মিলে নছরকে অতি যত্নে গোছল দিয়ে পাক-সাফ করলেন। তওবার কথা শুনে নছর খাঁ বল্‌লে :

—আপনারা বলছেন, তওবা করবো। জীবনভর লুটপাট করার পর আজ মরণ-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে এ তওবায় ফায়দা কি দাদা?

—কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে তো আমাদের কারো কোনো নালিশ নাই, নছর খাঁ।

—মানুষ সব সময় নালিশ করতে জানে না বলেই তো আল্লা দুই দুইজন ফেরেস্তাকে তার কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছেন। তারা তো অন্তত: আমার সব অপকাজের এত্তেলা সময় মতো দিয়ে রেখেছে।

—কিন্তু কে জানে, কার সম্বন্ধে কি খবর ওখানে গোপনে এত্তেলা হয়ে আছে?

—ওহ্। লাখ টাকার পেট দিয়ে আল্লা নছর খাঁকে পাঠালো তোমাদের দরবারে—তোমরা তাকে দিলে কিনা পাঁচ টাকা মাশোয়ারা। আচ্ছা, লুটতরাজ ছাড়া বেচারার সামনে আর কি পথ ছিল খোলা?

—কিন্তু কেন তুমি এসব সাত-পাঁচ ভাবছো, নছর খাঁ?

—আজ যে তাঁর কাছে চলেছি, দাদা, নিকাশ দিতে হবে না?

—কিন্তু দয়াময়ের দয়ার কি সীমা আছে, নছর খাঁ?

—হ্যাঁ, ঐ তো নছরের একমাত্র ভরসা।

—ঐ ভরসাই তো মানুষের শেষ ভরসা, নছর খাঁ।

—আচ্ছা, নায়েব মশাই, হাশরের ময়দানে আল্লার আরশের তলে আমি যখন কেঁদে লুটিয়ে পড়বো, তখন এ-প্রমাণটা দিতে পারবেন না যে, নছরের ঘরে খাবার থাকতে সে কোনদিন কারো কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে খায়নি?

—তা পারবো, নছর খাঁ, নিশ্চয় পারবো।

—আল্লার অসীম দয়া আর আপনার এই প্রমাণ, বেশ, শেষ পর্যন্ত তাহলে এর উপর নির্ভর করেই নছর খাঁ অকূল দরিয়ায় কিশতী ভাসিয়ে দেবে।

একটি সভার রিপোর্ট

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

শৃগাল জাতির এক বিরাট সভার রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংবাদদাতা নিজের নাম প্রকাশ না করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজেই আমরা ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কেহ যদি আমাদের প্রকাশিত সংবাদের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন, তাহা হইলে তিনি ঠকিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা শাসাইয়া রাখিতেছি, আমাদের হাতে সংবাদদাতার নাম আছে। সুতরাং সাবধান, ওরূপ কুকর্ম করিয়া কেহ গাঁটের পয়সা জলে ফেলিবেন না। সংবাদের সত্যতা অবধারণের জন্য যদি কাহারও মনে বাস্তবিকই অদম্য কৌতূহল জাগে, তাহা হইলে তিনি হা করিয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবেন। তাহা হইলেই সংবাদের যাথার্থ্য তিনি স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। মাথার এই কস্রতের কথা মনে থাকিবে ত? যাহাদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, তাহারা এই পর্যন্ত পড়িয়াই ২০০ শক্তির এক ডোজ ফস্ফোরাস খাইয়া লইবেন। আমাদের ডাক্তার-বন্ধুও প্রথমে এই রিপোর্ট অবিশ্বাস করিয়া রিপোর্টারকে 'ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা'র রোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরে উপরোক্ত কস্রত অবলম্বন করিয়া নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন। ক্ষীণ-স্মৃতি পাঠকদের জন্য তিনিই উপরোক্ত প্রেস্ক্রিপশন বাতলাইয়া দিয়াছেন। আশাকরি, পাঠকগণ এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন এবং প্রেস্-ক্রিপশন বাবদ প্রত্যেকে ৪টি করিয়া টাকা পাঠাইবেন। যাহা হউক, এখন রিপোর্ট প্রকাশ করা যাউক।

ভাওয়াল গড়ে বিরাট শৃগাল কনফারেন্স।

সভাপতির মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ

মাতৃভাষা-সমস্যার অপূর্ব সমাধান
(প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ)

ইতিমধ্যে বিখ্যাত ভাওয়ালগড়ে এক বিরাট শৃগাল সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশের সমস্ত জঙ্গলের প্রায় দশ সহস্রাধিক সুসভ্য ভদ্র শৃগাল সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুচ্ছতাড়নে ও বিচিত্র হুঙ্কার-ধ্বনিতে ভীত হইয়া আশেপাশের পশুপক্ষী প্রায় ১০ মাইলের ওদিকে পলাইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের কুন্দনিন্দিত দন্তবিকাশে ভাওয়ালগড়ে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের লীলা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল।

সেই গড়ের ভিতরে একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা সভাপতির মঞ্চের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই মঞ্চের উপর একটা আমগাছের বৃহৎ গুড়ি আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। তাহাই President elect-এর আসন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। মঞ্চের উপর মোটামোটা লাঙ্গুলধারী বহু সুসভ্য শৃগাল লাঙ্গুলাসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মঞ্চোপরি উপবিষ্ট শৃগালদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন গণ্যমান্য সভ্যের নাম করা গেল। মিঃ কুক্কুটভক্ত A.B.C. (সুন্দরবন শৃগাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী), মিঃ ছাগারি বাহাদুর D.E.F. (মধুপুর গড়ের ব্যাঘ্ররাজের পারসনাল এসিস্ট্যান্ট), মৌলভী কিধার বক্স্ খাঁ-সাহেব (তাহেরপুর জঙ্গলের Governor De-Facto), ডাক্তার কুক্কুরমিত্র সাহেব B.J.M.S. (বেচেলর অব জেকেল্স মেডিসিন এণ্ড সার্জারী, সুন্দরবন মেডিকেল ইউনিভার্সিটি), মিঃ উদরপূজারী G.H.I. (উকিল, ভাওয়ালগড় হাইকোর্ট), সার কুন্দদশন L. M. N. O. (রিটায়ার্ড চীফ্-জাস্টিস্) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সভার নির্বাচিত সভাপতি মিঃ কেয়া-হুয়া-হো X.Y.Z. সভায় আগমন করিলে উপস্থিত শৃগাল-সভ্যবৃন্দ বিচিত্র কেউমেউ শব্দে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। সভাপতি সাড়ম্বরে আমের গুড়ির সুউচ্চ আসনে আরোহণ করিলেন এবং চেয়ার অভাবে নিজ লাঙ্গুলের উপর উপবেশন করিলেন। সভাপতির ইঙ্গিতে তখন সভারম্ভ ঘোষণা করা হইল। জনৈক প্রিয়দর্শন যুবা-শৃগাল বিচিত্র সুরে প্রারম্ভিক সঙ্গীত (Opening song) গাহিতে লাগিলেন। হারমোনিয়ম ইত্যাদির অভাবে কয়েকজন সভ্য নিজ নিজ লাঙ্গুল-

সঞ্চালনের চটাচট শব্দে সঙ্গীতের তাল দিতে লাগিলেন। অবশেষে এই বিচিত্র সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে পর শৃগাল সভ্যবৃন্দের বিচিত্র কোলাহল ও তুমুল লাঙ্গুল-চটাচটের মধ্যে সভাপতি বক্তৃতা দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। সভ্যবৃন্দের আনন্দোল্লাস থামিলে সভাপতি মহাশয় গুরুগম্ভীর আওয়াজে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন।

"উপস্থিত ভদ্র শৃগালবৃন্দ ও মাননীয় শৃগালগণ! আপনারা বাঙ্গলার বিভিন্ন জঙ্গল হইতে কষ্ট করিয়া এ সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া বাঙ্গলার শৃগাল জাতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। অহো, আজ আমাদের কি শুভদিন। এই শুভদিনের স্মৃতিকে শৃগাল জাতির মনে চির-জাগরূক রাখিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রায় শতাধিক মৃত গরু, সহস্রাধিক ছাগশিশু এবং লক্ষাধিক কুক্কুট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সভাশেষে বাড়ী ফিরিবার সময় আপনারা এইগুলি দ্বারা জলযোগ করিয়া যাইবেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে সভাপতির মুখে লালার সঞ্চার হইল। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়া লালা সংবরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে জনৈক শৃগাল সভ্য প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, "জলযোগটা আগে সারিয়া সভায় যোগদান করিলে ভাল হয় না কি?"

সভাপতি ইতিমধ্যে লালা সম্বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "না, তাহা এটিকেট-বিরুদ্ধ। সংযম সভ্যতার একটি অঙ্গ। আমাদের মত সুসভ্য জাতির পক্ষে সংযম বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সুসভ্য জাতিরা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট জলযোগের লোভেই সভায় যোগদান করিয়া থাকে এবং জলযোগের সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কেবল ছটফট করিতে থাকে। কিন্তু তথাপি তাহারা সংযম বিস্মৃত হইয়া অসভ্যতার পরিচয় দেয় না। আপনারা সভ্যতার এই প্রথম শিক্ষা নোট করিয়া লউন।"

এই বলিয়া সভাপতি তাঁহার পূর্ব বক্তৃতার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ, বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে বড়ই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিবেশী কুকুর সম্প্রদায় আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া থাকে এবং যখন-তখন আমাদের কুৎসা কীর্তন করিয়া থাকে। তাহারা কিসে আমাদের চেয়ে বড়? বুদ্ধিতে? না, শিয়াল-পণ্ডিতের ক্ষুরধার বুদ্ধির সামনে

কুকুর জাতিকে অনেকবার নাকানি-চোকানি খাইতে হইয়াছে। তবে কি শারীরিক শক্তিতে? কিন্তু আপনারা জানেন, শারীরিক বল বলই নহে। যাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথায় আমার সহিত একমত হইবেন। আপনারা হিতোপদেশের কথা স্মরণ করুন। পশুরাজ সিংহকেও একদিন শৃগালের নিকট বুদ্ধি ধার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং কুকুর ত কোন্ ছার!"

এমন সময় ন্যাশনালিস্ট সভ্য পশুরাজ সিংহ সম্বন্ধে কটূক্তি করিয়া উঠিল এবং বক্তৃতা ঝাড়িল, "উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, এই অত্যাচারী সিংহ জাতিকে আমাদের দেশ হইতে আগে তাড়াইতে হইবে। সাত-সমুদ্র তের নদীর ওপারে আফ্রিকার জঙ্গলে থাকিয়া এই দুর্বৃত্ত জাতি যেভাবে আমাদের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আমাদের সর্বস্ব শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহাতে প্রতিবেশী কুকুর জাতির অত্যাচারের প্রতিকার-চিন্তা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এদের তাড়াইবার জন্য সত্বর হউন। এদেশে এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সুতরাং কুকুর জাতির সহিত ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আসুন আমরা আগে সিংহ জাতিকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দেই, তাহাদের রাজশক্তি সমূলে উৎপাটিত করি।"

কতকগুলি শৃগাল-সভ্য এই বক্তৃতায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং লাঙ্গুল আস্ফালনে উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। কিন্তু মঞ্চোপরি উপবিষ্ট মোটা মোটা লেজধারী সভ্যবৃন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহারা সভয়-চীৎকারে সভাপতির লেজের পশ্চাতে আসিয়া জমায়েত হইল।

সভাপতি মহাশয় তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বক্তৃতা শুরু করিলেন, "সভ্যগণ, অর্বাচীন বক্তার কথায় আপনারা কান দিবেন না। এই উন্মাদ রাজদ্রোহ প্রচার করিয়া ১২৪ (ক) ধারায় অপরাধ করিয়াছে, আবার জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ১৫৩ (ক) ধারায়ও পড়িয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় পশুজাতিই জানে, শৃগাল জাতি অত্যন্ত রাজভক্ত। শৃগাল জাতি রাজপদ লেহন করাকে ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সুতরাং এই অর্বাচীন পশুরাজের বিরুদ্ধে আজ যে কটূক্তি করিয়াছে, তাহা ইহার ব্যক্তিগত মত—সমগ্র শৃগাল জাতি এজন্য দায়ী নহে। বক্তৃতা শেষ হইলে আমি স্বয়ং রাজভক্তি সম্বন্ধে সভার সম্মুখে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিব। এখন আমি

সভাপতি হিসাবে এই অর্বাচীন ও তাহার সমর্থকদিগকে আদেশ করিতেছি, তাহারা এই দণ্ডে সভাস্থল ত্যাগ করুক।"

মঞ্চোপরিস্থ মোটা লেজধারী সভ্যেরা কাউমাউ করিয়া হর্ষধ্বনি প্রকাশ করিল। উপরোক্ত বক্তা ও তাহার কয়েকজন সমর্থক ক্রোধভরে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সভাপতি বলিতে লাগিলেন, "এখন পূর্বে যাহা বলিতেছিলাম, সেই কথার অনুসরণ করা হউক। কুকুর জাতি মুখে যতই মিত্রতার ভান করুক, কিন্তু তাহাদের অন্তর যে শৃগাল-বিদ্বেষে ভরা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কথা যে শৃগাল বিশ্বাস না করে, সে যে শৃগাল নহে, একেবারে আস্ত গাধা, তাহাতে সংশয় নাই। তেমন শৃগালের বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই। আমি তাহাকে জলে ডুবিয়া কিংবা আগুনে পুড়িয়া মরিবার ব্যবস্থা দিতেছি।

"কুকুর জাতি হাটে-মাঠে-ঘাটে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর আমরা জঙ্গলের অন্ধকার হইতে মুখ বাহির করিলেই ওরা আমাদের দিকে দাঁত খিঁচাইয়া আসে। রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া অসভ্য মানুষের ঘরে খাদ্য আহরণ করিতে গেলেও কোথা হইতে এই মানুষের গোলাম কুকুর দাঁত বাহির করিয়া আমাদিগকে তাড়া করিয়া আসে। ফলে প্রায়ই খাদ্য আহরণে আমাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হয়। এর প্রতিকার কি? কিসের বলে তাহারা এতটা ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে সাহসী হয়? এ সম্বন্ধে আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, উহাদের মধ্যে যে জাতিগত সঙ্ঘবদ্ধতা আছে, আমাদের মধ্যে তাহা নাই। এই জাতিগত সঙ্ঘবদ্ধতা আবার সাহিত্য-চর্চার ফল। আমাদের সাহিত্য-চর্চা নাই বলিয়াই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারি না। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করিতে হইবে।"

এই পর্যন্ত বলিয়াই শৃগাল-সভাপতি নীরব হইলেন এবং চক্ষু অর্ধমুদিত করিয়া শৃগাল সভ্যবৃন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রোতাগণের কেমন লাগিতেছে! তাহাতে যাহা বুঝা গেল, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া সভাপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আপনাদিগকে সভ্যজাতির আর একটি বিশেষত্বের কথা

বলিয়া দেই। বক্তার বক্তৃতা যখন শ্রোতাগণের খুব মনঃপুত হয়, তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, "Hear, Hear!" লেজহীন অসভ্য জাতিরা "Hear, Hear" বলার সঙ্গে সঙ্গে হাততালিও দিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের লেজের অভাব নাই, সুতরাং আমাদিগকে লেজ সঞ্চালনের চটাচট শব্দ প্রকাশ করিলেই অধিক সভ্যতা প্রকাশ পাইবে। সুতরাং আপনারা আমাদের জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে ও লেজ সঞ্চালনের দ্বারা সভ্যতার পরিচয় দিবেন। ইহাতে বক্তা ও শ্রোতা—উভয়ের প্রাণেই উৎসাহের সঞ্চার হয়।"

এই বক্তৃতার ফল ফলিল। শৃগাল সভ্যগণ সহস্র-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কেয়া-হুয়া-হো" এবং তাহাদের লাঙ্গুলের চটাচট শব্দে সমগ্র বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল।

সভাপতি বলিতে লাগিলেন, "তারপর শুনুন, যেদিন কুকুর-সম্প্রদায় তাহাদের সাহিত্য-সমিতি গঠিত করিল, সেই দিন হইতেই না তাহাদের উন্নতি আরম্ভ হইল। সেই হইতেই তাহারা বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে কুকুর-সমিতি গঠন করিয়া কি বিপুল বিক্রমে জীবন-সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ত আপনারা স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। সুতরাং আমাদিগকে সাহিত্য-শক্তি অর্জন করিতে হইবে। ইহা না হইলে শৃগালের জাতীয় জীবন কখনো উন্নত হইবে না। (কেয়া-হুয়া-হো ধ্বনি ও লাঙ্গুল চটাচট শব্দ)

সাহিত্য-শক্তিতে উন্নত হইয়াই অসভ্য কুকুর-সম্প্রদায় আজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আজ কবি-লেখকের অভাব নাই, অথচ যে শৃগাল জাতির পদতলে বসিয়া একদিন সমস্ত পশুজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়াছে, যে শৃগাল জাতির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিশ্বের সমস্ত পশুজাতিকে একদিন চমকিত করিয়াছিল, তাহারাই আজ চরম অবনতির অন্ধকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে! অহো! বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কালের পরিমাপে আজ মানুষের ঝাঁটাখেকো কুকুর জাতিও সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতেছে, আর চির-সভ্য শৃগালজাতি অসভ্য বলিয়া লাঞ্ছিত হইতেছে!" (কেয়া-হুয়া-হো ধ্বনি ও লাঙ্গুল চটাচট শব্দ)

অতঃপর শৃগাল-সভাপতি অতীত গৌরব-স্মরণে ভাবাধিক্যের পেষণে কিছুক্ষণ আত্মসমাহিত হইয়া রহিলেন। পরে ভাবাবেগ প্রশমিত হইলে

আবার বক্তৃতা শুরু করিলেম, "বন্ধুগণ, মূল বিষয় ছাড়িয়া আমি ভাবাবেগে অন্য পথে চলিয়া গিয়াছিলাম। আপনারা আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ক্ষমা করিবেন। এখন আসল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। বলিতেছিলাম কি, আমাদিগকে সাহিত্য-শক্তি অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু এই সাহিত্য-শক্তি অর্জন করিতে হইলেই প্রথমতঃ আমাদিগকে ভাষা-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কোন্ ভাষায় আমরা সাহিত্য-চর্চা করিব? মাতৃভাষায়? কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা কি? অনেক মূর্খ শৃগাল কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠিবেন যে, আমরা যখন বঙ্গদেশবাসী এবং আমরা যখন বাঙ্গলা ভাষাতেই কথা বলি, তখন আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা কখনো এরূপ মূর্খতার পরিচয় দিবেন না। প্রথমতঃ ধরুন, কুকুর জাতি বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের সাহিত্য রচনা করে। সুতরাং বাঙ্গলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা কি করিয়া হইতে পারে? অসভ্য কুকুর যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করিবে, সুসভ্য আমরা সেই ভাষা মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিব? সত্য বটে, আমরা বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলি; তাই বলিয়া তাহা আমাদের মাতৃভাষা হইবে কেন? তাহা হইলে আমাদের বিশিষ্টতা রহিল কৈ? কথা বলার ভাষাকে কুকুরেরা মাতৃভাষা করিয়া লইয়াছে,—ইহা তাহাদের অসভ্যতার একটি বড় লক্ষণ। আমরা সুসভ্য জাতি, আমরা তাহাদের এই হীন অনুকরণ কেন করিব? একটি দৃষ্টান্ত দিই। শুনিয়াছি, ভারতের অসভ্য মানুষেরা বিলাত গিয়া ইংরাজী শিখিয়া আসে এবং তাহাকেই তাহারা মাতৃভাষা করিয়া লয়। আমি একবার এইরূপ এক মানুষের বাড়িতে মুরগী ধরিতে গিয়াছিলাম। তখন সে বাড়ীর গিন্নী আমাকে ভীষণ এক লগুড়াঘাত করিয়া 'কিচির-মিচির' শব্দে কি একটা কথা বলিয়াছিল। তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি, উহা ইংরাজী ভাষার একটা গালি। যখন অসভ্য মানুষেরও পর্যন্ত মাতৃভাষা নির্বাচনে এমন আত্মমর্যাদাবোধ আছে, তখন সুসভ্য আমাদের তাহা না থাকিলে চলিবে কেন?

"তারপর কুকুর-রচিত বাঙ্গলা-সাহিত্যে আমাদের কুৎসা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। অভদ্র 'হিদেন্‌স্' কুকুর জাতি অত্যন্ত শৃগাল-বিদ্বেষী। তাহারা আমাদের 'ম্লেচ্ছ, ছোটলোক' বলিয়া গালাগালি দিয়া সাহিত্য রচনা

করিয়াছে। এই গালাগালিপূর্ণ সাহিত্য আমাদিগকে বিষের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। এর পাল্টা গালাগালি দিতে হইলে আমাদিগকে অন্য ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। কারণ যে ভাষায় গালাগালি খাওয়া যায়, সেই ভাষায় উল্টা গালাগালি দিতে তত জোর প্রকাশ পায় না। এই জন্যই সাহেবেরা বাঙ্গালীদিগকে গালাগালি দিতে উর্দু ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

"এখন প্রশ্ন, আমাদের মাতৃভাষা হইবে কোন্ ভাষা? উত্তর, উর্দু ভাষা। এমন জোরের ভাষা আর নাই। আর আমাদের নিত্যব্যবহৃত ক্রিয়াপদের দিকে লক্ষ্য করিলে কি বুঝা যায়? 'কেয়া-হুয়া' এই ক্রিয়াপদের সহিত বাঙ্গলার সম্পর্ক কি? বরং উর্দু সাহিত্যেই এই ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমাদের মাতৃভাষা যে উর্দু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলাও আমি আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। আমরা বাঙ্গালী শৃগাল বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমরা আগে শৃগাল তারপর বাঙ্গালী। বিশ্বের শৃগাল জাতির সহিত আমরা একসূত্রে বাঁধা। সমগ্র বিশ্বের শৃগালকে একসূত্রে বাঁধিতে পারে কোন্ ভাষা? উর্দু ভাষা। বিশ্বের শৃগাল-জাতিত্বের ছাপ শুধু এই ভাষাতেই আছে। 'কেয়া-হুয়া' শুধু এই একটি কথা দ্বারাই শৃগাল জাতির ভাষা-সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

শৃগাল-সভাপতির বক্তৃতা এই পর্যন্ত হইয়াছে, এমন সময় এক শৃগাল-সভ্য দৌড়িয়া আসিয়া জানাইল, "সভাপতি মহাশয়, সর্বনাশ হইয়াছে। আপনি যে সমস্ত ন্যাশনালিস্ট সভ্যকে সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহারা জলযোগের প্রায় সমস্ত আয়োজনই এক রকম সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র শৃগাল-সভাপতি এক লম্ফে স্বীয় উন্নত আসন হইতে অবরোহণ করিলেন এবং লাঙ্গুল উঁচু করিয়া যেদিকে জলযোগের আয়োজন রাখা হইয়াছিল সেইদিকে দৌড় দিলেন। শৃগাল-সভ্যগণ ব্যাপার বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সভাপতির অনুসরণ করিলেন। সুতরাং সভার কাজ এই খানেই শেষ হইল।

আদুভাই

আবুল মনসুর আহমদ

আদুভাই ক্লাশ সেভেনে পড়তেন। ঠিক পড়তেন না বলে পড়ে থাকতেন বলাই ভালো।

কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোন শ্রেণীতে তিনি কখনো পড়েছেন কিনা, পড়ে থাকলে ঠিক কবে পড়েছেন, সে-কথা ছাত্ররা কেউ জানতো না। শিক্ষকরাও অনেকে জানতেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, তাঁরাও এক কালে আদুভাইর সমপাঠী ছিলেন; এবং সবাই নাকি অই এক ক্লাশ সেভেনেই আদুভাইর সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন ক্লাশ সেভেনে আদুভাইর সমপাঠী হ'লাম, ততদিনে আদুভাই ঐ শ্রেণীর পুরাতন টেবিল ব্ল্যাকবোর্ডের মতই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইর এই অসাফল্যে আর যেই যত হতাশ হোক, আদুভাইকে কেহ কখনো সেজন্য বিষণ্ণ দেখে নি। কিংবা নম্বর বাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কখনো কোন শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেন নি। যদি কখনো কোন বন্ধু বলেছে: যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্টে সর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে-কয়ে নম্বরটা নিন্ না বাড়িয়ে। তখন গম্ভীরভাবে আদু-ভাই জবাব দিয়েছেন: সব সাবজেক্টে পাকা হয়ে ওঠাই ভাল।

কোন্ কোন্ সাবজেক্টে সর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন আছে, তা কেউ জান্তো না, আদুভাইও জানতেন না; জানবার কোনো চেষ্টাও করেন নি; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরঞ্চ তিনি যেন মনে করতেন, ও রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। তিনি বলতেন: যে দিন তিনি সব সাবজেক্টে পাকা হবেন: প্রমোশন সেদিন তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে

শুভদিন যে একদিন আসবেই, সে বিষয়ে আহুভাইর এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখে নি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্নপত্র চুরি করে অপরের খাতা নকল করে আহু-ভাইর ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গেছে, এ ধরনের ইঙ্গিত আহুভাইর কাছে কেউ করলে তিনি গর্জে উঠে বলতেন : জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আহুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে : আহুভাই, আপনার কি সত্যই প্রমোশনের আশা আছে? নিশ্চিত বিজয়-গৌরবে আহুভাইর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন, "আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভালো। যে গাছ লক্‌লকিয়ে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙ্গেছে।

সেজন্য আহুভাইকে কেউ কখনো পিছনের বেঞ্চিতে বসতে দেখে নি। সাম-নের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, হা করে গিলতেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজন মত নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আহুভাই ছিলেন ক্লাশের একজন অন্যতম ভালো ছাত্র।

শুধু ক্লাশের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছুতেন। এ ব্যাপারে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেউ তাঁকে কোন দিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আহুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আহুভাই কোন্ অনাদি কাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আসছেন। তার একটি, স্কুল কামাই না করার জন্য; অপরটি, সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলীর পাড়া-গাঁ থেকে রোজ রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে; কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করে উঠতে পারে নি। চৈত্রের কালবোশেখী বা শ্রাবণের ঝড়-ঝঞ্ঝায় যেদিন পশুপক্ষীও ঘর থেকে বেরোয় নি, সেদিনও ছাতার নীচে গুড়িসুড়ী হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আহুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আসতেন। তেমন দুর্যোগে ছাত্ররা

কেউ আসেনি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁরা ক্লাসে একটি উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে 'আদাব স্যার' বলে যে একটি ছাত্র শিক্ষকদের চমকিয়ে দিতেন, তিনি ছিলেন আহুভাই। আর চরিত্র? আহুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিংবা অভদ্রতা করতে কিংবা মিছে কথা বলতে দেখে নি।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্স্ট হলাম। সুতরাং আইনতঃ আমি ক্লাশের মধ্যে সব চাইতে ভাল ছাত্র এবং আহুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কি জানি কেন, আমাদের দু'জনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্টি হলো। আহুভাই প্রথম থেকে আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার উপর যেন তাঁর কত কালের দাবী।

আহুভাই মনে করতেন; তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা শুনে সবাই হাসতো। সে হাসিতে আহুভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না, বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসাসূচক হাসিই মনে করতেন। তার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেতো।

অন্যসব ব্যাপারে আহুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তাঁর নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাসা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না দেখে আমার মন আহুভাইর পক্ষপাতী হয়ে উঠতো। গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। আহুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি ক্লাশ সেভেনেই অবস্থান করছিলেন।

২

ডিসেম্বর মাস।

সব ক্লাশের পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের 'বিবেচনা' হয়ে গিয়েছে। 'বিবেচিত' প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাশ করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার চাইতে দ্বিগুণেরও ঊর্ধ্বে উঠেছে।

কিন্তু আহ্নভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটোরিয়েল ক্লাশ করছিলাম। ছাত্ররা শুধু শুধু স্কুল প্রাঙ্গনে জটলা করছিল—প্রমোশন-পাওয়া ছেলেরা নিজেদের কীর্তি-উজ্জল চেহারা দেখাবার জন্য; না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোন প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবী জানাবার জন্য।

এমনি দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আহ্নভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলাম। আহ্নভাইকে আমরা সবাই মুরুব্বী মানতুম। তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বললাম : কি হয়েছে আহ্নভাই, অমন পাগলামো করলেন কেন?

আহ্নভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে অমন বিচলিত জীবনে আর কখনো দেখি নি। তাঁর মুখের সর্বত্র অসহায়ের ভাব।

তাঁর কাঁধে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম : বলুন, কি হয়েছে?

আহ্নভাই কম্পিত-কণ্ঠে বললেন : প্রমোশন। আমি বিস্মিত হলুম; বললুম : প্রমোশন? প্রমোশন কি? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

: না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

: ও পেতে চান? সেত সবাই চায়।

আহ্নভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সঙ্কোচ-জড়িত প্যাঁচ মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এত দিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেন নি, কারণ প্রমোশন জিনিসটাকে যথাসময়ের পূর্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবারে তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সেই কারণটি বললেন। তা এই যে, আহ্নভাইর ছেলেই সেবার ক্লাশ সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আহ্নভাইর কোন ঈর্ষা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ায় তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আহ্নভাইর স্ত্রীর তাতে গুরুতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আহ্নভাইকে সেবার প্রমোশন পেতে হবে, নয়ত পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আহ্নভাই বাঁচবেন কি নিয়ে?

আমি আহ্নভাইর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজী হলাম।

প্রথমে ফারসী-শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ, তিনি একদা আমাকে মোট একশত নম্বরের মধ্যে একশো পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাস্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায় মৌলবী সা'ব বলেছিলেন : ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর-পাওয়ার পুরস্কার-স্বরূপ আমি খুশী হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখসিস দিয়েছি। অনেক তর্ক করেও হেডমাস্টার মৌলবী সা'বকে এই কার্যের অসংগতি বুঝাতে পারেন নি।

মৌলবী সা'ব আহুভাইর নাম শুনে জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিয ও খোদার নাফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেন নি বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টিনের বাক্স থেকে অনেক খুঁজে আহুভাইর খাতা বের করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন : ছাখো।

আমি দেখলাম মোট তিন নাম্বার পেয়েছেন। তবুও হতাশ হলাম না। পাশের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দিলাম। তিনি বললেন : তুমি কার জন্য কি অন্যায় অনুরোধ করছো, খাতাটা খুলেই একবার দেখো না।

আমি মৌলবী সা'বকে খুশী করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুললাম। দেখলাম : ফারসী পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটি ফারসী হরফ নেই। তার বদলে ঠাস বুনানো বাঙলা হরফে অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখলাম : এই বঙ্গদেশে ফারসী ভাষা আমদানীর অনাবশ্যকতা ও ছেলেদের উহা শিখাইবার চেষ্টার মূর্খতা সম্বন্ধে আহুভাই যুক্তিপূর্ণ একটি থিসিস লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবী সা'বের মুখের দিকে চাইতেই তিনি জয়ের ভঙ্গিতে বললেন : দেখেছো বাবা, বেতমিয কাজ? আমি নিতান্ত ভালমানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাস্টিকেটের সুপারিশ করতো।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত মৌলবী সা'ব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না : খাতার উপর ৩-এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ী ছুটলুম। সেখানে দেখলুম : আহুভাইর খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা

রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বললাম। অঙ্কের মাস্টার তো হেসেই খুন। হাসতে হাসতে তিনি আদুভাইর খাতা বের করে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্তা ভালো ভালো অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন। সেইজন্য এবং প্রশ্নকর্তার ত্রুটির সংশোধনের জন্য আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন। এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে সমস্ত অঙ্ক কষেছেন, শিক্ষক মশাই প্রশ্নপত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে আদুভাইর উত্তরের সত্যিই কোন সংশ্রব নেই।

প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল থাক আর নাই থাক, খাতায় লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিত বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মশায়, যা হোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয় নি। সুতরাং পাশের নম্বর দিতে রাজী হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্যসব সাবজেক্টের শিক্ষকদের রাজী করাতে পারলে তিনি আদুভাইর প্রমোশনের সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্ণ মনে অন্যান্য পরীক্ষকদের নিকটে গেলাম। সর্বত্র অবস্থা প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এমন গাঁজাখুরি গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, কোন্ রাজা কোন্ সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোন প্রমাণ নেই। ইংরেজীর খাতায় তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকার চেষ্টা করেছেন—অবশ্য কে যে সিরাজ আর কে যে ক্লাইভ. নীচে লেখা না থাকলে তা বুঝা যেতো না।

হতাশ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল চোখে আমার পথপানে চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে নিস্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

: তবে আমার কি হবে ভাই?

—বলে, তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কিছু একটা করবার

জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বললাম: তবে কি আহুভাই আমি হেডমাস্টারের কাছে যাবো?

আহুভাই ক্ষণেক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন: তুমি আমার জন্য যা করেছো, সেজন্য ধন্যবাদ, হেডমাস্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই, সেখানে যেতে হয় আমি যাবো। হেডমাস্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাই নি। এই প্রার্থনা তিনি আমার ফেলতে পারবেন না। —বলেই তিনি হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আহুভাইর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দিলাম।

৩

সেদিন বড়দিনের ছুটি আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটি দেওয়া হলো।

আমি বাইরে বসে দেখলাম: স্কুলের গেটের সামনে একটি পোস্তার উপর একটি উঁচু টুল পেতে তার উপর দাঁড়িয়ে আহুভাই হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তার বক্তৃতা শুনছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আহুভাই বলছিলেন: হ্যাঁ, প্রমোশন আমি মুখ ফুটে চাই নি। কিন্তু সেই জন্য কি আমাকে প্রমোশন না-দেওয়া এঁদের উচিত হয়েছে। মুখ ফুটে না চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম; এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোন জিনিস আছে কিনা আমি তা যাচাই করলাম। দেখলাম, বিবেচনা বলে কোন জিনিস এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্মম, হৃদয়হীন। একটা মানুষ যে চোখ বুঁজে এঁদের বিবেচনার উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোন জিনিস থাকলে সে কথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাকতে পারতেন।

আহুভাইর চোখ ছলছল করে উঠলো। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন: আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ

চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটি প্রমোশন। তা দিলে এঁদের কি এমন লোকসান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না-দেওয়ায় আমি রেগে গেছি। রাগ আমি করি নি। আমি শুধু ভাবছি, যাদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার ছেলের বাপ-মা ছেলেদের জীবনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকেন, তাঁদের আক্কেল কত কম, তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প।

একটু দম নিয়ে আহ্ভাই আরম্ভ করলেন: আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেই নি। বছর বছর নতুন নতুন পুস্তক ও খাতা কিনতে আপত্তি করি নি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বললেন না: "আহ্মিয়া, তোমার প্রমোশনের কোন চান্স নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেবো না।" মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কেনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না। শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাদের যত নিয়ম-কানুন এসে বাঁধলো? আমি ক্লাশ সেভেনে পাশ করতে পারলুম না বলে ক্লাশ এইটেও পাশ করতে পারতুম না, একথা এঁদের কে বলেছে? অনেকে ম্যাট্রিক আই-এতে কোন মতে পাশ করে বি. এ., এম. এ'তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোন্ কুগ্রহের ফলেই আমি ক্লাশ সেভেনে আটকে পড়েছি, একবার কোনমতে এই ক্লাশটা ডিঙোতে পারলে আমি ভালো করতে পারতাম, এটা বুঝা মাস্টারদের উচিত ছিল। আমাকে একবার ক্লাশ এইটে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্স এঁরা দিলেন না।

আহ্ভাইর কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখলাম, শ্রোতৃগণের অনেকের গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

গলা পরিষ্কার করে আহ্ভাই আবার শুরু করলেন: আমি কখনো এতসব কথা বলি নি, আজো বলতাম না। বললাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড় ছেলে এবার ক্লাশ সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে! সে-ও এই স্কুলেই পড়তো। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম।

যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে আজ আমাকে কি অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।

আহুভাইর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি গলায় দৃঢ়তা এনে আবার বলতে শুরু করলেন: কিন্তু আমি সত্যকে জয়যুক্ত করবোই। আমি একদিন ক্লাশ এইটে—

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙ্গে দিলো। হৈ চৈ করতে করতে ছাত্ররা যে-যার পথে চলে গেলো। আমিও আহুভাইর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে চুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে—সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জানলাম না।

৪

আমি সেবার বি.এ. পরীক্ষা দেবো। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেফাফায় এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র হবে মনে করে খুললাম। ঝরঝর তক্‌তকে সোনালী হরফে ছাপা পত্র। পত্রলেখক আহুভাই। তিনি লিখেছেন: তিনি সেবার ক্লাশ সেভেন থেকে এইটে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কিছু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ী ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরিতে পেয়েছি।

ছাপা চিঠির সঙ্গে হাতের লেখা একটি পত্র। আহুভাইর পুত্র লিখেছে: বাবার খুব অসুখ। আপনাকে দেখবেন তার শেষ সাধ।

পড়াশোনা ফেলে ছুটে গেলাম আহুভাইকে দেখতে। এই চার বছর তাঁর কোন খবর নেই নি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোটো হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বললে: বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়া শুরু করেছিলেন যে, তিনি শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াশুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাস্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পাল্কী চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথা মতো তাকে প্রমোশন দেওয়া হলো। তিনি তাঁর 'প্রমোশন উৎসব'

উদ্‌যাপন করার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কা'কে কা'কে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিস্টও তিনি নিজ হাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যারা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ী ফিরলেন।"

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম।

ছেলে আমাকে গোরস্থানে নিয়ে গেলো। দেখলাম, আদুভাইর কবরে খোদাই করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে—

Here sleeps Adu Mia who was promoted
from Class VII to Class VIII.

ছেলে বললো : বাবার শেষ ইচ্ছামতোই ও-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

য়্যান্‌ব্যালেন্সড

মাহবুব-উল আলম

নূতন সব্‌ডেপুটি।

মাহফুজ কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়াই এ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হোস্টেলের আরাম-চৌকিতে শুইয়া শুইয়া নয়। ম্যাট্রিক পাস ছেলে, তাহার জীবনে ছোঁয়া লাগিয়াছিল তাহার বড় ভাইয়ের। একান্তভাবে। সেই স্বাধীন-চিত্ততা। তবুও দুই ভাইয়ের চরিত্রে ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

বড় ভাই তজমুল 'স্কীম' করিতেন নিখুঁত, কিন্তু কাজের বেলায় সব পণ্ড করিয়া ফেলিতেন। মাফুহজ 'স্কীম' করিত ছোটখাট (তজমুল ভাবিতেন কী সংকীর্ণ!), কিন্তু কাজের বেলায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া উহাকে করিয়া তুলিত বিরাট। দেশের লোক তজমুলকে ভাবিত 'নষ্টচন্দ্র', কারণ তাহার উপর বহু আশা-ভরসা তাহারা করিয়াছিল ; আর মাহফুজকে ভাবিত 'খাসা ছেলে'। দেশের লোক কি ভাবে, তজমুল তাহার খবর রাখিতেন না, কারণ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মুখের উপর কথা বলে এ সাহস কাহারও ছিল না। সুতরাং মাহফুজকে দাদার নিন্দা ও নিজের প্রশংসা দুই-ই শুনিতে হইত। তজমুল যত কাজ পণ্ড করিতেন, মাহফুজ হারকিউলিসের মতো পরিশ্রমে উহাকে যতটা পারিত মধুরেণ সমাপয়েৎ করিয়া তুলিত। কিন্তু উহার অপেক্ষাও কঠিন ছিল এই অনবরত দাদার নিন্দা ও নিজের প্রশংসা শুনিয়া যাওয়া। ইহাতেও মাহফুজ এতটুকু নষ্ট হয় নাই। কারণ, মাহফুজ ইহার এক বর্ণও বিশ্বাস করিত না। দাদাকে লইয়া তাহার মনে মনে গৌরবের অন্ত ছিল না। মাহফুজ ভাবিত : "দাদার নিকট আমি কতটুকু। সমুদ্রে একটা বিন্দু বই ত নয়।" ওদিকে মাহফুজকে লইয়া তজমুল ঠিক ততখানি গৌরব বোধ করিতেন। সংসার ছিল তজমুলের মনের চোখে একটার পিছনে একটা অফুরান প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন। ইহাদের অনেকগুলি মুখব্যাদানের সামনেই তজমুল রীতিমত ভয় পাইতেন। তখন ভাবিতেন : "কিন্তু মাহফুজ ত আছে।"

দৃশ্যত: দুই ভাইয়ের বাদানুবাদের অন্ত ছিল না। মাহফুজ ছিল মা-ঘেঁষা: মা চাহিতেন সংসারে ভাত-কাপড়ের অনটন না হউক, সকলে সুখে শান্তিতে থাকুক। তজমুল ছিলেন বাপ-ঘেঁষা ; বাপ চাহিতেন বাড়িটা হইয়া উঠুক একটা লেবরেটরী, ইহার দিকে দিকে নিত্য 'এক্সপেরিমেন্ট' চলিতে থাকুক। তবুও সংসারে মনের অমিল হইত না। কারণ, সকলের মন ছিল এক ছাঁচে ঢালা। পরিবারটি ছিল প্রেমধর্মী।

দাদার ছোঁয়া লাগিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিলেও তাহার মনে কোনো স্বপ্ন গজাইয়া উঠে নাই—এই ডেপুটি হওয়ার স্বপ্ন, অন্ততঃপক্ষে একটা কেরানী হওয়ার স্বপ্ন।

ওদিকে বাপমায়ে মিলিয়া তজমুলের বৌ ঘরে আনিলেন। মা দেখিলেন বৌ-এর প্রয়োজন। তজমুল বেশ বাড়িয়াছে, তাহার পাশে বৌ না হইলে আর মানায় না। চাই কি, বৌ আনিলে তজমুলের দায়িত্ববোধ জন্মিতে পারে ; উপার্জনের পথও হয়ত সে দেখিবে। বাপ পাইলেন এই প্রস্তাবে মস্ত বড় এক্সপেরিমেন্টের পূর্বাভাস—বৌ আনা, বৌ ও ছেলের জন্য ঘরের বন্দোবস্ত, নাত্‌নাতিনী—বিপুল ভাঙ্গাগড়ার অধীর আগ্রহে তিনি কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। মাহফুজের মতামতের কোনো প্রয়োজন হইল না। কারণ, মাহফুজ ছিল নীরব প্রকৃতির ছেলে। যখন কোনো কাজে হাত দিত, তাহাকে মনে হইত অসুর, চির-দুর্বার। আর যখন কাজ করিত না, তখন সে যেন নিজের ভিতর লুকাইয়া থাকিত, তাহার অস্তিত্ব কেহ অনুভব করিত না। মাহফুজ 'না' করিলে বৌ ঘরে আনিতে কেহ সাহস করিত না। কিন্তু 'না' যখন সে নিজ হইতেই করিল না, 'হ্যাঁ' সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কেহ বোধ করিল না। মাহফুজ 'না' করিবে জানিলে তজমুল তাঁহার একটিও অপয়া স্কীমে হাত দিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু 'না' যখন সে করে নাই, একটির পর একটি স্কীমে হাত দিয়া বারে বারে হাত পুড়িতে তাহার বাধে নাই। তবুও পরিবারে অশান্তি হইত না। কারণ, কাজ যখন কেহ নষ্ট করিত মাহফুজ একরূপ অভ্যাস বশেই যেন উহার প্রতিকারে লাগিয়া যাইত। পেছনে ফিরিয়া দোষীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশও যেমন সে করিত

না, নিজের কাজের জন্য আত্মপ্রসাদ বোধও তেমন ছিল না। কাজ মনের মতো করার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন নিজের ভিতর আবার ঘুমাইয়া পড়িত।

তবুও লোকে দেখিত : দু'ভায়ে বাদানুবাদ লাগিয়াই আছে। বাদানুবাদ সত্যই লাগিয়া থাকিত। কিন্তু সে ছিল দু'ভায়ের পৃথক একটি জীবন—সংসারের বাহিরে শুধু লেখাপড়ার রাজ্যে। তজমুল ছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধি, পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিষয়ের মর্মে প্রবেশ করিতেন। আর, জীবনে তাঁহার স্মৃতি হইতে উহা মুছিত না। তিনি অধীর হইতেন আনন্দটুকু মাহফুজকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু, মাহফুজের গ্রহণশক্তি ছিল বড় মন্থর। আর তজমুল এত কথা তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেন যে, মাহফুজের মগজে সব এলোমেলো হইয়া যাইত। তখন তজমুলের হইত বেজায় রাগ। কারণ, তাঁহার নিকট ছোট ভায়ের 'বেওকুফি' অপেক্ষা বড় অপরাধ হইতে পারে না। মাহফুজ ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার কানে 'অকর্মা' অপেক্ষা বড় গালি হইতে পারে না। ছোটবেলায় এই নিয়া রাগের মাথায় তজমুল মাহফুজের উপর মারপিট করিতেন। মাহফুজ কিছু বলিত না। ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া অপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। তখন তজমুলের হইত অনুতাপ। তিনি চোখের জলে বুক ভাসাইতেন। মাহফুজ তামাক সাজিয়া আনিয়া দিত। আলবোলা টানিতে টানিতে তজমুল ভাবিতেন : 'এমন ভাই কাহারও হয়!' মাহফুজ নীরবে পাশে বসিয়া কল্পনা করিতে চেষ্টা করিত : 'কত বড় বিদ্বান! এমনটি দুনিয়ায় আর আছে।' দুটি ভাই—একজন এই মাটির পৃথিবী, অপর জন ওই আকাশের সূর্য। ক্রমে মাহফুজ আবিষ্কার করিল যে তর্ক করিলেই তজমুল খুশী হন। পড়ার উপর তর্ক সে দিনে দিনে বাড়াইয়া দিল। তজমুলের উৎসাহের সীমা রহিল না। তিনি কোমর বাঁধিয়া তর্কের খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তজমুল যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড, মাহফুজ যেন তার চাবি। তবে এ রেকর্ডে পুনরাবৃত্তি নাই, ইহার ঘোরারও বিরাম নাই। আর মাহফুজ যেন 'টার্গেট'; তজমুল উহার উপর গুলী ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া হাত সই করিবেন।

বিয়ের সূচনায় তজমুল অনেকগুলি বই পড়িয়া ফেলিলেন; আর ধোপা যেমন পাটের উপর আছড়াইয়া কাপড় পরিষ্কার করে, মাহফুজের উপরও অনবরত আছড়ানোর ফলে এ সম্বন্ধে তাহার 'আইডিয়া'গুলি পরিষ্কার হইয়া

গেল। পরিষ্কার হইলে দেখা গেল, সত্য যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা একমাত্র 'বার্থ-কন্ট্রোল'। তজমুল অমনি একটা 'স্কীম' রচনায় লাগিয়া গেলেন—গ্রামে গ্রামে 'ক্লিনিক'—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পাঁচ বৎসরের শেষে 'ক্লিনিক' একটাও দেখা গেল না, শুধু লাভের ঘরে পাওয়া গেল পাঁচ বৎসরে পাঁচটি সন্তান—ইহার মধ্যে তৃতীয়টি জড়, চতুর্থটি বোবা, পঞ্চমটি এখনও অনিশ্চিত। এমন সময় বাবা গেলেন মারা, সংসারের নানা টানাটানিতে মায়ের মেজাজ হইয়া উঠিল রুক্ষ। ভার আইনতঃ পড়িল তজমুলের ঘাড়ে। তিনি সংসারে শান্তি আনিতে চাহিলেন মাহফুজের বৌ ঘরে আনিয়া। মাহফুজ করিল দৃঢ় 'না'; সব আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

স্থানীয় সার্কেল অফিসার ডেপুটি হওয়ার তদ্বির করিতেছিলেন। দু'বার তাঁহার নমিনেশন গিয়াছিল, আর একবার পাঠাইতে পারিলেই 'কিল্লা ফতে'। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার মুরুব্বী—জেলার কলেক্টর বদলী হইয়া গেলেন। সার্কেল অফিসার মনে করিতেছিলেন, ডেপুটি হইতে না পারিলে জন্ম বৃথা। ইহার জন্য যে কোনো তদ্বির করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। মাহফুজ ভাবিত, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কেহ না দেখে মতো কলেক্টরকে সেজদা করিতে বলিলেও তিনি পিছপাও হইতেন না।

নূতন কলেক্টরকে বাগাইবার জন্য তিনি ঠিক করিলেন, উহার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দেখাইবেন। কিন্তু, ইহার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ান—বহু টাকা চাঁদা উঠান প্রয়োজন। খাটিতে পারে অথচ কাজ নষ্ট করিবে না, নষ্ট হইতে দিবে না, এমন লোক চাই। তিনি মাহফুজকে চিনিতেন, তাহাকে ডাকাইয়া এই কাজে লাগাইয়া দিলেন, অযাচিত কিছু অর্থ সাহায্যও করিলেন।

বড় ধুমধামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটনের আয়োজন হইল। কিন্তু, অনুষ্ঠানের দিন সার্কেল অফিসার যাবতীয় আয়োজন নিজের হাতে রাখিলেন। কলেক্টরকে দেখাইতে হইবে ত। আঙ্গিনায় রশি বাঁধিয়া দিয়া যাহাদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন তাহাদিগকে বাহিরে রাখা হইল। চিকিৎসালয়ের বারান্দায় এজলাস বানান হইল, উপরে পাখা বসান হইল এবং উহার নীচে যাঁহারা জৌলুস করিয়া বসিলেন তাহাদের মধ্যে জনকয়েক পদস্থ কর্মচারী, স্থানীয় বৃদ্ধ কাজী সাহেব, সদর হইতে

আগত কয়েকজন উকীল এবং মাহফুজ। মাহফুজ বসিয়াছিল সার্কেল অফিসারের অনেক অনুরোধে। যদি আবার প্রয়োজন হয়।

মাহফুজের কাজ ছিল না। সে যেন নিজের ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের লোকেরা একজন দশজন হইয়া সব কাজের তদারক করিতেছিল।

প্রোগ্রাম মত কাজ চলিতে লাগিল। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে এক উকীল—তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও—মুদ্রিত ইংরেজী অভিনন্দন পাঠ করিলেন। রশির ঘেরার ভিতর তাঁহাকে বিশেষ মহিমান্বিত দেখাইতে-ছিল। রশির বাহিরে থাকিয়া জনতার অনেকেই অঙ্গুলি নির্দেশে সাহেবকে দেখাইতেছিল। সার্কেল অফিসারের ইসারায় চৌকিদারেরা চাপা গলায় "বেয়াদব! বেয়াদব!" হাঁকিয়া তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল। (হিন্দু চৌকিদারেরা হাঁকিয়াছিল 'বেআদ্দপ'!) ইহা দেখিয়া সেই উকীলটি সাহেবকে শুনাইয়া অস্ফুটে বলিলেন: 'সাহেব অল্পদিনের মধ্যেই ভারী জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।' সমর্থনের একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল: "Oh! Yes." "Undoubtedly." "Certainly!" অবশেষে যেন জেদাজেদি করিয়া সকলের কণ্ঠকে ডুবাইয়া কাজী সাহেব মোটা গলায় হাঁকিলেন: "বেশক! বেশক।" সাহেব উপর হইতে একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। এদেশে রশির ঘেরায় সাহেবরা আপত্তি করেন না। কিন্তু, এই রশি যে বিলাতি চোখে খুব বড় হইয়াই দেখা দেয় তাহা নিঃসন্দেহ।

তারপর 'চায়ের' নামে একটা বিরাট ভুরিভোজন। রশির বাহিরের লোকেরা চাহিয়া দেখিতে লাগিল কত রকমের 'খানা'—ছোট ছেলেদিগকে কাঁধের উপর তুলিয়া ধরিয়া বয়স্কেরা পিছন হইতে দেখাইতে লাগিল। রশির ভিতরে খাইয়া বাঁচিল অনেক। সার্কেল অফিসার নিজে তদারক করিয়া খানসামাদের দ্বারা বড় বড় অফিসারদের বাসায় কিছু 'নমুনা' পাঠাইয়া দিলেন। আহার সারিয়া সাহেব সিগারেট ধরাইলেন। অতঃপর উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঔষধের শিশিগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার কি খেয়াল হইল; বলিলেন: "আমি ঔষধ বিতরণ actually দেখতে চাই।"

সার্কেল অফিসার ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; সালাম দিয়া বলিলেন: "Alright, Sir!" নিমেষেই হাঁকিলেন: "চারু ডাক্তার!"

চৌকিদারেরা রব তুলিল : "ডাক্তার বাবু। ডাক্তার বাবু!"

একজনের উপর দশজন ছুটিল তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে। ঠেলাঠেলিতে ক্ষীরোদ চৌকিদারের মাথার পাগড়ি খুলিয়া খসিয়া পড়িল।

ক্ষীরোদের যেখানে ছিল ভয়, সেখানেই হইল বাঘের সঙ্গে দেখা। জাতিতে শীল, আগে লিখাইত 'নাপিত', গান্ধী আন্দোলনের পর লিখাইতেছে 'নায়ী ব্রাহ্মণ'। বয়স সত্তর হইতে আশীর মধ্যে। নিজে কামাইতে পারে না; চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া কেহ তাহার হাতে কামাইতে রাজী হয় না। শরীর জীর্ণ হইয়া মাথার খুলি পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। ছেলেটি কামায়; নিজে মান্ধাতার আমলের চাকুরিটি বজায় রাখিয়াছে। ছেলেটি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার-দিগকে বিনামূল্যে কামায়, সুতরাং তাহার যোগ্যতার প্রশ্ন উঠে না। তিনজনে মিলিয়া পাগড়িটা বাঁধিয়াছিল, এখন একা কিছুতেই উহাকে বাগে আনিতে পারিল না। কিন্তু, বিপদ ঘটিল না। সাহেব দেখিতে পাওয়ার পূর্বেই প্রেসিডেন্ট তাহাকে রশির ওপারে পাঠাইয়া দিলেন।

চারু ডাক্তার কাঁপিতে কাঁপিতে হাজির হইলেন। কোনো স্কুলে পড়েন নাই। তাঁহার খুড়া ছিলেন ডাক্তার। লোকের বাত ফোঁড়া কাটিতেন, সিভিল সার্জন যেটা অসাধ্য বলিয়া ফেরৎ দিতেন তিনি অবলীলাক্রমে সে কাজে হাত দিতেন। রোগী মরিলে তাঁহার দুর্নাম হইত না। কারণ, একবার সিভিল সার্জনের নিষেধ সত্ত্বেও একটা রোগীকে অস্ত্রোপচার করিয়া তিনি আরাম করিয়াছিলেন। কিন্তু, এখন সেদিন নাই। পকেটে আইডিনের শিশি একবার তুলিলে সেটা আর নামানোর প্রয়োজন হয় না, কোনো গতিকে ছিপি খুলিয়া পকেটের রঙ জ্বলিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। হোমিওপ্যাথি আসিয়া অস্ত্রো-পচারকে এখন অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। চারু ডাক্তারও সুতরাং হোমিওপ্যাথি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। তবে কুইনিন মিকশ্চারটা তাহার জানা ছিল। আসিতেই তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন—মাভৈঃ, যে বাগেই হউক তিনি মিকশ্চার চালাইবেন।

ইতিমধ্যে সাহেব মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন : "Any of you ill, gentlemen ?" সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

সার্কেল অফিসার নিরুপায়। পরক্ষণেই নজর পড়িল কাজী সাহেবের উপর। কাজী সাহেব ইংরেজী বুঝিতে পারেন নাই; ব্যাপার কি, ঠাওর

করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সার্কেল অফিসার চোখে ইসারা করিলেন এবং বলিলেন : "কাজী সাহেবের না পেটে অসুখ?"

চতুর কাজী সাহেব অম্‌নি পেটে হাত দিয়া আগাইয়া গেলেন : "ডাক্তার বাবু! পেটে বড় অসুখ।"

ডাক্তার পেটে হাত দিলেন, কিন্তু উহা এইমাত্র রকমারী খানায় এমন বোঝাই হইয়াছিল যে, ভিতরে ঢুকিয়া পড়া ছাড়া উপর হইতে কিছুই মালুম করিবার সাধ্য ছিল না। তিনি পেছপাও হইলেন না। মুখে বলিলেন : ম্যালেরিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে হাঁ করাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গেলাস কুইনাইন মিকশ্চার ঢালিয়া দিলেন। যে কষ্টে তিনি উহা গলাধঃকরণ করিলেন এবং তখন তাঁহার মুখখানার অবস্থা যাহা হইল উহা দেখিয়া সাহেব মুখ ফিরাইয়া মুচকিয়া হাসিলেন ; ভদ্রলোকেরা রুমাল বাহির করিয়া হাসি চাপা দিলেন। কিন্তু, তবুও কাজী সাহেব নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বিভোর হইয়াছিলেন খাঁ-সাহেবীর স্বপ্নে। পরপর সার্কেল অফিসাররা তাঁহাকে উস্কানি দিয়া নিজেদের কাজ হাসিল করিয়া লইতেন। এখন চাকুরে মহলে তাঁহার খাঁ-সাহেবী একরূপ নির্ঘাত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছিল। পেটের অসুখ হউক বা না হউক—কিছুরই তোয়াক্কা করিয়া তাঁহার এই 'কাম্‌য়াবি' তিনি ফসকাইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এমন সময় পিছনের সারিতে হঠাৎ একটা লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে একটা দৃঢ়তা, চোখে একটা তেজ। সে মাহফুজ। অর্ধ জাগ্রতের ন্যায় তাহার মুখ হইতে বাহির হইল : 'যত সব বাজে।' পরক্ষণেই সাহেবের দিকে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া সে দৃঢ় পদক্ষেপে আঙ্গিনায় নামিয়া গেল এবং রশির ঘেরা পার হইয়া জনতায় মিশিয়া গেল।

কি একটা যেন জনতার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইল। তাহারা পরস্পরে ডাকাডাকি করিয়া বলিতে লাগিল : "সভা ভাঙ্গল, ওরে সব চল।"

সাহেব মুখে বলিলেন : "Never mind, C. O." কিন্তু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন : জনতা দূরে মিলাইয়া যাইতেছে।

সকলের আগে মাহফুজ নীরবে মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছে। সেবারে সার্কেল অফিসারের নমিনেশন গেল না। কিন্তু, সাহেব মাহফুজকে ডাকাইয়া

বানাইলেন সবডেপুটি কলেক্টর। দৌলতপুরে ঋণ সালিসের নূতন কেন্দ্র হইয়াছে। মাহফুজের উপর দেওয়া হইয়াছে উহার ভার।

মাহফুজ ট্রেনে চলিয়াছে দৌলতপুর। 'ইন্টার'-এ সে একা। ভাবিতেছে: দৌলতপুরে দিয়াছে ভালোই হইয়াছে। দৌলতপুরে তাহার এক মামাতো বোনের শ্বশুরবাড়ি। খুব ছোটবেলায় একবার সে বাপ-মা-নানী ও মামুর সাথে দৌলতপুর গিয়াছিল। বোনটির সবে মাত্র একটি খোকা হইয়াছিল, তাহাকে দেখিতে। তখন ট্রেন হয় নাই। নৌকায় কাটিরপাড় হইয়া তাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল।

পরের স্টেশনই কাটিরপাড়। হঠাৎ খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। মাহফুজ দেখিল: তাহার কামরার দরজা খুলিয়া একটা লোক উঁকি মারিতেছে। গাড়ির বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল, এবারে থামিয়া গেল। মাহফুজ শুইয়া আছে, যেন নিজের ভিতর নিজে ঘুমাইয়া আছে। গাড়ি আবার চলিতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় লোকটি লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিল এবং তাহার সুটকেসটি লইয়া নামিয়াই পড়িত যদি না মাহফুজ ঝটিতি উঠিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিত। লোকটি একটুখানি ছাড়াইয়া লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল না—একবার মাত্র চোখে হাত দিল, পরক্ষণেই চেঁচাইয়া উঠিল: "অন্ধ, বাবা, ছেড়ে দাও; ভুলে উঠে পড়েছি এই গাড়িতে।"

মাহফুজ তাকাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অন্ধই বটে, একজোড়া দৃষ্টিহীন সাদা চোখ—উহাদের কোথাও কালো নেই। কিন্তু, যখন উঠে তখন তাহাকে মনে হইয়াছিল দিব্য চক্ষুষ্মান। মাহফুজ বলিল: "ভয় নেই, চল আপাতত: দৌলতপুর পর্যন্ত, তারপর দেখা যাবে।"

আকস্মিকতা কাটিয়া গেলে ভালোরূপে চাহিয়া মাহফুজের মনে হইল, লোকটিকে সে কখনও দেখিয়া থাকিবে। লোকটির গলার আওয়াজ তাহার বেশ চেনা এবং উহার সম্বন্ধে তাহার মনের এককোণে অপ্রীতির একটা আধারও জমিয়া আছে। তজমুলের মনে পড়িল। তিনি হইলে শুনামাত্রই বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মতো স্মৃতিশক্তি কয়জনের আছে?

তাহার মনের আকাশে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে ছোটবেলায় নৌকায় দৌলতপুরে যাওয়ার সময় কাটিরপাড়ে তাহাদের নৌকা আরেকটা নৌকার পাশে নোঙ্গর করিয়াছিল না। সেই নৌকাটা ছিল নূতন—নানা

রকম রঙ করা—'মাথি'তে কয়েকটা ফুলের মালা ও একটা কড়ির মালা দোলানো। মাহফুজ তাহাদের নৌকার 'মাথি'তে বসিয়া ঐ নৌকার 'মাথি'কে পায়ে ঠেলিয়া দিতেছিল, 'মাথি'টা আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া পানির টানে আবার পাশে আসিয়া ভিড়িতেছিল; মাহফুজ আবার পায়ে ঠেলিয়া উহাকে দূরে পাঠাইতেছিল। ছৈয়ের উপর বসিয়া এই লোকটা হুঁকা টানিতে টানিতে উহা লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ সে অবজ্ঞা ও ওস্তাদীর সুরে মাহফুজকে চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "ওরে ছোঁড়া, তোর মাথায় কেউ লাথি মারিলে কেমন লাগিবে?" মাহফুজ প্রশ্নটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে নিজেকে বড় অপমানিত মনে করিয়াছিল। তাহার বাবা ভিতর হইতে বাহির হইয়া লোকটাকে খুব তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু, সে এতটুকু গ্রাহ্য করে নাই। সমানে উত্তর করিয়াছিল: "তোমার ছেলের থেকে আমার নৌকার মান কম কিসে? নৌকার যখন 'মাথি' আছে, কেন সে 'মাথি'র মান অপমান থাকবে না?" কি উদ্ধত ছিল লোকটি। পরে তাহার ভগ্নিপতির নাম জানিতে পারিয়া থামিয়া যায়। সেই লোক। নৌকার মাঝি। কিন্তু, সুটকেস নিয়া সরিতেছিল কেন? এখন চুরি-ডাকাতি করিয়া ফিরিতেছে নাকি? আবার দেখা যাইতেছে অন্ধও। কী ব্যাপার?

মাহফুজ কিছু চিন্তা করিয়া লইল। তারপর বেশ ধীরভাবেই বলিল: "দেখ, তোমার চালাকি আমি ধরতে পেরেছি। তুমি আসলে অন্ধ নও, ধরা পড়বার ভয়ে চোখে 'আব' গুঁজে দিয়ে অন্ধ সেজেছ। তুমি চুরির মতলবেই ঢুকেছিলে। আর তোমাকে আমি চিনেছিও। আমার ছোট-বেলায় তুমি ছিলে নৌকার মাঝি। তোমার সে নৌকা কোথায় গেল? বেশ ত নূতন দেখেছিলাম।"

লোকটি একবার ঘাড় ফিরাইয়া চোখে হাত দিল। মুখ ফিরাইতেই মাফুহজ দেখিল: একজোড়া সতেজ দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া আছে, উহার কালো পুত্তলী হইতে খাঁচার বাঘের ন্যায় একটা পাশবিক ভাষা মনের বৈকল্য কাটাইয়া যেন কিছুতেই বাহির হইতে পারিতেছে না। কী প্রচণ্ড সে ভাষা, আর কী দুরতিক্রম্য মনের সে ক্লীবত্ব।

মাহফুজ তাহাকে কিছু সময় দিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল: "দেখ,

আমি দৌলতপুরে ঋণ-সালিসের ডেপুটি হয়ে যাচ্ছি। তোমাদের দুঃখ-দৈন্যের কিছু প্রতিকার হয়ত এই ঋণ-সালিসের ফলে হতে পারে।"

মাঝির মুখের যতো কুঞ্চন—এক একটা কুঞ্চনের পেছনে কত ব্যর্থতা ও হতাশা জট পাকাইয়া আছে তাহা কে বলিবে—সব মরা স্নায়ুগুলির উপর দিয়া যেন স্ফুর্তির একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। পরম আগ্রহে—কিন্তু দৃষ্টিতে অবিশ্বাস পুরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল: "বক্রেশ্বর মহাজনকে আপনি আঁটতে পারবেন?" মাহফুজ জিজ্ঞাসা করিল: "কে বক্রেশ্বর মহাজন?" মাঝির প্রত্যেকটি লোমকূপ হইতে যেন অসংখ্য পিষ্ট ও পীড়িত ব্যাঘ্র-শিশু ক্রুদ্ধ আর্তনাদে ইহার উত্তর দিতে চাহিল। বলিল: "সেই ত আমার ভিটে বাড়ি নিলামে চড়িয়েছে। নৌকার ব্যবসা বেশ চলছিল দেখে আমার পেছনে লোক লেলিয়ে দিলে। রাত নাই, দিন নাই; তার লোকে শুধু মন্ত্রণা দিতে লাগলে—এবার বড় ঘর থেকে বিয়ে কর। মাথায় দুর্বুদ্ধি এল। গেলাম হাছানপুর কাজী-বাড়ী। ওরা হাঁকলে সাতশ' টাকার অলঙ্কার, দুইশ' টাকা বাড়ি-খরচা। বাপ বিয়ে করেছিলেন একশ' টাকার অলঙ্কার দিয়ে। বক্রেশ্বরের লোক বুঝিয়ে দিলে: বাপকে আমি অনেক ডিঙ্গিয়ে গেছি। টাকা অত কোথায় পাব? বক্রেশ্বর এগিয়ে আস্‌ল: বিয়ে সেই করিয়ে দিবে। তারপর পাঁচশ' টাকার অলঙ্কার সেই দিলে, অর্থাৎ আড়াইশ' টাকার সোনা-রূপায় আড়াইশ' টাকার দিলে খাদ ও ওজন কম। বাকী টাকা আমিই দিতে পারলাম। কিন্তু, বক্রেশ্বরকে সব রেহেন করে দিতে হ'ল। দুই পয়সা হারে সুদ লিখতে হ'ল, কারণ অন্য খাতককে তার হার দেখাতে হবে ত। কথা থাকল, আমি যতদিনে পারি আসল টাকা শোধ দিলেই হবে। সুদ সে কিছুতেই আমার থেকে নেবে না। তারপর আমার নৌকা হয়ে উঠল তার নৌকা। সময় নাই অসময় নাই তার কাজে নৌকা খাটাতে হয়। তার ধারি, 'না' করতে পারি না। হাঁফিয়ে উঠে বছর দুই পরে নানা 'ঢালা উপর' ক'রে টাকা নিয়ে গেলুম। সে টাকা নিলে না। উলটে আরও মুরুব্বিয়ানার সুরে ধমকে দিলে: "টাকা ত তোমার কাছে জমাই রেখেছি। এত ব্যস্ত কেন? আমি ত আর টাকা চাইনি?" উপায় নেই। তখন বুঝতে পারলাম যে, অজগরের কুক্ষিতে পড়েছি। এদিকে কোম্পানী রেল বসালে। নৌকার আর গরুর গাড়ীর ব্যবসা অচল হয়ে গেল। গরুর গাড়ি-

ওয়ালারা একজোট হয়ে রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কয়েকখানি মোটর কিনে। নৌকাওয়ালারা কিন্তু জাহাজ করতে পারলে না। নৌকা আমাদের বেচতেই হল। সময় বুঝে বক্রেশ্বর দিলে নালিশ পাই-পয়সা পর্যন্ত সুদ হিসাব করে। এত যে নৌকা খাটালাম, নিজেরা খাটলাম তার কাজে, আমারি মতো কত জনের ঘরে তার ইঙ্গিত পেয়ে তার টাকা চুকিয়ে দিলাম, মুখের যত চুক্তি সব মিথ্যে হয়ে গেল। শুধু সত্য হয়ে থাকল তার দলিলখানি। বিপর্যয়ে পড়ে তদ্বিরই করতে পারলাম না। এক তর্ফা ডিক্রী হয়ে গেল। নৌকাওয়ালারা গিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খুললাম দোকান—ভাতের, চা-বিস্কুটের, ডাল-চালের। প্রথম প্রথম মোটর বেশ চল্‌ল। তারপর রেল-কোম্পানী দিলে ভাড়া কমিয়ে, আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড তাদের সঙ্গে জুটে দিলে রাস্তার মেরামত বন্ধ ক'রে। মোটরগুলি সব জখম হতে লাগল। টানা হেঁচড়া ক'রে ক'রে শেষ হয়ে গেল আমাদের কত রশি কাছি ছিঁড়ে। ততদিনে বক্রেশ্বর নিলামে চড়িয়ে ভিটে বাড়ী কিনে নিয়েছে; চোখের উপর দিনের পর দিন বক্রেশ্বরের লোক আঙ্গিনা পর্যন্ত চষে কলাই বুনে দিয়ে গেল। এদিকে পথে লোক চলাচল আর হয় না, সকলে চিনে নিয়েছে রেল। পেটে ভাতই জুটে না। কাচ্চা বাচ্চার সংসার। হাছানপুরের বিবি দুঃখে গলায় দড়ি দিতে চাইলে। নৌকাওয়ালা গাড়িওয়ালা সকলে মিলে রেলের কুলী হলুম। কিন্তু, মাল কম! অত কুলীর পোষাবে কেন? তখন 'জুটি' গেল ভেঙ্গে, মাল নিয়ে হল কাড়াকাড়ি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এমন সময় আমি পড়লাম চা বাগানের ম্যানেজারের মোটর চাপা। ম্যানেজার দয়া করে পাঁচ টাকা দিবে কেন? কিন্তু যে কয়দিন শুয়ে কাটাতে হ'ল, ওর মধ্যে আমার মগজ পরিষ্কার হয়ে গেল। এই হাত-পা-চোখের ব্যবহারের কোনো পথই আমি দেখলাম না। এখন তাই নূতন ফিকির ধরেছি। আপনি পারবেন বক্রেশ্বরকে শায়েস্তা করতে?"—আবেগে তাহার আওয়াজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মাহফুজ জিজ্ঞাসা করিল: "তোমার নিলাম হয়েছে কতদিন?" মাঝি বলিল: "আস্‌ছে মঙ্গলবার বাইশ দিন হবে।"

মাহফুজ কিছু চিন্তা করিল। তারপর বলিল: "তুমি দিন দুই-তিনের মধ্যেই দৌলতপুরে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

মাঝি খুশি হইল। হায়রে, পুরানো সম্পদ যদি আবার ফিরে পাওয়া যায়। স্টেশনেই মাহফুজ মাঝিকে নামাইয়া দিল।

দৌলতপুরে পৌঁছিয়াই মাহফুজ মা'র ও তজমুলের চিঠি পাইল।

মা লিখেছেন: বৌয়ের শরীর বড়ই খারাপ, এবারে প্রসবের সময় বাঁচিবে এরূপ কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তিনি আর পারিতেছেন না। এবার মাহফুজ একটা বিয়ে করুক। সে তাহাকে এত কষ্ট দিবে তিনি কখনও মনে করেন নাই।

তজমুল জানাইয়াছেন...বার্থ কণ্ট্রোল সম্বন্ধে তাঁহার অন্যতম কার্যকরী Thesis শেষ হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, উহাই জাতীয় পুনর্গঠনের পন্থা—দুঃখের বিষয় তাহার ভাবীর শরীর বড় খারাপ যাইতেছে। Thesis লইয়া ব্যস্ত থাকায় এতদিন তিনি নিজে তাহার দেখাশোনা করিতে পারেন নাই। এখন সেদিকে মনোযোগ দিবেন। এ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থেরও অর্ডার দিয়াছেন।

সপ্তাহের মধ্যেই মাঝি আসিল। তাহার কেস সম্বন্ধে মাহফুজ অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেখিয়াছে। আইনের চোখে সে ঋণী নহে। কারণ, বক্রেশ্বর বুদ্ধি করিয়া সম্পূর্ণ দাবীর পরিবর্তে নিলাম ডাকিয়াছে। লোভে পড়িয়া দাবীর যদি কিছু জের সে রাখিয়া দিত তাহা হইলে আইনের চোখে মাঝি এখনও ঋণী থাকিত এবং তাহার ঋণ-সালিসের উপলক্ষ্যে হয়ত নিলামের পুনর্বিবেচনা চলিতে পারিত। আইনের ব্যাখ্যা সে মাঝিকে শুনাইল। মাঝির মুখের কুঞ্চনগুলো আবার শিহরিয়া উঠিল, প্রাণের মূলে যেন হিমজট্ পাকাইতেছে। সে ঘাড় ফিরাইয়া আবার চোখে হাত দিল। মাহফুজের দিকে যখন চাহিল তখন সব সাদা, চোখের কোথাও কালো নাই।

: বক্রেশ্বর নির্লোভ, এ কথা শুনাতেই ডেকেছিলেন তাহ'লে। আসি।

মাঝি বাহির হইয়া গেল। যতদূর তাহাকে দেখা যায় মাহফুজ চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল: Unbalanced। এদেশের সকলেই Unbalanced.

ততক্ষণে রাস্তার উপর মাঝির বিশ্রী গলার হাঁক শোনা যাইতেছে: "অন্ধ, বাবা, ভিক্ষা দাও, আল্লার ওয়াস্তে একটি পয়সা ভিক্ষা দাও।"

হানিমুন

মতিনউদ্দীন আহমদ

বিয়ের পর 'বাজগন্তি' সেরে যেদিন শ্বশুরবাড়ী থেকে বাড়ী ফিরে এলাম সেদিন-ই রাত্রে খাওয়ার পর ডাক পড়ল বাবার ঘরে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, এমনি সময়ে এমনি ভাবে যখন ডাক পড়ে তখন একটা বিশেষ রকমের হুকুম হয়, আর সেটা সব সময় আরামপ্রদও হয় না; সুতরাং নিশির ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বুকে দুরু দুরু শুরু হয়ে গেল।

বাবার ঘরের দিকে চলেছি তো চলেইছি, সে পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। এদিকে আমার বুকের ভিতরে পেণ্ডুলামের গতি খুব বেশী হয়ে গিয়েছে। তার উপর যেন মনে হচ্ছিল, আমার শার্ট আর গেঞ্জির মাঝখানে কেউ কয়েকটি জ্যান্ত আরশুলা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আপনারা আমার বাবার মেজাজ তো জানেন না, তাই কোন কিছু আন্দাজ করতে পারবেন না। আমি কিছুটা জানি বলেই আমার মুস্কিল হয়েছে। তাঁর মনের বয়স এক অংশে দেহের সঙ্গে মিল রেখে খুবই প্রাচীন, আর অন্য অংশে চির নবীনতা বিদ্যমান। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে অংশ চলে আসছে। এর সঙ্গে জুড়ে আছে তাঁর হুজুগপ্রিয়তা। অতএব আপনারা ত্রৈরাশিক অংক কষে দেখুন, তার ফল কি হবে ভেবে দেখুন।

আমি ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে কাঁচা। থার্মোমিটারে জ্বর কত ডিগ্রি উঠেছে তা দেখতে হলে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়। ফলে অসময়ে তার ঘরে আমার ডাক পড়লে আমার মগজের তারে যে সব সুর বাজতে শুরু করে, সেগুলো বিলকুল বেসুরো হয়ে যায়। একমাত্র একটা ভরসা ছিল, ডুবে যাচ্ছে মানুষ ভাসমান কুটোর উপর যতখানি ভরসা রাখে—ততখানি ভরসা ছিল যে, বাড়ীতে নতুন বউ আছেন। একেবারে আনকোরা নতুন, সুতরাং তাঁর চোখের উপর কিংবা তাঁর শোনার গণ্ডির ভেতর তাঁর সদ্যলব্ধ স্বামীর উপর কোনো জুলুম চলবে না। কিন্তু ভরসার চেয়ে ছিল ভয় বেশী এবং

সেই সঙ্গে সঙ্গে বিগত সময়ের অসুবিধাজনক হুকুমগুলির স্মৃতিও এসে মনে উদয় হচ্ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সুবিধাজনক বা সুখের জন্য যত কিছু হুকুম বাবা আগে আগে করেছেন, তার কোন কথাই যেন মনে পড়ছিল না।

যাকগে, আমার মনের অবস্থা মোটামুটি খারাপ, বেশ ভালো রকমের খারাপ। এই কয়েকদিন বিয়ের ঝামেলা, তারপর 'বাজগস্তির' সুখদুঃখ, আত্মীয়-স্বজনের ভীড় বা উপস্থিতির দরুন নানা ফন্দি-ফিকির—এ সব প্রায় কাটিয়ে দিয়ে 'ওর' আড়ষ্ট ভাবকে বেশ অনেকটা কাটিয়ে এনেছি, এমন সময় না জানি কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। লুসাই পাহাড়ের তলায় বাবার কাঠের যে কারবার আছে, হয়ত বা সেখানকার ম্যানেজার হাজার কয়েক টাকা মেরে সরে পড়েছে বা সেখানে হয়ত দুটি কি পাঁচটি হাতীর অসুখ হয়েছে কিংবা তিনটি হাতী 'জংলীর' সাথে 'ঘর ছেড়ে বনে' চলে গিয়েছে। অতএব আমাকে ছুটতে হবে সেখানে। বাবার এত বুদ্ধি, কিন্তু তিনি এই কথাটা বুঝতে পারেন না কেন যে, পাহাড়ে জায়গায় যদি ম্যানেজার টাকা নিয়ে সরে পড়ে তবে তাকে ধরে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়ই, এমন কি পুলিশের পক্ষেও না। তার হাতে অতগুলি টাকা রয়েছে, ধরতে গেলেই তা থেকে ভেঙে ভেঙে তা দিয়ে গুলি ছুড়ে ছুড়ে পুলিশকে তাড়াবে। ওর কোন ক্ষতি হবে না তাতে, যায় যাবে আমার বাবার টাকা যাবে, ওর বাবার তো নয়। তার পর হাতীর যদি অসুখ হয়ে থাকে তো তার জন্য পশুডাক্তার রয়েছে। আমি গিয়ে কি করতে পারি? ডাক্তারী জ্ঞান বলতে আমার সেই একটাকার কেনা গৃহচিকিৎসা আর কাঠের ছোট একটি বাক্স। বাড়ীতে নিদান পাড়ার কোন অবলা শিশুর অসুখ-বিসুখ হলে, কোন পুরুষ অভিভাবক কেউ বাড়ী না থাকলে মেয়েরা একেবারে নিরাশ্রয় হলে তবে আমাকে দিয়ে তাদের বাচ্চাদের চিকিৎসা করান। আমার ওষুধের একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, যদি বাচ্চা রোগী ভাল হয়ে যায়—(আর আশ্চর্য, প্রায়ই ভালো হয়ে ওঠে! মনে হয় আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি করলেও আমার রোগী ভাল হয়ে উঠত। এ অবশ্য আমার হাতযশ)—তবে আমার ওষুধ আর চিকিৎসার গুণ, আর যদি না সারে তবে হোমিওপ্যাথির বৈষ্ণবোচিত অহিংস ধর্মের দোহাই দিয়ে আমি নির্দোষ থেকে যাই। কিন্তু পাড়ার অপর লোকের বাচ্চাদের ভক্ষ্য ওষুধে হাতীর কি কাজে লাগবে? সব ওষুধ সহ বাক্স হাতীর

মুখে পুরিয়ে দিলেও কিছু হবে না। এই বিরাট দেহে ওষুধের বড়ি ত বড়ি, শিশি পর্যন্ত একটি আর একটির দেখা পাবে না। কি করে পাবে বলুন দিকিনি, মনে করুন একটি শিশি গিয়েছে লেজের দিকে, একটি গিয়েছে শুঁড়ের দিকে আর একটি গিয়েছে তলপেটে, একবার দৃশ্যটি ভেবে দেখুন। আর একবার শিশি-জন্ম না হলে এ জন্মে কি আর এদের দেখাশুনা হবার সম্ভাবনা আছে? তার উপর হাতীর পেটের ভিতর ক্ষুধার যে আগুন, সে ত আর আপনার আমার পেটের মতো ৫ কিম্বা ৭ ডিগ্রী ফার্নহিটের নয়, সেখানে গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ অঙ্কের ভাজ্যের মত শিশি, বড়ি সব শেষ হয়ে গিয়ে অবশিষ্ট যদি হাতে কিছু থাকে তবে থাকবে শুধু ঐ কাঠের বাক্সটি, আর ভাগফল কিছুই থাকবে না। কারণ, প্রথমত: হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বৈষ্ণব-ধর্মী, দ্বিতীয়ত: বাক্সের ভিতর সব রোগেরই ওষুধ আছে কিনা, তার আবার প্রতিষেধকও রয়েছে, সুতরাং যত প্লাস তত মাইনাস, ফল শূন্য—হাতে থাকে শুধু কাঠের বাক্স—১।

যদি জংলীর সাথে দু' চারটি হাতী পালিয়ে যায়, ত তারা যাবেই। কেউ কি তাদের আটকাতে পারবে? সে হল গিয়ে স্বভাবধর্ম। কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক শুনে রাধা যেতে চাইলে তাঁকে কি কেউ আটকাতে পেরেছিল? লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার যুগ থেকে শুরু করে এ যাবৎ যতখানি প্রেমের নভেল পড়েছেন বা সিনেমা দেখেছেন সবগুলির প্লটের কথা ভেবে দেখুন, ঐ অবস্থায় দু'পায়া মানুষকে কি কেউ আটকাতে পেরেছে? আর আমি যাব চারপায়া হাতীকে বাধা দিতে?

আমি সদ্য বিবাহিত। মিলন-বিরহ অবস্থাগুলো আমি এখন কায়-মনোপ্রাণে খুব ভালোভাবে অনুভব করছি। হাতীর মনের অবস্থা এখন আমার মনের অবস্থা থেকে বেশী দূরে নয়। আর আমি যাব তাকে বাধা দিতে? আমি রামচন্দ্রের বাপ দশরথ নই। ঐ সব কাজ হচ্ছেনা আমাকে দিয়ে। তা বাবা চটেন চটুন তা আমি কি করব?

কি সব ভাবছি। বাবার চটা মেজাজ যেন আমি জানি না। এই কথা মনে উদয় হতেই সার্টের আর গেঞ্জীর মাঝখানের আরশুলাগুলো ছুটা-ছুটি শুরু করে দিয়েছে। বুকে পিঠে তাদের ঠ্যাঙ্গের খোচা শুঁড়ের শুড়শুড়ি

টের পাচ্ছি। বাবার ঘরের দরজার সামনে এসে পৌঁছতেই মনে হলো আমার মগজের ভিতর থেকে মগজের এক একটা চাকতি এক একটা প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসার জন্য সাজগোজ করে একবারে তৈরী হয়ে নাকের ছিদ্রের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার প্রথম ধমকের সঙ্গে সঙ্গেই চাকতিগুলি ধড়ফড় করে বেরিয়ে যাবে, বোমারু বিমানের পেটের তলায় বোমা ফেলার ঘুলঘুলি খুলে বোমা ফেলার হুকুমের জন্য বোমা নিয়ে বোমান্দাজ সিপাহী যেমন তৈরী হয়ে থাকে।

শেষ দৃশ্য—বাবার ঘরে আমার প্রবেশ, বাবা আমার মুখের দিকে তাকালেন—মুহূর্ত সময়—বোমা ফেলার লিভারে বোমান্দাজ সিপাহীর হাতে একটুখানি চাপ পড়ল—বাবা বললেন, একদম বিনা ভূমিকায়—রেডিও স্টেশনে রেকর্ড করা বক্তৃতা যেমন করে শোনান হয়—বিলকুল বিনা ভূমিকায় বিনা আবেগে। বাবা বললেন—দেখ, বিয়ের হাঙ্গাম সব চুকেবুকে গিয়েছে। তুমি দিন পনর বৌমাকে নিয়ে শিলং ঘুরে আস। ইচ্ছে হয় অন্য কোথাও যেতে পার। হাজারখানেক টাকা লাগবে, খাজাঞ্চির কাছ থেকে নিয়ে যাও। তার উপর আরো পাঁচশ' বেশী নিও। বিদেশ বিভুঁয়ে হঠাৎ কোন দরকার হতে পারে। অপরিচিত জায়গায় টাকা-ই একমাত্র সাহায্যকারী। আর দেখ, সঙ্গে চাকর নিওনা, সুবিধা-অসুবিধা যা হয়, তা তোমরা দু'জনে যাতে ভাগ করে নিতে পার, তার জন্য বলছি। আর কাল ভোরের ট্রেনে বেরিয়ে পড়। যেখানেই যাও পৌঁছে একটা খবর দিও, তোমরা কোথায় উঠলে। এর বেশী চিঠিপত্র লিখে সময় নষ্ট করো না। খুব হৈ-হুল্লোড় করে হলিডেয়িং করে এসো।

তখন মুখ দিয়ে কোন কথা বা কোন শব্দ বেরিয়েছিল কি না জানি না। যদি না বেরোয় তবে রক্ষা। নতুবা সেই শব্দের আওয়াজ হ'ত এই রকম একটা কিছু—বাবা আমার, সোনা আমার, মানিক আমার, আমার সাত রাজার ধন, আমার কোলে এস যাদুমনি, তোমার মাখনের মতো তুলতুলে গালে চুমু খাই—ইত্যাদি। বাবা যদি এসব শোনেন তবে কি মনে করবেন? ভাববেন হয়তো, ছেলেটার অভ্যাস একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আমার মন তখন যে কোন আসমানে আছে, তা কি করে আপনাদের বোঝাবো? আপনারা খুব ভালো ভালো কয়েকটা উপমা নিজেরাই জোগাড় করে নিন। তাড়াতাড়ির মধ্যে আমার মনে মাত্র একটা উদয় হচ্ছে। তা নমুনাস্বরূপ আপনাদের বলে দিচ্ছি। খুব জবর পাম্প করা বেলুনের হাওয়া ছেড়ে দিলে বেলুনের রবারের যেমন আরাম হয়, আমারও সেই রকম আরাম বোধ হচ্ছিল।

বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে কি করে কতখানি সময় ব্যয় করে নিজের ঘরে এসে পৌঁছেছিলাম তা বলতে পারব না। নাটকের 'পটপরিবর্তন' বা সিনেমার 'দৃশ্যান্তর' গোছের কিছু একটা কল্পনা করে নিন। সার্টের আর গেঞ্জীর মধ্যকার আরশুলাগুলি তখন আর নেই। তখন পিঠে বুকে মুখে কে যেন মাখন—সুগন্ধি মাখন মাখিয়ে দিচ্ছে। নাকের পিছনের প্রজাপতিগুলি আবার হলদে রঙের মগজ হয়ে যার যার জায়গায় চলে গিয়েছে।

ঘরে এসে বিবিকে সংবাদ দিতে গিয়ে মস্ত এক অসুবিধায় পড়লাম। ওর ভাল নাম ফাজিলাতুন্নেছা। এই নামকে ছোট করে আদরের নাম করতে গেলে পালসিটিলা যেমন পা-লস্ হয়, লুৎফন্নেছা যেমন লুৎফা হয়, তেমন করে ফাজিল বা ফাজি বলে আদর করা ত হয়ই না, বরং হিতে বিপরীত হয়ে যাবার বেশ সম্ভাবনাও থাকে। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মা-বাপের এতটুকু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল যে, ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের জীবন যার সঙ্গে গাঁথা হয়ে যাবে সে কিছু না কিছু কবিগিরির অধিকারী হতে পারে। আমার মতে, প্রত্যেক মা-বাপ তাঁদের ছেলে-মেয়ের নাম রাখার সময় এই কথাটি যেন মনে রাখেন, আর খেয়াল রাখেন, সন্তান হয়ত বড় হলে এশিয়ার যে কোন একটা বিষয়ে বৃহত্তম হয়ে যেতে পারে। অতএব তার নাম সই করার সময় আদ্য অক্ষরগুলো যেন সুচারুভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকে যাতে সই করা নাম যে কোনো ভালো ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সইর মতো অপাঠ্য হলেও ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রামের রেখার মত ঢেউ তোলা হয়।

থাক নামের দুঃখ, ইউনিভার্সেল প্রেমের নাম—রানী দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বললাম, বললে ঠিক হয় না, ছুঁড়ে ফেললাম।

"রানী, বাবার হুকুম, হানিমুন, কাল সকালে বেরিয়ে পড়তে হবে, শুধু তুমি আর আমি, চাকর-বাকর কেউ যেতে পারবে না, দিন পনর শিলং কিম্বা অন্য কোথাও—ওঠো তৈরী হয়ে নাও—গরম কাপড় ফ্লাস্ক নিতে ভুলো না—বাবা বলেছেন হৈ-হুল্লোড় করতে, আমরা করব হানিমুন—সব গোছাও, সময় নেই হাতে, কাল সকালের ট্রেন ধরতে হবে।"

নতুন নামটি পেয়ে খুশি হয়ে রানী বললে, "গৌহাটিতে আমার এক খালু আছেন, প্রফেসারী করেন, তাঁর ওখানে একদিন থেকে কামাখ্যা দেখে শিলং যাওয়া যাবে।" আমি তখন ছুনিয়ার সব লোকের সব প্রার্থনা মঞ্জুর করতে প্রস্তুত! সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর সামান্যতম ইচ্ছার তো কোন কথাই নাই। খালুকে পরদিন ভোরে পাঠাবার জন্য একটি টেলিগ্রাম তখ্খুনি লিখে রাখলাম।

গৌহাটি স্টেশনে খালু 'দণ্ডায়মান'। 'রানী' দূর হতে আমাকে দেখালেন। 'দণ্ডায়মান' অবস্থা এর চেয়ে ভালো ভাবে মূর্ত হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিলনা। আপনি যত সূক্ষ্মযন্ত্র জোগাড় করতে পারেন তার একটি এনে খালুর ছুই পায়ের সঙ্গে স্টেশনে বাঁধানো প্লাটফর্মের কোণ মাপুন, কোন দিকেই ৯০ ডিগ্রীর একটুও এদিক সেদিক পাবেন না। গলাবন্ধ লম্বা কোট আর প্যাণ্ট দেখলেই আপনার নাকে একটা প্রফেসারী প্রফেসারী গন্ধ লাগবে, হাসপাতালের ডাক্তারের গায়ে যেমন আইডোফর্মের বা লাই-সোলের গন্ধ পাওয়া যায়। খালুকে দেখলে মনে হয়, তার সাহচর্যে এসে হয়ত কোটপ্যাণ্ট এমন রূপ পেয়েছে। নয়ত এই রকম স্যুট পরাতে তাঁর মুখের ভাবটা প্রফেসার গোছের হয়ে গিয়েছে। তাঁর মুখে দাড়ি আছে এবং নাই-ও অর্থাৎ তিনি যদি নিয়মমাফিক দাড়ি কামান, তবে ছু' একদিন কামান নি, আর যদি দাড়ি রাখেন তবে সবে মাত্র লন-মোয়ার দিয়ে কদমছাঁটা ছেঁটে এসেছেন। আর সর্বোপরি তাঁর মাথায় লাল ফেজ। দাঁড়ান তার আগে মাথাটার একটু পরিচয় দিয়ে নিই। মাথাটা একটা ভালো বাংলা কছুর মতো, পেছন দিকে একটা ডুমুরের মতো। বোধ হয় সব বিদ্যা বুদ্ধি ওখানে স্টক করা থাকে। সম্পর্কে খালুশ্বশুর, এর বিষয়। তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তখন তুরস্কের সিংহাসনে সুলতান আবছুল হামিদ অধিষ্ঠিত ছিলেন এর আগের তারিখ যদি খোঁজ

করতে চান, তবে আপনারা যে কেউ গবেষণা করে ডক্টরেট পেতে পারেন তাতে আমার কোন ওজর-আপত্তি নেই।

খালুকে দেখে মন খুব খুশি হলো না। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে কদমবুছি করতে হলো। বিবির গুরুজন, অতএব আমারও গুরুজন। বিবি পরিচয় করিয়ে দিতে আমতা আমতা করে বললেন, "খালু এই—ইনি—এর—"

আমি যেন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী, সদ্য ধরা পড়েছি! বিবি যেন পুলিশের জোগাড় করা সাক্ষী। সেনাক্ত মহড়ায় আমাকে সেনাক্ত করছেন। খালু যেন হাকিম। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছিল না, তার উপর খালুকে দেখে মন একেবারে দমে গিয়েছিল।

খালু শুধু 'হু' বলে বিবির সেনাক্ত করাকে মেনে নিলেন। ঠিক যেমন স্টেশনের তারিখ দেওয়ার মেশিনে টিকিট ঢুকিয়ে ঘটাং করে চাপ দিয়ে তার উপর তারিখ এঁকে দেয়, খালুও তেমন আমার আমিত্ব মঞ্জুর করে নিয়ে তার বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

যে দু'দিন ছিলাম খালুশ্বশুরের বাড়ীতে, তার ফলে মরার পর গোর-আজাব আমার মাফ হয়ে গিয়েছে, আমার এ ধারণা একেবারে বদ্ধমূল। খালুর নির্লিপ্ততা আর খালু-পুত্রের অত্যধিক লিপ্ত-থাকা, এই বিপরীতমুখী দু'টানায় পড়ে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। খালু-পুত্র বয়স্কাউট, সপ্তাহে অন্ততঃ একটি ভাল কাজ তাকে করতে হয়—যেমন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা. অন্ধকে রাস্তা পার করে দেওয়া, ফাঁস-লাগা ছাগলের গলার দড়ি ঢিলে করে দেয়া। তাঁর এই ভাল কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য এই সব মন্দ কাজ কেউ না করলে অর্থাৎ কেউ বিপদে না পড়লে তিনি উদ্ধার করে তাঁর স্কাউটগিরী করবেন কি করে? আগের দু'সপ্তাহে কোনও লোক কোনও বিপদে পড়েনি, কোন জন্তুর গলায় ফাঁস আটকায়নি অতএব তার দু'টি ভাল কাজ বকেয়া পড়ে গিয়েছে। মাতৃহীন কিশোর স্কাউট বাপ কলেজে গেলে পর সারাদিন বন্ বন্ করে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় দু' দুটো ভাল কাজ করতে পারে। অবশেষে নতুন দুলাভাইকে পেয়ে বেচারার গলায় একটু রস হযেছে। তারপর এই দু'দিন আমার উপকার করতে গিয়ে আমাকে যে কি নাজেহাল করেছে, তার একটি মাত্র নমুনা শুনুন।

আমি একটা বিলেতী কাগজে পড়ে তাকে শুনিয়েছিলাম যে, এক গ্রামের রাস্তায় মোটরের চাকা কাদায় আটকে গেলে গাড়ীর মালিক ঐখানে বসা কয়েকটি ছোকরাকে ডেকে বললেন তাঁর গাড়ী ঠেলে দিতে। তারা তাই করল, আর মোটা হাতে বকশিশ পেযে গেল। বকশিশ দিয়ে গাড়ীর মালিক বললেন, যখন কোন গাড়ী এখানে না আটকায় কিম্বা কাদা শুকিয়ে যায়, তখন তোমরা কি কর? ওরা বললে, আমরা তখন ঐখান থেকে পানি বয়ে এনে এখানে কাদা করে রাখি।

তখন যদি জানতাম আমার গল্প গো-বীজ টীকা-দানের মতো আমার উপরেই প্রয়োগ করা হবে তখন কে বলতো এমন গল্প?

রাত্রে যেই শুয়েছি, ঘুম তখনো আসেনি, হঠাৎ মশারীর উপর থেকে কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা পানি পড়ল মুখের উপর। ভাবলাম উপরের তলায় হয়ত কে পানি ফেলেছে, কাঠের ছাদ, তাই চুইয়ে আসছে। নতুন আত্মীয়, তার উপর আবার খালুশ্বশুরের মেহমান, এ নিয়ে ডাকাডাকি করা শোভন হবে না। মিয়া-বিবিতে মিলে কোন রকমে খাটখানাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। আবার শুতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা পানি পড়ল। বিছানাও দেখি খানিকটা জায়গা একেবারে ভিজে গিয়েছে। এত রাত্রে কি করা যায়, দু'জনে মিলে তাই ভাবছিলাম, হঠাৎ বাইরে শুনলাম শালামিয়া চাপা গলায় ডাকছে, "দুলাভাই, ও দুলাভাই, জেগে আছেন?"

দরজা খুলে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে বলল, "আপনাদের কোন কিছুর দরকার আছে? কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে নাকি?"

আমি হাতে আসমান পেয়ে বললাম, "ভাই, উপর থেকে ছাদ চুয়ে ঠাণ্ডা পানি পড়ছে, ওটা বন্ধ করার ব্যবস্থা কর দিকিনি, সোনামনি ভাই আমার!"

এত রাতেও স্কাউটের খাকি শার্ট, শর্ট আর স্কার্ফ পরা সোনামনি ভাই আমার তখ্খুনি বললেন, "সব ঠিক করে দিচ্ছি। উপর থেকে পানি পড়তে পারে না, কারণ আপনাদের সোজা উপরে বাবার পড়ার ঘর, কেউ সেখানে থাকে না রাত্তির বেলায়।" এই বলেই এক লাফে খাটের কোণায় উঠে মশারীর চাঁদোয়া থেকে এক চাকা বরফ নামিয়ে এনে বল্ল, "এই দেখুন! এই বরফ থেকেই পানি পড়ছিল। আপনারা এখন বিছানাটা উল্টিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমার এক হপ্তার একটা ভাল কাজ হয়ে গেল।"

শুতেই হলো। অনেক কাণ্ডকারখানার পর শুয়ে শুয়ে বিবিকে বললাম, "তোমার এই ভাইটি কিন্তু বাঁদরের চেয়ে বাঁদর, ও যদি বেঁচে থাকে তবে হয় জগৎ বিখ্যাত অন্তত এশিয়া বিখ্যাত ব্যক্তি হবে, নইলে—নইলে ফাঁসিতে ঝুলবে, ওর কোন মধ্য পন্থা নেই।"

বিবি বললেন, "ওকে বাঁদর বলো না, জিরাফ বলতে পার, কেননা জিরাফের মধ্যে যেমন উট, ঘোড়া, জেব্রা এই রকম বহু জন্তুর আলামত দেখা যায়, ওর মধ্যেও তেমনি বহু জনের সমাবেশ রয়েছে। আর দেখ, ও খালুর খুব আদরের ছেলে, মা-মরা ছেলে মানুষ করেছেন কি না, তিনি যেন ওসব শুনতে না পান, তিনি আবার হাতীর মতো—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এই হাড্ডিমা টিম টিম হাতীর মতো হলেন কি করে?"

বিবি বললেন, "না, না হাতীর মতো আকারে নয়, স্বভাবে। হাতী যেমন কোন ঘটনা সহজে ভুলতে পারে না, এই খালুও তেমনি কোন কিছু ভুলতে পারেন না। তাঁর আদরের ছেলেকে বাঁদর কিম্বা জিরাফ বললে—"

আমি লেপমুড়ি দিতে দিতে বললাম, "যাকগে যা হয় হয়ে গেছে, চল তোমার এই বাঁদর জিরাফ হাতীর চিড়িয়াখানা থেকে কালকের ভোরের গাড়ীতে শিলং চলে যাই।"

শিলংয়ের সেরা হোটেল পাইনউড্—সেখানে গিয়ে উঠলাম। খালু-শ্বশুরের চিড়িয়াখানা থেকে উদ্ধার পেয়ে পাইনউড্ হোটেল আমার কাছে ভূস্বর্গের মতো মনে হচ্ছিল। আমরা সকালের দিকে পায়ে হেঁটে এদিক-ওদিক বেড়াই, আর দুপুরে খাওয়ার পর ট্যাক্সি করে দূরে গিয়ে ঘুরে আসি। তৃতীয় দিনে আমার বিবি বললেন, "আমাদের পাশের টেবিলে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসেন, দেখছো তার কি মনোভাব? নিশ্চই ওর মনে কি একটা সাংঘাতিক দুঃখ আছে।"

আমরা তখন আনন্দের সাগরে সাঁতার কাটছি। আমরা তখন চাই সারা দুনিয়ার লোক আনন্দ করুক। তাই এই ভদ্রলোককে আনন্দ দান করতে উৎসুক হয়ে তাঁর টেবিলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতে পারি?"

ভদ্রলোক বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কি জানতে চান বলুন?"

আমি বললাম, "আমি আর আমার স্ত্রী কয়েক দিন থেকে দেখছি আপনি একা এই টেবিলে বসে খান, আপনার সঙ্গী কেউ নেই, একা একা বেড়াতে যান আর সব সময়-ই মনমরা হয়ে থাকেন।"

ভদ্রলোক খুব গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি একটু থেমে বললাম, "আমরা কি আপনাকে কোন রকমে একটু আনন্দ দিতে পারি?"

আবার আর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "সত্যিই আমি একা। বহুদিন থেকে সিজনের সময় আমার শিলং আসার অভ্যাস, কিন্তু আর যতবার এসেছি আমার সঙ্গে আমার লাইলী থাকত, আজ লায়লী বেঁচে নেই, তাই আমি একা—"

ভদ্রলোকের চোখ ছল ছল করে উঠল, গলায় যেন কিসের এক দলা এসে কথা বন্ধ করে দিল, ঠোঁট দু'টি কাঁপতে লাগল। আমি বললাম, "আপনার মনে কষ্ট হবে জানলে এই কথা আমি তুলতাম না, আমাকে মাফ করুন।" তিনি বললেন, "না, না, কষ্ট হচ্ছে না, বরং আপনাদের কাছে লায়লীর কথা বলতে পারছি বলে যেন একটু আরাম বোধ করছি। বরাবর এই হোটেলে উঠতাম কিনা, তাই এর প্রত্যেকটি দরজা প্রত্যেকটি পরদা প্রত্যেকটি আয়না লায়লী স্মৃতিতে মাখা। এই টেবিলটায় আমি লায়লীকে পাশে নিয়ে খেতাম, তাই বরাবর এই টেবিলে বসি, ওতে লায়লীকে আরো বেশী করে মনে পড়ে।"

আমি বললাম, "এই স্মৃতি সত্যিই আপনার পক্ষে বড় বেদনাদায়ক। আমার মনে হয়, আপনি এই হোটেল ছেড়ে দিয়ে ফার্নডেল কিম্বা মোরে-লোতে উঠলে এই বিষাদমাখা স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পেতেন।"

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, "তা হতে পারে না, তাতে লাইলীর আত্মা ব্যথা পাবে। আমার লাইলী যে সব জিনিস পছন্দ করত, যে সব খাবার খেতে ভালবাসত, আমি তাই পছন্দ করি, শুধু সেই খাবারগুলি খাই।"

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললাম, "চলুন, কাল চেরাপুঞ্জি গিয়ে ফেরার পথে মোপলং-এ একরাত থেকে আসি।"

আমার বিবিও তখন এসে যোগ দিলেন, বললেন, "আপনাকে কাল যেতেই হবে। আপনি 'না' বল্লে আমরা মানব না।"

আমি দোহার দিলাম, "আপনি আমাদের মেহমান।"

ভদ্রলোক রাজী হলেন।

পরদিন ট্যাক্সি করে আমরা সকালের খাওয়ার পর চেরাপুঞ্জির দিকে পাড়ি দিলাম। রাস্তায়, এলিফেন্ট ফলস্ দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে গিয়ে ফলস্-এর সাইনবোর্ড দেখে ভদ্রলোক বললেন, "আমার লাইলী এলিফ্যান্ট ফলসের জন্য একেবারে পাগল ছিল। এখানে এলে পর শিলং-এ ফেরার কথা ভুলে যেত। ওঃ তার যে কি আনন্দ। একবার এদিক থেকে, আর একবার ওদিক থেকে দেখে দেখে তার দেখার সখ মিটত না। এবার শিলং এসে একদিনও এলিফ্যান্ট ফলস্ দেখতে আসিনি, জানি না লায়লীর আত্মা তার জন্য আমাকে শাপ দিচ্ছে কি না।"

আমি বললাম, "কাল ফেরার পথে, এলিফ্যান্ট ফলস্ হয়ে যাব।"

চেরাপুঞ্জিতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ভদ্রলোক ওভারকোট গায়ে দিয়ে এদিক ওদিক কি খুঁজতে লাগলে আমি তাঁর পিছন পিছন গিয়ে দেখি একটি পাথরের উপর বসে দূরে মুশমাই জলপ্রপাতের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন। পাথরের উপর আর একজনের বসবার মতো জায়গা ছিল, আমি সেখানে বসতে পারতাম, কিন্তু তিনি সেখানে হাত রেখে দেওয়াতে আমার বসা হলো না। আমার যেন মনে হলো চোখের জল (হয়ত-বা বৃষ্টির ফোঁটাও হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হলো চোখের জল)।

আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন। আমার দিকে না তাকিয়ে মুশমাই প্রপাতের উপর চোখ রেখে বলতে লাগলেন, "যতবার লায়লীকে নিয়ে চেরাপুঞ্জি এসেছি ততবার এই পাথরের উপর পাশাপাশি বসেছি আর মুশমাইর দিকে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখেছি। আজ শুধু আমার দু'টি চোখ মুশমাইকে দেখছে, আমার লায়লীর দু'টি চোখ আজ কোথায়?"

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এক রকম জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে গাড়ীতে বসলাম। আমার বিবি ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে দিলেন। তিনজন চা ও কিছু খাবার খেয়ে মোপলং-এর পথ ধরলাম।

মোপলং ডাকবাংলো বড় সুন্দর জায়গা। হানিমুন বা হলিডেয়িং করার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আছে কিনা জানি না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় আমরা যতদুর পারলাম লায়লীর কথা যাতে না ওঠে তার চেষ্টা করলাম,

কিন্তু পেরে উঠলাম না। খাওয়ার সময় মুরগীর রান হাতে নিয়ে বললেন, "আমার লায়লী মুরগীর রান খুব পছন্দ করত, আজ সেই রান আমার হাতে কিন্তু আমার লায়লী আজ কোথায়?" আমরা তখন মহা মুশকিলে পড়ে গেছি। না পারি লায়লীর কথা থেকে তাকে বিরত করতে, না পারি নিজেরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে। শুতে যাওয়ার সময় ভাবলাম, তাঁর ঘরে চিমনীর আগুন নিভিয়ে দিযে যাই, কি জানি তিনি ভুলে যান, কিন্তু প্রস্তাব করতেই তিনি বলে উঠলেন, "না, আগুন থাক, আমি ঘুমোব না—শেষবার যখন লায়লীকে নিয়ে মোপলং আসি, তখন আমরা এই ঘরেই ছিলাম, আর পাশের ঘরে একদল যুবক-যুবতী সারারাত গান-বাজনা আর তাস খেলে কাটিয়েছিল। সেই গোলমালে লায়লী চোখের পাতা একবারও চোখ বুজতে পারেনি। তারপর আজ লায়লী বেঁচে নেই বলে কি আমি এই ঘরে ঘুমোতে পারি?"

পরদিন শিলং এসে আমি এক ফাঁকে বললাম, "দেখুন, আপনি শিলং-এ আসা ছেড়ে দিন। শিলং-এ কত জায়গায় আপনার কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, আপনি এখানে এলে পর তা থেকে রেহাই পাবেন না। তাই আমার মনে হয়, আপনি নতুন কোন জায়গায় বেড়াতে যান, সেখানে গেলে পুরানো কোন স্মৃতি এসে আপনাকে কষ্ট দিতে পারবে না।"

তিনি বললেন, "তা করে দেখেছি, কিন্তু ফল উল্টো হয়। নতুন জায়গায় গেলে পর নতুন কিছু দেখলে কিম্বা খেলে মনে হয়, আমার লায়লী ওটা দেখেনি আর আমি একা একা দেখছি, কিন্তু আমার লায়লী ওটা খায়নি, আর আমি একা একা খাচ্ছি। তখন যা দুঃখ আর কষ্ট হয় তা এর ঢের ঢের বেশী।"

সেই রাত্রে খাওয়ার সময় তিনি বললেন, "আসছে কাল শিলং পিক দেখে হ্যাপীভ্যালী হয়ে ঘুরে এসে যখন ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করার সময় এলো তখন তিনি বললেন, "ওর টাকাটা আপাততঃ আপনার কাছ থেকে দিয়ে দিন কিন্তু ওটা আমার দেনা, আপনাকে নিতেই হবে, আপনার ডাইরীতে লিখে রাখুন। আর দেখুন, কাল যাব ঈগল ফলস্ দেখতে, সেখানে থেকে গলফ্ লিঙ্কস্ দেখে রেসকোর্স দিয়ে আসব, কিন্তু আমি

মেজবান, আপনারা মেহমান, 'না' বললে শুনবো না। জানেন তো, শিলং-এর গলফ্-লিঙ্ক দুনিয়ার দুই নম্বর, স্কটল্যাণ্ডের পরেই এর স্থান।"

বলাবাহুল্য এই সব ভ্রমণেও লায়লীর কথা ছাড়া আর কোন কথা তিনি বলেননি। লাইলী হয় এটা দেখেছে, আর না হয় এটা দেখেনি, দু'কারণেই তিনি পস্তাচ্ছেন। ফিরে এসে আগের দিনের মতো ট্যাক্সির টাকা তাঁর পক্ষ থেকে আমাকেই দিতে হয়েছে, কিন্তু তিনি বারে বারে বলে দিয়েছেন, ওটা তার হিসাবে লিখে রাখতে; পরে তিনি শোধ করে দেবেন। বিডন, বিশপ জলপ্রপাত দেখতে গিয়েও সেই একই ব্যাপার হয়েছে—আমরা তার মেহমান আর খরচটা সাময়িকভাবে ধার দিয়ে খাতায় লিখে রাখা।

রাত্রে আমার বিবি বললেন, "মুস্কিলেই পড়া গিয়েছে আর কি! লায়লীর কথা শুনতে শুনতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখন কি করা যায় বল দিকিনি?"

আমি বললাম, "হানিমুনটা একেবারে মাটি করে দিলে আর কি! চল এক কাজ করি। কাল খুব ভোরে নাস্তা না খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। যে দিকে চোখ যায় সে দিকে চলে যাব। তারপর বেশ দেরী করে হোটেলে ফিরব। ততক্ষণ হয়ত লায়লীর মজনু বেরিয়ে পড়বেন।"

পরদিন ভোরবেলা আমরা তা করলাম। ক্যামেল ব্যাক রোড বেয়ে লেকের উপরের পুলে পা দিয়েই দেখি মূর্তিমান মজনু আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শুধু তাঁর হাতে ফুলের মালা নেই। আমরা ধরাপড়া আসামীর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পেলাম না। আবার শুরু হলো তাকে নিয়ে ঘোরা; লাইলীর কথা এবং হোটেলে ফিরে এসে তাঁর পক্ষ থেকে ট্যাক্সি ভাড়া আদায় আর তাঁর হিসাবে লিখে রাখা।

এরপর চলল আমাদের নিত্য চেষ্টা, কি করে তাঁকে ফেলে একা বেরোতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমরা একদিনও সফলকাম হতে পারিনি। ভদ্রলোকের কি এক অবধৌতিক শক্তি ছিল, আমরা যেদিন দেরী করে ঘুম থেকে উঠেছি, তিনিও সেদিন দেরী করে উঠেছেন, আমরা যেদিন বড় বাজারে বেড়াতে গিয়েছি, সেদিন মওখারের মোড়ে

আমাদের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় তাকে পেয়েছি, যেদিন নংথুমাইর দিকে বেড়াতে গিয়েছি, সেদিন তাকে পেয়েছি ধানখেতের মোড়ে, লাটভবনের পাশ দিয়ে সর্টকাট করে গিয়ে দেখেছি, ডনবস্কোর মূর্তির নীচে তিনি জীবন্ত মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

ঐ রাত্রে খাওয়ার পর আমরা দু'জনে নীরবে চিমনীর সামনে বসে ভাবছি, একই কথা ভাবছি—কি করে কাল ওঁর হাত থেকে বাঁচা যায়। আমাদের হানিমুন তখন শিকায় উঠে গিয়েছে, আমাদের তখন জীবন-মরণ পণ হয়েছে কি করে আমরা ওঁকে বাদ দিয়ে শিলং শহরে চলা-ফেরা করব। এমনি সময় দরজায় টকটক শুনে ভাবলাম, বেয়ারা হয়ত কোন কাজে এসেছে, বললাম, "আ যাও।"

দরজা খুলে ঢুকলেন বেয়ারা নয়, তিনি—আমাদের প্রাণের শত্রু—আনন্দের সশরীরী ব্যাঘাত—লাইলীর মজনু—তাঁর হাতে এক টেলিগ্রাম। আমি উঠতেই বললেন, "দেশ থেকে এই টেলিগ্রাম এসেছে, তাই কাল খুব ভোরেই চলে যাচ্ছি, স্পেশাল টাইমে, এই জন্য এই অসময়ে বিদায় নিতে এলাম, কিছু মনে করবেন না।"

আমি সৌজন্যের খাতিরে বললাম, "না, না, তাতে কিছু হয়নি, কিন্তু কোন দুঃসংবাদ নয় ত?"

আমি টেলিগ্রামখানা পড়ে দেখলাম, তাঁর ম্যানেজার লিখেছেন—"খানজাদা করাগত খাঁ, কেয়ার পাইনউড্, শিলং। বেগম সাহেবার অসুখ বেশী, শীঘ্র বাড়ী ফিরুন।"

আমি ব্যাপার বুঝতে না পেরে বললাম, "তবে কি আপনার বেগম সাহেবা বেঁচে আছেন?" আমি বোকার চেয়ে আরো বোকা বনে গেলাম, আমতা আমতা করে বললাম, "তবে যে আপনি লায়লীর মরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন।"

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, "হ্যাঁ, লায়লীর কথা বলেছি বলে কি লায়লী আমার বউ হয়ে গেল? আপনি কি যাতা ভেবেছেন, লায়লী আমার বড় আদরের এলসেশিয়ান কুকুর ছিল। বেগম সাহেবা ওকে দেখতে পারতেন না বলে আমি ওকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখতাম। হায়বত শহরের

নওয়াবজাদা আমার শ্বশুর। ঘরজামাই হয়ে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে বিয়ে করে কি যে ভুল করেছিলাম ; তাই ত' লায়লীকে নিয়ে দেশে বিদেশে বছরে ছ'মাস কাটিয়ে দিতাম। যাকগে, আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে, সত্যিই আপনাদের পেয়ে এই কয়দিন বেশ সুখে কাটানো গিয়েছে। লায়লীর দুঃখ অনেকটা ভুলে যেতে পেরেছি। আচ্ছা আসি, আদাব।"

তবু আমরা সে রাত্রে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমালাম। তার পরদিনই হানিমুন শেষ করে বাড়ীর পথে ফিরতে হলো, কারণ মজনুর কল্যাণে আমদের টাকা ফুরোতে আর বেশী বাকী ছিল না।

রাহু

আবুল ফজল

রাহেলা নাশতার প্লেট হাতে খাবার ঘরে ঢুকে দেখে হাসান ও চা'র ট্রে দুই-ই অদৃশ্য। বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কারণ এটা একেবারে আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়। এ-রকম প্রায়-ই ঘটে। বলা নেই, কওয়া নেই—মাঝে মাঝে চা'র কাপটা হাতে নিয়ে হাসান শোবার ঘরে গিয়েই বসে। আর রসিয়ে রসিয়ে পাঁচ মিনিটের চা-পান আধ ঘন্টায় সারে। রাহেলার চোখে মুখে একটা অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি উঁকি মারে বুঝি। শোবার ঘরে ঢুকে দেখতে পায়, চা'র ট্রেখানা সামনে নিয়ে হাসান তাকিয়ে আছে দেয়ালে টাঙানো ফুলসাইজ ফটোটার দিকে এক নজরে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে কিনা বুঝা যায় না।

জোর ক'রে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল রাহেলা। নাশতার প্লেটটা রাখতে রাখতে বল্লে: মরা মানুষের আকর্ষণ যে এত বেশী তা তো জানতাম না।

এক ঢোক চা গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে হাসান বল্লে: না জানার তো কথা নয়। ব'লে, সেও হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল মুখে।

—তাও তো বটে। না হয় আমাকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ দুঃখে? রাহেলার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আমেজ। হাসান নীরবে খেতে থাকে। সে কিছুটা স্বল্পভাষী। থাকতেও চায় শান্তভাবে। মনের সুখদুঃখ মনে চেপে রাখাই তার স্বভাব। চা'র কাপে তুফান তোলা তার আদৌ পছন্দ নয়। তবুও খণ্ড তোফান মাঝে মাঝে উঠে পড়ে। চা'র কাপটা শেষ করে বল্লে: তোমার প্রতি কোনো অন্যায় হচ্ছে কি? ঠোঁটের কোণে একটু-খানি দেঁতো হাসি ফুটিয়ে যোগ করলে—ধরতে গেলে তুমিই তো আমার সর্বময় কর্ত্রী।

—অবশ্য দিল্ ছাড়া, কেমন? বক্র হাসির সঙ্গে ঝটিতি বলে বসলো রাহেলা। ড্রয়ারের চাবির গোছাটা যখন আমাকেই দিয়েছ, তখন তা বলতে পার বৈকি। মর্মভেদী ভ্রূকুটির সঙ্গে এইটুকু যোগ করতেও ছাড়লো না সে।

—দিল্ তো দেখবার বা দেখাবার উপায় নেই, না হয় দেখতে পেতে...। দেশলাইর কাঠিটা সিগারেটের মুখে ঠেকাতে ঠেকাতে, বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই হাসান সিগারেটে মন সংযোগ করলে।

অগ্নিদৃষ্টি হেনে রাহেলা বলে উঠলো: হ্যাঁ, দেখতাম বৈ কি, তোমার সারা দিল্ জুড়ে রয়েছে রাহেলা। পাতলা ও ঈষৎ লাল ঠোঁট দু'খানি তার আর একবার বেঁকে কঠিন হয়ে উঠল বুঝি।

—হুঁ! এই সংক্ষিপ্ত সাড়া দিয়ে চুপ মারলো হাসান। তারও ঠোঁটে ঈষৎ বাঁকা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—তবে সেই রাহেলা, এই—বুকের উপত্যকায় ডান হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা জোরে ঠুকে দিয়ে যোগ করলে: রাহেলা নয়। ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বল্লে: ঐ রাহেলাই।

—তা হোক, রাহেলা তো বটেই। আবার হাসানের ঠোঁটে বাঁকা হাসির ক্ষীণ রেখা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য যোগ করলো: তোমার নাম রাহেলা বলেই তো...। ফুটন্ত তেলের কড়ায় যেন বেগুনের টুকরো ছুঁড়ে ফেলা হ'ল।

—বড্ড অনুগ্রহ। তবে আমাকে না, আমার নামটাকেই আমি ওর জায়গায়,—চোখ তুলে ঈশারা করল ছবিটার দিকে: অফিসিয়েটিং না? ঠোঁট বেঁকিয়ে, না উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারতে উদ্যত সাপের মত ঘাড় আন্দোলিত করে রাহেলা মাথাটাকে এমন সজোরে এক ঝাঁকানি দিল যে এলো খোঁপাটা খুলে চুলগুলো সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে।

যদিও এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে ওদের, তাহলেও রাহেলার তন্বীদেহে এখনো স্থূলতার লক্ষণ দেখা দেয়নি। হাসান কিছুটা মোটাসোটা, গম্ভীর ও শান্ত। তার চলনে বলনে ক্ষিপ্রতা বলে কিছু নেই। চলবার সময় বেশ ওজন ক'রে এক একটা পা ফেলে, বলবার সময়ও ওজন ক'রে এক একটা কথা বলে। ক্লাবে, পার্টিতে অথবা সরকারী দরবার ইত্যাদিতে

ওরা যখন এক সঙ্গে যায়, তখন অনেকে দেখে বিস্মিত হয়: ক্ষিপ্রগামিনী রাহেলা আগে আগে লঘু পা ফেলে এগিয়ে চলেছে আর হাসান ষোল-আনা অফিসিয়েল গাম্ভীর্য বজায় রেখে যেন ওর পদাঙ্কানুসরণই করছে।

অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়ানো রাহেলার দিকে তাকিয়ে হাসানের মনেও বুঝি মুহূর্তে বিদ্যুত চমকে উঠল। রাহেলার মোহিনী মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই মুচকি হাসির সঙ্গে বলে উঠল: মন্দ কি? আমি অফিসিয়েটিং এ. ডি. এম. আর তুমিও আমার অফিসিয়েটিং...। হাসান কথার মাঝখানে হোঁচট খেলো।

—ওয়াইফ!—রাহেলা ফেটে পড়ল। কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে গেলে? দু'মুখো সাপ কোথাকার! ঝরঝর করে এবার সে কেঁদে ফেল্লে এবং দ্রুত ছিটকিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

হাসানের প্রথমা স্ত্রী একটি মাত্র মেয়ে রেখে মারা গেছে, সে প্রায় বছর ছয় আগে। 'যে একবার বিয়ে করেছে সে আর একবার বিয়ে না করে থাকতে পারে না'—এ যুগের সাক্ষাৎ দুর্বাসা বার্ণাড শ'র এই উক্তিটিকে মিথ্যা প্রমাণ ক'রে হাসান প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলে বিয়ে না করেই। বয়স বেশী নয়, একটি মাত্র মেয়ে, ভাল চাকরি করে অথচ বিপত্নীক। এ দৃশ্য অনেকের চোখেই বিসদৃশ। অনেকেরই ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল রীতিমত। একটা হিল্লা না করতে পেরে অনেকেই অস্বস্তিবোধ করছিলেন মনে মনে। ঘটক নয় এমন লোকও এই অবস্থায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘটকালি শুরু ক'রে দেয়। এই ক'বছর যেখানেই সে বদলী হয়েছে, সেখানেই এরকম রবাহুত ঘটক ও হিতৈষীর দল জুটতে দেরী হয়নি, আর দেরী হয়নি ওদের ঘটকালির ঘটা শুরু হতে। অবশ্য কয়েক মাসেই যখন সকলে বুঝতে পারে, এ বড় শক্ত সুপারি, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে সবাই হাসানের নিন্দায় হয়ে ওঠে পঞ্চমুখ। কেউ কেউ বলে ফেলে... হয়ত বিয়ে করার সামর্থ্যই নেই। বক্তা ও শ্রোতাদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে তাচ্ছিল্যের হাসি। কেউ কেউ আরও এগিয়ে গিয়ে একেবারে এর বিপরীত কথাই রটায়—হয়ত ডুবে ডুবে পানি খায়।

বছরখানেক আগের কথা। হাসান তখন ময়মনসিংহে। একদিন কালেক্টর তাকে ডেকে পাঠালেন। বেশ করে চা-নাশতা পরিবেশন ক'রে আর

কোনো রকম ভূমিকা না ক'রেই আমজাদ সাহেব সোজা বলে ফেল্লেন: আমি বলি, তুমি এবার বিয়ে ক'রে ফেল, হাসান। আমার জানা শোনা ভালো মেয়ে আছে; বলত...। হাসান কালেক্টরের হাবভাব দেখে এই আশঙ্কা যে না করছিল তা নয়। স্থানে-অস্থানে এই রকম প্রস্তাব শুনতে শুনতে না শোনাটাই সে এখন ব্যতিক্রম বলে মনে করে। তবে স্বয়ং কালেক্টরের কাছ থেকে এই প্রথম সে এ ধরনের প্রস্তাব শুনতে পেল। মরিয়া হয়ে বল্লে: স্যার, আমার একটি মেয়ে আছে।

—আমি জানি। তাই তো তোমার আরো তাড়াতাড়ি বিয়ে করা উচিত। তোমার বৌএর দরকার না থাকতে পারে, মেয়ের কিন্তু মা'র দরকার আছে। আদেশসূচক ভংগীর সঙ্গে স্নেহের আমেজ মিশিয়ে কালেক্টর সাহেব বল্লেন।

—ও কি। আর একটি পেষ্ট্রি নাও। এই তাগিদ দিয়ে তিনি ফের পূর্ব কথার জের টানলেন: আমার বন্ধু ও আত্মীয় তাহের সাহেবের একটি মেয়ে আছে, বেশ ভালো মেয়ে। ঢাকায় আই. এ. পড়ছে। তাহের সাহেব ওখানে এডিশনাল জজ। মেয়ে দেখতে চাও তো ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। আমি ছোটকাল থেকেই জানি, রাহেলা খুব ভালো মেয়ে। হাসান সহসা উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠল: কি নাম বল্লেন, স্যার?

—রাহেলা। খুব ভালো মেয়ে, দেখতে-শুনতেও......। হাসান কি যেন ভাবতে লাগল। কয়েক মিনিট মাত্র। হঠাৎ বলে বসলে: আপনি কথা বলুন, স্যার।

—মেয়ে দেখবে না একবার! কালেক্টরের কণ্ঠে বিস্ময়।

—না, স্যার।

—ফটো?

—দরকার নেই, স্যার।

—দেনা-পাওনা?

—অলঙ্কারপত্র আমি যা দিতে পারি দেব, ওঁদের কিছুই দিতে হবে না; না মেয়েকে, না আমাকে।

আমজাদ সাহেব খুব খুশী হলেন বটে, কিন্তু খানিকটা অবাকও হলেন। এতদিন ধরে তিনি শুনে এসেছেন এ বড় শক্ত সুপুরি, কাঠ পাথর শিল

নোড়া কিছু দিয়েই ভাঙ্গা যায় না। অথচ সেই সুপুরি তাঁর কাছে একেবারে মোমের পুতুল বনে গেল। সাধাসাধি করতে হ'ল না, প্রয়োজন হ'ল না কোনো রকম মৃদু হুমকিরও। নিজের ক্ষমতার প্রতি তার মনে নতুন ক'রে আস্থা ফিরে এলো।

এইভাবে শুধু নামের আকর্ষণেই হাসান ফের বিয়ে করতে রাজি হ'ল। রাহেলাকে দিয়েই রাহেলার স্থান পূরণ হবে এ হয়ত সে ভাবলে।

প্রথম প্রণয়ে বুদ্ধি-বিবেচনার বিশেষ বালাই থাকে না। প্রথমা স্ত্রী রাহেলার সঙ্গে এ রকম প্রণয়ের ফলেই হাসানের বিয়ে হয়েছিল। এখন হাসানকে দেখে কিউ হয়ত ভাবতেই পারে না যে, সেও প্রেমে পড়তে পারে। সেই অসম্ভবও কিন্তু সম্ভব হয়েছিল। সেই রাহেলা যখন একটি মাত্র মেয়ে রেখে বিয়ের দু'বছর পরেই মারা গেল, তখন হাসান প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কোনো অবলম্বন না থাকলে হয়ত সুস্থ ও সুস্থির হতে তার বেশ সময় লাগতো। কিন্তু মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে সে প্রাণ-পণ-চেষ্টায় শোক দমন করল। চেষ্টা ক'রে শোক ভোলা যায় বটে, কিন্তু স্মৃতি তো যায় না!

কন্যা রাজিয়া বা রাজুর মুখে হাসান তার মা'র চেহারাই যেন পড়তে পায়। মা আর বাবার যুগ্ম স্নেহ দিয়ে মেয়েকে সে মানুষ করে তুলবে, বিয়ে সে আর করবেই না, রাহেলার মৃত্যুর পর মনে মনে এই সঙ্কল্পই সে করেছিল। এতদিন এই সংকল্পে সে ছিলও অটল। হঠাৎ আর একটি রাহেলার আবির্ভাবে, নতুন এক আবেগের ধাক্কায় তার সেই সঙ্কল্প হ'ল বানচাল।

রাহেলা এসেই দেখতে পেল স্বামীর শয্যাকক্ষে প্রথমার ফুলসাইজ ফটো—এমন ভাবেই টাঙানো যেন শুয়ে শুয়েও দেখা যায়। আয়ত চক্ষু দু'টি মেলে সে যেন তাকিয়ে দেখছে স্বামী ও কন্যার প্রতিটি গতিবিধি। তার গতিবিধিও কি?

প্রথম প্রথম রাহেলা এসব কিছুই মনে বড় একটা আমল দেয়নি। বরং মন থেকে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলতেই সে চেষ্টা করেছে সব সময়। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই সে বুঝতে পারল, স্বামীর মন জুড়ে রয়েছে প্রাক্তনা ও তার মেয়ে।

বিয়ের পর মাস দুই না যেতেই খিটিমিটি শুরু হয়ে যায় রাজুর শোওয়া নিয়ে। মা মরার পর থেকেই রাজু বাপের সঙ্গেই শোয়। বিয়ের পরও সেই ব্যবস্থাই কায়েম রয়েছে। বড় খাট—তিন জনের তাতে বিশেষ কোনো অসুবিধাই হয় না। তবু রাহেলা এরি মধ্যে রাজুর পৃথক বিছানায় শোবার কথা যে না বলেছে তা নয়। হাসান প্রতিবারই সংক্ষিপ্ত 'না' জানিয়েই চুপ করেছে। দু'একবার হয়ত বলেছে: ও কোনদিন পৃথক বিছানায় শোয়নি, ভয় পাবে।

এর দিন পনের পর বোধ করি...একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে হাসান দেখে তো অবাক! নীচের বৈঠকখানায় মেহমানের জন্য একখানা ফালতু খাট ছিল—দেখল শোবার ঘরে সেই খাটখানাই সযত্নে পাতা হয়েছে। পরিপাটি করে বিছানা ক'রে তাতে রাজুর বালিশ, গায়ের চাদর, মায় ছোট পাশবালিশ দু'টিও সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি নতুন মশারী পর্যন্ত খাটানো হয়েছে।

হাসান ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলো: এ বিছানা কার জন্য? কোনো মেহমান এসে পড়েছে নাকি? বিস্ময়ের ভান করলো একটুখানি।

—রাজু এখন থেকে আলাদা শোবে। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে রাহেলা উত্তর দিলে: নতুন মশারিটাও কিনতে হলো। রঙিন মশারিটা রাজুর কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে। না রাজু?

রাজু কিন্তু কোন সাড়াই দিল না।

—হুঁ। এর বেশী আর কোনো উচ্চবাচ্য না করেই হাসান কাপড় ছাড়তে লাগলো।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম হাসানও ঘটা করে গল্প করত রাজুর মা সম্পর্কে। তার হালচাল পছন্দ-অপছন্দ কিছুই যেতনা বাদ। খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করত সব কিছু। তাকে চা-নাশতা দিয়ে তার খাওয়াটা বসে বসে দেখা তার এক বিশেষ সখ ছিল। তার চা সে খাবার টেবিলে না দিয়ে প্রায় শোবার ঘরেই দিত। নিজে কিন্তু সে চা খেত না কোনদিন। হাসান কতদিন নিজের পেয়ালাটা ওর মুখে তুলে ধরে ওকে চা অভ্যাস করাতে চেষ্টা করেছে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কতদিন চা চলকে পড়ে দাগ লেগেছে উভয়ের কাপড়ে। এ সব গল্পও হাসান বাদ দেয়নি। সারা মুখে হাসির আভা

ছড়িয়ে যোগ করত : চা খেলে নাকি ওর ঘুম হয় না। শুনে রাহেলা একদিন বলে বসলো : আমার কিন্তু উল্টো। চা না খেলে আমার ঘুমই হয় না। এই না বলে হাসানের আধ-খাওয়া পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রাহেলা ঢক্ ঢক্ ক'রে সবটুকু চা-ই খেয়ে ফেল্লে। অবশ্য কেটলি থেকে আর এক পেয়ালা ঢেলে হাসানের সামনে এগিয়ে দিলে। হাসান বল্লে : পেয়ালাটা একবার ধুয়ে ফেল্লে না কেন ?

রাহেলা হঠাৎ জ্বলে উঠলো : কেন ? তোমার এঁটো চা আমি খেলাম না ? আর ঐ পেয়ালায় চা খেতে তোমার আপত্তি ?

হাসান আমতা আমতা করে বল্লে : তুমিও তো হাইজিন পড়েছ......। রাহেলা এবার বোমার মত ফেটে পড়ল : যখন চুমু খাও তখন হাইজিনের কথা মনে থাকে না ?—হাঁ, জানি আমার নামটুকুই শুধু চেয়েছিলে। আমাকে নয়। আজ থেকে ওসব হারাম বলে জানবে। রাগে সে প্রায় থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

—কি সব ? হাসানের গলা ঠাণ্ডা তবে ভংগিটা তির্যক।

—ন্যাকা সেজনা। বল্লাম শোননি ? উদ্যত-ফণা রাহেলা বল্লে। বিস্ময়ের ভাণ করল হাসান : কলেমা-পড়া জিনিস হারাম হয় কি করে ? কোন সাড়া না পেয়ে নির্বিকার কণ্ঠে ফের যোগ করলে : আমি ত চা হারাম হয়েছে বলিনি, শুধু হাইজিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম।

—আমিও হাইজিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—চুমু খাওয়া আরো বেশী আন-হাইজিনিক। বলে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাহেলা কিন্তু আজ নিজে থেকেই চা'র সরঞ্জাম শোবার ঘরে নিয়ে এসেছিল।

চা খেয়ে উঠে হাসান চাকরকে ডেকে বলে দিলে : চাপরাশিকে নিয়ে এক্ষুণি খাটটা সারিয়ে ফেল।

রাহেলার মাথায় যেন চট্ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঝটিতি ঢুকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে : না। কিচ্ছুতেই সরাতে পারবে না। রাজু না শোয় আমিই শোব। থাক সরাতে হবে না। বলে রাগে গরগর করতে করতে সে ফের বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিয়ের পর রাজু প্রথম প্রথম রাহেলার কাছ ছাড়া হ'ত না। পায়ে পায়েই ঘুরে বেড়াত। রাহেলাও আদর-যত্ন করত বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে।

কে জানে কেন দিন দিন তা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

হাসান অফিস থেকে ফেরার আগেই রাহেলা রাজুকে ডেকে তার মাথা আঁচড়িয়ে দিত, এক একদিন এক এক রঙের ফিতা দিয়ে বেঁধে দিত চুল, ওর মুখে পাউডার মাখিয়ে ক'রে দিত সাজগোছ। নিজের লিপস্টিক দিয়ে ছোট্ট ঠোঁট দু'টো করে দিত লাল, নখপালিশ দিয়ে নখ দিত রাঙিয়ে।

দেখে হাসান খুশী হয়ে উঠত।

ইদানিং রাজু বায়না ধরলে ধমক দিয়ে ওঠে: অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে নিজে আঁচড়াতে পারনা?

রাজুর চোখেমুখে অন্ধকার নেমে আসে।

আগের মত মেয়ের সাজগোছ হয় না, হয় না চুলবাঁধা। আনাড়ী হাতে ফিতা বাঁধা হয় যা-তা করে। কাপড়ের এখানে ওখানে নখপালিশের দাগ। এমন কি নাকের ডগায়ও।

দেখে হাসান একদিন বিরক্তকণ্ঠে বল্লে: তোমার মাম্মিকে বলতে পার না?

—মাম্মি দিলে না'ত আমি কি করি? অভিমানে রাজু প্রায় কাঁদো কাঁদো।

অফিসের পোশাকেই হাসান বসে গেল মেয়ের চুল আঁচড়াতে। রাহেলা আসার আগেও নিজেই তো মেয়ের চুল আঁচড়ানো থেকে সব সাজগোছ ক'রে দিত। ধাই একটা আছে বটে কিন্তু রাজু কিছুতেই ধাইএর হাতে চুল আঁচড়াতে রাজী নয়। হাসান আনাড়ী হাতে মেয়ের কপালে একটা টিপও দিয়ে দেয়।

রাহেলা যে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল তা একেবারে অকারণ নয়। বিয়ের মাসখানেক পর থেকেই প্রায় এই ঘটতে শুরু করেছে। অবশ্য সব দিন নয়। কোন কোনদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গলেই হঠাৎ তার গা ছমছম ক'রে ওঠে—মনে হয় হাসানের পাশে রাজুর মা যেন শুয়ে আছে। কতদিন ঘুমের ঘোরে শিউরে উঠেছেও। একবার তো এমন গোঁ গোঁ ক'রে উঠল যে, হাসানের পর্যন্ত ঘুম গেল ভেঙ্গে। কম্পিতা রাহেলাকে জড়িয়ে ধরে ও চেঁচিয়ে উঠল: কি, কি?

দেখল ঘামে রাহেলার সর্বশরীর ভিজে সপ্ সপ্ করছে। আর বুক করছে কামারের হাপরের মত।

আলাদা খাটে শুয়েও রাহেলা এ অদ্ভুত পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পায় না। ওখানে শুয়ে থেকেও মনে হয়, কে যেন তার জায়গায় স্বামীর পাশে শুয়ে আছে। কে তা তার অজানা নয়। তবুও অনেক সময় মন তা স্বীকার করতে চায় না। মনের এই অস্বস্তি আরো বেশী করে অসহ্য হয় এ কারণে যে, এসব কথা হাসানকেও বলা যায় না, বল্লে সে হয়ত হেসেই উড়িয়ে দেবে, হয়ত প্রাক্তনার প্রতি তার আকর্ষণ যাবে আরো বেড়ে। তার প্রতি অকারণ অবহেলা হয়ত দাঁড়াবে সকারণ উপেক্ষায়।

হঠাৎ একদিন সেই খাটখানাকে আর ওদের শোবার ঘরে দেখতে পাওয়া যায় না। অফিস যেতে যে খাটখানাকে ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে গিয়েছিল। অফিস ফেরৎ ওটাকে দেখতে না পেয়ে হাসানও কম অবাক হয়নি। কিন্তু মুখে কিছু না বলে নীরবে ও প্রত্যাশিত রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওই-ই ওর স্বভাব। পারতপক্ষে কোন ব্যাপার নিয়েই সে উচ্চবাচ্য করতে চায় না। আর প্রকাশ করে না মনের উচ্ছ্বাস কথায় বা আচরণে।

সামাজিক জীবনে রাহেলা কিন্তু খুব উচ্ছ্বসিত। যোগও দেয় প্রায় সব অনুষ্ঠানেই। হাসান যাক বা না যাক তাতে ওর বেশী তোয়াক্কা নেই। বিয়ের পর অবশ্য প্রথম প্রথম ওর সঙ্গী হওয়ার জন্য হাসানকে ও খুব পিড়াপিড়ী করত। এখন কিন্তু একা যেতে ও আর আপত্তি করে না। যে অনুষ্ঠানেই যাক নিজের প্রাণচাঞ্চল্যে সে অনুষ্ঠানকেই ও মুখর করে তোলে। গান যে ও খুব ভালো গাইতে পারে তা নয়, তবুও অনুরোধ এলে হারমোনিয়ামের সামনে গিয়ে বসে পড়তেও কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

হঠাৎ একদিন রাহেলা বলে বসলো: আমি ড্রাইভিং শিখব। হাসান যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্লে: হাতি না কিনতেই কাছি! গাড়ী আগে কেনা হোক, তখন না হয় দেখা যাবে। আর শিখবেই বা কোথায়?

—শিখে রাখলে ক্ষতিটা কি? আমি মকসুদকে বলেছি, ও রোজ এসে কিছুক্ষণ ক'রে শিখাবে বলেছে।

মকসুদ ডি. এস. পি। ওদের পুরোনো আলাপী। নিজের গাড়ী আছে।

—কাল থেকেই শিখতে আরম্ভ করব। ও এসে আমাকে নিয়ে যাবে। রাহেলা স্বামীকে এত্তেলা দিয়ে রাখল।

সত্যই পরদিন আটটার সময় মকসুদ তার মরিসখানা নিয়ে হাজির হল। গাড়ী থেকেই সে হাসানকে 'মর্নিং' জানাল।

রাহেলা আগে থেকেই তৈরী ছিল। হাসান কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখল রাহেলার মুখের দিকে।

—ঈদের দিনে কেনা ঝুমকো জোড়া এতদিনে পরবার সুযোগ পেলে? কৌতূহলী হাসান জিজ্ঞাসা করল।

—কেমন দেখাচ্ছে, বল! রাহেলার কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার আমেজ। চমৎকার! আর একবার তাকিয়ে দেখল হাসান। রাহেলার তন্বী দেহখানি যেন হাসি-খুশীতে লীলায়িত। যাক্ এতদিনের মনমরা ভাব হয়ত কেটে গেল এবার। ভেবে হাসান খুশী হল বুঝি মনে মনে। রাজুর শোওয়া নিয়ে খিটিমিটির পর আজই প্রথম রাহেলাকে তাজা ও প্রাণচঞ্চল দেখতে পেল ও। খুশী হয়েই যেন হাসান বল্লে: মকসুদ, ওকেও নিয়ে যাও।

হাসানের অফিস-ঘরের সামনে দণ্ডায়মান গাড়ী থেকে মকসুদ বলে উঠল: নিশ্চয়ই, এস রাজু, এস মা।

মকসুদ এখনো বিয়ে করেনি। কম্পিটিটিভ দিয়ে চাকরী পেয়েছে অল্প-কাল মাত্র। চাকুরী পাকা হলেই বিয়ে করবে এই তার সঙ্কল্প।

এরপর থেকে রোজই মকসুদ এসে রাহেলাকে নিয়ে যায়। অফিস-ঘরে বসে কাজ করতে করতে কোনো দিন হাসান বলে: রাজুকে নিয়ে গেলে না?

—না, ও পড়াশুনা করুক, এখনো এ-বি-সি-ডি'টাও শিখা হয়নি ভালো ক'রে। রাহেলা বেরিয়ে যেতে যেতে স্বামীর জানা কথাই ওকে আর একবার জানিয়ে যায়।

প্রথম প্রথম রাহেলা হাসানের অফিস-ঘর হয়েই যেত আর মামুলীভাবে বলতও: আমি আসি তা হলে। যদিও হাসানের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ঝটিতি বেরিয়ে পড়তো। এখন আর অতটুকুও দরকার মনে করে না ও।

সেদিন রবিবার। ব্রেকফাস্টের পর হাসান বল্লে: আজ আমাদের শিকারে যাওয়ার কথা না? তুমি যে শুয়ে রয়েছ এখনো! যাবে না?

—না! শরীরটা বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে, ভালো লাগছে না কিছুই। মাথাও ধরেছে বেজায়। শোওয়া থেকেই উত্তর দিলে রাহেলা।

রাজুকে নিয়ে হাসান বেরিয়ে পড়ল সরকারী জীপে।

কথা ছিল সবাই যার যার গাড়ী ক'রে হাটহাজারী ডাকবাংলোয় গিয়ে মিলবে। সেখানে সকাল সকাল লাঞ্চ সেরে বাচ্চা আর পরিবারদের ওখানে রেখে, ওরা রওয়ানা দেবে জঙ্গলের দিকে। এস. ডি. ও. ঐ মর্মে সার্কেল অফিসারকে এত্তেলা দিয়ে রেখেছে আগে থেকেই।

ডাকবাংলোয় পৌঁছে হাসান মকসুদকে না দেখে বেশ কিছুটা অবাক হ'ল। কারণ পার্টির তালিকায় তারও নাম ছিল।

যথাসম্ভব নির্লিপ্তভাবে এস. ডি. ও-কে জিজ্ঞেস করলে: মকসুদ কই?

এস. ডি. ও. আলী জানালেন: তাঁর নাকি কি এক জরুরী ইন্‌ভেষ্টিগেশানে যেতে হবে, মার্ডার কেস, তাই আসতে পারলে না।

সাব-জজ সামাদ সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন: মিসেস হাসান এলেন না যে?

নিরীহ প্রশ্ন, কিন্তু অন্তরালে একটি ফোড়ন যে আছে তা হাসানেরও লক্ষ্য এড়াল না। মুখে তার লাল আভা দেখা দিল। তবুও উত্তর দিতে হ'ল: ওর শরীরটা খুব খারাপ। বিছানা থেকেই উঠতে পারেনি আজ।

—আমাদের 'ইভিল সার্জন'কে খবর দিলেন না কেন? এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মামুন ব'লে উঠল। ওরা ঐ ব'লেই সিভিল সার্জনকে খেপায়।

—ইভিল আর ডেভিল যাই বল, আমাদের জান্ আর ছুটি এই দু'এর মালিক কিন্তু আমিই...। পাল্টা শুনিয়ে দিলে সিভিল সার্জন হোসেন।

সবাই প্রায় এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: আলবৎ, আলবৎ। ছুটিটার মালিক যে তুমি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। আর জানের ব্যাপারে আজরাইলের সঙ্গে তোমার যে বখরা আছে, তা কে না জানে, বল?

মামুন ভালো মানুষ সেজে বল্লে: মিঃ ইভিল, তুমি মিসেস হাসানকে একবার দেখে এলে না কেন?

হোসেন: খবর পেলে তো দেখবো। এসব কেস্ দেখা তো রীতিমত প্লেজেন্ট ডিউটি।—সিভিল সার্জনও তাহলে রসিকতা করতে জানে।

বিস্ময়ের ভাণ করে মামুন বল্লে: মিঃ হাসান, ইভিলকে খবর দেননি কেন?

হাসান উত্তর দেওয়ার আগেই হঠাৎ প্রবেশনার সি. এস. পি. হালিম বেমক্কা বলে বসল: মকসুদ সাহেবও কোনো খবর দেননি বুঝি?

হাসান মুহূর্তে গর্জে উঠল : সাট-আপ্। সবাই স্তম্ভিত। কিসের থেকে কি হয়ে গেল। আনন্দ ক'রে ছুটির দিনটা কাটাবে ব'লে সবাই এসেছে, হঠাৎ এ কি ঘটে গেল ?

নীরবে কাটল কয়েক মিনিট। হাসানের সর্ব দেহ থর থর করে কাঁপছে তখনো, দু'চোখে আগুনের ফুলকি।

এস. ডি. ও. ছুটে এসে হাতজোড় ক'রে বল্লে : আমরা মাফ চাই স্যার, আমরা সবাই মাফ চাই। অনেকেই সায় দিল এস. ডি. ও-র সঙ্গে। হালিমের ইচ্ছা হচ্ছিল হাসানের হাত ধরে মাফ চায়, কিন্তু ওর চেহারা দেখে কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেল না ও।

হাসান কম্পিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠল : রা...রা রাজু, গাড়ীতে উঠে এস। ড্রাইভারকে পিছনে যাওয়ার ইঙ্গিত ক'রে নিজেই জীপের স্টিয়ারিং হুইল ধ'রে বসলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই দিলে স্টার্ট। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল দলশুদ্ধ।

ষোলশহর ছাড়িয়ে নতুন রেসিডেন্সিয়াল এলাকার ভিতর দিয়ে যে প্রশস্ত রাস্তা হয়েছে তা দিয়েই আসছিল হাসানের জীপ। কিন্তু সোজা বাসায় না গিয়ে জুবিলী রোডে এসেই সে মোড় ফিরল পশ্চিম দিকে। সার্কিট হাউস ছাড়িয়ে টাইগার পাস হয়ে সে পাহাড়তলীর দিকে চালিয়ে দিলে জীপ। এই লক্ষ্যহীন ঘোরার একমাত্র লক্ষ্য হয়ত মাথাটা ঠাণ্ডা করাই। হঠাৎ রাজু চেঁচিয়ে উঠল : আব্বা, ওই দেখ মাম্মী মকসুদ চাচার সঙ্গে গাড়ী চালাচ্ছে।

হাসান চোখ তুলেই দেখতে পেল মকসুদের পাশে রাহেলা, উভয়ের হাত স্টিয়ারিং হুইলে, একজনের কব্জি আর একজনের কব্জির উপর। উভয়ের চোখে-মুখে হাসি-খুশীর উচ্ছ্বাস। হাসান একবারের বেশী দু'বার তাকাতে পারলে না ওই দিক পানে।

রাজু আবার চেঁচিয়ে উঠল : মাম্মীদের গাড়ী আব্বা, ওই চলে গেল।

হঠাৎ বাঁ হাতে ঠাস ক'রে মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্লে : চুপ।

হাসান মেয়ের সঙ্গে ব্যবহারে এই প্রথম ধৈর্য হারাল। তড়িৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল। চাপরাশীর কাঁধে গেলাফ-মোড়া বন্দুকটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে আবার সামনে তাকিয়ে

জীপ সামলাতে হলো। জীপ তখন পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের কাছে এসে পড়েছে। মকসুদের গাড়ী হয়ত ততক্ষণে স্টেশন ছাড়িয়ে সদরঘাট রোড ধরেছে।

পরদিন সকাল বেলা মকসুদের গাড়ী কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই হাসান চাপরাশীকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দিলে: রাহেলা আর ড্রাইভিং শিখবে না। You may go.

মকসুদ গট্ গট্ ক'রে ঢুকে হাসানকে লক্ষ্য ক'রে বল্লে: হাসান, এভাবে অপমান করার কোনো মানে হয়?

—অপমানবোধ না করলেই পার। আর অপমানের কথাই বা ওঠে কেন? হাসান নির্বিকারভাবেই উত্তর দিলে।

—জান, আমার সময়ের যথেষ্ট মূল্য আছে। তোমার স্ত্রীর বহু অনুরোধেই আমি তাঁকে ড্রাইভিং শিখাতে রাজী হয়েছিলাম।

—সেই অমূল্য সময় আর নষ্ট না করতেই তো বলা হচ্ছে। হাসানের কণ্ঠস্বর অনাবশ্যক কঠোর।

—এ দেখছি, যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর। হতাশায় ভেঙে-পড়া কণ্ঠে মকসুদ বল্লে।

—দেখ মকসুদ, যার জন্যই চুরি করনা কেন, চোর চোরই; তার বেশী মর্যাদা সে কোথাও পেতে পারে না। মকসুদের চোখে চোখ রেখেই হাসান কথাগুলি বলা তো নয়, যেন নিক্ষেপ করলে।

স্তম্ভিত মকসুদ তবুও দাঁড়িয়ে আছে দেখে হাসান এবার প্রায় আদেশের সুরেই বল্লে: You may go.

—আচ্ছা, গুড্ বাই।

কোনো প্রত্যুত্তরই দিলে না হাসান।

মকসুদ বিদায় হওয়ার মিনিট দুই পরেই সেজে-গুজে, পাউডার-এসেন্সের গন্ধে ভ'রে দিয়ে রাহেলা প্রায় হন্তদন্ত হয়েই ছুটে এল। বাইরে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠল: আরে মকসুদ গেল কোথায়? আমি বাথরুমে ছিলাম ব'লে একটু দেরী হ'ল। তার গাড়ীর হর্ন শুনলাম যে। বলনা, ও গেল কোথায়?

ফাইল থেকে চোখ না তুলেই হাসান বল্লে: জাহান্নামে।

—ঠাট্টা রাখ। সত্যিই বলনা ও কোথায় গেল? আজ যে আমার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ড্রাইভ করার কথা। রাহেলার চোখে-মুখে হতাশ ব্যাকুলতা।

—ড্রাইভিং আর শিখতে হবে না। আমি ওকে নিষেধ ক'রে দিয়েছি।

—তুমি কেন নিষেধ করতে গেলে? আমি শিখবই। সেই অপরূপ গ্রীবা-ভঙ্গির সঙ্গে ঝুমকো দু'টি সজোরে দুলিয়ে রাহেলা বল্লে।

—সে পরে দেখা যাবে। এখন ভিতরে যাও। হাসানের কণ্ঠে আজ অস্বাভাবিক কঠোরতা। হাসানের চোখের দিকে তাকিয়ে রাহেলা যেন মুহূর্তে মিইয়ে গেল। আশ্চর্য, আর কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রেই সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মিনিট দু' তিনেক পরে হঠাৎ কি ভেবে হাসান ওপরে উঠে এল। দেখল, রাহেলা বিছানায় পড়ে' ফুলে ফুলে কাঁদছে। তবুও সেইদিক পানে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে হাসান বল্লে: আমাকে না বলে আর কোনদিন কোথাও যেয়ো না।

সাপের মত ফণা তুলে রাহেলাও গর্জে উঠল: কেন? আমি কি তোমার কেনা বাঁদী?

এইবার রাহেলা শোয়া থেকে উঠে বসল এবং দৃপ্তকণ্ঠে বলল: আমার বুঝি মান-ইজ্জত নেই? ঠোঁট তার বাঁকা হয়ে উঠল।

—নিশ্চয়ই আছে। আছে ব'লেই তা রক্ষা করতে বলছি এবং তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমারও বটে।

—আমার ইজ্জত আমি বেশ রক্ষা করতে জানি ও পারি। ও বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না।

—হবে। গম্ভীর ও দৃঢ়কণ্ঠে হাসান জানালে। কি একটা কাগজ সন্ধান করতে করতেই বল্লে: আমাকে না জানিয়ে কোথাও আর যেয়ো না।

—গেলে কি করবে শুনি? রাহেলা প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল। মারবে নাকি? গায়ে হাত তুলবে? জোর খাটাবে? গ্রীবা আন্দোলিত ক'রে রাহেলা একটার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলে হাসানের দিকে।

—তবুও ধৈর্য হারাল না হাসান। বেশ শান্ত কণ্ঠেই বল্লে: প্রয়োজন হলে জোর খাটাতে হবে বৈ কি।

—এতখানি অসভ্য, বর্বর তুমি? বলতে বলতে সে উদ্যত-ফণা সাপিনীর মতো মাথা উঁচু করে হাসানের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ালো। তারপর

একটার পর একটা অলঙ্কার গা থেকে খুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল। হাসান আড়চোখে তাকিয়ে দেখল—রাহেলা প্রায় ক্রোধোন্মত্ত হলেও অলঙ্কারগুলি ঠিক ঠিক বিছানায় গিয়েই পড়ছে। যাক। ভিতরে রাগে ফেটে পড়লেও হাসান মনে মনে একটু না হেসে যেন পারল না।

কাগজটা এতক্ষণে খুঁজে পাওয়া গেল বোধ করি। ওটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হাসান বল্লে: লোক হাসিয়ো না। কন্‌ফারমেশনটা হয়ে গেলেই আমি গাড়ী কিনব, তখন ইচ্ছামতো তুমি ড্রাইভ করতে পারবে।

—গরু মেরে জুতো দান, না? রাহেলা ফেটে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে হারাল জ্ঞান।

এর আগেও দু'একবার এ রকম ঘটেছে। ডাক্তার বলেছে: হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। মারাত্মক কিছু নয়, উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ না দিলে আর কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করলে এ রোগ সহজে সেরে যায়। হাসানের আজ আর ফাইল ক্লিয়ার করা হোল না। মাথায় পানি ঢালতে হলো, লেবু আর স্মেলিং-সল্ট প্রয়োগ করতে করতে শেষ কালে রাহেলা চোখ মেলে তাকাল। এ অভ্যস্ত প্রক্রিয়ায় ফল পাওয়া যায়। তাই আর আজ-কাল ডাক্তারকে খবর দিতে হয় না।

তা সত্ত্বেও ব্যতিক্রম হ'ল না। অফিস থেকে ফিরে এসেই হাসান দেখল সেই অবাঞ্ছিত খাটখানার আবার আবির্ভাব ঘটেছে। অন্য ঘরে শোবার কথাও যে রাহেলা না ভেবেছে, তা নয়। কিন্তু আজকাল চারদিকে যেভাবে চোরের উপদ্রব বেড়েছে তাতে একা এক ঘরে শুতে তার সাহস নাই। তাদের বাসায়ও চোর দু'দুবার খিল খুলে ফেলেছিল। হাসানের ঘুম কিছুটা পাতলা। দু'বারই ভাগ্যিস সে জেগে পড়ে। আর একবার তো চোর পোর্টিকোতে উঠে, দোতলার জানালার শিকই কেটে ফেলেছিল। হাসান বন্দুকে কার্টিজ ভরতে ভরতে চোর পালিয়ে যায়। তখন থেকে হাসান বন্দুকে কার্টিজ ভরেই রাখে। কয়েকদিন আগে চোর দোতলার জানালা-পথে হাত দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট জজের স্ত্রীর গলা থেকে হারই নাকি খুলে নিয়ে গেছে! মা গো! এ কথা মনে হলেই তার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে আর অজ্ঞাতসারেই মুখে এসে যায়: মা গো!

কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাহেলাকে হাসানের সঙ্গে একই ঘরে থাকার

ব্যবস্থা এ-বারও করতে হ'ল। অবশ্য আলাদা বিছানায়—সেকালের 'গোসা-ঘরের' এ-কালিক সংস্করণ।

একবার তো হাসানের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে রাহেলা বাপের কাছে সিলেট চলেও গিয়েছিল। তাহের সাহেব কিন্তু কঠোর প্রকৃতির লোক, তদুপরি পরহেজগার। মেয়েকে একা দেখেই ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন : হাসান কই? রাহেলার মুখ থেকে কোনো উত্তরই বেরুল না। তার গম্ভীর ও রুক্ষমূর্তি দেখেই তিনি অনুমান করতে পারলেন। স্বামীকে ছেড়ে এইভাবে আসা তাঁর কাছে মেয়ের কুলত্যাগেরই সমান। ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে সেদিনই তিনি মেয়েকে সঙ্গে ক'রে রওয়ানা দিলেন চাটগাঁর দিকে। যার মাল তার হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে তিনি হতে পারলেন নিশ্চিন্ত। ফেরার সময় মেয়েকে শাসিয়ে গেলেন, দ্বিতীয়বার এরকম করলে তার মুখই তিনি দেখবেন না।

অফিস-ফেরৎ হাসান ঘরে ঢুকে আড়চোখে খাটটার দিকে তাকিয়ে বল্লে : আপদটা আবার এসে ঢুকেছে দেখছি।

রাহেলা নির্বাক। রাজু ছুটে এসে বল্লে : মাম্মী আনিয়েছে ওটা, আব্বা।

—হুঁ! ব'লে সে কাপড় ছাড়তে লাগল।

সন্ধ্যার দিকে হাসান মেয়েকে আদর করতে করতে বল্লে : সিনেমা দেখতে যাবে?

যাব আব্বা। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রাজু।

রাজুর কপালে একগুচ্ছ চুল রিং পাকিয়ে থাকে সব সময়। তার মারও ছিল ও রকম। ছবিতেও তা স্পষ্ট বাঁ পাশের কপালের উপর দেখা যাচ্ছে। রাজু ওই রিং নিয়েই জন্মেছে। হাসানের মেয়েকে আদর করার ওই এক নিয়ম...মেয়েকে কোলে বসিয়ে রিং পাকান কেছগুচ্ছকে টেনে টেনে সোজা ক'রে আবার ছেড়ে দেওয়া। ছেড়ে দিলেই চুলগুলো যথাস্থানে ফিরে গিয়ে আবার আংটির আকার ধারণ করে। এইভাবে মেয়ের কেশগুচ্ছ নিয়ে খেলা করতে করতে হাসান মৃদু হাসির সঙ্গে বল্লে : তোমার মাম্মীকে তা হলে তৈরী হতে বল।

রাহেলা অন্যদিকে মুখ ক'রে কি যেন সেলাই করছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : অত সোহাগ দেখাতে হবে না, যেতে হয় মেয়েকে নিয়েই যাও; আমি যাব না।

এই কণ্ঠস্বর হাসানের অপরিচিত নয়। রাহেলা ভয়ানক সিনেমাগত প্রাণ, কোনো ছবিই সে প্রায় বাদ দেয় না। হাসান আজ তার এই দুর্বলতারই সুযোগ নিতে চেয়েছিল। ও নিজে কিন্তু সিনেমার মোটেও ভক্ত নয়। দেখেও কালে-ভদ্রে। তবুও নিজের মান রক্ষার জন্য আজ তাকে মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় যেতেই হ'ল।

রাত সাড়ে ন'টার দিকে ফিরে এসে হাসান দেখে তো অবাক। শোয়ার ঘরের সারা মেঝেয় ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। রাজুর মার ফটোখানাও একপাশে পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে।

—ছবি পড়লো কি ক'রে? হাসান চেঁচিয়ে উঠল: মতিন বাবুর্চি ও চাকর ছুটে এল।

—আমরা হুজুর বাবুর্চিখানায় ছিলাম। হঠাৎ ঝনঝনাৎ শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখি, ছবিখানা পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আম্মাও ছিলেন বাথরুমে। সঙ্গে সঙ্গে রাহেলাও ব'লে উঠল: আমি তো শব্দ শুনে ভয়েই অস্থির। ভাবলাম, ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি। বাইরে এসে দেখি, না! ঘরে ঢুকেই দেখি এই অবস্থা।

—ভাঙা কাঁচগুলো সাফ করিসনি কেন? হাসান ধমকে উঠলো চাকরকে।

—আম্মা বল্লেন কিনা, থাক অমনি, সাহেব এসে দেখুক। বাবুর্চি ভীত কণ্ঠে জানাল।

হাসান টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখল, না পেরেকগুলি তো ঠিকই আছে, একটাও পড়েনি, রশিগুলিই ছিঁড়ে গেছে। কাটার মত মনে হচ্ছে যেন। মনে মনেই ভাবল। ঢুপ্ ক'রে নেমে বল্লে: রশি পুরনো হয়েছে, তাই ছিঁড়ে গেছে।

মতিন বল্লে: মাত্র ক'মাস আগেই তো ছবিগুলি ঝেড়েমুছে নতুন ক'রে টাঙ্গানো হলো।

—তুই কি জানিস? সে তো অনেক দিনের কথা। রাহেলা ধমকে উঠলো মতিনকে।

—হুঁ। বলেই হাসান হুকুম করলে: পরিষ্কার ক'রে ফেল সব।

ছোট্ট সংসার ওদের। মাত্র তিনটি প্রাণী। আড়াইটি বলাই সঙ্গত। এখানে মনে মনে মেঘ জমলে এবং তা ঘন ঘন হলে জীবন বড় অসহ্য

হয়ে ওঠে। হাসান ও রাহেলা স্বামী-স্ত্রী। অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথাই ইদানিং উভয়ের মধ্যে চলে না। স্বামীর শয্যা রাহেলার কাছে দিন-দিনই বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। শত চেষ্টা করেও রাতের অন্ধকারে স্বামীর পাশে রাজুকে রাজুর মা মনে না করেও পারে না। অথচ হাসানকে এসব কথা বলাই চলে না। হাসানেরও মনে জেগেছে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব। মাঝে মাঝে রাহেলার প্রতি অবিশ্বাসও যে মনে উঁকি মারে না, তা নয়। রাহেলার আকর্ষণ ড্রাইভিং, না ড্রাইভারের প্রতি? এই দ্বন্দ্ব মন থেকে সে কিছুতেই দুর করতে পারে না। তবুও সহজ দাম্পত্য-জীবন সে পেতে চায়। কিন্তু কিছুতেই যেন তা গ'ড়ে উঠছে না। তা ব'লে সময় তো ব'সে নেই। সময় বয়ে চলেছে আপন গতিতে। এইভাবে গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস।

কিছুদিন ধরে রাহেলার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। খেতে পারে না রীতিমত। খেলেই বমি-বমি ভাব হয়। মেজাজের মতো চেহারাও তার হয়ে পড়েছে রুক্ষ।

লেডী ডাক্তার দেখে বল্লে: অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ। তবে আরো মাস দুই না গেলে পাকাপাকি ক'রে বলা যাচ্ছে না কিছুই।

হাসান শুনে খুশী হ'ল। ভাবল, মা হলে ওর মন-মেজাজ বদলে যেতে পারে। শান্ত ও মধুর হতে পারে ব্যবহার। লেডী ডাক্তার বিদায় হলে হাসান হাসিমুখে বল্লে: সত্যিই আমি খুব খুশী হয়েছি। অনুমান যেন সত্য হয়।

রাহেলা শুনে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল: আমি চাইনা, চাইনা তোমার। আলুথালু বেশে ছুটে গিয়ে খাবার ঘরের টেবিলের উপর পড়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হাসান তো থ। সু-খবরেও খুশী হয় না এমন পাগল তো দেখিনি। মাথায় ছিট আছে নাকি? না, এও হিস্টিরিয়ার এক লক্ষণ?

মাস দুই পরে লেডী ডাক্তার এসে পাকা খবর জানিয়ে গেল। হাসান খুশী হ'ল বটে কিন্তু রাহেলার বিরক্তি দিন-দিনই বেড়ে চল্ল। হাসানের কাছে এই এক হেঁয়ালী।

একদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হাসান সামনের পোর্টিকোতে ইজিচেয়ারে

গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল। সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে হাত বাড়াল দিয়াশলাইর সন্ধানে। না পেয়ে ডাক দিল: রাজু।

রাজু রেলিং ধরে রাস্তার লোক চলাচল দেখছিল। সাড়া দিল গলার ভিতর এক অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে। শুনেই হাসান বুঝতে পারল কি যেন খাচ্ছে ও গাল ভরে। বল্লে: দিয়াশলাইটা আন্।

দিয়াশলাই নিয়ে মেয়ে কাছে আসতেই মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল: কি খাচ্ছ?

কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল রাজু। মুখের ক্রিয়াও যেন বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

—গালের ভিতর কি? হাসান মেয়েকে কাছে টেনে আবার প্রশ্ন করল।

রাজু এবার ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্লে: চকোলেট আব্বা।

তার গোপন করার প্রচেষ্টা দেখে হাসানের মনে কৌতূহলের সঞ্চার হ'ল।

সেও ফিস্‌ফিস্ ক'রে শুধাল: কোথায় পেয়েছ?

দরজার দিকে একবার দেখে নিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে: তুমি কাকেও বলবে না তো? মাম্মী খুব ক'রে মানা করেছে।

—তোমার মাম্মীকে আমি বলব না।

—মকসুদ চাচা এত্ত বড় এক টিন চকোলেট এনেছে আমার জন্যে।

—মকসুদ চাচা কখন এসেছিল? সন্দিগ্ধ কণ্ঠে হাসান জিজ্ঞেস করল। রাজু ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাতে লাগল।

—আমি কাকেও কিছু বলব না। হাসান আবার মেয়েকে আশ্বাস দিল।

—দুপুরে তুমি যখন অফিসে চলে গেছ।

—প্রায়ই আসে বুঝি?

—হ্যাঁ। আমার জন্যে চকোলেট আনে, মাঝে মাঝে রসগোল্লাও...।

অনুচ্চস্বরে আবার যোগ করলে রাজু: আজ তো ওঁর গাড়ী ক'রে আমরা বেড়িয়েও এসেছি। মাম্মী আর মকসুদ চাচা কিন্তু তোমাকে এসব কথা বলতে মানা করেছে। মাম্মী আমাকে একটা টাকাও দিয়েছে।

বাপের গলা জড়িয়ে ধরে সে আবার মিনতি করলে: আমি বলেছি, আব্বা, তা বলবে না কিন্তু।

পর্দার আড়ালে স্যাণ্ডেলের শব্দ হ'ল যেন। রাজু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মেয়েকে সজোরে ঠেলে দিয়ে হাসান উঠে দাঁড়াল। স্বল্পপরিসর পোর্টিকোতেই পায়চারী করতে লাগল দ্রুতপদে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে।

প্রায় নিঃশব্দে এবং একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকল ওদের।

অবাঞ্ছিত খাটখানার আবার ডাক পড়ল। সব জিনিসেরই একটা ভূমিকা আছে। এই দম্পতির জীবনে এই খাটখানার অবদানও কম নয়। এবার হাসানই চাপরাশীকে ডেকে ব'লে দিলে: ওঘর থেকে খাটখানা নিয়ে এসে এখানে পেতে দিয়ে যাও।

সব ঠিকঠাক ক'রে চাপরাশী বিদায় হ'ল। বাবুর্চি আর চাকর শুতে গেল নীচে। ঝি তো সাতটা বাজতেই পালিয়েছে। রাজু সন্ধ্যা-রাতেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওই ওর অভ্যাস।

স্বামী-স্ত্রী ঘরের দু'প্রান্তে দু'জন মৌন হয়ে ব'সে আছে। হাসান দু'একবার চোখ তুলে দেওয়াল-সংলগ্ন বন্দুকটার দিকে চেয়ে দেখলে। রাহেলার হাই উঠছে। অগত্যা শুতে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল বুঝি। হাসান গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে: ওই খাটেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়।

বিস্ময়ের ভাণ ক'রে রাহেলা বল্লে: কেন? ঘাড় তার বাঁকা হয়ে উঠল। কেউটের ফণার মতো তা উত্থিত হ'ল।

হাসান ব্যঙ্গ ক'রে ব'লে উঠল: কেন? তুমি না বলেছিলে একদিন, তোমারও মান-ইজ্জত আছে?

—আছেই তো। ঝটিতি উত্তর এল।

—পর-পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করলে মান-ইজ্জত থাকে নাকি? হাসান প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আবার তাকাল বন্দুকটার দিকে।

—কে বল্লে? আমি ঢলাঢলি করেছি? যা মুখে আসে তা বলো না কিন্তু, ভালো হবে না। সাপের ফণার মতো আন্দোলিত হতে লাগল রাহেলার গ্রীবা।

—মকসুদ আসেনি আজ? আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তোমরা...।

—হ্যাঁ এসেছিল। তাতে দোষ হয়েছে কি?

—তাতে দোষ হয়েছে কি? হাসান চিৎকার ক'রে উঠল।

—তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, কোনো সুযোগ নেয়া-নেয়ি হয়নি। এবার প্রায় নির্বিকার কণ্ঠেই রাহেলা বল্লে।

হাসান আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘন ঘন তাকাতে লাগল ভরা বন্দুকটার দিকে।

হাসানের এই মূর্তি রাহেলার দৃষ্টি এড়াল না। তার দু'চোখের আগুন যেন মিইয়ে এল। হঠাৎ ফণা হ'ল অবনত। আশ্চর্য, সে আর কোনো উচ্চবাচ্যই করল না।

—ইচ্ছা করলে তুমি কালই তোমার বাপের কাছে চলে যেতে পার, অথবা... রাগের মুহূর্তেও হাসান ইতস্ততঃ করল।

রাহেলা স্বামীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে নিল একবার।

—মকসুদের কাছেও যেতে পার। বলেই হাসান মশারীর ভিতর ঢুকে সটান শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে ও ঘামতে লাগল। আর বুকের ভেতর চলতে লাগল হাপর।

মনে মনে ভাবল রাহেলা, ভালই হ'ল। আলাদা শুলে সে কিছুটা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। পাশে অন্য কেউ শুয়েছে ব'লে মনে হয় না। শুনতে পায় না কারো দীর্ঘশ্বাস। ঘুমের ঘোরে শিউরে উঠতে হয় না বারে বারে। সেদিন এই ভাবেই রাহেলা সান্ত্বনা খুঁজেছিল মনে মনে।

কিন্তু এইটুকু সান্ত্বনা সম্বল ক'রে কয় মাস আর কাটানো যায়। স্বামীর সঙ্গে মান-অভিমান বা রাগ ক'রে পৃথক বিছানায় সে বহুবার শুয়েছে বটে, কিন্তু একটানা দীর্ঘ দু'মাস কখনও থাকেনি। যতই দিন যেতে লাগল ততই সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে—তার দেহ-মন উন্মুখ হয়ে উঠল স্বামী-সান্নিধ্যের জন্য। এ দু'মাস হাসান তার সঙ্গে একটিবারও কথা বলেনি। তার পূর্ণাবয়ব দেহের দিকে তাকিয়ে তার চোখেমুখে খুশী ফুটে ওঠা দূরে থাক বরং একটা ঘৃণা যেন ভ্রূকুটির রূপ নিয়ে স্পষ্টতর হচ্ছে দিন দিন। রাহেলার তন্বী দেহ এখন এক অপরূপ সুডৌল রূপ নিয়েছে। তার দেহে যা অপূর্ণ ছিল, এতদিনে যেন তা পেল পূর্ণতা।

রাহেলার এখন ইচ্ছে হয়। আশ্চর্য। সেই ইচ্ছাটা দিন-দিনই দুর্দমনীয় হয়ে তাকে ক'রে তুলেছে অস্থির ও ব্যাকুল। সেই ইচ্ছা আর কিছুই নয়, শুধু স্বামীর পাশে একটুখানি গা ঘেঁষে শোবার, স্বামী দেহের উষ্ণতা অনুভব

ক'রে পড়ে থাকার। কিন্তু গায়ে প'ড়ে সে কি ক'রে...? তার সব দেহে রস সিঞ্চিত ক'রে যে সন্তান ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠেছে, তাতো হাসানেরই সন্তান। সে দিকেও সে একবার ফিরে তাকাচ্ছে না। রাহেলার বহু বিনিদ্র রজনী যেন আর কাটতেই চায় না। মনে মনে শুধু উচ্চারিত হয় নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর।

একদিন সে মরিয়া হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। সমস্ত মান-অভিমান লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে হাসানের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মশারী তুলে তার তুলতুলে হাত দু'খানি হাসানের পায়ের উপর রাখল। হাসানের ঘুম গেল টুটে। সে শ্লেষের স্বরে ব'লে উঠল : কে?

—আমি। লজ্জা-নম্র কণ্ঠে উত্তর এল।

—এখানে কেন? দূর হও, না-পাক কোথাকার! ঝাঁজালো কণ্ঠে এই ব'লেই সে সজোরে পা নিল টেনে।

—কাঁপতে কাঁপতে মশারীর বাইরে এসে দাঁড়াল রাহেলা। তারপর ফেটে পড়ল মুহূর্তে : আমি না-পাক, না তুমি? মেয়ে নিয়ে শোয়ার মজা টের পাওয়াব, পাওয়াব, পাওয়াব একদিন।

কি বললি হারামজাদী? বিছানা থেকে ছিটকে পড়ে উন্মাদ হাসান সেই অন্ধকারেই ছুঁড়ে মারল লাথির পর লাথি।

—মাগো...আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই একটি পতনের শব্দ হলো শুধু। তারপর ব্যাপক নিস্তব্ধতা। কম্পিত হস্তে সুইস্ টিপলো হাসান—রাহেলা মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে, সংজ্ঞা নেই ব'লেই মনে হচ্ছে, আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। তক্ষুণি ফোন করা হ'ল হাসপাতালে, সিভিল সার্জনের বাসায়। চাকর-বাকরকে জাগিয়ে পাঠানো হ'ল এখানে ওখানে। এম্বুলেন্স এসে যখন রাহেলাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তখন পূর্ব দিকে প্রায় ফর্সা হয়ে উঠেছে, কিন্তু রাহেলার জ্ঞান তখনো ফিরে আসেনি। বহু চেষ্টার পর বেলা বারটা নাগাদ রাহেলার হুঁস হ'ল। কিন্তু দেখা গেল ভ্রূণ আর বেঁচে নেই। একটি মৃত কন্যাশিশু।

যাক্ ফল নষ্ট হলেও গাছ বেঁচে আছে—সবাই সান্ত্বনা দিল হাসানকে এই বলে।

—কেমন ক'রে ঘটল ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাসান প্রায় অতিষ্ঠ ও বিব্রত হয়ে পড়ল।

—অন্ধকারে খাট থেকে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গিয়েই ঘটিয়েছে। দেখেন না কাণ্ড! আমাকে ডাকলেই হ'ত।

ডাক্তার অবশ্য বলেছিল: শুধু পড়ে গেলে এমন আঘাত পাওয়ার কথা নয়। শক্ত কিছুর ধাক্কা না খেলে এমন হতেই পারে না।

—ঘুরে একেবারে ড্রেসিং টেবিলের কোণার উপর গিয়ে পড়ল কিনা... এক্সিডেন্টের কোনো হাত-পা আছে নাকি? এক্সিডেন্ট, এক্সিডেন্ট!

না হয় পাশেই তো আমি ছিলাম। আমাকে বল্লেই তো লাইট জ্বালিয়ে দিতাম।

রাহেলাকে প্রায় মাস দুই হাসপাতালে কাটাতে হ'ল। যখন ছাড়া পেয়ে ফিরে এল, তখন রাহেলাকে রাহেলার ছায়ামূর্তি বলেই মনে হতে লাগল। আগের সেই চেহারা নেই, নেই সেই শরীর, নেই সেই লাবণ্য। তার স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য হয়ে এসেছে স্তিমিত। এখন যেখানে বসে সেখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকে। শোয় তো শুয়েই থাকে। দিন আর রাত কাটে প্রায় একই অবস্থায়......মৌনভাবে। আগের মতো বেড়াতেও আর বের হয় না।

ডাক্তার বার বার ক'রে বলে দিয়েছিল একটু মুক্ত হাওয়ায় বেড়াবার কথা। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার দু'চার দিন পর হাসান একদিন খুব মিনতি ক'রে বল্লে: চল, পতেঙ্গা থেকে বেড়িয়ে আসি, ভালো গাড়ী পাওয়া গেছে একটি।

—না। এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু দিয়েই রাহেলা চুপ ক'রে রইল, আর মুখ নিল ফিরিয়ে অন্য দিকে।

হাসপাতাল থেকে ফিরেও সে নিজের সেই আলাদা খাটেই শোয়। নিজের মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকে। ডাক্তার বলে দিয়েছিল: ওঁকে নিজের খেয়ালেই চলতে দেবেন, বড্ড শক্ পেয়েছেন। কিছুটা মানসিক বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয়। বেশ কিছুদিন ওঁর কথা ও কাজের বিরুদ্ধতা করবেন না। কোনো রকম উত্তেজনার কারণ যেন না ঘটে, বাড়ীর সবাইকে

এ কথা বলে দেবেন। তাই হাসান ওর শোয়া থাকা সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনো কথাই বলেনি।

হঠাৎ একদিন হাসানের কি এক খেয়াল হ'ল...রাহেলার বালিশটা তুলে নিয়ে ওর খাটে ওর নিজের বালিশের পাশে রেখে দিলে। মুখে কিছুই বল্লে না বটে তবে ইশারাটা অর্থপূর্ণ।

শোবার সময় কিন্তু রাহেলা নিজের বালিশ নিজের বিছানায় নিয়ে এসে যথারীতি শুয়ে পড়ল। ওর কপালের কুঞ্চিত রেখা দেখে হাসান ওর অপ্রসন্নতা বুঝতে পারল।

এই ভাবে আরো দিন পনর বিশ কাটল। হাসান নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দিন দিন।

অগত্যা একদিন মনে মনে ভাবলে...আরো একটু খোলাখুলি ভাবে না হয় চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্।

রাজু সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়ে। শোবার আগে অনেক ইতস্তত ক'রে হাসান হঠাৎ উঠে গিয়ে রাহেলার শীর্ণ হাত হু'খানি তুলে নিলে নিজের হু'হাতে। বল্লে: চল, আজ থেকে আমার ওখানে শোবে। আজ তার চোখেমুখে ও কণ্ঠে এক বিনম্র মধুর অনুনয়ের ভংগি।

রাহেলা এক ঝাঁকুনিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: আমি না না-পাক? কোন্ আক্কেলে আমার হাত ধর? যাও, শোও গে, মেয়ে নিয়েই জীবন কাটাওগে।

অন্য সময় হলে এই কথায় হাসান আবার ধৈর্য হারাত। হয়ত আবার ভীষণ কিছু একটা ক'রে বসত। আজ কিন্তু কিছু বল্ল না, নীরবেই সয়ে গেল। অনেক রাতে হাসানের ঘুম গেল ভেঙে। শুনতে পেল, রাহেলা বিড় বিড় ক'রে কি সব যেন বকছে। কান পেতে রইল নিঃশব্দে। রাহেলা ব'কে চলেছে: আমি না-পাক, কি করেছি? ড্রাইভিং শিখতে চেয়েছি, মকসুদের সঙ্গে মিশেছি, আলাপ করেছি, এই তো? শুধু এইতো...।

প্রায় রাতে, দিনেও কখনো কখনো বসে বসে শুধু নিজের মনে বিড় বিড় করতে থাকে ও। একটানা ঘণ্টা হু'য়েকও বোধ করি ও ঘুমায় না। ওর স্বগতোক্তিতে হাসানেরও বার বার ঘুম যায় টুটে।

আর একরাত্রে হঠাৎ জেগে পড়ে হাসান শুনতে পেল: মজা বের

করছি, তুমি তো খুনী, আমার মেয়েকে খুন করেছ তুমি, খুন করেছ। সঙ্গে সঙ্গে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল ও।

সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি: খুনী, খুনী তুমি, মজা বের করছি, দেখনা।

হাসান ভেবে পায়না কি করবে। সব রকম আঘাত সে এখন সহ্য করতে প্রস্তুত। তবু ও ভালো হোক, সুস্থ হোক—এ সে সর্বান্তকরণে কামনা করে।

দিনের বেলায় ওর প্রস্তরমূর্তিবৎ নীরবতা হাসানের কাছে আরো অসহ্য লাগে। ওর এই নীরবতা যেন ওর পৌরুষকেই ব্যঙ্গ করতে থাকে।

সিভিল সার্জেন হাসপাতালের পথে রোজই একবার ক'রে আসেন। দেখে যান। একদিন হাসানকে বল্লেন: ছুটি নিয়ে একবার চেঞ্জে যান না কেন? আমার তো মনে হয় ওতে উপকার হতে পারে।

হাসান বল্লে: যেতে রাজী হলে তো?

সত্যই, হাসান যা অনুমান করেছিল তাই হ'ল। রাহেলাকে চেঞ্জের কথা বলতেই সে শুধু...না, বলেই ঘাড় ফিরিয়ে নিলে অন্য দিকে। ডাক্তার তখনও বিদায় নেয়নি। ওর 'না' শুনেই ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এখন কোথাও গিয়ে কাজ নেই। এখানে এই পরিচিত পরিবেশে থাকাই ভালো। চোখ টিপলেন হাসানের দিক চেয়ে।

রাজু সব সময় চোখের সামনে থাকবে এতেও মনটা খুশি থাকার কথা। পূর্ব কথার জের টানলেন ডাক্তার এই ভাবে।

রাহেলার ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

একদিন হাসানকে লক্ষ্য ক'রে বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রায় স্কুল মাস্টারের মতোই রাহেলা জিজ্ঞেস ক'রে বসল: God-এর Feminine কি, বলো দেখি?

—কেন? Goddess! এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে হাসান বিস্মিত না হয়ে পারল না।

—Tiger-এর?

—Tigress। হাসানের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চললো।

—আর Murderer-এর Feminine কি, বল দেখি।

—Murderess! বিমূঢ় হাসানের মুখ থেকে বের হ'ল।

তারপর এক বিকট হাসি হেসে হাসানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলে উঠলো: Murderess। এইভাবে বার তিন-চারেক Murderer—Murderess আউড়িয়ে গুম হয়ে বসে রইল মৌনভাবে, যেন তলিয়ে গেল অন্তরের অন্তঃস্থলে। হয়ত ওর মনের গতির মোড় ফিরাবার জন্যই হাসান অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বললে: এই ছবিটা......রাজুর মার ছবিটা নির্দেশ ক'রে ......অন্য ঘরে সরিয়ে রাখি, কেমন?

—না। মুখ না ফিরিয়েই গম্ভীর কণ্ঠে রাহেলা উত্তর করলো।

কি একটা তদন্তের জন্য হাসানকে শুক্রবার মফঃস্বল যেতে হ'ল। রবিবারে বিকেলে অথবা সোমবার সকালে ফিরবে। মেয়েলোক বলতে বাসায় একটি ঝি-ই মাত্র। সেও আবার রাত্রে থাকে না। খেয়ে-দেয়ে ভাত-সালন নিয়ে নিজের বাড়ীতেই শুতে যায়। চাকর আর বাবুর্চি থাকে নীচে। চাপরাশী তো ওর সঙ্গেই যাবে। অগত্যা ঝিকেই হাসান খুব ক'রে বলে দিলে, এ দু'দিন ও যেন বাড়ী না যায়। রাজুদের ঘরে নীচে বিছানা পেতে যেন শোয়। চারিদিকে চুরির হিড়িক, একটু সাবধানে যেন থাকে। ঝিকে ও চাকর-বাবুর্চিকে এ তাগিদটুকুও দিলে হাসান।

যাওয়ার মুহূর্তে রাজু বায়না ধরলে...সেও যাবে। আগে আগে তাই করত ও। যখন এস. ডি. ও. ছিল তখন তো হাসানকে খুব টুর করতে হ'ত। তখন মেয়েকে সব সময় সঙ্গে করেই নিয়ে যেত। এবার কিন্তু হাসান কিছুতেই রাজি হ'ল না: না, তোমার মাম্মীর শরীর ভালো নয়, একা থাকতে পারবে না। তুমি সঙ্গে থাক।

সেটাই তো ওর পক্ষে বেশী ভয়াবহ। মাম্মী তো আজকাল কোনো কথাই বলে না এবং মাঝে মাঝে ওর দিকে যে ভাবে তাকায়, ওর তো ভয়ে বুক পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। বাপের হুকুম শুনে সে তো প্রায় কেঁদে ফেল্লে। কিন্তু হাসান আজ নাছোড়বান্দা। রাহেলার এই অবস্থায় ওকে একা রেখে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া অমানুষিক কাজ হবে। এই সে ভাবলে। অতএব কান্নাকাটি সত্ত্বেও রাজুকে থাকতেই হ'ল। অভয় দেওয়ার জন্যই যেন হাসান মেয়েকে বল্লে: আমি ঝিকে বলে দিয়েছি, সে সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। রাত্রে তোমার খাটের নীচে বিছানা ক'রে ও শোবে; দু'দিন তো মাত্র।

রাহেলা যেন আজ কিছুটা অতিরিক্ত উৎকর্ণ হয়ে স্বামীর কথাগুলো শুনল। হঠাৎ ওর চোখে-মুখে একটা ভ্রূকুটি যেন খেলে গেল।

এমনি রাহেলা সব সময় মৌন হয়েই থাকে। এমন কি চাকর-বাকরকেও কিছু বলে না। ওরা নিয়মমাফিক গোসলের পানি, খাবার ইত্যাদি যেখানে যখন যা দেবার তা দিয়ে যায়। রাহেলা নিজের খেয়াল-খুশি মতো যখন ইচ্ছা গোসল করে, যখন ইচ্ছা খায়।

হঠাৎ শনিবার বিকালে ঝিকে ডেকে রাহেলা বল্লে: তোমার তো রাত্রে থাকার কোনো প্রয়োজন দেখি না।

ঝি বল্লে: সাহেব বলে গেলেন, আমি কি করি, মা। আমার তো রাত্রে এখানে ঘুমই হয় না। আপনি বলেন তো আমি আজ বাড়ী গিয়েই ঘুমাই।

—বেশতো। সে-ই ভালো।

—সাহেব বকবে না তো, মা? কিঞ্চিৎ দ্বিধার সঙ্গে বুড়ী জিজ্ঞাসা করল।

রাহেলা বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল: বকবে কেন? আমি বলব 'খন। তুমি বাড়ী গিয়ে শোও গে।

ঝি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বল্লে: তা হলে তো মা খুব ভাল হয়। ঠাঁই নড়া হলে আমি ঘুমুতেই পারি না।

—সাহেব যখন নেই, আমরাও খেয়ে সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়ব। রাজুতো বেলা ডুবলেই ঝিমুতে থাকে। তুমিও ভাত-সালন নিয়ে না হয় বেলাবেলিই চলে যাও।

—তা করব, মা। ঝি যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ঝড়-বাদলের দিন, তাই করব মা। কাজ-কামটা তা হলে আমি সকাল সকাল সেরে নিই। এই বলে ঝি উঠে পড়ল।

বাবুর্চি ডেকে রাহেলা বলে দিলে: রান্নাটা আজ সকাল সকাল সেরে ফেল। সন্ধ্যার দিকে তোমাকে একটু কাজে পাঠাবো।

রাহেলার কথাবার্তায় আজ কোনো রকম অসঙ্গতির লক্ষণ নেই। স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের মতোই কথা বলছে সে আজ। চাকর-বাকরেরাও একটু বিস্মিত যে না হ'ল তা নয়। ভালো হয়ে ওঠার লক্ষণ মনে ক'রে

বুড়া বাবুর্চিটা মনে মনে বেশ একটু খুশীও হ'ল। ভাবলে, সাহেব এলে বলতে হবে।

চাকর ছেলেটাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে রাহেলা প্রায় ফিস্‌ফিস্ করেই জিজ্ঞাসা করল : কেরোসিন কবে এনেছ?

মতিন তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। এসব নিয়ে বিবি সাহেব তো কোনদিন মাথা ঘামায় না। ভয়ে মুখ তার প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিবি সাহেব কোন খবর নিয়েছে নাকি, না বাবুর্চিই ফাঁক ক'রে দিলে। বুক তার ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ভয়ে ভয়েই বল্লে : কালই তো এনেছি আম্মা।

—বোতলটা নিয়ে আয় দেখি।

—ভয়ে ওর প্রায় হার্টফেল হওয়ার দশা। হিসেব তো দেয় এক সেরের, আনে তো তিন পোয়া।

ভয়ে ভয়েই বোতল নিয়ে এল। রান্নাঘরে একটা কুপি‍ই তো জ্বলে। বোতল প্রায় ভর্তিই আছে।

—আচ্ছা রেখে আয়।

কর্ত্রীর মুখে আজ স্বাভাবিক কথা শুনে বাবুর্চির মত মতিন কিন্তু মোটেও খুশী হ'ল না। সের সাত আনা করেই আনে বটে কিন্তু হিসেব তো দেয় সাড়ে সাত আনা। যাক, দামের কথা যখন জিজ্ঞাসা করেনি, আপাতত ফাঁড়া কেটে গেছে মনে ক'রে মতিন কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল মনে মনে।

বেলা ডুবতে না ডুবতেই ঝি বিদায় হ'ল। বাবুর্চিকে ডেকে তার হাতে কিছুটা টাকা আর একটা ফর্দ দিয়ে বল্লে : এই জিনিসগুলি রেলওয়ে স্টোর থেকে কিনে নিয়ে এসো। আসবার সময় ঘুরে পাব্লিক লাইব্রেরী থেকে দুটো বইও আনতে হবে...ফর্দের পেছনে বইয়ের নাম লিখে দিয়েছি।

—তা হলে ফিরতে তো অনেক দেরি হবে, আম্মা। মগরেবের পর রাজুকে যে খাওয়াতে হবে। বাবুর্চি জানালো।

—ওকে মতিন খাওয়াতে পারবে। আর আমি তো আছি-ই।

বাবুর্চির বিস্ময়ের অন্ত নেই। বিবি সাহেবার মুখে এমন কথা তারা অনেকদিন শোনেনি।

বাবুর্চি চলে যাওয়ার পর রাজুকে ডেকে রাহেলা বল্লে : রাজু, বায়স্কোপ দেখতে যাবি ?

—যাব, মাম্মী। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রাজু।

—তবে আয়, তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিই। অপ্রত্যাশিত স্নেহের সুরে রাহেলা বল্লে।

তারপর নিজেই আলমারী খুলে রাজুর কাপড়-চোপড় সব বের ক'রে জড় করলে। ঈদের দিনের ফুল-হাতা দামী ফ্রকটা বেছে নিয়ে বল্লে : এইটি পরো, বেশ মানাবে। রাজু খুশীর চোটে দড়ি ছাড়াই প্রায় স্কিপিং শুরু ক'রে দিলে। রাজু নীল রঙের সালোয়ারটাই পরতে চেয়েছিল। রাহেলা কিন্তু আপত্তি করল : না। চোস্ত পাজামাটাই পরো, ওটাতেই তোমাকে মানায় ভালো। অগত্যা তাই পরতে হ'ল। মাথায় বেশ ঝপঝপে ক'রে খোশবু তেল মাখিয়ে দিয়ে, নানা রঙের ফিতা দিয়ে রাহেলা আজ স্বহস্তেই রাজুর মাথায় বেণী গেঁথে দিলে। এমনি রাজু মোজা কিছুতেই পরতে চায় না, আজ কিন্তু রাহেলা ওকে একেবারে ফুলমোজা না পরিয়ে ছাড়ল না। তবে বল্লে : ঝড়-বাদলের দিন, ক্যানভাসের জুতো-গুলিই পরো।

রাজু বল্লে, মাম্মী, আমার বিহে-হারটা বের ক'রে দাওনা, পরি।

—না। ও-রকম হার এখন কেউ পরে নাকি! ওটা ভাঙিয়ে তোমাকে নতুন ডিজাইনের হার গড়িয়ে দেব। রাহেলা ওকে সান্ত্বনা দিলে।

—আব্বা বলেছেন, ওটা আমার আম্মার। ওটা তিনি কিছুতেই ভাঙতে দেবেন না।

—হুঁ।...কি জানি কেন আজ হঠাৎ হাসানের অনুকরণ করল রাহেলা। তারপর মতিনকে ডেকে বল্লে : আমরা সিনেমায় যাব ; আমাদের জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে আয় তো।

মতিন বল্লে : ঘোড়ার গাড়ী তো আম্মা স্টেশনে ছাড়া পাওয়া যাবে না। ঘোড়ার গাড়ী উঠে যাচ্ছে কিনা, সারা শহরে দু'চারখানা আছে কিনা সন্দেহ। ওখান থেকে গাড়ী এনে যেতে যেতে সন্ধ্যার শো' তো শুরু হয়ে যাবে, আম্মা।

—বেশ, তা হলে ন'টার শো'তেই যাব।

—তা হলে আম্মা, যেখানেই পাই সেখান থেকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারব। তাই করি আম্মা।

—আচ্ছা।

বিবির খোশমেজাজ দেখে মতিন সাহস ক'রে বল্লে: আমার ছুডু ভাইকে সদর ঘাটের কাছে এক সাহেবের বাসায় চাকরী দিছি, একটু দেখে আসবো, আম্মা? ফিরবার পথে গাড়ী নিয়ে আসব তখন। সাড়ে আট-টার মধ্যেই গাড়ী নিয়ে এসে পড়ব।

—আচ্ছা, যা।

মতিন সার্টটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফের জিজ্ঞাসা করলে রাহেলা: রান্নাঘরে বাতি দিয়েছিস?

—দিয়েছি।

—আচ্ছা, যা।

সেজে-গুজে রাজু বলে উঠল: মাম্মী, তুমি কাপড় পরলে না?

—তোমাকে খাইয়ে তবে আমি পরব। চল, তোমাকে আগে খাইয়ে দিই। ফিরতে অনেক রাত হবে, ক্ষিধে লাগবে তোমার। রান্নাঘরে বসেই চারটা খেয়ে নাও। বাবুর্চি তো নেই, মতিনও চলে গেল, আমি বেড়ে দেব, চল।

আজ রাহেলাকে দেখলে কেউই ভাবতে পারবে না ও অসুস্থ, ওর বুদ্ধি ও কথায় আছে কোনো গোলমাল। পিঁড়ি পেতে রাজুকে বসিয়ে বাসন-পেয়ালা ধুয়ে নিজেই ভাত-তরকারী বেড়ে দিলে। রাজু খেতে শুরু করল গোগ্রাসে—সিনেমা দেখার উৎসাহে তার হাত-মুখ দুই-ই ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে আজ।

পাশেই কুপির আলোটা দপদপ ক'রে জ্বলছে। রাহেলার কি খেয়াল হ'ল কে জানে, হঠাৎ রান্নাঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ ক'রে দিলে। চক্ষের নিমেষে এক অঘটন ঘটে গেল। কিসের ধাক্কা খেয়ে কুপিটা পড়ল কাৎ হয়ে, আর রাজুর সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে মাথা বেয়ে কি এক তরল পদার্থ যেন গড়িয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। রাহেলা ছিটকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে চিৎকার দিয়ে উঠল: আগুন, আগুন! ঘর থেকে তার কানে শুধু ভেসে

এলো একবার : মাম্মী ! পরক্ষণে বার দুই : আব্বা গো, আব্বা গো। আগুনের পত্পত্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না এরপর।

দেখতে দেখতে রাস্তা থেকে, আশেপাশের বাড়ী থেকে লোকজন এসে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু কিছু করবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। রাহেলা উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করতে লাগল : মা রাজু গো, মা রাজু গো।

দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই সিভিল সার্জন, ডি. এম., এস. পি. এবং আর আর সব অফিসারেরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। ডি. এম. তক্ষুণি হাসানের কাছে স্পেশাল মেসেঞ্জার ও জীপ পাঠিয়ে দিলেন।

*　　　*　　　*

জীপের অন্ধকার বক্ষে হাসান কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ছিল। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অদম্য শোকাবেগে সে মাঝে মাঝে সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠছিল। ড্রাইভার আর সহযাত্রী সাব-ডেপুটির সামনে কিছুতেই চোখের পানি ফেলবে না ......জীপে ওঠার সময় সে মনে মনে এই সংকল্প করেছিল বটে ; কিন্তু সেই সংকল্পের বাঁধ বোধ করি পাঁচ মিনিটও টিকল না।

কিন্তু জীপ শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে নতুন এক সংকল্প ক'রে বসলো : না, আমাকে শক্ত হতে হবে। পুরুষ মানুষ আমি......পুরুষের ভূমিকা আমাকে পালন করতেই হবে। খোদার যা হুকুম তাই হয়েছে। আমিও যদি মুষড়ে পড়ি, তা হলে রাহেলার অবস্থা কি হবে? এমনি তার মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, রাজুর মৃত্যু নিয়ে আমি যদি তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করি, তা হলে তার আর পাগল হতে দেরী লাগবে না।...দু'টি খুন হবে বটে, কিন্তু রাজুকে তো আর ফিরে পাব না? অলরেডী, দু'টো খুন...না, না, অতীত, ডুবে যাও, মুছে যাও স্মৃতি থেকে। রাহেলা সত্যই বলেছিল Murderer-Murderess. আমি আহাম্মক ও বেকুব বলে তার এই ইশারা বুঝতে পারিনি। হে অতীত, ডুবে যাও, মুছে যাও! অতীত ও মৃত্যুকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ তা নয়, তাতে জীবনে দুঃখ ও বিভ্রাট অনিবার্য। হে অতীত, ডুবে যাও, মুছে যাও তুমি! আজকের সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনেও নতুন দিনের উদয় হোক।...হাসানের কণ্ঠে প্রায় প্রার্থনার সুর।

না, আমাকে শক্ত হতেই হবে। পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে নিয়ে হাসান বেশ রগড়ে রগড়ে চোখের জল ও তার চিহ্ন মুছে ফেল্লে। সিগারেট কেস্ বের ক'রে নিজে একটি মুখে দিয়ে, কেস্‌টি সঙ্গী সাব-ডেপুটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে: নিন্! বিস্মিত সাব-ডেপুটি সঙ্কোচ ও বিনয়ে গদ গদ হয়ে বল্লে: না স্যার, না স্যার। হাসান ফের বলে উঠল: নিন্ না।

সাব-ডেপুটির হাত তবুও আড়ষ্ট হয়ে রইল।

আজকাল ছাত্ররা পর্যন্ত মাস্টারকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খায় অথচ সাব-ডেপুটিরা ডি. এম., এ. ডি. এমের সামনে সিগারেট খেতে সাহস পায় না। এই চরম শোকের দিনেও একথা মনে হতেই হাসানের ঠোঁটে একটুখানি হাসি দেখা দিল বুঝি।

ঘরে ঢুকে হাসান সোজা শয়নকক্ষেই চলে গেল। তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় রাহেলা ভেঙে পড়ল। হাসান মনে মনে যা মহড়া দিয়ে এসেছিল, সান্ত্বনার সুরে তাই বলে গেল: খোদার হুকুম, রাহেলা। খোদার হুকুম। না হলে মেয়ে অত কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও আমি তাকে নিয়ে গেলাম না কেন সঙ্গে ক'রে? সে হঠাৎ রান্নাঘরে খেতে গেলই বা কেন আজ? আর তুমি অত ক'রে বলা সত্ত্বেও আমি ইলেকট্রিক তারটা রান্নাঘর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম না কেন এদ্দিন ধরে? কত ছেলেমেয়েই তো কুপির আগুন লেগে পুড়ে মরে ...। তোমার দোষ কী? খোদার হুকুম কে রদ করতে পারে? তা না হলে ঝি, চাকর, বাবুর্চি এক সঙ্গে তিন জনই বাড়ী ছেড়ে যাবে কেন? তুমি বল্লেও তাদের যেতে হবে নাকি? তারা তো জানে তুমি অসুস্থ, তোমার মাথার ঠিক নেই। আসলে সব খোদার হুকুম, রাহেলা।

রাহেলা তার অর্ধদগ্ধ আঁচল দেখিয়ে নতুন ক'রে ফুঁপিয়ে উঠল: মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে দেখ না আমার গায়েও আগুন ধরে গিয়েছিল... আর একটু হলে দু'জনেই ...।

ওর বাক্য শেষ না হতেই হাসান বলে উঠল: খোদা হাফিজ! খোদা হাফিজ! আমি জানি, আমি সব জানি, সব বুঝতে পারি।

রাহেলা মনে মনে চমকে উঠল...কী জানে? কি বুঝতে পারে! হাসান

কি জানে? এই তো মাত্র এল। নীচে চাকর-বাকরদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এসেছে কি?

—খোদা জানের মালিক। আমরা মাথা কুটলেও তো ও ফিরে আসবে না। বলতে বলতে হাসান হাত ধরে উঠিয়ে রাহেলাকে বিছানায় তুলে বসালে। তারপর বেরিয়ে গেল বৈঠকখানার দিকে, যেখানে রাখা হয়েছে রাজুর লাশ।

রাহেলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল কি? না, সন্দেহ করল, হাসান বুঝেও না বুঝার ভান করছে? না, তাকে আইন ও দশজনের ঘৃণা থেকে বাঁচাবার এ এক ফন্দি? এই দ্বন্দ্ব-দোলায় তার মনও ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল।

কি জানি কেন এবার থেকে রাহেলা একদম মৌন হয়ে গেল। রাজুকে দাফন করতে নিয়ে যাওয়ার পর সে যে চুপ করল......আজও রাজুর মৃত্যুর চার-পাঁচ মাস পরেও তা আর ভাঙ্গল না। হাসান নানাভাবে চেষ্টা ক'রে বিফলমনোরথ হয়েছে। সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছে, বেড়াতে যাওয়ার জন্য সাধাসাধি ক'রে দেখেছে। কোনো সাড়া পায়নি। শুধু ঘাড় নেড়ে তার সব কথাই না ক'রে দিয়েছে রাহেলা। সব সময় যেদিকে ইচ্ছা দুই বড় বড় চোখ তুলে চেয়েই থাকে...হাসান ঘরে ঢুকলে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে অনেক সময়। দু'চোখ দিয়ে কি যেন সন্ধান করে।

মাঝে মাঝে শুধু নিজের ডান হাতখানি উল্টে-পাল্টে দেখে। কেউ কাছে না থাকলে হাতখানি নাকের কাছে ধরে শুঁকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ ওর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বাসা বদলালে হয়ত ভালো হতে পারে এই ভেবে হাসান ডি. এম-কে বলে নতুন বাসার ব্যবস্থা করলে। নদীর হাওয়া ও নদীর দৃশ্যে হয়ত রাহেলার মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। এই ভরসায় নদীর পাড়ে এক ধনীর 'হাওয়া-ঘর'ই ভাড়া নিলে হাসান। কিন্তু তাতেও অবস্থার ইতর-বিশেষ হ'ল না। আগের মতই ভাবলেশহীন দু'চোখ মেলে একইভাবে ঠায় বসে থাকে রাহেলা। মাঝে মাঝে কি যেন বিড় বিড় ক'রে বলে। কখনো আপন মনে হাসে। আর শুধু উল্টে-পাল্টে দেখে নিজের ডান হাতখানি বার বার।

ঝি-ই প্রথম লক্ষ্য করল, আস্ত সাবান নিয়ে গোসলখানায় ঢুকলে ও ঘণ্টা দু'ই পরে বেরিয়ে এলে দেখা যায়, সাবানের আর অস্তিত্বই নেই। ফলে রোজই একখানা ক'রে লাক্স কিনতে হচ্ছে।

পরে হাসানও তা লক্ষ্য করল। একদিন হাসান বলে ফেল্লে: অত সাবান কি ক'রে খরচ কর, দিনে একখানা ক'রে...।

রাহেলা ফেটে পড়ল: সাবানটাও জোগাতে পারবে না তুমি? আমি আর কি খরচ করি? সিনেমা দেখি না, বেড়াতে যাই না।

—না, না, তা পার না কেন? আমতা আমতা করল হাসান। এবার থেকে এক ডজন ক'রে সাবান কিনে আনতে ব'লে দেব চাপরাশীকে। তুমি যত ইচ্ছা ব্যবহার কর; আমার কোনো আপত্তি নেই।

এখন থেকে আর সে গোপন করে না। গোসলখানায় ছাড়াও এখন যখন-তখন সাবান ঘষে ঘষে হাত ধোয়। এক একবার ধুয়ে হাতখানি নাকের কাছে তুলে ধরে। আবার নতুন ক'রে সাবান মাখে আর জোরে জোরে ঘষতে থাকে। এই ভাবে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বেলার পর বেলা।

হঠাৎ একদিন নেহাত অপ্রত্যাশিতভাবে হাসানের দিকে চেয়ে রাহেলা বল্লে: হ্যাঁগা, আমাকে কিছু ভালো আতর আনিয়ে দিতে পার, অথবা খুব ভালো এসেন্স?

—আচ্ছা। চাপরাশী এক্ষুণি গিয়ে ভালো আতর এসেন্স যা পায় নিয়ে আসবে।

সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েক রকম আতর-এসেন্স এসে গেল এবং হাসান নিজের হাতেই তা রাহেলার ড্রেসিং টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলে।

এখন থেকে দেখা যায়, বারকয়েক সাবান ঘষে ভালো ক'রে হাত ধুয়ে তাতে বসে বসে সে আতর কি এসেন্স ডলতে থাকে আর মাঝে মাঝে নাকের কাছে হাত তুলে শুঁকে দেখে। আবার নতুন ক'রে আতর কি এসেন্স ঘষতে থাকে।

হাসানের যেন এই দৃশ্য ও এই অবস্থা আর কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। অগত্যা একদিন হাসান রাহেলার কাছে বসে অত্যন্ত বিনয়নম্র কণ্ঠে বল্লে: তোমার কি হয়েছে, আমাকে বল। বলতে বলতে রাহেলার ডান হাতখানি নিজের দু'হাতে তুলে নিলে। রাহেলা বড় বড় চোখ দু'টি স্বামীর মুখের

উপর ন্যস্ত ক'রে নীরবে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। হাসানের কণ্ঠ ফের গদ গদ হয়ে উঠল : বল, তোমার কি দুঃখ। রাহু......।

আবেগের আতিশয্যে নেহাত অতর্কিতেই এই সম্বোধন তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। না-হয় জীবনে কোনদিন রাহেলাকে এ সম্বোধন সে করেনি। শব্দটি উচ্চারণ করেই সে চমকে উঠল। আদরের আবেগে তিন অক্ষরের নামকে দুই অক্ষরে পরিণত ক'রে ডাকলে তাতে যে অপূর্ব মাধুর্যে মন-প্রাণ ভরে ওঠে, সেই অনাস্বাদিত মাধুর্যে হাসান চমকে ওঠেনি, সে চমকে উঠেছে শব্দটির বাংলা অর্থ মনে পড়ে যাওয়ায়। সত্যই রাহেলা কি তার জীবনে 'রাহু' হয়েই দেখা দিয়েছে?

অসম্ভবও সম্ভব হ'ল। অপ্রত্যাশিতও ঘটল। রাহেলা কোনদিন যা করে না, আজ তা করল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলে : তুমি কোনো সন্দেহ করবে না তো?

—না। কেন সন্দেহ করব? তুমি ভালো হও, সুস্থ হও, এই আমি চাই। খোদার হুকুম...মেয়ে মারা গেছে। আমদের তো এখনো ছেলে-মেয়ের বয়স যায়নি, রাহেলা।

আমার এই হাতে শুধু কেরোসিনের গন্ধ কেন বলতে পার? রাহেলা ডান হাতখানি দেখিয়ে বল্লে।

কই দেখি। হাসান হাতখানি তুলে নিয়ে শুঁকে দেখল বারকয়েক। তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বল্লে : দূর, কিচ্ছু না......তোমার হাতে তো আতরের খোশবুই ভুর ভুর করছে।

—সত্যি? রাহেলার চোখেমুখে হাসির দীপ্তি।

—সত্যি না তো কি? হাসানের কণ্ঠে আদরের সুর।

পরদিনও কিন্তু আবার সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। সাবান ঘষে ঘষে হাত ধোওয়া আর তাতে ডলে ডলে আতর-এসেন্স মাখানো। হাসান এবার ঢাকায় বদলির চেষ্টা করল। অন্তত্র, নতুন পরিবেশে রাহেলার মন থেকে এইসব স্মৃতি ধীরে ধীরে হয়ত মুছে যেতে পারে...এই সে মনে মনে ভাবলো। বিশেষত ঢাকায় ওর মা-বাবা আছেন। তাহের সাহেব অবসরের পর ঢাকায় বাড়ী করেছেন। মা-বাবার স্নেহ-যত্ন ও সান্নিধ্যে

হয়ত তার মনের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠতেও পারে। এই আশায় হাসান তদ্বির ক'রে সেক্রেটারিয়েটে বদলি হলো।

কিন্তু তাতেও রাহেলার ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্তন হ'ল না। সেই একই ভাবে নির্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকা। খেয়াল হ'লে সাবান ঘষে ঘষে হাত ধোওয়া, আতর-এসেন্স মাখা—নাকে হাত দিয়ে শুঁকে নাক-মুখ কুঞ্চিত করা। সারাদিন ধরে এই প্রায় চলতে থাকে। ঢাকায় বড় ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ যাঁরা আছেন সবাইকেই একে একে দেখিয়ে শেষ করেছে। কারো পরামর্শ উপেক্ষা করেনি। কিন্তু ফল তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। অনেকেই মত দিলে...মস্তিষ্কবিকৃতিরই লক্ষণ।

ওর মাও নিজের কাছে নিয়ে মাসখানেক রেখেছিলেন। সেখানেও সেই একই অবস্থা। তিনি আরো কিছুকাল মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাহের সাহেব বল্লেন: যার মাল তার কাছে থাকাই ভালো। তাহের সাহেব পরহেজগার ও হিসেবী লোক। অবসর গ্রহণের পর তিনি আরো পরহেজগার ও আরো একটু হিসেবী হয়ে পড়েছেন।

সমবয়সীদের কেউ এই বিষয়ে খোঁচা দিলে তিনি বলে ওঠেন: যান, হাশরের দিন যার বোঝা তাকেই বইতে হবে। ছেলে বইবে না বাপের বোঝা, বাপ বইবে না ছেলের বোঝা। দুনিয়াটা তো মুসলমানের জন্য যাকে বলে ছোট হাশর।

হাসান প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কি করবে ভেবে পায় না। কখনো কখনো ভাবে বটে...বিলেত নিয়ে গিয়ে কোনো মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে কিছুদিন রাখতে পারলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু চাকুরিজীবী মানুষের সেই সম্বল কোথায়?

জীবনে সে কারো কাছে হাত পাতেনি। তাই বড়লোক আত্মীয়দের কথা সে মনে বড় একটা স্থান দেয়নি। শ্বশুরের মনোভাব তার অজানা নয়। তিনি হয়ত এই ছোট হাশরের পর কি রকম নির্বিঘ্নে বড় অর্থাৎ ফাইনেল হাশর পার হয়ে যাবেন সেই কল্পনায় নিশ্চিন্ত আছেন! প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড শেষ ক'রে দিলে, তারপরেও যদি রাহেলা বেঁচে থাকে তার চলবে কি করে! অতএব, তাতে হাত দিতে সে অনিচ্ছুক। রাহেলার অলঙ্কার-পত্রগুলি বিক্রি করলে কয়েক হাজার পেতে পারে বটে। কিন্তু তা

করতে মন তার কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। তাই কয়মাস ধরে হাসানের মন নানা পরিকল্পনায় দোদুল্যমান। আপাতত দীর্ঘ ছুটি চেয়ে দরখাস্ত ক'রে রাখলে একটা। কোথাও না হয় চেঞ্জেই যাওয়া যাবে, ভাবখানা এই। কক্সবাজারে গিয়ে মাস কয়েক কাটিয়ে আসবে না হয়।

রাহেলা আপন খেয়াল-খুশী মতেই চলে। হাসান কখনো তার ইচ্ছার বিরোধী হয় না। আগের মতই রাহেলা নিজের বিছানায় একা একাই শোয়।

এর মধ্যে একদিন রাত্রে হাসানের কি জানি কি ইচ্ছা হ'ল। হঠাৎ উঠে গিয়ে রাহেলার বিছানায় তার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর রাহেলার হাত দু'খানি ধরে ফেলে বল্লে: চল, আমার বিছানায় শোবে। কণ্ঠ তার আবেগে কম্পিত।

--না। রাহেলার কণ্ঠস্বর অকুণ্ঠ ও দৃঢ়।

—কেন? হাসান প্রায় ভেঙে পড়ল।

—গন্ধ লাগবে। বলেই নাক কুঞ্চিত করল।

—কিসের গন্ধ? কোনো গন্ধ নেই। ও তোমার মনের ভুল। বলে, রাহেলার হাত দু'খানি নিজের নাকের কাছে, মুখের কাছে তুলে ধরে তাতে ঘন ঘন চুমু খেতে লাগল হাসান।

—লক্ষ্মীটি, আজ আমার কাছেই শোও। বলে, সে এক রকম কোলে করেই রাহেলাকে নিজের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলে এবং তার চোখে মুখে অজস্র চুমু খেয়ে তার মাথায় কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

কিন্তু অর্ধ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর হাসান বিছানা হাৎড়িয়ে আশ্চর্য হল···রাহেলা নেই। উৎকর্ণ হাসান শুনতে পেল...চাপা কান্নার শব্দ উঠেছে যেন। উঠে সুইচ টিপল। দেখল—রাহেলা নিজের বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পরদিন রবিবার।

বিকেলে হাসান রাহেলার ডান হাতখানি তুলে ধরে বল্লে: চল বেড়াতে যাই, অনেকদিন তো রমনার খোলা মাঠে বেড়াওনি, যাবে লক্ষ্মীটি? দেখবে রমনার চেহারা কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ভালো লাগবে তোমার দেখে।

—না।

তারপর হঠাৎ অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে রাহেলা বলে উঠল : বস একবার। হাসান চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসল।

—জান, কলেজে থাকতে আমি একবার লেডী ম্যক্‌বেথের পার্ট ক'রে প্রাইজ পেয়েছিলাম।

—হাঁ, হাঁ। তা তো জানি। বিয়ের পর তুমি কত বারই তো সে গল্প করেছ। দু'একবার তো লেডী ম্যক্‌বেথের স্বগতোক্তি আবৃত্তি ক'রে আমাকে শুনিয়েছিলেও। বিস্মিত হাসান ধীরে ধীরে বল্লে।

—আজ একবার শুনবে! আমার মনে আছে কিনা দেখ দেখি।

হাসান শঙ্কিত হয়ে উঠল। না, না, তার দরকার কি? আমিও ম্যক্‌বেথ নই আর তুমিও নও লেডী ম্যক্‌বেথ। ওই শুনে আমাদের লাভ? প্রসারিত হাসির সাথে হাসান বলে উঠল।

রাহেলা হাসানের কথায় কর্ণপাত না করেই বলে চল্ল :

Here's the smell of the kerosene still all the perfumes

of Arabia will not sweeten this little hand. oh, oh, oh.

হাসতে চাইল বুঝি রাহেলা কিন্তু তার দু'চোখ প্লাবিত ক'রে বেয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা।

হাসান অভিভূত হলেও তা দমন ক'রে আবহাওয়াকে হালকা ক'রে তোলার জন্যই হয়ত হাসিমুখে বলে উঠল : তুমি দেখছি খো'দার উপর খোদকারী করতে শুরু করেছ!

—তুমি ধরতে পেরেছ? রাহেলার কণ্ঠে অসীম বিস্ময়।

—কেন পারব না? সেক্সপিয়র কি আমি তোমার চেয়ে কম পড়েছি নাকি? আর ওই প্যাসেজটা তো তোমার মুখেই কতবার শুনেছি। তখন...

—তোমার তা হলে মনে আছে সব? হাসানকে কথা শেষ করতে না দিয়েই রাহেলা বলে উঠল।

—থাক্, থাক্। ম্যক্‌বেথ আর লেডী ম্যক্‌বেথ চুলোয় থাক। ও সবের সঙ্গে তোমার আমার সম্পর্ক কি? আমরা তো আর...বলতে বলতে হাসান থেমে গেল।

—সত্যি? তুমি কোন সন্দেহ......

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রাহেলা চেয়ে রইল হাসানের চোখের দিকে।

—সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? খোদার হুকুম···আমাদের দুই মেয়েই মারা গেছে। হয়ত আমরা দু'জনেই অপরাধী। কিন্তু সে তো mere accident, রাহেলা! সে তো mere accident, accident-এর উপর তো কারো হাত নেই। হাসানের কণ্ঠ আন্তরিক ও গম্ভীর।

—সত্যি তুমি বিশ্বাস কর? রাহেলার কণ্ঠে অনন্ত বিস্ময়।

—যা সত্যি তা বিশ্বাস করব না কেন? রাহি, বাইবেলের সেই অমর কথা মনে নেই? 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।'

রাহেলার জীবনের কয়েকটি দুর্লভ অভিভূত মুহূর্ত কাটল নীরবে। হঠাৎ উঠে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে উঠল: তুমি এত ম-মহ। রাহেলার মুখে আর কোন কথাই জোগাল না। কিন্তু তার সারা দেহমন যেন উন্মুখ হয়ে উঠল স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু পারল না। দুই বড় বড় চক্ষু মেলে হাসানের মুখের দিকে সে শুধু চেয়েই রইল অনেকক্ষণ ধরে! তার দু'চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু দুই গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করছিল বুঝি। হাসান পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে শুধু যে তার দু'চোখের উদ্‌গত অশ্রু মুছিয়ে দিলে তা নয়, সস্নেহে জড়িয়ে ধরে তার দুই শীর্ণ গণ্ডে দুটু চুমুও এঁকে দিলে। একি তার অতৃপ্ত করুণার অভিব্যক্তি, তা একমাত্র তার অন্তর্যামীই জানে। কিন্তু রাহেলা নীরবে স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে রইল অনেকক্ষণ। আশ্চর্য! আজ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টাই করল না সে।

একজোড়া প্যাণ্ট

আবু জাফর শামসুদ্দীন

উনিশ শ' তেত্রিশ ইংরেজী সাল থেকে আবু রুশদ ওবায়দুল্লাহ মিঞা কেরানীর চাকরি করেন। তখন আফিস ছিল কলকাতায়—ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে, ৩নং চারনক প্লেসে।

আপন ভাগ্য নিয়ে দুনিয়ার কেউ সবস্তুত: সন্তুষ্ট নয়। ওবায়েদ মিঞা তার ব্যতিক্রম। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তার। দশটা-পাঁচটা আফিস—রুটিনবাঁধা জীবন। কলেঙ্গার একটা মেসে বাস করতেন ওবায়েদ মিঞা। সকাল ন'টা পনরোর মধ্যে গোসল আর খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি আফিসে রওয়ানা হতেন। পায়ে হেঁটেই অবশ্য. কখনও তিনি একটি পয়সা ট্রাম ভাড়া দেননি।

তার নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে প্রথম ঝড় এলো ১৯৪৬ সালের মহা দাঙ্গায়। তারপরেই পার্টিশন—পাকিস্তানে বদলি—কলেঙ্গার মেস ত্যাগ—আরো কতো কি ঝক্কি।

ঢাকায় এলেন ওবায়েদ মিঞা। নতুন জায়গা। অন্তহীন ওলোট-পালোট। সারা জীবন ডেসপাচে কাজ করে এসেছেন তিনি। হঠাৎ তাকে ডিলিং এসিসটেন্টের পদে বদলী করা হলো।

নতুন 'বড় বাবু' সিরাজুদ্দীন সাহেবের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন ওবায়েদ মিঞা, স্যার আমাকে ডেসপাচ থেকে বদলি করবেন না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বড় বাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন: নতুন দেশ। ঝামেলা ঝক্কি অনেক। আপনার মতো সিনিয়র হ্যাণ্ডকে ডেসপাচে রেখে আমি আফিস চালাবো কেমন করে। না, না, ওসব চলবে না। সকলকে জানপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে তবে না হবে দেশের তরক্কি।

এমন বিপদও মানুষের হয়। সাধারণ বিভাগের গাদার গাদা চিঠি আর ফাইলের মধ্যে ওবায়েদ মিঞা হাবুডুবু খান।

কি যে মাথামুণ্ডু করতে হবে তাই মাথায় আসে না। খেই হারিয়ে যায় ভাবনার। এদিকে পোশাক পরিবর্তনের ঝামেলা—ধুতি ছেড়ে পাজামা : স্যাণ্ডাল ছেড়ে আলবার্ট।

তার উপর আবার বড় বাবুর তিরস্কার লেগেই আছে। স্ত্রীও তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঢাকায় উপস্থিত। বিক্রমপুর বর্ষায় ডুবেছে। সাপের ভয়। তা ছাড়া পৈত্রিক ভিটাবাড়ীর অর্ধেক পদ্মা গ্রাস করেছে, বাকী অর্ধেকও যে কোন মুহূর্তে যাবে যাবে করছে।

ছেলেপুলের লেখাপড়াও আছে।

আফিসে রাত আটটা ন'টা বাজে ; সেদিকে খেয়াল নেই। দারোয়ান এসে বলে : বাবু, অফিস বন্ধ করবো এবার।

তাইত সুয্যি (ওরফে সুরুজ মিঞা)। আচ্ছা যাই তাহলে আজকের মতো। উঃ, কি যে মুশকিলে ফেলেছেন আল্লাহ্ আমাকে।

একদিন হেড এসিসটেণ্ট সিরাজ মিঞা বড় সাহেবের ঘর থেকে নিজ কামরায় ফিরেই গম্ভীর স্বরে হাঁক দেন : ওবায়েদ সাহেব!

একটা দুরূহ ফাইলে ডুবে ছিলেন ওবায়েদ মিঞা। মাথা তুলে জওয়াব দেন : স্যার।

এদিকে আসুন!

এই সেরেছে রে! ভাবতে ভাবতে ওবায়েদ মিঞা বড় বাবুর টেবিলের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং ডান হাতে মাথা চুলকাতে থাকেন।

যান! বড় সাহেবের কামরায় যান! ডেকেছেন আপনাকে।

সাক্ষাৎ মালেকুল মওত উপস্থিত হলেও ওবায়েদ মিঞা অধিক ভয় পেতেন না। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন : কি জন্যে স্যার?

তার আমি কি জানি! কোন্ ফাইলে কি করে রেখেছেন আপনিই জানেন। যান, শীগগির যান।

এর চাইতে ফাঁসির হুকুম হলেও সম্ভবতঃ ওবায়েদ মিঞা খুশী হতেন। কেননা তার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আছে, সুপ্রীম কোর্ট আছে।

বড় সাহেব অর্থাৎ ইনামুল্লাহ খান। দুর্দান্ত সাহেব। আদ্য সিলেবলে জোর দিয়ে ইংরেজের ইংরেজি বলার দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি

যা বলেন, তা দূর থেকে শুনলে মনে হয়, আয়ারল্যাণ্ড থেকে সদ্য সমাগত কোন সাহেব কথা বলছেন।

সাহেবের ঘরের সম্মুখে পাগড়িবাঁধা তকমাআঁটা দু'জন আর্দালী টুলে বসে গোঁফে তা' দিচ্ছিল। স্ক্রীন সরিয়ে ওবায়েদ মিঞা ঘরে ঢুকবার সময় তারা মুচকি হাসে।

শয়তানের দল! ওবায়েদ মিঞা মনে মনে তাদের নিপাত কামনা করেন।

ইয়েস। ফাইল থেকে চোখ তুলে তাকান ইনামুল্লাহ খান। হোয়াটস্ ইয়োর নেম ?

আঃ মর! এতদিনে আবার নাম জিজ্ঞাসা করা কেন? মুখে বলেন, মাই নেম ইজ ওবায়দুল্লাহ খান স্যার।

ডেমন্ ইয়োর র্ র্ খান। তারপর কি যে বলেন কিছুই বুঝা যায় না।

ওবায়েদ মিঞার পা জোড়া তখন স্থির নেই। হাওয়ায় কম্পনরত বৃক্ষশাখার মতো অনবরত কাঁপছে।

ওবায়েদ মিঞা এক রকম জ্ঞানহারা। কোন রকমে বলেন: ইয়েস স্যার।

ডেমন্ ইয়োর ইয়েস স্যার্‌র্‌র্। রাখ তোমার ইয়েস স্যার। একটা ফাইল দেখিয়ে বলেন, হোয়াটস্ স্ দিস ননসেনস? ফাইলে এসব কি মাথামুণ্ডু লিখেছ তুমি? বলে মোটা দু'আড়াই সেরি ফাইলটা ওবায়েদ মিঞার নাকের উপর ছুঁড়ে মারেন বড় সাহেব।

'ডজ' করে নাক বাঁচান ওবায়েদ মিঞা। ফাইল তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে মেঝেয় পড়ে। কাগজপত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এদিকে ওবায়েদ মিঞার মাথাটাও হঠাৎ ঝিম ঝিম করতে থাকে। চোখের সামনে যেন কিছুই নজরে আসে না—সব অন্ধকার আর মাঝে মাঝে সরষে ফুল। পড়তে পড়তে সাহেবের টেবিলের সম্মুখের চেয়ারটার হাতল ধরে কোন-ক্রমে নিজেকে খাড়া রাখেন ওবায়েদ মিঞা। পরে উবু হয়ে ফাইল কুড়িয়ে নেন তিনি।

হুম্, পুট আপ ফ্রেস নোটস্‌স্ অন্‌দা মেটার্‌র্‌র্। বিষয়টির উপর নূতন করে নোট লিখ।

ওবায়েদ মিঞা স্ক্রীন পর্যন্ত এগুতে না এগুতেই ফের হাঁক দেন বড় সাহেব: হিয়ার্‌র্‌র্। চেন্‌জ ইয়োরর্ দেট গড ডেমনড ড্রেস, ইউ গ্যাসটি

ফুল। গেট টাইডি এণ্ড টিপটপ। আর শোন, তোমার ঐ অভিশপ্ত ময়লা পোশাক বদলাও, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আঁটসাট পোশাক পরো।

এণ্ড নাউ গেট ইয়ো আউট, ইয়ো গড ডেমনড ফুল। আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত গর্দভ, এখন ঘর থেকে নেকালো। শেষ করেন বড় সাহেব।

ওবায়েদ মিঞা টলতে টলতে নিজ ঘরে ফিরে আসেন। কোনক্রমে আপন চেয়ারে বসে চোখ বোজেন তিনি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন: পানি।

সহকর্মীরা এসে মৌচাকের মতো তাকে ঘেরাও করে। সকলের মুখে এক প্রশ্ন: কেন ডেকেছিলেন বড় সাহেব?

জুনিয়র কেরানীর জীবনে বড় সাহেবের আহ্বান দিনমজুরের পোলাও-কোর্মা খাওয়ার মতো জীবনে কচিৎ কদাচিৎ ঘটে।

ওবায়েদ মিঞা পানির গেলাস এক চুমুকে নিঃশেষ করে চক্ষু বোজেন। বুকের অবস্থা তখনও গুরুতর। পায়রা আর কত কাঁপে, তার বুকের কম্পন তার চাইতেও বেশী।

মিনিট পনরো পরে আসন ত্যাগ করেন ওবায়েদ মিঞা। ফাইলসহ বড় বাবুর ঘরে ঢুকে পড়েন বিনা আহ্বানে—যে কাজ কখনও তিনি করেন না।

বড় বাবু!

কে? ও! ওবায়েদ মিঞা! কি ব্যাপার?

এই নিন ফাইল। আমি আর চাকরি করবো না, বাড়ী চল্‌লাম—কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে উপোষ করবো, ভিক্ষে করে দিনপাত করবো তাও ভালো, কিন্তু বড সাহেবের ঘরে! না, না, আর কখনও না।

কণ্ঠস্বর নয়, কান্না!

বড় বাবু ওরফে সিরাজ মিঞা অবাক। বলে কি লোকটা!

হয়েছে কি? খুলে বলুন। চাকরি ছাড়বেন কেন?

মরতে মরতে বেঁচে এসেছি স্যার। বাপরে! সে কি ইংরেজী? শব্দের শেষে যদি "আর" থাকে তবে আর রক্ষে নেই! একটা নিমিষে চার পাঁচটা হয়ে যায়। 'গডডেমনড'—শব্দের মানেই বুঝতে পারলাম না। না! না! বড় বাবু আমার চাকরিতে কাজ নেই। দেশের জন্যে জেহাদ করতে বলুন রাজী, কিন্তু বড় সাহেবের কামরায় আর নয়—ইংরেজ আর কত ইংরেজ। ইংরেজের চৌদ্দপুরুষ বড় সাহেবের মতো ইংরেজ হতে পারবে না।

ওঃ! এই কথা! তা বড় সাহেব একটু কড়া মেজাজের লোক। তাতে কি হয়েছে! একবার যখন ডাক্তে আরম্ভ করেছেন তখন ঠিক নজর পড়েছে আপনার উপর। উন্নতি হবে ওবায়েদ মিঞা, উন্নতি হবে।

উন্নতির কাজ নেই আমার। ফাইলে আবার কি নোট দিতে হবে, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তার উপর আবার মড়ার উপর খাড়ার ঘা। হুকুম করলেন পোশাক পরিবর্তন করতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে। না বড় বাবু, আমি চাকরি করবো না, আর একদিন ও ঘরে ঢুকলে...হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকেন ওবায়েদ মিঞা...আর একদিন ও ঘরে ঢুকলে নির্ঘাত জানে মারা যাবো। মরার সময় বিবি ও বাল-বাচ্চার মুখ পর্যন্ত দেখবো না—শেষ করেন ওবায়েদ মিঞা।

চুপ করুন। ছিঃ! কঠোর স্বরে বললেন হেড এসিসটেণ্ট সিরাজ মিঞা। চাকরি আপনার করতেই হবে। আপনার মতো ভালো একটি হ্যাণ্ড আমি ছাড়তে পারবো না। এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস আইনে পড়েছেন আপনি—আপনারা। চাকরি ছাড়বো বললেই ছাড়া যায় না—ধরে নিয়ে আসবে পুলিশ। এই দুঃসময়ে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

দম নিয়ে আবার শুরু করেন বড় বাবুঃ পোশাক বদলাতে বলেছেন সাহেব, বদলান। জানেন না, এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে—আফিসে ঢিলা-ঢালা পোশাক অর্থাৎ পাজামা, শার্ট, পাঞ্জাবী, আচকান-পাজামা এ সব পরার যুগ আর নেই? প্যাণ্ট ও হাওয়াই শার্ট ধরুন, স্মার্ট হন। দেখছেন না, আর আর সকলে পরে। স্মার্ট হন, উন্নতি হবে। হাঁ, ফাইলটা রেখে যান, আমি দেখে দিচ্ছি।

আর শুনুন! দু'চারদিনের মধ্যে প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট বানাতে ভুলবেন না যেন। একবার যখন বড় সাহেবের নজরে পড়েছেন, তখন হুকুম তামিল হলো কি না দেখার জন্যে আবার যে কোন দিন তলব করতে পারেন। কপাল ভালো আপনার। পোশাক পরিবর্তনের নির্দেশ যখন হয়েছে, তখন নিশ্চয় উন্নতি হবে। যান! যান! মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন গিয়ে।

মহার্ঘভাতা সমেত সর্বসাকুল্যে বেতন একশ' পঁয়ষট্টি টাকা পাঁচ আনা মাত্র। বিবি আছেন, বাচ্চা কাচ্চাও তিনটি, নাবালক ভাই একটি, মা বুড়ীত আছেই। ফাইফরমাসের জন্য একটি নাবালক চাকরও রাখতে হয়। মোট

আট জনের সংসার। একশত পঁয়ষট্টি টাকা থেকে তিরিশ টাকা বাড়ী ভাড়া দেওয়ার পর হাতে থাকে মাত্র শত পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি টাকা লাগে রেশন উঠাতে। বাকী থাকে গোটা সত্তরেক টাকা। বাজারে সব জিনিসের দাম রোজ চড়ছে। তার উপর ছোট ভাই এবং দুটি ছেলের পড়ার খরচ আছে। কোলের শিশুর দুধ—সকলের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি সব কিছু ঐ সত্তর টাকায় সারতে হয়। বেতনের টাকায় প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট বানালে সারা মাস উপোষ করতে হবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে এস্টিমেট করেন ওবায়েদ মিঞা। প্যান্ট এক জোড়া না হলে হয় না, হাওয়াই শার্টও দুটো চাই। ছ' ছ' বারো গজ। তার মানে পঁয়তাল্লিশ টাকার শুধু কাপড়। তারপর সেলাই। খাজনা থেকে বাজনা বেশী। কম করেও পনরো টাকা। পনরো আর পঁয়তাল্লিশ—ষাট। বাপরে! বেতনের প্রায় অর্ধেক। উপায়।

বড় বাবু বলেছেন, সাহেবের হুকুম তামিল করলে উন্নতি হতে পারে, অর্থাৎ ইউ. ডির পোস্ট। সব মিলিয়ে দুশ' টাকার চাকরি।

একবার উন্নতি আরম্ভ হলে তার পথ রোধ করে কে। কিন্তু না, না, হেড এসিসটেন্টের চাকরিতে সে যাবে না—বাপরে. দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার বড় সাহেবের ঘরে ঘোড়দৌড়। অমন চিবিয়ে—আর অক্ষরকে র র র র র বানিয়ে ইংরেজি বলা, কার বাপের সাধ্য বুঝে। কখখনও না। তবে ইউ. ডি. পর্যন্ত হওয়া যায়—দরকারও। আল্লাহ্ মেহেরবানী করেছেন—বিবির কোলে দিয়েছেন তিনটি বাচ্চা! নাবালক ভাই আছে। এদের স্কুল, পরে কলেজ—বড় ছেলেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দিতে পারলে ভালো হয়। মস্ত বড় চাকরি ইঞ্জিনিয়ারদের। হাজার হাজার টাকা। গ্যাট গ্যাট করে চলে। গোঁ গোঁ করে কথা কয়। ইঞ্জিনিয়ার মানে সাহেব। বেতনের চাইতে উপরি অনেক বেশী।

কিন্তু প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট! ওরাই তো ঠেকাবে দেখছি। শত্রু—উন্নতির পথে কাঁটা। কিন্তু তবু ও দুটো জিনিস চাই। সমস্ত জীবন, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা—সব কিছু নির্ভর করছে ঐ প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টের উপর।

উপায় কি! হাওলাত বরাতও ইদানিং পাওয়া যায় না। যার কাছে

চাওয়া যায় সে-ই বলে, দিনকাল ভালো নয়। নিজেরই চলে না, হাওলাত দেবো কোত্থেকে।

তোরাব মিঞা, মন্নান মিঞা, মুনির মিঞা সকলের ঐ এক জওয়াব।

বিবি কুলসুমের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ওগো ঘুমিয়েছ? ডাকেন ওবায়েদ মিঞা।

কোলের শিশুকে মাই দিতে দিতে অনেক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন কুলসুম বিবি।

ওগো শুনছো। কুলসুম বিবির পিঠে ঠেলা দেন ওবায়েদ মিঞা।

ও! পাশ ফিরে শোয় মাত্র। জাগার কোন লক্ষণ নেই। আরো জোরে ধাক্কা দেন ওবায়েদ মিঞা। ওগো শুনছো, বড় জরুরী কথা, একটু জাগো না গো!

কি জ্বালা! রাতে একটু ঘুমোবো তারও উপায় নেই। আল্লাহ্‌তালা কি নসীবই দিয়েছিলেন আমার!

চুপচাপ।

ওগো একটু জাগো না। বলছি বড় জরুরী কথা আছে, প্যান্ট।

কুলসুম বিবি ততক্ষণে জেগেছেন।

প্যান্ট! আগা নেই, মাথা নেই, প্যান্ট। কিসের প্যান্ট! জওয়াব দেন কুলসুম বিবি।

কাপড়ের গো, কাপড়ের। ঐ যে সায়েবেরা পরে, সেই প্যান্ট!

হাঁ সায়েবেরা পরেইত, কারণ তারা সায়েব......কুলসুম বিবি বিরক্তির সুরে বলেন।

আহা শোনই না ছাই সব কথা। না শুনেই মারমুখো হয়ে উঠলে। খালি ঘুম আর ঘুম। আফিস-ফেরত দু'টো সুখ-দুঃখের কথা বলবো তারও জো নেই।

তোমার খালি ঘুমের খোঁটা। পাঠিয়ে দাও আমায় অন্য কোথাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক। সে মুরোদও তো নেই, ভিটেবাড়ী তো পদ্মায় খেয়েছে। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন কুলসুম বিবি।

আহা, হা! অত রাগো কেন? বলছিলাম, জরুরী কথা আছে। সায়েব বলেছেন, প্যান্ট...।

ফের প্যান্ট! কিসের প্যান্ট? তুমি পাগল হলে না কি?

আরে শোনই না সবটা, পাগল হইনি। সায়েব বলেছেন পোশাক বদলাতে, প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট ধরতে। বড় বাবু বললেন: জলদি বানাও। প্যান্ট হাওয়াই শার্ট আঁটসাট পোশাক। পরলে উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে—ইউ. ডি. বেতন দু'শ থেকে আরম্ভ...

ও তাই বলো! সত্যি মাইনে বাড়বে না কি গো? আর যে সংসার চলে না।

বাড়বে বাড়বে। নির্ঘাত বাড়বে। বড় বাবু সিরাজ মিঞা ভালো লোক। কিন্তু...

কিন্তু আবার কি? তদ্বীর লাগবে না কি গো?

না গো না, তদ্বীর ফদ্বীর কিছু নয়। প্যান্ট পরে অফিস করতে হবে।

তা বানিয়ে নাও না কেন?

বানিয়ে নাও বললেই তো আর বানিয়ে নেওয়া যায় না। যেমন তেমন কাপড় দিয়ে তৈরী করলেও একজোড়া প্যান্ট আর একজোড়া হাওয়াই শার্টের দাম পড়বে অন্ততঃ ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা। অত টাকা পাবো কোথায়?

একটি করে বানাও না কেন?

একটিতে হয় না, কুলসুম, একটিতে হয না। সাফ-সুতরা এবং ইস্তিরি চাই, নইলে প্যান্ট পরা চলে না। গরমের সময় দু'দিনে পাছায় হলদে দাগ পড়ে। পাজামার অর্ধেক ঢাকা থাকে শার্ট পাঞ্জাবীতে, কিন্তু প্যান্টের পাছা থাকে খোলা, হলদে হয়ে গেলে তা নিয়ে আর বেরোনো যায় না।

তা হলে উপায়? কুলসুম বিবি চিন্তিত।

সেই তো ভাবছি। তা হলে উপায়?

মাইনের টাকা থেকেই বানাও।

সারা মাস খাবো কি?

কারও কাছ থেকে ধারকর্জ...।

সে আর আজকাল পাওয়ার জো নেই কুলসুম। একটি পয়সাও কেউ ধার দেয় না।

তা হলে পাজামাই চালাও। আগে পরতে ধুতি! পাকিস্তান হলো। বললে, মুসলমানী আদব-কায়দা লেবাস চলবে এখন। ধরলে পাজামা।

পাজামাই চালাও, নসীবে উন্নতি থাকলে ওতেই হবে। মুসলমানের দেশে পাজামাতে প্রমোশন হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে।

তুমি কিছু বুঝ না কুলসুম, কিছু বুঝ না। দুনিয়াটা এত সোজা নয়। সায়েব-সুবারা প্যান্ট-কোট ছাড়া অন্য কোন পোশাক পছন্দই করেন না। দুনিয়ার সব জায়গায় ঐ লেবাস। লাট-বেলাটের বাড়ী খানা-পিনায় ঐ পোশাক, বিদেশে দুতাবাসে ঐ পোশাক, কোথায় নয় ও পোশাক। আচকান-পাজামা, পাজামা-পাঞ্জাবী উঠে গেছে। ওসব ঢিলাঢালা পোশাক হিন্দুস্তানে কিছু কিছু চলে। হিন্দুস্তান আবার একটা দেশ নাকি! নচ্ছার! নচ্ছার! আমাদের পোশাক চুরি করে দরবারী পোশাক করেছে। তাই না আমরা ও পোশাক ছেড়ে দিয়েছি। বলছিলাম কি, কাবুলির কাছ থেকে কর্জ নি, গোটা সত্তরেক টাকা। সুদ বড় চড়া। টাকায় মাসে দু' আনা। তাহলে ধরো আট টাকা বারো আনা।

আট টাকা বারো আনা! মানে ন' টাকা। মাইনে থেকে মাসে মাসে কাটা যাবে না কি গো?

কাটা ঠিক যাবে না। তবে কাবুলির সুদ! মাস-পয়লা তারিখে আফিসের ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে লাঠি হাতে। না দিয়ে উপায় নেই।

তাহলে মাসে ন' টাকা কম আসবে ঘরে। এমনিতে চলে না তার উপর ন' টাকা কম! কেমন করে সংসার চালাবো? না, না, ওতে কাজ নেই। তুমি বরং আমার কানপাশা জোড়া বিক্রী করে দাও।

তাও ভেবেছি কুলসুম। ওটা বেচলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা পাওযা যাবে মাত্র। ওতে হবে না। খামোখা জিনিস দু'টো হাতছাড়া হবে। আপদে বিপদে কাজে লাগবে। না, কাবুলি ছাড়া গতি নেই।

মাইনে বাড়বে তো ঠিক?

সে কি আর না বাড়ে, বড় বাবু যখন বলেছেন...।

শীগগির বাড়বে তো?

শীগগির বই কি। আলবৎ শীগগির। চাই কি কোট প্যান্ট পরার পরদিন থেকেই হতে পারে।

হ্যাঁ গা, মাইনে বাড়লে আমায একটি ঢাকাই শাড়ী কিনে দেবে?

দেবো।

আর! আর চারগাছি সোনার চুড়ি? আজকাল সব বউরা সোনার চুড়ি পরে, আমারই পোড়া কপাল!

দেবো, দেবো, তাও দেবো।

তুমি খুব ভালো—না গো?

বন্দী! বন্দী! ওবায়েদ মিঞা আজ আফিসে বন্দী। কাবুলির তিন মাসের সুদ বাকী। কোলের ছেলেটার হলো সান্নিপাতিক জ্বর। কালো-বাজারে ক্লোরোমাইসিটিন সাড়ে বত্রিশ টাকা ফাইল। বহু চেষ্টা ও তদ্বীরে সাড়ে সতরো টাকা কন্ট্রোল রেটে পাওয়া গেলো দু'ফাইল। ছেলের জ্বর তো ছাড়লো, কিন্তু কাবুলির তিন মাসের সুদ পড়লো বাকী। ডাক্তারে পথ্যে আর দৌড়াদৌড়িতে আরো অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেলো—নালার মুখ দিয়ে যেমন প্রবল বেগে বৃষ্টির পানি বেরোয় তেমনি বেগে বেরিয়ে গেলো অনেক অনেক টাকা।

কোথা থেকে কেমন করে এত টাকা এলো তা কি তিনি নিজেই জানেন। মামলার টাকা ভূতে যোগায়, এ টাকা জুগিয়েছে লোকে। কত লোকের কাছে যে হাত পেতেছেন ওবায়েদ মিঞা—দু'টাকা এক টাকা, তিন টাকা, পাঁচ টাকা করে অজস্র কর্জ করেছেন। কর্জ করার ভারী চমৎকার ফন্দি শিখেছেন ওবায়েদ মিঞা। ঠেকলেই মানুষ শিখে। এক সঙ্গে দশ বিশ টাকা হাওলাত চাইলে কেউ দেয় না। কিন্তু দু' টাকা এক টাকা চাইলে ফিরায় না: ফিরতের জন্য কড়া তাগিদও শুনতে হয় না।

কিন্তু কাবুলির তিন মাসের সুদ ছাব্বিশ টাকা চার আনা—একটি পয়সা পর্যন্ত দিতে হবে। তার উপর আবার খুচরো হাওলাত শোধ। তা হলে আজ পয়লা তারিখে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। সারা মাসের রেশন। ছেলেদের স্কুলের মাইনে। আর—আর হাঁ, প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টের ইস্তিরি খরচ মাসে অন্ততঃ দু' আড়াই টাকা। বাঙলা সাবান এক সের দু' টাকা, নীল চার আনা। শালার প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট ধু'তে ইস্তিরি করাতেই চলে যায় মাসে চার পাঁচ টাকা। ফ্যাসাদ, মহা ফ্যাসাদ, প্রায় এক বছর হয়ে গেছে স্যুট ধরেছেন ওবায়েদ মিঞা, কিন্তু কৈ প্রমোশন

তো হলো না। বড় বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কতবার। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। রোজ রাত আটটা পর্যন্ত ফাইলের কাজ করেন তিনি—কিছু না, কিছু না, সেই আগের একশত পঁয়ষট্টি টাকা পাঁচ আনার সঙ্গে একটা ইনক্রিমেন্ট যোগ হয়েছে মাত্র।

উঃ! আফিসের নতুন ছেলেছোকরার দল কি পাঁজি! যে দিন তিনি প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট ধরলেন—সে কি আলোড়ন। যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলো। সব এসে শামিল হলো তার চেয়ারের চারদিকে—তিনি যেন নতুন বধূ আর কি!

কি কুক্ষণে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট তৈরির ইতিহাস বলেছিলেন ওবায়েদ মিঞা এই অপোগণ্ড বদমাশদের কাছে।

মীর আবুল কাসেম—নতুন ডেচপাচ ক্লার্কটা বলে কি না: ওবায়েদ দাদা, কৈ, আমাদের খাওয়াটা কৈ ?

কিসের খাওয়া ভাই ?

কেন, আপনার যে ইউ. ডিতে প্রমোশন হলো

কবে ? কখন ?

ও আপনি জানেন না বুঝি! বড় বাবু বলেননি? এ তার ভারী অন্যায়। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে গ্যাট গ্যাট করে চলতে দেখেছেন আপনাকে বড় সাহেব। এবং দেখামাত্র অর্ডার দিয়েছেন! পাবেন, পাবেন, আজই অর্ডার পাবেন।

ছোকরা এমন করে বলে, বিশ্বাস না করে পারা যায় না। যান তিনি বড় বাবুর কাছে।

বড় বাবু! ও বড় বাবু!

কে ও? ওবায়েদ মিঞা নাকি? ফাইল থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন বড় বাবু।

কি খবর, কি চাই ?

আমাকে না কি ইউ. ডিতে প্রমোশন দিয়েছেন আজ বড় সাহেব ?

কৈ, না তো।

আফিসে তখন থমথমে শান্ত ভাব। প্রবল বারিবর্ষণের পূর্বক্ষণের আকাশের মতো ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষা করছে।

কিন্তু! কিন্তু! ঐ মীর আবুল কাসেমটা যে বললো।

ফেটে পড়ে অফিস। হোঃ হোঃ। হিঃ হিঃ! উঃ! সে কি বিকট গগনভেদী হাসি! লোকগুলো আস্ত গাঁড়ল। লোকের কি আর প্রমোশন হয় না? ওবায়েদ মিঞা একাই প্যান্ট পরেন নাকি? ঐ কাসেম ছোঁড়াটাই যত নষ্টের মূল। পশ্চিম বাংলায় বাড়ী কি না। রসিক বটে, হাসাতে পারে লোককে।

টং টং টং·। ঐ, ন'টা বাজলো। ফাস্ট গেট, সেকেণ্ড গেট দু' গেটেই কাবুলি দাঁড়িয়ে ছিল। বহু আগে একটা গেট বন্ধ হয়ে গেছে—এখন দু' শালাই এক গেটে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে। একটু আগেও সুরুজ মিয়া খোঁজ নিয়ে এসেছে। যেমনকে তেমন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, চিবুকে লাঠি ঠেকিয়ে ঝিমুচ্ছে, কিন্তু আসলে তা নয়। শৃগালের মত ধূর্ত ওরা—শিকার ধরবার আগে মিটি মিটি করে বোকার মতো তাকায়—যেন কিছু জানে না। দাঁড়িয়ে আছে শের খাঁ স্বয়ং। বাপরে, বাপ! শের খাঁর সে কি চেহারা। বাঘ, আস্ত বাঘ সে। একটা কব্জি দু'হাতের মুঠোয় আঁটে না।

উপায়! আর তো আফিসে থাকা যায় না। সুয্যি খেতে গেছে, এক্ষুণি আফিসে তালা মারতে ফিরবে।

ধরা দেওয়া! না, না, তা হয় না। আজ ধরতে পারলে আর রক্ষা নেই। রাত্রির আবছা আলোকে এক লাঠিতে মাথা ফাটিয়ে দিলেই তাকে রক্ষা করে কে?

না, না, সে হবার জো নেই। গেট দিয়ে বেরোবার কোন উপায় নেই। "হালার পুতেরা" সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে গেট আগলে।

ওবায়েদ সাহেব! এবার না উঠলেতো নয়।

রাখ্ বাবা! একটু রাখ্। এই নে দুটো পয়সা। একটা পান খেয়ে আয়, আর চট করে দেখে আয়ত বাবা, এখনও 'হালার পুতেরা' দাঁড়িয়ে আছে কি না!

সুরুজ মিয়া পান খাওয়ার যম। পয়সা দুটো নিয়ে তরতর করে দোতলা

থেকে নেবে যায়। ফিরে এসে খবর দেয়: তাদের যাওয়ার নাম গন্ধও নেই, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে গেটের বাইরে।

বাবা সুরুজ মিয়া! তাহলে উপায়! আমিত বাপ, ওদের সমুখ দিয়ে যেতে পারবো না—গেলে রক্ষা নেই। পাঁচিলও বড্ড উঁচু—বুড়ো বয়সে টপকে পার হতে পারবো না, হাত-পা ভেঙ্গে মরবো।

সুরুজ মিঞার দিল নরম। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হলেও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর দুঃখে দুঃখী। মাথা চুলকাতে থাকে সে।

চট করে মাথায় কি বুদ্ধি খেলে যায় সেই জানে। একটু বসুন, উপায় বোধ করিবা একটা হবে, বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়।

দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে সুরুজ মিয়া। হাতে কালো রঙের একটা কাপড় মতো কি। ওবায়েদ মিয়াকে দিয়ে বলে: দেখুন তো, ফিট করে কি না?

এ যে বাবা বোরকা। বোরকা দিয়ে কি হবে?

তাও বুঝলেন না? আপনি একেবারে শিশু। ওটা আমার পরিবারের। দারোয়ানের কোয়ার্টারে পরিবার নিয়েই থাকি। আপনি ওটা পরুন, তারপর চলুন আমার সঙ্গে।

এত বিপদেও মুচকি হাসি খেলে যায় ওবায়েদ মিঞার মুখে। মন্দের ভালো। আল্লাহ্‌তালা কখন কাকে কেমন করে বাঁচান তিনি জানেন।

বোরকা পরেন ওবায়েদ মিঞা। উঁচু ঘরের ইংরেজী মেয়েদের গাউনের মতো পায়ের পাতা পর্যন্ত সাইজের বোরকা। ওবায়েদ মিঞার হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। কিন্তু জুতা? প্যাণ্ট?

জুতা খুলুন, প্যাণ্ট গুটিয়ে নিন—বলে সুরুজ মিয়া। এইত চমৎকার সব ঢেকে গেছে, বাইরে শুধু দুটো পা। চলুন এবার আমার সঙ্গে।

জীবনের একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে যায়। একটা মাত্র দিন। কিন্তু দিনের মূল্য কম নয়। আজকের মতো বাঁচলে কাল কি হবে তা কালই জানে। মুহূর্তে মুহূর্তে জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন পরিবেশ, নতুন চেতনা।

তৈরির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্যাণ্ট জোড়াকে ওবায়েদ মিঞা ধোপার হাত দেখাননি। তিনদিন পর পর আফিস থেকে ফিরে রাত্রে

ঢাকাই সাবান দিয়ে নিজ হাতে ওবায়েদ মিঞা প্যান্ট কাচেন, নীল এবং ভাতের মাড় দেন। পরে ইস্তিরির জন্য ধোপার দোকানে দিয়ে আসেন।

কিন্তু এত করেও প্যান্ট জোড়া টেকানো যায় না। হাওয়াই শার্ট তো কবেই হাওয়া হয়ে গেছে। তার জায়গায় আজকাল টেনিস শার্ট পরেন তিনি।

এক বছর দু'বছর, তিন বছর...কত বছর যায়, কিন্তু ওবায়েদ মিঞার ইউ. ডিতে প্রমোশন আজ হয় কাল হয় করেও হয় না। আঙ্গুর ফলের মতো শৃগালের নাগালের বাইরে উপরে ঝুলতে থাকে। এদিকে প্যান্ট জায়গায় জায়গায় ক্ষয় পেতে থাকে। আপনা আপনি স্থানে স্থানে মাকড়সার জালের মতো অস্বাভাবিক হালকা হয়ে যায়। তারপর ছিঁড়ে যায়। সে কি যেমন তেমন ছেঁড়া—টিকের আগুনে পোড়ার মতো গোল হয়ে হয়ে ছেঁড়া। না করা যায় সেলাই, না চলে তালি। প্যান্ট তালি দেওয়াই চলে না, জানেন ওবায়েদ মিঞা। তবু খুব ক্লিন রিফু করেছেন তিনি অনেক জায়গায়।

এদিকে বড় বাবু সিরাজ মিঞা রিটায়ার করে চলে গেছেন—তাঁর জায়গায় নতুন বড় বাবু হয়েছেন শরিফ সাহেব—আহমদ শরিফ।

সিরাজ মিঞা চলে যাবার দিন দুঃসাহসে ভর করে বলেই ফেলেছিলেন ওবায়েদ মিঞা—স্যার প্যান্টতো ছিঁড়ে গেলো, আর বানাতে পারবো না, আমার প্রমোশনটা......

সিরাজ মিঞা বলেছিলেন : নিশ্চয়। নিশ্চয়। কি, জানেন, খালিই হলো না কোন পোস্ট আমার আমলে, কি করবো বলুন! তবে আপনার কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট খুব ভালো লিখেছি। নতুন বড় বাবু দেখবেন। নিশ্চয় আপনার প্রমোশন হবে। শরিফ সাহেব! বেচারার দিকে একটু নজর রাখবেন, খুব ভলো কাজ করেন ওবায়েদ মিঞা। প্রমোশন যেন হয়। ওঁর প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে।

শরীফ সাহেব আশ্চর্যান্বিত। প্যান্ট! অর্থাৎ?

আমারই অপরাধ, শরীফ সাহেব, আমারই অপরাধ। ওবায়েদ মিঞা আগে আসতেন ময়লা পাজামা পরে। বড় সাহেবের দৃষ্টি পড়লো। বললেন : পোশাক বদলান। আমি বললাম, প্যান্ট ধরুন, প্রমোশন হবে। সেই থেকে ওবায়েদ মিঞা প্যান্ট ধরেছেন। একদিনও বেগায়ের প্যান্ট হননি।

ওদিকে আফিসে হাসির হট্টরোল। উঃ! কেন যে এত হাসে ঐ লোকগুলো।

মুশকিল বাঁধিয়েছে "হালার পুতের" প্যান্ট। না কেচেও উপায় নেই, ফরসা রাখতেই হয়; কাচলেও নতুন করে ছেঁড়ে। এদিকে বছর আরো একটা চলে গেলো। পুরো পাঁচ বছর হলো প্যান্টের ওমর—একটি ছেলের স্কুলে যাবার বয়স।

ইতিমধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে তার দুনিয়ার উপর দিয়ে। স্ত্রী কুলসুম আরো একটি নতুন মানুষ আমদানী করেছেন দুনিয়াতে। খোকা। বেশ নরম গোলগাল চেহারা—মিটি মিটি করে তাকায় আর হাসে।

রবিবার দিনটা কাটে ভালো। কাপড় কাচার কাজটা দিনের বেলায়ই সারা যায়। কিন্তু নতুন বড়বাবু আসার পর মাঝে মাঝে রবিবারেও আফিস করতে হয়। শরিফ সাহেব বলেন: খাটুন, ভালো করে খাটুন, প্রমোশন আপনাকে দেবোই।

সেদিনও রবিবারে আফিস যেতে হলো ওবায়েদ মিঞাকে। তবে বড় বাবুকে বলে সকাল সকালই ফিরলেন। প্যান্ট কাচতে হবে। ইস্তিরির জন্যে দিতে হবে। অনেক কাজ।

কত ফিকির ফন্দি করে কত যত্নের সঙ্গে কাচতে হয় প্যান্ট। শিশুর গা মাজার মতো তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে—ব্যথাও না পায়, গাও সাফ হয়। আছড়ানো কবেই ছেড়ে দিয়েছেন। সাবানের ফেনার মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হয় আজকাল। পরে সামান্য নাড়াচাড়া দিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নীল ও ভাতের মাড় দেন। পানি নিঃসারণের কাজটাই আজকাল বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। নিঙড়ানো যায়ই না—ভালো করে নিঙড়াতে গেলেই কোন না কোন জায়গায় নতুন করে ফেটে যায়। হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপলে যতটা পানি পড়ে, বাকি পানি দড়িতে ঝুলন্ত প্যান্ট থেকে টুপটুপ করে পড়ে। অবসর সময়ে সেই পানির তামাশা দেখেন ওবায়েদ মিঞা—প্রথমে বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঘন লাইন ধরে পড়তে থাকে, তারপর কাতরা কাতরা।

শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল ওবায়েদ মিঞার। কাপড় কাচা ভালো লাগে না। আজ কুলসুমই কাজটা করে দিক না। তার অনেক কাজ—তা হোক, আজ একটু স্বামী-সেবাও করুক।

ও সফিকের মা। সফিকের মা!

কি গো, কেন ডাকছো? রান্নাঘর থেকে উত্তর দেন কুলসুম বিবি।

শরীরটা ভালো নেই আজ। আমার প্যাণ্ট দু'টো কেচে দিও। কেমন যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমিয়ে নি।

চারটা বাজে, ঘুমোবে তুমি?

তা হোক, একটু ঘুমিয়ে নি। এই দেখো সাবান, নীল। সাবধানে কেচো, ছেঁড়ে না যেন। পারবে তো?

পারবো। কোমল কণ্ঠে উত্তর দেন কুলসুম বিবি।

ওবায়েদ মিঞা আজ ক্লান্ত...মনে হয় বহুদিন ধরেই ক্লান্ত। কোলের ছেলেটাকে কাছে নিয়ে কাত হতেই তার ঘুম আসে।

উঃ! কি ময়লা হয়েছে প্যাণ্ট জোড়া। পুরুষ মানুষের নাকি কাম কাপড় কাচা! সাবানগুলো বেহুদা খরচ হয়। পানির সঙ্গে ভাসিয়ে দেয় সাবানের সাদা ফেনাগুলো। যে সাবান ক্ষয় হয় প্যাণ্ট কাচতে—তাতে দশটা কাপড় কাচা যায়। ময়লা সাফ করতে হলে সাবান সোডা মিশিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হয় কাপড়-জামা। আপন মনে এ সব কথা ভাবতে ভাবতে সাবান মাখিয়ে সঙ্গে কিছু সোডা দিয়ে এলুমিনিয়ামের হাড়িতে প্যাণ্ট জোড়া সিদ্ধ করতে থাকেন কুলসুম বিবি। সঙ্গে বাচ্চাদের কাপড়ও দু'চারটা দিয়ে দেন—এক খরচে কাজ চলে যায়। তারপর বড় পিঁড়ির উপর ধোপার ঢঙে সব কাপড় এক সঙ্গে আছড়াতে থাকেন কুলসুম বিবি—হিচ্ছ্। হু! হিচ্ছ্! হু।

সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করেন ওবায়েদ মিঞা। দড়ি থেকে টেনে নিয়ে প্যাণ্ট জোড়া বগলদাবা করে ছুটেন ধোপার বাড়ি। ইস্তিরি চাই, নইলে প্যাণ্ট পরা যায় না।

রমনি। ও রমনি! রমনি। আমার প্যাণ্ট জোড়া আগে ইস্তিরি করে দাও তো বাপ। বড্ড তাড়া। দেখ সাতটা বাজে। গোসল আছে, খাওয়া আছে। সাড়ে আটটার মধ্যে হাঁটা না দিলে সময় মতো পৌঁছা যায় না।

আপনার সব কাজই জরুরী। দিন—রমনি ধোপা হেসে বলে।

ওবায়েদ মিঞা ইস্তিরির টেবিলের পাশে রক্ষিত টিনের ভাঙা চেয়ারটায় বসে অপেক্ষা করতে থাকেন।

কাপড়ে পানি ছিটিয়ে নিয়ে ইস্তিরিতে আগুন ভরে ধোপা। জ্বলন্ত অঙ্গারের আগুন ধক্ ধক্ জ্বলছে। ওবায়েদ মিঞা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

প্রমোশন। ইউ. ডি. এসিসটেন্ট। বেতন দু'শ থেকে সাড়ে তিনশ'—বাসা বদল—খাঁটি দালানে বসবাস—স্ত্রীর জন্য চারগাছা সোনার চুড়ি—দেনা শোধ—পুত্রদের পড়াশুনার খরচ—কত কি কল্পনার জাল বুনেন তিনি।

একটা বিড়ির আধখানা ছিল পকেটে। সেটা ধরিয়ে সুখটান দেন ওবায়েদ মিঞা। একটানেই বিড়ির দফারফা। নীল ধোঁয়া নাকে মুখে। কি আরাম! চোখ বোজেন তিনি।

কি? কি বললে? চমকে জিজ্ঞাসা করেন ওবায়েদ মিঞা।

আর ইস্তিরি হবে না, নিন আপনার প্যান্ট।

কেন? কেন? ওবায়েদ মিঞার চোখে মুখে আতঙ্ক।

ও প্যান্ট গেছে, এই দেখুন না। রমনি ধোপা উত্তর দেয়।

একি স্বপ্ন! না সত্যি। কি দেখছেন ওবায়েদ মিঞা! প্যান্ট। কোথায় প্যান্ট? এ যে দুটো ন্যাকড়া মাত্র। পুঁজরা পুঁজরা হয়ে খুলে গেছে আঁশগুলো।

কালও ছিল আস্ত দুটো প্যান্ট—তাজা নাদুস নুদুস এক জোড়া ভেড়ার মতো। হাঁ, ভেড়ার মতো কত যত্নআত্তি করে কত খাইয়ে দাইয়ে ঐ প্যান্ট জোড়াকে 'মানুষ' করেছেন ওবায়েদ মিঞা। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের নিত্য সহচর—সহোদর ভাইতো দূরের কথা ঔরসজাত পুত্রেরও এত যত্ন নেয় না কেউ। কে নিত্য সঙ্গে সঙ্গে রাখে পুত্রকে! তার হাত-পা আছে, দূরে চলে যায়, অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেশে। কিন্তু প্যান্ট! সে যে নিত্য সহচর, নিত্য লেগে রয়েছে গায়ে—পোষা কুকুরের মতো প্রভুর সঙ্গ ছাড়েনি কখনও—বিপদে আপদে সর্বদা তার সহচর।

প্যান্ট দুটো তার চোখের সমুখে নৃত্য করছে! এ্যা! প্যান্ট তো নয়, দুটো পেত্নী। তাণ্ডব নৃত্য করছে। আজানু চুল ছেড়ে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছে, আর বিকট অট্টহাসি হাসছে: কৃষকায় ওরা—কার যমজ মেয়ে গো? থ্যাবড়ানো মুখ। দাঁত বের করে বিকট হাসি হাসছে? ভেংচাচ্ছে নাকি ওবায়েদ মিঞাকে? না, না, তা হতেই পারে না। তার নিত্য সহচর তাকে ভেংচাবে কেন? এত বড় সাহস! দুটো থাপ্পড় দিলে সব

ঠিক হয়ে যাবে। মারের চোটে ভূত পালায়। তবু, তবু থামছে না তো। ঐ তো অট্টহাসি হাসছে ডাইনী ছুটো।

হোঃ। হোঃ। হোঃ।

হোঃ। হোঃ। হোঃ। হিঃ। হিঃ। হিঃ। হোঃ। হোঃ। হোঃ।

আরে কি হলো ওবায়েদ সাহেব? ওকি, অমন করছেন কেন?

হোঃ। হোঃ। হিঃ। হিঃ। ডাইনী ছুটো পেয়েছে কি? হোঃ। হোঃ। হিঃ। হিঃ। তোরা নাচছিস, খুব হাসছিস—দেখাচ্ছি মজা। আমিও পারি—উলঙ্গ হয়েও পারি। হোঃ। হোঃ। হিঃ। হিঃ।

ওবায়েদ মিঞা উলঙ্গ উন্মাদ। নৃত্য করছেন তিনি। রমনি ধোপা তাকে ধরে নিয়ে আসে বাসাবাড়িতে।

ঢাকায় দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে সেদিনই প্রথম অফিস কামাই করেন ওবায়েদ মিঞা।

গাড়ীওয়ালা

আশরাফ-উজ্-জামান

—শালা লোক, কেরায়াঠো লেনে নেই দিস্।—রুদ্ধ আক্রোশে শপাং শপাং বেত পড়ে হাড়-বের-করা ঘোড়া দুটির উপর।

ভাড়া নিয়ে দরদাম হচ্ছিল, কোথা থেকে এক সাইকেল রিকশাওয়ালা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তার গ্রাহককে। রিকশাওয়ালাদের উপর আক্রোশ দিন দিন যেন তার বেড়েই যাচ্ছে।

কাল্লু মিঞা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। শুকনো জীর্ণ চেহারা, থুঁতির উপর যেন লটকে আছে একগুচ্ছ কাঁচাপাকা দাড়ি। ততোধিক শীর্ণ ঘোড়া দুটি। আরও ময়লা রং-চটা গাড়ী। দরজা-জানালাগুলিকে যেন কোন রকমেই আর জোড়াতালি দিয়ে রাখা যায় না। সকাল থেকে এক ক্ষেপে মাত্র আট আনা পয়সা আয় হয়েছে। ঘোড়া দুটিকে কোন রকমে খাওয়াতেও রোজ আট দশ আনা পয়সা লাগে। বাড়ীতে সংসারও নেহাৎ কম বড় নয়—দুই বিবি, ছোট ছেলে-মেয়ে তিন চারটি। বড় দুই ছেলের আয় তার হাতে আসে না। নিজেদের সংসার নিয়েই তারা ব্যস্ত। বড় মেয়েটি মাঝে মাঝে আসে বাপের বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে নিয়ে, তখন টানা-টানি আরও বেড়ে যায়। দিন দিন কাল্লু মিঞা হয়ে যাচ্ছে আরও শীর্ণ, রুক্ষ, বদমেজাজী।

কিন্তু দিনকাল চিরদিনই এই রকম ছিল না। এই গাড়ী চালিয়েই তার আয় হয়েছে প্রচুর। ইয়া তাজী তাজী ছিলো তার ঘোড়া, ফাস্টো-কেলাস ঘোড়ী। তকতকে ঝকঝকে পেতলের সাজ, ঘোড়া দুটির মাথার উপর রংদার গোল গোল বলের মত সাঁজোয়া ফুল। আয়ও হতো গড়ে প্রায় তিন চার টাকা। প্রচুর তখনকার দিনে। গোশত দশ পয়সা সের, চালের মণ তিন টাকা। তরিতরকারী মাছ অঢেল। ঘোড়ার ছোলার মণ আড়াই টাকা। প্রচুর খেয়ে খাইয়েও হাতে টাকা বেঁচে যেত। বিবিদের জন্য

আসতো বেলোয়ারী চুড়ী, ছেলে-মেয়েদের নতুন কাপড়, ঘোড়ার নতুন বাহারী সাঁজ।

তখন সবে মাত্র ঢাকা শহরে দু'একটি করে রিকশা আসতে আরম্ভ করেছে, যারা চড়ছে, নেহাৎ লজ্জার সঙ্গে কম পয়সা দিতে হয় বলে। স্টেশন থেকে সদরঘাট পর্যন্ত ভাড়া দু'আনা। এই সেদিন পর্যন্তও কাল্লু মিঞা কেউ ভাড়া কম দিতে চাইলে বলেছে—রিকশাতে যাইয়া চড়েন গা মিঞা, এই পয়সাতে ঘোড়ার গাড়ী চড়ন যায় না।

ঠিক এই সময়েই বুঝি আরম্ভ হলো যুদ্ধ। কোন সাত সমুদ্দুরের পারের যুদ্ধের ঢেউ এসে লাগলো ঢাকা শহরে। চালের দাম বেড়ে গেল। গোশতের দাম, ঘোড়ার দানার দাম বেড়ে হলো ডবল।

আয়ও কিছু বেড়ে গেল বৈকি! কিন্তু ব্যয় আরও তিনগুণ। বৎসরান্তে গাড়ীতে রং দেওয়া হলো না। বাইরের জিনিসের চালান বন্ধ। ঘোড়ার সাজেরও আমদানী নেই, মুচি ডেকে সেলাই ও জোড়া দিতে হলো। শহরে রিকশাও বেড়ে গেল অনেক। ভদ্রলোকেরা প্রকাশ্যভাবে চড়তে আরম্ভ করলে রিকশাতে।

তখনো ঘোড়ার গাড়ীতে গাড়োয়ানরা অভিজাত শ্রেণীর। কিন্তু কাল্লু মিঞার যেন কোন রকমেই আর পোষায় না। বিবিদের বেলোয়ারী চুড়ি যোগানও বন্ধ হয়ে গেল। ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় আসে না। গাড়ী চলার চাইতে বসে থাকে বেশীক্ষণ। স্টেশনে কারু সঙ্গে হয়ত দরদাম হয় একটাকা, রিকশাওয়ালারা মাঝখান থেকে এসে আট আনায় নিয়ে যায় সেই সওয়ারীকে।

কোথাও কোন রকমের আর বরকত হয় না। গাড়ীর হালত আরও খারাপ। রং নাই, দরজা-জানালার কব্জাগুলি ঢিলা হয়ে গেছে, ঘোড়াগুলির হালত আরও খারাপ, চাকচিক্য নেই, কাহিল। ট্যাক্স দিতে যেয়ে গাড়ী প্রথম শ্রেণীতে পাস হলো না, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে এলো, কাল্লু মিঞাও নেমে এলো গাড়োয়ানদের অভিজাত শ্রেণী থেকে।

পরের বছর তৃতীয় শ্রেণী। ছ্যাকরা গাড়ী। ঘোড়া দুটির পাঁজরের সব কটি হাড় গোনা যায়। ছোলার যা দাম হয়েছে, কেনা অসম্ভব। শুধু ঘাস খাইয়ে ঘোড়াকে আর কাঁহাতক টেকান যায়। গাড়ী আর টানতে

পারে না। কাল্লু মিঞার হাতের বেত শপাং করে আছড়ে পড়ে সেই হাড় আর চামড়ার উপর—শালা লোক সব খালিস তবভি চলনে নেই স্থকে।

যুদ্ধ থেমে গেল, আরও নূতন নূতন এলো রিকশা। জিনিসের দাম না কমে আরও যেন বেড়েই চললো। জিল্লুর গাড়ীর ঘোড়া গেল মরে। গাড়ী বন্ধ রেখে সে মেওয়া বেচতে শুরু করলে। ছাক্কুর গাড়ী মোটরের সংগে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে গেল, আর মেরামত হলো না। সাত্তার গাড়ী রেখে রিকশা কিনে বসলো। ছ্যাকরা গাড়ীর সংখ্যা দেখতে দেখতে এলো কমে।

কাল্লু মিঞার একটু ভালো সময়ও এলো বৈকি! আয় হঠাৎ বেড়ে গেল। ঢাকা পাকিস্তান হয়ে গেল। দলে দলে আসতে আরম্ভ করল হিন্দুস্তান থেকে। মাইলখানেক দূরে সওয়ারী নিয়ে যেতে কাল্লু মিঞা হাঁকে চার টাকা, পাঁচ টাকা। নতুন লোকেরা তাইতেই রাজী হয়ে যায়, মাল-পত্র নিয়ে রিকশার চাইতে ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধা বেশী।

কিন্তু এ আয়ের মেয়াদও অল্পদিনের। লোকজন আসার যে বন্যা, তা বন্ধ হয়ে গেল। নতুন আমদানীর টাকা শেষ হয়ে গেল ঘরে নতুন টিন লাগাতে, আস্তাবলের চারিদিকে বাঁশের বেড়াগুলি নতুন করে দিতে। ঢাকা শহরও যেন হঠাৎ বে-আব্রু হয়ে গেল। মেয়েরাও রিকশাতে চড়তে শুরু করলে। প্রথমে বাইরের মেয়েরা তারপর ঢাকারও। ঘোড়ার গাড়ী হলো ইতর, রিকশা অভিজাত, নতুন নতুন রিকশাতে ছেয়ে গেল সমস্ত শহর।

কাল্লু মিঞা চোখে মুখে আর যেন কিছু দেখতে পায় না। এই রিকশা-ওয়ালারাই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রতিবন্ধক, তার শত্রু। পলকে পলকে তার মুখের গ্রাস নিচ্ছে কেড়ে। ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে উদ্ধত বাজের মত। দিন দু'টাকাও আর আয় হয় না। নিজেরা ঠিক মত খেতে পায় না। ঘোড়াকেও খাওয়াতে পারে না দানাপানি। গাড়ীর দরজা ভাঙ্গা, খড়খড়ি একবার উঠালে আর নামানো যায় না। গত কয়েক দিন ধরে ছোট ছেলে আর মেয়েটার জ্বর। তাদের ঔষধ-পথ্যও আর না করলে চলে না।

সকাল সকালই ক্ষেপটা গেল হাতছাড়া হয়ে। ভালোই বোধ হয় কিছু দাও মারা যেত আজ। বিস্তর পোটলা পুটলি নিয়ে এক মাড়োয়ারী। দরদাম হচ্ছে দু'টাকায় পৌঁছে দেবে কেরানীগঞ্জের আড়ত পর্যন্ত। মাঝখান থেকে এক রিকশাওয়ালা এসে রাজী হয়ে গেল এক টাকায়। এদিকে,

ওদিকে, পাশে সেই বিরাট মালের বোঝা নিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন রিকশাতেই। কাল্লু গাড়ী চালালো সামনের দিকে গাল দিতে দিতে।

স্টেশনে এখন আর কোন গাড়ীর সময় নেই। মাঝপথ থেকে ঘোড়ার গাড়ীতেও আজকাল কেউ উঠতে চায় না। নওয়াবপুর পথটা চকমকে। রিকশা, বাস, মোটরে ভর্তি। তাড় ভাঙ্গা, হাড়গোড় বেরকরা গাড়ীটা যেন বেসিজ্রিল, বেঢপ।

ভিক্টোরিয়া পার্কে বাস স্ট্যাণ্ডে কিছু সওয়ারী পাওয়া যেতে পারে, সেদিকেই গাড়ী ছোটায় কাল্লু মিঞা। মুখে তখনো সে বিড় বিড় করে গাল দিচ্ছে রিকশাওয়ালাকে—যো শালানে মেরা রোজী খারাপ কিয়া উসকা রোজী ভী আল্লাহ্ উঠায়গা। হঠাৎ পথের মাঝখানেই রাশ টেনে ধরে কাল্লু মিঞা। একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তাকেই বুঝি হাতছানি দেয় একটি লোক। সঙ্গে মালপত্রও যেন রয়েছে। দু'জন রিকশাওয়ালাও যেন দেখতে পেয়েছে সেই হাতছানি, তারাও ছোটে সেই দিকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নেয় কাল্লু মিঞা। রশি ঢিলা দিয়ে চাবুক মারে ঘোড়ার পিঠের উপর। তাকে সকলের আগে সেখানে পৌঁছতেই হবে, আবার চাবুক পড়ে—শপাং।

ভড়কে গিয়েই বোধ হয় ঘোড়া চলে আসে রাস্তার বাঁ দিক থেকে ডাইনে। হাতের রশিও কাল্লু মিঞার সম্পূর্ণ আলগা, তার দৃষ্টি শুধু দোকানের সেই লোকটির দিকে।

হঠাৎ রাস্তার লোক চীৎকার করে উঠে—রোখ রোখ। ঘোড়ার রশি প্রাণপণে টেনেও বুঝি গাড়ী আর রোখা যায় না। রাস্তার চলমান লরীর উপর হুমড়ী খেয়ে পড়ে গাড়ী, কাল্লু মিঞা ছিটকে যেয়ে পড়ে রাস্তায়। লরী থামতে থামতে পিষে, দলে ছেঁচ্‌ড়ে নিয়ে যায় কাল্লু মিঞাকে। হৈ হৈ করে এগিয়ে আসে চারিদিকের জনতা—গোলমাল, চীৎকার, পুলিশ, এ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু তার আগেই শেষ হয়ে গেছে কাল্লু মিঞা।

কাল্লু মিঞার শেষ যাত্রা ঘোড়ার উপরেই—আজিমপুরার দিকে। কিন্তু নিজের গাড়ী নয়, পিন্টু সর্দারের ভাড়াটে গাড়ী তিন টাকা আট আনা ভাড়া হয়েছে।

গাড়ীওয়ালাদের মাঝে মাঝে ভাল রোজগারও হয় বৈকি!

কুণ্ডল

মবিন উদ-দীন আহমদ

এক কথা, দুই কথার পরই শুরু হয়ে গেলো ঝগড়া। সামান্য একটু-আধটু কথা কাটাকাটিও নয়—সঙিন ব্যাপার।

প্রথমে কথা কাটাকাটি—

তারপর রাগারাগি, চেঁচামেচি—

তারপরই তুলকালাম কাণ্ড।

স্ত্রী মুসতারীর গায়ে জোর কম, কিন্তু মুখের জোরে সে দিগ্বিজয় করতে পারে। স্বামী মনজুর মুখে তেমন তুখোড় না হলে কি হবে—এক চড়ে একটা রোগা দুর্বলা বউকে কাত করে ফেলবার মত গায়ের জোর তার আছে।

হলোও তাই।

মুসতারী যখন বল্লে, হাই তুলতে যার চোয়ালে খিল ধরে, তার আবার বন্দুক ঘাড়ে নেবার সখ কেন? আমার কথা তো আমি ছেড়ে ছুড়েই বসে আছি। এ জীবনে সাধ-আহ্লাদ আমার যে মিটবে না—জানি। কিন্তু দশটা নয়. পাঁচটা নয়, একটা মাত্র মেয়ে—একজোড়া দুলের জন্য এক বছর থেকে কাঁদছে। ক'টা টাকাই বা দাম। তাও কিনে দেবার মুরোদ নেই! আরে আমার মরদ!

মারাত্মক কথা! এরপর আর কোন পুরুষের মেজাজ ঠিক থাকা সম্ভব নয়।

মনজুর ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে মুসতারীর গালে। "ও মাগো" বলে চোখ বন্ধ করে বসে পড়লো বউটা। ভূপতিত স্ত্রীর পাছায় আর একটা রাম লাথি কসিয়ে দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলো মনজুর।

মেয়ে কানে গয়না পরবে বলে সেই কবে দিলারার কান বিঁধিয়েছে মুসতারী। কিন্তু ফুটো কানে গয়না আর উঠলো না। পাছে গয়না পাওয়ার

লজ্জায় ফুটো দুটি ধীরে ধীরে বুজে যায়, সেই ভয়ে সরু সরু দুটি বাঁশের কাঠি মূসতারী পরিয়ে রেখেছে মেয়ের কানে।

গয়নার কথা মনে এলেই বায়না ধরে দিলারা।

আমাকে একজোড়া দুল কিনে দাও না মা...। রাস্তা দিয়ে কত সব মেয়েরা যায়—কেমন সুন্দর সুন্দর দুল ওদের কানে। অমন একজোড়া দুল দাও না মা আমাকে পরিয়ে। বল না মা —দেবে?

বড় বড় চোখ দুটি মেলে দিলারা তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। তার দুই চোখে রাজ্যের মিনতি।

মায়ের চোখও ছলছল করে ওঠে। একমাত্র মেয়ে, তাকে ভালোমন্দ খাওয়ান পরানর সাধ-আহ্লাদ কোন মায়ের না থাকে। কিন্তু সাধ থাকলে কি হবে! সামর্থ্য কোথায়!

বাচ্চা মেয়ে, ওকে কে বুঝাবে যে, যাদের সংসার চালানই দায়, তাদের মেয়ের কানে সোনার দুল ঝুলান কত মুস্কিল। কিন্তু তবু মা স্তোক দেয় মেয়েকে।

: দেবোরে ' গড়িয়ে—দেবো। দুটো দিন সবুর কর। বড্ড টানাটানি যাচ্ছে এখন। হাতে টাকা এলেই দেবো।

: কবে দেবে? দুদিন দুদিন করে কত দিনই তো গেলো! না, আমি আর সবুর করবো না—দাও তুমি।

ছলছল চোখে মূসতারী হাসে।

: পাগল মেয়ে! এখন কোথায় পাব আমি! আয়, কাছে আয় আমার।

দিলারা সরে আসে মায়ের কাছে। মূসতারী মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে।

: লক্ষ্মী, সোনা মা আমার! সামান্য দুটো দুলের জন্য অমন করলে লোকে বলবে কি!

কেঁদে ফেলে দিলারা।

: দেবে না যদি, তবে কেন আমার কান দুটো অমন ফুটো করে রেখেছো? কেন কানে আমার ব্যথা দিয়েছিলে?

গয়না পরার খুশীতে কান বিঁধান প্রস্তাবে একবারও আপত্তি করেনি দিলারা। এতটুকুও না। চুপচাপ এসে কান পেতে দিয়েছিল।

মা যখন সুঁচ দিয়ে পটাপট দু'কান ফুটো করে সুতো বেঁধে দিল তখন একবারও উঃ আঃ করেনি।

: জান মা, কিছু লাগেনি আমার—টেরই পাইনি…।

কিন্তু চোখের কূলে কূলে টল টল করছে পানি—তবু মুখে হাসি টেনে এনেছে।

যে দিন দুলের জন্য খুব বাড়াবাড়ি করে দিলারা, সে দিন মার খায় সে মায়ের হাতে। মেয়েকে কাঁদিয়ে মা নিজেও কাঁদে। তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় স্বামীর সাথে।

মনীরাদের বাসার কাছেই ইস্কুল।

বড় রাস্তা ধরে খানিক দূর এগিয়ে যেতে হয়—তারপর একটা গলি। এই গলি দিয়ে মিনিট কয়েক হাঁটলেই ইস্কুল। ইস্কুলে যেতে ক'মিনিটই বা লাগে মনীরার—বড় জোর দশ মিনিট। একা একাই তো ইস্কুলে যায় সে। রোজই যায়। সেজেগুজে, বেণী দুলিয়ে, ফ্রক উড়িয়ে, কাঁধে খাতা বইয়ের একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে সেদিনও ইস্কুলে যাচ্ছিল মনীরা। পথে একজন লোক ডাকলে।

: এই যে খুকি—!

মনীরা তাকালে লোকটার দিকে।

: ইস্কুলে যাচ্ছ বুঝি ?

সহাস্য মুখে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো লোকটা।

: হু—

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় মনীরা।

: আমাকে চিনতে পারলে না ? বাঃ বেশতো তুমি !

লোকটার চোখে মুখে একটা সকৌতুক হাসির বন্যা। অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে থাকে মনীরা।

: ভুলে গেছো ! এই তো সেদিনও তোমাদের বাসায় বসে কত গল্প করে এলাম। তুমি তো কতবার ঘুরেফিরে গেলে আমাদের কাছ দিয়ে। মনে পড়েছে এবার ?

তবুও লোকটার চেহারা মনে পড়ে না মনীরার। চেষ্টা করে মনে করতে কিন্তু কৈ মনে পড়ে না তো!

: তোমার বাবা ভাল আছেন?

লোকটা প্রশ্ন করে আবার।

: হু—।

: মা—

: মাও ভাল—

: বেশ। তোমার নামতো—? এইযে, আমিও দেখছি ভুলে বসে আছি তোমার নাম! কি আশ্চর্য!

লোকটা মুখ টিপে হাসে।

: কি যেন নাম তোমার?

: মনীরা খান—।

: ঠিক ঠিক—মনীরা খান। এবার মনে পড়েছে। চিনাবাদাম খাবে? লোকটা পকেট থেকে কিছু চিনাবাদাম বের করে মনীরার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ইতস্তত: করে মনীরা।

: আরে নাও নাও—। লজ্জা কি! আমি তোমাদের আপন লোক। রসো, তোমার ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ইস্কুলে গিয়ে মজা করে খেও। কেমন?

মনীরা সঙ্কোচে মাথা নাড়ে।

: আচ্ছা—।

মনীরার বই খাতার ব্যাগের মধ্যে চিনাবাদামগুলি দিয়ে দেয় লোকটা। তারপর মনীরার একখানি হাতে ধরে ধীরে ধীরে পথ চলে।

সঙ্কোচ কেটে যায় মনীরার। খুশী হয়ে ওঠে মন। গল্প করতে করতে দু'জনে পথ চলে। বড্ড ভাল লাগে লোকটাকে মনীরার।

: চমৎকার লোক তো!

ভাবে মনীরা।

হঠাৎ এক সময় লোকটা বলে, তোমার কানের দুলজোড়া ভারি সুন্দর! চমৎকার দেখতে!

মনীরা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

: ওকে বুঝি ভুল বলে?

: তবে?

অপ্রস্তুত মুখে তাকায় লোকটা।

: কুণ্ডল— । মা বলেন, এ ধরনের কুণ্ডল নাকি খুব হালের ফ্যাসান।

: তাই নাকি?

: হু— ।

সগর্বে উত্তর দেয় মনীরা।

: কিন্তু কুণ্ডল দুটো অমন বাঁকা হয়ে গেল কি করে? আছাড় পড়েছিল নিশ্চয়।

মনীরা সহজেই স্বীকার করে আছাড় পড়েছিল।

: কালকে টিফিনের সময় ছুটতে ছুটতে পড়ে গিয়েছিলাম।

মনীরা হাসে।

: তাতেই বোধ হয় অমন বেঁকে গেছে। দাঁড়াও ঠিক করে দিচ্ছি আমি।

কুণ্ডল দুটি খুলে হাতে নেয় লোকটা। নেড়েচেড়ে দেখে। আচমকা একটা গলি ধরে ছুটে পালাতে থাকে এক সময়।

কেমন যেন বেয়াকুব বনে যায় মনীরা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

: আমার কানের কুণ্ডল নিয়ে পালিয়ে গেলো একটা লোক।

: কোথায়...কোথায়?

: কোনদিকে গেলো?

: কেমন দেখতে লোকটা? গুণ্ডার মতো?

মনীরাকে ঘিরে বহু লোক জড় হয় রাস্তায়। নানা রকম প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তাকে। কিন্তু ততক্ষণে লোকটা হাওয়া হয়ে গেছে।

খুশীতে ঝলমল করছে দিলারা।

মনের আনন্দে কি যে করবে বেচারী ভেবেই পাচ্ছে না? হাসছে, গান গাইছে না, অকারণে এদিক ওদিক ছুটছে। ভাঙ্গা একখানি আয়না তুলে ধরে ঘন ঘন মুখ দেখছে।

দিলারার কানে এক জোড়া সোনার দুল ঝকঝক করছে। দিলারার বাবা আজই এনে দিয়েছে দুল দুটি। কি যে ভাল লাগছে বাবাকে দিলারার।

দিলারার বাবা মনজুর গল্প করছে বসে মেয়ের সাথে। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে আছে দিলারা। বাপের মুখে প্রশান্ত হাসি।

মা এসে বল্লে, দিলারা, এবার খুলে রেখে দে দেখি দুল জোড়া। খেলতে খেলতে কোথায় হারিয়ে ফেলবি আবার।

দিলারা মাথা নেড়ে প্রবলভাবে আপত্তি করে।

: না মা না...হারাবো না আমি।

: না, বিশ্বাস নেই কিছু। হারিয়ে গেলেই তো টাকার মাল গেলো লোকসান হয়ে। চারিদিকে যা সব চোর ছ্যাচোড়! ভুলে ভালিয়ে কে এক সময় খুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

স্ত্রীর কথা শুনে মনজুরের মুখখানি সহসা বিবর্ণ হয়ে যায়।

: আয়, কাছে আয় আমার। আজকে খুলে রেখে দি। কালকে আবার পরিস কেমন?

বল্লে মা।

বিবর্ণ মুখে মনজুর বল্লে: থাক না আরো কিছুক্ষণ। খুলোএখন পরে।

মুসতারী সহাস্য মুখে তাকিয়ে থাকে মেয়ের মুখের দিকে। চোখে তার অপূর্ব একটা স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

: ভারি সুন্দর মানিয়েছে ওকে। তাই না?

বলে মুসতারী

: তা মানিয়েছে সত্যি।

উত্তর দেয় মনজুর। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ধীরে ধীরে চেপে যায় সে।

রক্তের ডাক

বুলবুল চৌধুরী

পেটের ডানদিককার সেই তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথাটা এক একবার বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিঁকিয়ে উঠছে। এ্যাল্‌কোহলিক সিরোসিস্।

এই সেদিন পর্যন্ত কী গর্বটাই না করে বেড়াতো কোরবান। বুক ফুলিয়ে বলতো: আগর সরাবই না খেলাম ডাগ্‌দরবাবু, তবে আর মরদ কিসের? বিমারি টিমারি, ও আমার হবে না—আপনি বেফিকির থাকেন।—বলেই চোখের ইসারায় বাজুর তাবিজটা দেখিয়ে পান-খাওয়া কুচকুচে দাঁতগুলো উদ্‌ঘটিত করে দিয়ে কোরবান হাসতো: হাঁ, মাথা দুলিয়ে তাবিজের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতো: দেখেছেন এটা কী, চালাকি নয় বাবু, জবরদস্ত ফকিরের দেওয়া তাবিজ—শালা রোগের সাধ্যি কি কাছে ঘেঁষে। ফিন্ আমার ডর কী বলুন?

কিন্তু তার সেই গর্ব, তাবিজের সেই মাহাত্ম্য ধূলিতে মিশে গিয়েছে। নিরঙ্কুশ সরাবের নেশা ক্ষমা করেনি কোরবানকে। অত্যধিক পান-দোষের বিষক্রিয়া অবশেষে দেখা দিয়েছে। কিছুদিন হলো প্রকাশ পেয়েছে জীর্ণ লিভারের অসহ্য কঠিন এই ব্যাধি।

অন্যদিন হলে দাঁতে ঠোঁট চেপে যন্ত্রণা-বিকৃত-আনত মুখে বেঞ্চের এক-প্রান্তে বসে থাকতো কোরবান শেখ। মনে মনে ধিক্কার দিত নিজেকে। ব্যাধিগ্রস্ত লিভারের কোষে কোষে দুঃসহ ব্যথাটা যখন চিনচিনিয়ে উঠতো তখন নিজের পান-প্রকৃতির প্রতি একটা নিষ্ফল আক্রোশ অনুভব করে অস্বাভাবিক রকমের অধীর হয়ে উঠতো কোরবান। আর সেই মুহূর্তে মহল্লার ভাঁটিখানার সেই মেদপুষ্ট ভুঁড়িওয়ালা শুঁড়িটার প্রকাণ্ড মুখখানা ভেসে উঠতো তার চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরটা প্রতি-হিংসার আঁচে ঝলসে যেত—তখন ইচ্ছে করতো ছুটে গিয়ে ছোরার আঘাতে সেই হারামীটার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে আসে—খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে

ফেঁসে দিয়ে আসে তার চর্বিওয়ালা ভুঁড়িটাই—ডেকে ডেকে ধারে খাওয়ানোর শয়তানি বুদ্ধিটাকে খতম করে দিয়ে আসে চিরদিনের মতো।

কিন্তু কোরবান শেখ আজ বে-খেয়াল। এই মুহূর্তে তার বাহ্যিক চেতনাটাই বুঝি লোপ পেয়ে গিয়েছে। দুঃসহ রোগের এমন অব্যক্ত জ্বালার অনুভূতিটাও যেন তেমন আর অনুভব করছে না। মুখের পেশীতে কোনোখানে এতটুকু কুঞ্চন পড়ছে না কোরবানের। অন্যদিনের মতো অসহনীয় জ্বালায় যন্ত্রণা-বিকৃত চাপা কণ্ঠে একবারো গোঙাচ্ছে না: আয় বাপ! —জিন্দেগী বরবাদ হয়ে গেল বলে আফশোষবশে ভুলেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অবধি ফেলছে না। ডাক্তার বসুর ক্লিনিকের এক কোণে বর্ষণ-উন্মুখ আকাশের মতো গম্ভীর মুখে বসেছিলো কোরবান।

আজ প্রায় সারাটা দিন ঘরের মেঝেতে চাটাইএর উপর শুয়ে কাটা ছাগলের মতো কোরবান ছট্‌ফট্ করেছে— এক একবার কুঁকড়ে গিয়েছে অসহ্য যন্ত্রণায়। সন্ধ্যার দিকে, এই ঘণ্টাখানেক আগে সুঁই নেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন ডাক্তার বসুর ক্লিনিকে আসছিলো কোরবান তখন পথেই সে প্রথম শুনতে পেয়েছে: আবার গুলি চলছে ধরম্‌তলায়—পিচঢালা কালো রাস্তায় খুনের দরিয়া বইছে। তবে আজ শুধু হিন্দুরাই নয় একা—জালিমের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ভাইরাও।

খবরটা শোনা অবধি অপরিসীম অধীরতায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে কোরবান: হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গেল।—এক হয়ে গেল সব ঝাণ্ডা! বলে কী! তাহলে তো এইবার জালিমের সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে—আদায় করা যাবে রশিদ আলীদের মুক্তি—বারতানিয়ার দম্ভ চুরমার করা যাবে অনায়াসে। হিন্দু-মুসলমানের একতা! ইত্তিফাক্! আর চাই কি? কিসের জন্য আর অপেক্ষা? জুলুমের সীমা তো কখন ছাড়িয়ে গিয়েছে। এইবার বজ্রনিনাদে ফেটে পড়ুক কোটি জনতার পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ—চুরমার করে দিক সব, তচ্‌নচ্ করে দিক...

গত নভেম্বরের হাঙ্গামায় কলকাতার পথে পথে যখন সাম্রাজ্যবাদী ঘাতকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো জনতা, তখন কোরবানের রক্তেও হিল্লোল জেগেছিল—এক একবার ইচ্ছে করেছিল বোমার মত সেও ফেটে পড়বে—মানবে না কোন কওমি বাধা নিষেধ। কিন্তু এবারের

হাঙ্গামার খবরটা শুনেই তার মাথায় রীতিমতো খুন চেপে গিয়েছিলো : ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল চাইছিল ছিঁড়ে পড়তে : হাঁ, ওক্‌ৎ আয়া—ওক্‌ৎ আয়া খুন কা বদলা খুন লেনে কা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ ভাইরা জান দিচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশাহীর নির্বিকার গুলির মুখে। ভেবেছে কী তারা—ওই সব জালিমের বাচ্চা—নাফরমান মরদুৎ ? গুলি চালিয়ে আমাদের সম্মিলিত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠের সোরমচানা স্তব্ধ করে দেবে ? হরগেজ নেহি।...

শিখায়িত বিদ্বেষের জ্বালায় তার ব্যাধি-জর্জর লিভারের অসহনীয় এই জ্বালাবোধ কখন যে তলিয়ে গিয়েছিল তা জানতেই পারেনি কোরবান। ডাক্তারখানায় আসবার পথে শোনা কাল্লুর অধীর কণ্ঠের কথাগুলো থেকে থেকে তার কানে বাজছিল : শোনা, শোনা ওস্তাদ, শোনা আজকা খবর ?... মনে পড়েছিল মিঠাইএর দোকান থেকে রামমিশিরের ডাক : কাঁহা চলতে হো কোরবান ভাইয়া ? আও, আন্দার আও। আজ হাম আওর তোম তো মিল গিয়া, শোনা ভি তো ?

কোরবান রাজাবাজার মহল্লার নামকরা গুণ্ডা। টেগার্টের আমলেও পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে করতো না এমন দুষ্কর্ম ছিল না। নারকেল-ডাঙ্গার বস্তিতে একবার বছর দশেক আগে জেনানা সম্পর্কিত এক হাঙ্গামায় প্রতিপক্ষের কে একজন অসতর্ক মুহূর্তে তার শিরদাঁড়া ঘেঁষে লম্বা একখানা ছোরা চালিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার বসুর সযত্ন চিকিৎসায় বেঁচে উঠলেও এখনো বিদ্ধ স্থানটিতে কোথায় যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই খচখচে একটা ব্যথা অনুভব করে। তার ওপর বয়সও বাড়ছে কোরবানের। স্বভাবতঃই তার উন্মত্ত হিংস্রতা দিন দিন ভোঁতা হয়ে আসছিল। আগে কারণে অকারণে তুবড়ির মতো দপ্ করে জ্বলে উঠতো কোরবান—তার ইস্পাত-কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হাতে হত্যার উল্লাসে আচমকা ঝিঁকিয়ে উঠতো শাণিত তীক্ষ্ণ ছোরা। ঝাঁপায় ঝাঁপায় তাড়ি খেয়েও এতটুকু নেশা হতো না। এখন অবশ্য পরিবর্তন ঘটেছে—অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে তার আদিম বন্যতা। কিন্তু তবু আজকের এই মুহূর্তে কোথা থেকে যেন কী হয়ে গিয়ে-ছিল—কোরবানের অন্তর্লীন ঝিমিয়ে আসা হিংস্রতা একটা চকিত আলোড়নে আগ্নেয়গিরির মতোই যেন বিক্ষুব্ধ গর্জনে চাইছিলো ফেটে পড়তে।

ডাক্তার বসুর ক্লিনিকে রোগীর ভিড়। দু'একজন করে লোক আসছে

আর যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু পর পর একধার থেকে রোগী দেখে যাচ্ছেন। প্রতীক্ষমান কয়েকজন লোকের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা চলছে। তাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কী একটা মন্তব্য কানে যেতেই কোরবানের চট্‌কা ভেঙ্গে গেল: মুখ ঘুরিয়ে সে তাকালো। চোখ দুটো তার আরক্তিম হয়ে উঠেছে। ঝাঁজালো স্বরে সে বললে: আপ কী বোললেন বাবু?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ফিরে তাকালেন। সন্দিগ্ধ কোরবানের সর্বাঙ্গে চোখটা বুলিয়ে নিলেন একবার। লুঙ্গি-পরা এই ইতর লোকটার সঙ্গে কে কথা বলতে যাবে? বিজাতীয় ঘৃণাই অনুভব করলেন ভদ্রলোক। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্যে সংক্ষেপে বললেন: কিছু না।

—কেয়া, কিছু না?—আগের চাইতেও ঝাঁজালো স্বরে কোরবান আবার প্রশ্ন করলে।

ভদ্রলোকটি এবার কিন্তু একটু যেন হক্‌চকিয়ে গেলেন। কোরবানের কণ্ঠস্বরে উষ্মা অনুভব করেছেন তিনি। লোকটার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার ফলটা খুব প্রীতিকর নাও হতে পারে। ছোটলোকদের বিশ্বাস নেই। অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই বললেন, কী আবার বলবো—বলছিলাম, এসব হাঙ্গামা করে কী লাভ? গতবারের মতো গুলিতে সব তো আবার ঠাণ্ডা করে দেবে।

—ঠাণ্ডা করে দেবে!—কোরবান হিংস্রভাবে খিঁচিয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো ধ্বক্ ধ্বক্ করে: কিস্‌কো কোন ঠাণ্ডা করে গা? আপ জানতে হ্যায়, ইস্ দফা একেলা হিন্দুলোগ নেহি—মুসলমান ভি আ মিলা—আব্ তুফান বহে গা তুফান, সমঝেঁ বাবু?

ওপাশের বেঞ্চি থেকে একজন তরুণ বয়স্ক লোক সোৎসাহে কোরবানকে সমর্থন করলে; ঠিক ভাই, বিলকুল ঠিক। এ্যাদ্দিন তো শুধু একতারই অভাব ছিল। এবার তোমরাও যখন এসে মিলেছ তখন তো তুফান বইবেই। কোনো শালাকে আর ঠাণ্ডা বানাতে হবে না আমাদের—বেনের জাত এবার পালাতে পথ পেলে হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কিন্তু দমলেন না। বরং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। হুঁ, তুফান বইবে। আরে বাবা গুটিকয়েক মিলিটারী ট্রাক পোড়ালেই আর ধরে ধরে জনকয়েক

গোরাকে 'জয়হিন্দ' বলালেই কী আর স্বাধীনতা আসে। দেখছি তো উল্টে সব নিজেদের নিরীহ লোকেরা গুলি খেয়ে মরছে। কী লাভ বাবা এতে? —মুখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোক পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন। ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, আমাদের দেশের লোকের কথা আর বলবেন না মশায়। একটা হুজুগ পেয়েছে কি অমনি হৈ চৈ। গতবারের কাণ্ডখানা দেখলেন না,—যতসব অশান্তি বাধানো আর কি?

একেই তো উন্মত্ত ক্রোধে কোরবানের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল, তার ওপর ভদ্রলোকটির বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। আগুনে যেন ঘি পড়লো। দপ্ করে জ্বলে ওঠার মতই কোরবান আচমকা খাড়া হয়ে দাঁড়ালো: গরদার কাঁহাকা! —পর মুহূর্তেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির ওপর সিংহের মতই কোরবান ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য! তেমন কিছুই সে করলো না। মুহূর্তখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ মুখ ফেরালো: আব মুজহে সুঁই দে দিজিয়ে ডাগদরবাবু—হাম যায়েঙ্গে।

ডাক্তার বসু ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন, আজ দশ বছর থেকে কোরবানকে চেনেন তিনি। শুধু চেনেন বললে অবশ্য ভুলই হবে—কোরবানের নাড়ি-নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় তার ঘনিষ্ঠ। বর্বর হলেও কোরবানের এমন একটা দিক আছে যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বহুদিন আগেই। এতটুকু উপকার যার কাছ থেকে পেয়েছে তার জন্যে কোরবান হাসিমুখে নিজের জানটাই কোরবানী দিয়ে বসতে পারে। এ খবরটা ডাক্তার বসুর জানা ছিল বলেই কোনদিনও এই লুঙ্গি-পরা লোকটাকে তিনি ইতর ভাবতে পারেননি। তিনি হেসে বললেন, রাগ করো না, বসো—শুধু সুঁই নিলে তো চলবে না—দাওয়াই নেবে কে?

—ছোড়িয়ে দাওয়াই-ওয়াই; শালা সুঁই ভি নেহি লেঙ্গে।—অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে কোরবান বেরিয়ে যেতে পা বাড়ালো।

—আরে চলেছো কোথায়? বসো, বসো।

এবার আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো কোরবান। চোখ দুটো তার রক্তমুখী হয়েই আছে। সে বললে, আপকা বদনামী হোগা ইস্‌লিয়ে, নেহি তো ইয়ে বাবুকা আজ এক আচ্ছা সবক দেলা দেতা হাম।—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির দিকে এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই কোরবান দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

—দেখলেন, দেখলেন তো ছোটলোকটার সাহস!—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এতক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

তরুণ বয়স্ক লোকটি বললো: ওসব ছোটলোক ভদ্রলোক বুঝিনে মশাই। দোষ ওর নয়—দোষ তো আপনার নিজের। আজ যে মুসলমানরাও এসে যোগ দিয়েছে এটা দেশের পক্ষে মস্ত একটা আশার কথা—কোথায় উৎসাহ দেবেন—তা নয়, যাচ্ছেতাই কী সব বলে লোকটাকে অনর্থক ক্ষেপিয়ে দিলেন। আপনাদের মশাই কোনদিনও শিক্ষা হবে না।

—অর্থাৎ?—ব্যঙ্গকুটিল চোখে তাকালেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি: তা সে যেই হোক না কেন, হুলিগ্যানইজম্ করে দেশের সর্বনাশটা করবে আর আমরা চুপ করে থাকব! এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কোন মানে হয়, না কংগ্রেস এ সব সমর্থন করে? যারা মূর্খ—ছোটলোক, তাদের এ বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়াই তো উচিত। আমি অন্যায় বলিনি কিছু, বুঝেছেন?

—ঠিকই তো—পাশের ভদ্রলোক সায় দিলেন: কোনোরকম গুণ্ডামীকেই প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না। তাতে দেশের—

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে একটা ধমক দিয়ে বসলেন ডাক্তার বসু: আপনারা দয়া করে এবার আসবেন কি?—কেন কে জানে ডাক্তার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। টেবিলের ওপর থেকে স্টেথিস্‌কোপটা তুলে নিতে নিতে অত্যন্ত বিরস কণ্ঠেই বললেন: এটা ক্লাব-রুম নয়, আমার চেম্বার।

ওদিকে তখন সর্বাঙ্গময় অগ্নিনিস্রাবের দুঃসহ দহন-জ্বালার অনুভূতি নিয়ে কোরবান হন হন করে এগিয়ে চলেছিল।

রাজাবাজারের মোড়টার কাছাকাছি একটা বিড়ির দোকানের সামনে এসে হঠাৎ সে থেমে দাঁড়ালো। সারা মুখখানা তার চক্‌চক্ করছে—জ্বলন্তলে আগ্নেয় চোখ দুটো স্ফীত হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্করভাবে। মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে দোকানের সম্মুখে ফুটপাতে পাতা একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়লো কোরবান।

সারকুলার রোডে ট্রাম চলাচল বন্ধ। ক্বচিৎ কখনো দু'একখানা বাস যাতায়াত করছে। হঠাৎ কী একটা স্মরণে আসতেই কোরবান ফিরে তাকালো: তাদের বিড়ির দোকানের পাশের হোটেলটা খোলাই তো

রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনকার মতো আজ সেখানে হুল্লোড় কই! গ্রামো-ফোনে কোকিল-কন্ঠিদের গান? কোথায় আজ অবিশ্রান্তভাবে বেজে চলা নানা রেকর্ডের কাওয়ালী আর নাত্। বিস্ময়করভাবেই নীরব হয়ে আছে হোটেলটা—কিসের এক যাদুমন্ত্রে ভেতরটায় গম্ভীর থমথমে আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছে যেন। অথচ কী আশ্চর্য, হাওয়াই-হামলার দিনগুলোতে যখন গভীর আতঙ্কে মৃত্যু-মগ্ন হয়ে উঠত কোলকাতা তখনকার সেই সব উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চিত দিনেও এই হোটেলটা সর্বক্ষণ সরগরম থাকতো। গ্রামোফোন বেজেই চলতো একটানা—আর সমস্ত কিছুর সোরগোল ছাপিয়ে শোনা যেত হোটেলের বয় মোস্তাফার উত্তাল কণ্ঠের ঘনঘন হাঁক। আর আজ......

হাঁ, আবতক্ জিন্দা হ্যায় মুসলমান।—কোরবান শেখের বুকখানা গর্বের আনন্দে চকিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে: হামারা খুন লাল হ্যায় আবতক্। কে বলে মুসলমানেরা বে-খেয়াল, নিষ্ক্রিয়—অলস? কে বলে জালিমকে তারা চিনতে পারেনি? সব ঝুট্। দেখুক, দেখুক না চেয়ে সেইসব কুৎসাকারীর দল। দেখুক আজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারাও জ্বলন্ত বিদ্বেষে রুখে দাঁড়াতে পারে কি-না—তাদেরও ঘরছাড়া করে কি-না রক্তের ডাক।

বিড়ির দোকান থেকে নেমে কোরবানের পাশে এসে দাঁড়াল কাল্লু। একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরলে, লো ওস্তাদ।

কোরবান কিন্তু বসেই রইল তেমনি আচ্ছন্নভাবে। চোখের পলক পড়ল না পর্যন্ত। যেন কথাটাই শুনতে পায়নি সে।

সবিস্ময়ে কোরবানের মুখের দিকে অপাঙ্গে তাকালো কাল্লু। যা ভেবেছে তাই। হুঁস হারিয়ে ফেলেছে ওস্তাদ। চোখের দৃষ্টি তার স্থির ও নিষ্পলক। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ঝলক দিয়ে উঠে থমকে রয়েছে মুখখানায়—যে কোন মুহূর্তেই তোড়ে ফিন্কি দিয়ে ফেটে বেরুতে পারে। অপ্রকৃতিস্থ কোরবান—বিচিত্র কিছু নয়। কাল্লুর নিজের দিলটাই আজ যে ভাবে 'বেচাইন' হয়ে উঠেছে তাতে করে তার ওস্তাদের মতো লোকের পক্ষে খুন খারাবির জ্বলন্ত নেশায় নিজের চেতনাটা হারিয়ে বসাই স্বাভাবিক। কিন্তু...?—কাল্লুর চোখের দৃষ্টি কেন কী জানি অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো:

কিন্তু তাই বলে এতখানি বেহুস—বেতাব, এমন চৈতন্যবিলুপ্তি! এ কি ভীষণ মূর্তি ওস্তাদের।—কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল কাল্লুর।

স্পন্দিত বুকে কাল্লু নিজের প্রসারিত হাতখানা গুটিয়ে নিলে। তারপর চিন্তাগ্রস্তভাবে বিড়িটা নিজেই ধরিয়ে নিয়ে কোরবানের পাশে বসে পড়ল।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছে কে জানে। হঠাৎ এক সময়ে কোরবান কী দেখে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালো। কাল্লুর চোখে পড়েছে: দুটো সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই ট্রাক সাঁ সাঁ দক্ষিণমুখী চলে যাচ্ছে নক্ষত্রবেগে। ধরমতলার উদ্দেশ্যেই নয় তো?

—কাল্লু! গম্ভীর চাপা কণ্ঠে কোরবান ডাকলো: কাল্লু! এবং পরক্ষণেই সে মোড়ের দিকে এগিয়ে চললো সঙ্কল্প-মন্থর পায়ে।

*　　　　*　　　　*

ঘুমটা যখন বেশ গাঢ় হয়ে আসছে ঠিক সেই সময় নিচের সদর দরজায় ঘন ঘন কড়া নড়ে উঠলো।

ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অপরিসীম বিরক্তিতে উঠে বসে বেড স্যুইচটা অন্ করে দিলেন ডাক্তার বসু। আপদ আর কি। রাত দুপুরেও দেখছি রেহাই দেবেনা লোকেরা। নাঃ, এতটা পসার না হলেই যেন ভাল হতো। অন্তত রাতে কযেকঘন্টা ঘুমানো যেতো নিরুপদ্রবে।

—ডাগদরবাবু! ও ডাগদর বা—বু!

—কে, কোরবানের গলা না? জিজ্ঞাসু চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার বসু।

হঁ্যা, হঁ্যা, তোমার সেই পেয়ারের লোকটাই। এই রাত দুপুরে যতসব কাণ্ড! জ্বালাতন আর কি। তোমার কিন্তু নিচে গিয়ে কাজ নেই বাপু! ওপর থেকেই ডেকে বলে দাও দরকার থাকলে কাল যেন আসে। রাত-বিরেতে ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে—ছিঃ ছিঃ—

—কিন্তু সে তো আজকাল মদ খায় না। আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছে।

আহা কি আমার ভীষ্মদেব রে! ওদের আবার প্রতিজ্ঞা। শুনলে না গলার স্বরটা কেমন জড়ানো? মদ আবার খায় না! না, না, তোমার নিচে যেতে হবে না। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে মাতালদের, বুঝলে?

—ভয় কিসের? নিশ্চয়ই কোন দরকারে এসেছে; নইলে এত রাত্তিরে ও আমায় কখখনো বিরক্ত করতো না।—ডাক্তার বসু পায়ে শ্লিপার জোড়া ঢুকিয়ে দিলেন।

—তবু তোমার যাওয়া চাই, না? আমার কথা বুঝি গ্রাহ্য হলো না! ঢের দেখালে যা হোক। বিনে পয়সায় তো চিকিৎসা করছোই তার উপর যখন তখন ওই ম্লেচ্ছ ছোটলোকটার সঙ্গে মাখামাখি না করলে তোমার চলবে কেন! নিজের এতটুকু মর্যাদাজ্ঞান বলেও কি কোনো পদার্থ থাকতে নেই তোমার? যতসব হুঁ।—সর্বাঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্তার বসুর স্ত্রী পাশ ফিরে শুলেন।

শুধু অহেতুক ভীতিই নয়, স্ত্রীর কণ্ঠে কোরবানের প্রতি একটা সংস্কারগত অবচেতন বিদ্বেষও যেন অনুভব করলেন ডাক্তার বসু। কৌতুক বোধ হলো তাঁর। মেয়ে জাতটা সত্যি কি অদ্ভুত। এই সেদিন পার্কে খুকীর গলা থেকে হারটা কে একজন বেমালুম সরিয়ে ফেললো। শুনেই ক্রুদ্ধ হয়ে কে বলেছিল: মেরা নাম শেখ কোরবান। ইয়ে মহল্লামে কৌন শালা এতনা ভারী বাহাদুর হ্যায় যো আপকা চীজ্ হজম কর লেগা। আম্মাজিকো বেফিকির রহ্নে বোলিয়ে ডাগদরবাবু—সেদিন কে এনে দিয়েছিলো খুকীর হার? কিন্তু তবু সে ছোটলোক—আশ্চর্য!

ডাক্তার বসু চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিচে নেমে এলেন। সদর দরজা ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে চাকরটা। কাল্লুর কাঁধে ভর দিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কোরবান।

—কি ব্যাপার হে, এত রাতে?

—ওস্তাদের বদন থোরা জ্বলে গেছে ডাগদরবাবু!—একটু ইতস্তত করে কাল্লু বললে।

—আমি তখনই বুঝেছিলাম কাণ্ড একখানা বাধিয়ে আসবে।—ডাক্তার বসু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: দেখি, দেখি, ভেতরে এসো।

অপারেশন্ টেবিলের উপর কোরবানকে শুইয়ে স্লাইডিং বাতিটা খানিকটা নিচে টেনে নামালেন ডাক্তার বসু। তাঁর পরীক্ষা-রত চোখের দৃষ্টি দেখতে দেখতে চঞ্চল হয়ে উঠলো—ভ্রূদুটো গেলো কুঁচকে। মারাত্মক বার্ণ্ কেস্। দেহের সম্মুখভাগ ভীষণভাবে ঝলসে গেছে, পরম উৎসাহে মুখখানাও লেহন

করে গেছে আগুনের শিখা। প্রায় সারা বুকটা জুড়েই পেশীগভীর ক্ষতচিহ্ন দগদগ করছে—হাতদুটোতে বীভৎস সব ফোস্কা। কোথাও গায়ের চামড়া গুটিয়ে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে লালচে নগ্ন মাংস। ঝলসে যাওয়া কালো মুখখানা বিবর্ণ হয়ে আছে। ভ্রূদুটো রোমহীন—খাপছাড়াভাবে মাথার চুলও পুড়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে অব্যক্ত যন্ত্রণার মসীহীন রেখাঙ্কন।

ক্ষিপ্র অথচ সংযত হাতে কোরবানের পোড়া শার্টটার অবশিষ্ট টুকরো-গুলো ছিঁড়ে ফেললেন ডাক্তার বসু। থার্ড ডিগ্রী বার্ন্ট কেস্। প্রচণ্ড শক্; তার উপর সেপসিসের আশঙ্কা।—মনে মনে তিনি শংকিতই হয়ে উঠলেন। মুহূর্ত বিলম্ব না করেই একটা মরফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়েই তিনি 'ট্রিপ্যালডাই' এর ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। প্রশ্ন করলেন: এমনভাবে কি করে পুড়লো শুনি?

অপারেশন টেবিলের পাশে উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে কোরবানের দগ্ধ দেহটার দিকে তাকিয়ে ছিল কাল্লু। উগ্র বিজলী বাতির উদ্ভাসিত আলোকে সে যেন এতক্ষণে দেখে বুঝতে পেরেছে কী ভীষণ মারাত্মক রকমের অঘটন ঘটে গেছে একটা। উত্তরে কান্নার মতো সুর বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে: পেটরোল কা আগ্ সে বাবু। যেয়সাহি টাঙ্কি বার্স্ট হুয়া বাস্ ওয়সাহি সারা বদনমে শালা আগ্ যেয়সা কুদ পড়া।

—ট্রাক জ্বালাতে যাওয়া হয়েছিল! বলিহারি তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান। এখন যাও বেশ করে আবার আগ্ লাগাও গে? যেমন কর্ম তেমনি ফল—ঠিক হয়েছে।—ডক্তার বসু গম্ভীর মুখে স্প্রের বোতলে 'ট্রিপ্যালডাই' ঢালতে লাগলেন।

আর ধীরে ধীরে মুদিত চোখের রোমহীন পাতাদুটো খুলে পিট্‌পিট্‌ করে তাকালো কোরবান শেখ। ততক্ষণ ডাক্তার বসু স্প্রে হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কোরবান এবার অপলক দৃষ্টিতে তাকালো তাঁর দিকে। চোখের সে-কী অদ্ভুত চাহনি—ঠিক যেন ডাক্তার বসুর দিকে চেয়ে নেই, তাঁর দেহ ভেদ করে কোথায় যেন চলে গেছে সে-দৃষ্টি। অকম্পিত মৃদু কণ্ঠে বললে: কেয়া স্রেফ তিন মিলিটারী ট্রাক জ্বালাকে মরেঙ্গে হাম, বস্? তব মেরা কসম কৌন পুরা করেগা? থোড়া বদন জ্বল গিয়া তো কিয়া পরওয়া।—নিষ্পলক চোখ দুটো কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে এলো কোরবানের আর

সেই সঙ্গে দোদুল্যমান উগ্র বিজলী বাতিটার চেয়েও সহস্রগুণ প্রখর হয়ে জ্বলতে লাগলো তার চোখের দুটি তারা : জঙ্গ তো স্রেফ শুরু হুয়া ডাগদর-বাবু! ইস্‌কা আখের তো দেখনে দিজিয়ে—কমস্ কম মেরি দিল্‌কি আগ্ তো বুতানে দিজিয়ে। উস্‌কা মওৎ আয়ে তো সহি—লেখকেন আব্ তো শালা খুদ আজ্‌রাইল ভি হাম্‌ছে দুর রহেগা ডাগদরবাবু।

একটা চমক লাগলো ডাক্তার বসুর : একি সব বলছে মুমূর্ষু লোকটা! দশ বছর আগেকার এই কী সেই মৃত্যুভয়-জর্জর ছোরাবিদ্ধ কোরবান শেখ? এ কী অভিনব মহতী রূপ! এতদিন তার অন্তরের এই আগ্নেয় জ্বালা কোথায় ছিল লুকানো?—মুগ্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণের জন্য ডাক্তার বসু ভুলে গেলেন, তাঁর সামনে রয়েছে প্রতীক্ষমান এক মারাত্মক এ্যাক্সিডেন্টের রোগী—ভুলে গেলেন, তিনি ডাক্তার।

* * *

সমস্ত কাজ ফেলে সকালের দিকে এসে ডাক্তার বসু কোরবানকে ড্রেস করে গিয়েছেন। অবস্থা তার উদ্বেগজনক। শকটা কাটিয়ে উঠলেও দগ্ধ শরীরের কোষে কোষে সেপসিসের বিষক্রিয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কাটা এখনো রয়েছে। চিকিৎসার সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বটে তবু ডাক্তার বসু আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আজো একবার তিনি চেষ্টা করে গেছেন কোরবানকে রাজী করাতে। কিন্তু সে টলেনি। বলেছে, নেহি, নেহি, হাম কভি নেহি যায়েঙ্গে হাসপাতাল। উঁহা থোরাই আপকা তরেহ্ মেরা এলাজ করেগা কোয়ি।

গরীবের ঘরে যতটা থাকা সম্ভব ততটুকু পরিষ্কার একটা কাঁথার ওপর কোরবান শুয়ে ছিল। শরীরের সমস্ত পেশীগুলো যেন তার কুঁচকে গেছে অসাড় হয়ে। আর চেতনা? সেটাও দুঃসহ প্রদাহের চমকে চমকে মধ্যে মধ্যে লোপই পেয়ে বসে। নিরবচ্ছিন্ন অব্যক্ত জ্বলুনি আর সর্বাঙ্গময় দুঃসহ দপদপে ব্যথা—মাথার শিরাস্নায়ুগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়তে চায়। সময় বুঝে লিভারের ব্যথাটাও আজ চিনচিনিয়ে উঠেছে ভীষণভাবে—যেন অদৃশ্য হাতে অনবরত তীক্ষ্ণাগ্র সূঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে কেউ। এক একবার ভাষাহীন যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠে কোরবান ঘনঘন মাথাটাকে এলোপাথাড়ি

ঝাঁকাচ্ছে। আর শিয়রে একধারে বসে আশঙ্কা-বিধুর দুরুদুরু বুকে পাখা করে চলেছে কোরবানের বৌ।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা সোর ভেসে এলো। প্রথমে কিছুই মনে হয়নি কোরবানের। কিন্তু সেই দুরাগত হল্লা ছাপিয়ে কিসের ঘনঘন আওয়াজ তার মুখখানারই ওপর যেন সাঁই সাঁই চাবুক মেরে গেল। ভীষণভাবে চমকে উঠে সে চোখ দুটো মেলে তাকালো—যন্ত্রণার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল মুহূর্তে: গোলি!—হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ খেয়েই যেন আচমকা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কোরবান শেখ।

বেসামাল ত্রস্ত পায়ে ছুটে বেরুতে যাবে এমন সময় ব্যাকুলভাবে পথ আগলে দাঁড়ালো তার বৌ: নেহি, নেহি মৎ যাও কঁহি—মৎ যাও!

—ছোড়, ছোড।—অধীর উত্তেজনায় বৌকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে কোরবান দমকা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজাবাজার আর সারকুলার রোডের মোড়। দুদিকে যতদূর চোখ যায়, টুকরো টুকরো বিক্ষুব্ধ জনতা—ঘরছাড়া বিপ্লবী সৈনিকের দল। মৃত্যু-ভয়হীন। বজ্রকঠোর মুখে মরণ-পণের আগ্নেয়-লেখা—জাতির সমস্ত অপমান আজ তারা ঘুচিয়ে দেবেই।

একটু আগে এখানে গুলি চলেছে। রক্তস্নাত রাস্তায় আর ফুটপাথে ঝরে যাওয়া রক্তপদ্মের মতো মৃত-আহতদের দল। একটা ট্রাক তখনো জ্বলছে দাউ দাউ করে। কিন্তু শত রৌরব, শত হাবিয়ার আগুন নিয়ে জ্বলে উঠলো কোরবানের চোখ।

তেরঙ্গা পতাকা হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো কাল্লু। রামমিশির এলো সবুজ নিশান কাঁধে। লাল ঝাণ্ডা উঁচিয়ে উদ্বেলিত বুকে দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো অযোধ্যা সিং। আরো এলো অনেকেই—মহল্লার ঘরছাড়া কত হিন্দু-মুসলমান। উল্লসিত ধ্বনি উঠলো কণ্ঠে কণ্ঠে:

—আগ্যা কোরবান ভাইয়া, আয়া তুম!

—আব্ তো কামাল করেঙ্গে হামলোগ্!

—আখের তুম ভি আ গিয়া ওস্তাদ!

নবতর উদ্দীপনার যেন গুঞ্জন পড়ে গেল দিকেদিকে।

আর পরক্ষণেই মন্থর—দাম্ভিক চালে কোথা থেকে আবার এসে দেখা

দিলে একটা সাঁজোয়া গাড়ী। ফুটপাথ থেকে উত্তাল ধ্বনি উঠলো কচি কচি কণ্ঠে: জয় হিন্দ! জয় হিন্দ!—থান থান ইট মারমুখী হয়ে উঠেছে বাচ্চা সৈনিকদের হাতে।

গাড়িটা হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। সাঁ করে ছুটে এলো ছেলেদের ছোট্ট দলটির কাছ বরাবর। 'পালিয়ে যা' 'ভাগ যা'—সোর উঠেছিল বয়স্কদের কণ্ঠে। কিন্তু এক পাও কেউ নড়েনি।

সাঁজোয়া গাড়িটার লৌহ বর্মাচ্ছাদনের ওপর সসঙ্গিনে রাইফেল বাগিয়ে বসেছিল এক গোরা সৈনিক। সে এবার নিচে নেমে এলো। মাত্র হাত কয়েক দূরে ছেলের দলটা। তাদেরই একজনের বুক লক্ষ্য করে গোরা সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো।

—লুক্ লুক্ এ্যাট ছ্যাট ওয়াকিং মমি!

ভিড় ঠেলে বিদ্যুৎ গতিতে কাছে আসতে দেখে সাঁজোয়া গাড়ির ভেতর থেকে কে এক গোরা সকৌতুকে চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ততক্ষণে ছেলেদের আড়াল দিয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেছে কোরবান: লে মার, মার গোলি, শালা জালিম কা বাচ্চা, মার না? তেরি —হিংস্রভাবে খিচিয়ে উঠে একটা অশ্লীল গাল দিলে কোরবান। দিশেহারা ক্রোধে তখন তার সর্বাঙ্গ বাঁশপাতার মতো কাঁপছে থর থর করে।

টমিটার চোখ দুটো একবার ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেই বিচিত্র স্নিগ্ধতায় স্তিমিত হয়ে এলো। আর একটু হলে টান দিয়ে বসেছিল ট্রিগারে। ক্রুর কৌতুকের বিদ্যুৎ চমকে গেল টমিটার চোখে। উঁচানো রাইফেলের নলটা সে গম্ভীর চালে আভূমি নামিয়ে নিলে।

কোরবান ঘুরে দাঁড়ালো: যা বেটা—ঘর যা।

চক্‌চক্ করছে টমিটার চোখ। ঠোঁটের কোণে তার আলগাভাবে মৃদু হাসির একটা রেখাই না ফুটে রয়েছে? একটু ইতস্তত করে ছেলেরা সরে যাবার জন্য পা বাড়ালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একজনের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে টমিটার হাতে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠলো রাইফেলটা। অস্ফুট এক অন্তিম চীৎকারে ছেলেটা মাটিতে ঢলে পড়লো।

যেন কারবালার ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছে কোরবান। জবরদস্ত জালিম এজিদের সেই কারবালা—শহীদ হাসান-হোসেনের রক্তস্মৃতিজড়িত মরু-

ময়দান। খুনিয়ারী কোরবানের মস্তিষ্ককোষের ঝিল্লিতে ঝিল্লিতে বিশৃঙ্খলতার মত্ত দোলানি লেগে গেল। চোখের পলকে ঝাপটা মেরে ছিনেয়ে নিলে রাইফেলটা।

কিন্তু বোলট্ এ্যাকসন আর্মি রাইফেল। এতো আর ছোরা নয় যে হত্যার উল্লাসে কোরবানের হাতে রুদ্রমূর্তি হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নাচতে শুরু করে দেবে। অনভ্যস্ত মারণাস্ত্র। আনাড়ীর মতো মুহূর্তখানেক অধীরভাবে সেটা নাড়াচাড়া করলে কোরবান। একটা লোহার ডাণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করারও উপায় নেই। তবে? তবে?—কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাত্র একটি মুহূর্ত পরেই কোরবানের অধীর চোখের তারায় ঝিকিয়ে উঠলো রাইফেলের ডগার উদ্ধত সঙ্গিনটা। এবং পরক্ষণেই টমিটার বুকে সেটা আমূল চালিয়ে দেওয়ার জন্য সে ক্ষিপ্রহাতে রাইফেল বাগিয়ে ধরলে।

কিন্তু বিঁধিয়ে দেওয়া হলো না। তার আগেই কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষের মতো মাটিতে হুমড়ি খেয়ে কোরবান পড়ে গেল। কলিজার খুনে দেখতে দেখতে ভিজে উঠল তার ধবধবে ব্যাণ্ডেজটা। সাঁজোয়া গাড়ির পিপহোলস্ দিয়ে ব্রেনগানের নলটা তখনও উঁকি মেরে রয়েছে—তখনো সেটার মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটা অতিক্ষীণ সূক্ষ্ম রেখায়।

থানা আর মর্গ। মর্গ আর থানা।—এক পর্দা জুতোর সোল খুইয়ে অবশেষে ছাড়পত্র মিললো। আর অপরাহ্ণে শবযাত্রা এসে দেখা দিলে ডাক্তার বসুর বাড়ির সামনে। ডাক্তার বসু অপেক্ষাই করছিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন তিনি। শবাধার নামিয়ে রাখলো বহনকারীরা। কী দেখে হঠাৎ চমক লাগলো ডাক্তার বসুর। দ্রুতপায়ে তিনি আবার গিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। উর্ধ্বশ্বাসে উঠে গেলেন ছাদে। হাওয়ায় পত্‌পত্ শব্দে তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে। সেটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এলেন ডাক্তার বসু।

পাশাপাশি দুটো পতাকা দিয়ে শবাধার ঢাকা। একটি বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের তরফ থেকে দেওয়া লাল ঝাণ্ডা। অন্যটি—আব-হেলাল চিহ্নিত সবুজ—শহীদের প্রতি মহল্লার মুসলিম লীগের সশ্রদ্ধ নজ্‌রানা।

ডাক্তার বসু এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে জানুপেতে বসলেন। ধীরে ধীরে শবাধারের মাঝামাঝি বিছিয়ে দিলেন তেরঙ্গা পতাকাখানা। মুহূর্ত কয়েক নির্বাক হয়ে রইলেন অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন: এবার চলো।

ডাক্তার বসুর পাশে এসে দাঁড়ালো কম্পাউণ্ডার। সসঙ্কোচে বললে, আপনিও কি যাচ্ছেন? রায়বাবুদের বাড়ীতে যাবার একটা আর্জেন্ট কল্ ছিল যে।

মন্থরগতিতে শবযাত্রা আবার চলতে শুরু করেছে। সকলের সঙ্গে মিলে নগ্নপায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন ডাক্তার বসু।

আর খুকীর হাত ধরে ডাক্তার বসুর স্ত্রী দোতলার বারান্দা থেকে চলন্ত শোক-মিছিলের দিকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে রইলেন।

জানঘর

শওকত ওসমান

তার সংগে দেখা হয়েছিল এক দুপুর বেলা যখন অকারণ কোন কাজ না থাকার ফলে খামখা বেরিয়ে খোঁজ করছিলাম যদি অবসর কাটানোর অনুকূল কিছু পাওয়া যায়। মফস্বল শহরে সময় যে সব সময় তরল পারদ হবে, এমন গ্যারান্টি স্বয়ং খোদাও দিতে তিনবার ফেরেশ্‌তাদের সংগে পরামর্শ করবেন। শ্লথগতি গ্রামের আবেষ্টনীর মধ্যে বাঁধ তোলা জমির মত এই সব শহর যেটুকু স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে তা চাঞ্চল্যের পরিমাপে অতিশয় অকিঞ্চিত্‌কর। জীবিকার বাইরে থিতিয়ে থাকাই এখানে সহজ ধর্ম, যেহেতু পেশার পরিমাণও আঙুলে এক মিনিটে গণে ফেলা যায়। সুতরাং হঠাৎ কোন কাজ উপলক্ষে এমন জায়গায় ঘেরা হয়ে গেলে আর আপনার যদি মজলিস বায় থাকে তাহলে কালাকাল জ্ঞান ভোলার চেষ্টা পাবেন, মনের খোঁচানির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। সময়কে যে মহাত্মা নদীর সংগে তুলনা করেছিলেন, তাঁর নিশ্চয় কালের ধারণা এবং স্থানের ধারণা ঘোঁটপাক খেয়ে গিয়েছিল অথবা মফস্বল শহর তিনি দেখেননি।

চৈত্র-বৈশাখে উত্তর বঙ্গের দুপুর ঝিরিঝিরি বাতাসে কোন রকমে দেহের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়, যদি না পেশী-সংচালক কাজে অনেক মনোযোগ দিতে হয়। আগেই বলেছি, আমি নেহাৎ ছাড়া অখুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই গ্রীষ্মের দুপুরান্তে হাঁটছিলাম একা একা, লোকাল-বোর্ডের এক সড়ক ধরে—যার দু'পাশে আম বা অন্যান্য গাছের সারি সূর্য বিরোধিতার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সেই আদিম সৃষ্টির প্রথম থেকে। আর বাতাস স্রেফ কুড়েমির একটা অজুহাত দিয়ে ডালপালায় গতর চলেছিল, যেন অদৃশ্য এক ব্যজনী মানুষের আইঢাই ভাব মুছে নিতে তৎপর। অবিশ্যি মাটির উপর সূর্যের ছিটেফোঁটা যা একদম পড়ছিল তা প্রায় অস্বীকার করা চলে এই জন্যে যে, সে তো এই জংলা ডাঙায় কেবল রংবেজের কোন

নক্সা বিশেষ। ছায়াফিকের কালো বর্ণরূপে এই ডিজাইনের জমিন তৈরী করছিল স্রোতের বিরুদ্ধে খাড়া লগির মত বার বার কেঁপে কেঁপে। উত্তর বঙ্গের পথ আমাকে কাবু করতে পারবে না এই পরিবেশে, যতই না তার দীর্ঘসূত্রতা আঁকাবাঁক নিক্।

লোকালয় ছিট্‌কে ছিট্‌কে যেন জংগলের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যে ছু' একটা ঘরদোর খড়ো কুটির ভাসিয়ে দিলে, সহসা আর হদিস না পায়, কেউ। তারপর মানুষ নিরুদ্দেশ এই পৃথিবী থেকে, এমনই একটা থম্‌থমে ছুপুর তোমাকে কেবল বাঁশবন, বেতঝাড়, কাটা শেয়াকুলের জংগল দেখিয়ে দেখিয়ে ভূত বা ততোধিক ভয়খেঁচা কোন প্রাণীর মুখোমুখি দাঁড় করাতে চায়। অনেক ভেতরে ঢুকে গা ছম্‌ছমানি না এলেও, আমি অনুভব করছিলাম, এবার কাজের মত একটা কাজ পাওয়া গেছে, যার মোকাবিলার অবসর এবার হাঁফ ফেলবে ঠিক, আবার উদ্বেগও খোচানির মত গায়ে মেখে নেবে।

বাতাসের ঠাণ্ডা ছায়ার শীতলতা মনের উপর আলসেমির পলেস্তারা লাগায়, কিন্তু ঘুম বা বিশ্রামের ঠেস এগিয়ে দেয় না। আমার পা নিজ কার্যে মোতায়েন এক এক বার হয়ত গতি কমায় তবু থেমে যাওয়ার ভান করে না এই নিসর্গ-রাজ্যে যেখানে আকর্ষণের ক্ষমতা হিসাবকে ঘোল খাওয়াতে পারে। কিন্তু যতোই এগোই সড়ক এলোপাতাড়ি বাতাস-চেরা তলওয়ারের কায়দায় আশপাশে ঘুরতে থাকে, অথচ অবসর আমার নিজের শর্তে কাটবে বলেই তো ছুপুরের খাতিরজমা বিছানা বালিশ খেয়ালের পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি একেবারে কোন দিকে নজর না রেখে। এখন মনের উপর বাইরের কোন চাপান্ এলে তা স্রেফ ইজ্জতের খাতিরে বা বোকা নাম কেনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমাকে এগিয়ে যেতেই হয়, যেহেতু বাসায় আমার সংগীর বাধা ঠেলেই আমি একঘেয়েমির খর্পর-খড়গ ভাঙতে চেয়েছিলাম এই ভাবে। কাঠঠোকরা পাখির কাঠফোড়া আড়ঠেকা তাল, ডালপালার গদির উপর কাঠবিড়ালির কুদোকুদি, মিথুনকালীন চিলের চিল্লানী, একটেরে লজ্জাভীরু কালো কাকের কালো ব্যবহার, বন্য পতঙ্গের ক্রিক্রিক্রি-সুলভ তান অথবা বেতজংগলে হিসহিস শব্দ এসবের মধ্যে পিছল মনোযোগ কোন কিছু খুঁজে পেলেও সহজে সেখানে মৌরসী বাসিন্দা নাম নিতে গররাজি। অবসর নিজের পাঁয়তারা মোতাবেক নিশান ওড়ানোর জন্যে বাঁশ পোঁতে, যখন

কোন প্রকার বাইরের ওৎপাতা উঁকিঝুঁকি ঠিক তার গায়ে বর্ষার কেঁচোর মত কিল্‌বিলে ঘৃণার সমগোত্র ঠেকবে।

চারিদিকে তখন নানা রকমের স্টেশনে, কোন জায়গায় ঠেকে গেলে সময় হু হু কুমড়ো-গড়ান গড়িয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার, সাপ বা ওই জাতীয় কোন জুজু এসে আস্তানা খোয়ানোর খবরটা দিয়ে যায়। কিন্তু বে-লাগাম ইচ্ছার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এই রাজ্যের যত কীট-পতঙ্গ গাছ-গাছড়া মাথা খুঁড়ে খুব সুবিধে করবে ব'লে তখন অন্ততঃ অনুভূত হবার কোন কারণ কেউ উড়িয়ে দিতে পারত না। স্বীকার করে নিতে কোন ঘাট নেই, দিনের বেলা ভয়ের একটা হিসেব নিকেশ এমনই দাঁড়ি-পাল্লার নিচে থাকে, কিছুটা বেহিসেবী তো চেষ্টা না করেই হওয়া যায়। এই সব কথা বলছি এই জন্যে যে, পরবর্তী ঘটনার পরপর দ্রৌপদী-উন্মোচন সম্পর্কে আর তফসীর না দিলেও কারো বুদ্ধিগম্য হতে যেন বেশী হুড়কা বা হাড়কা জাতীয় কিছু অথবা কেবলাজীর ঝাড়ফুঁক বা মুরিদীর প্রয়োজন না থাকে।

ক্রমশঃ সংকীর্ণ ঘুঁজি-পুঁজি পথ, বৃক্ষ লতাপাতার আওতা এমন চোখের সামনে চাপা দিতে থাকে যে ছায়া কায়া ধরে ধরে গোটা সংকল্প টুটি-টেপা ছাগল ব্যাবানির হাড়িকাঠে জমা দেয়। অলস অবসরে গাছপালার রাজ্যে রবি ঠাকুরের নারীপানা অনুকরণে কোন কাব্যগজ শুড় উঁচিয়ে এলে না হয় সিংহাসনের লোভে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিতে পারতাম, নিতান্ত নসীব নির্ভর সেখানে হাঁক মেরে এলো মেহের আলী, যার হাতে বাঁশি এই দ্বিপ্রহরে চিকন বাউল সংগীতের নির্ভেজাল ধাতব ছুরি পাঠিয়েছিল গেরো গেরো বাতাসকে কেটে কেটে আবার ছিঁড়ে জোড়া দেওয়ার জন্যে। এই আলীর ভূমিকা কিছু আগে আর কিছু পরে এই ভাবে,—যেমনে, মানবেতিহাসের ব্যথায় একান্ত অপরিহার্য অতীত অতীত, বর্তমান অতীত, অতীত বর্তমান এবং বর্তমান বর্তমান ইত্যাদির ঠিকানা পরিচয় যার সর্বকাল রঞ্জিত ভবিষ্যত সহ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, কেবলমাত্র কতগুলো কারণে, যার হদিস এই কাহিনী সমাপ্তির পর সকলের বোধগম্য হবে, আশা করা যাচ্ছে।

ষাঁড়-দেহে, রক্তাধিক্য অথবা কি কারণে শিংয়ের ধার যাচাইয়ের বায়ু

চড়চড় করে ব্যাখ্যা দেওয়া সত্যিই মুশকিল, কেবলমাত্র বুদ্ধির অভাবের জন্য নয় অনুপান উপাদান এত বেশী যে সব চালুনি চোলাই আর মানুষের ক্ষুরে কুলায় না। সহসা বাঁশির আওয়াজ আমার কানে পড়া মাত্র মনে হলো, গুমোটকাটা আবহাওয়ায় আমি ভাসছি, চিৎ সাঁতারে যেমন আকাশকে চোখের উপর তুলে এনে তারি সঙ্গে মিশে গেছি ভারমুক্ত দেহটা আছে কি নেই। কিন্তু এই শব্দ বারনের আগেই ফুৎ হোয়ে গেল মুখাগ্নিকৃত হাউইয়ের সলিতা যেমন উৎসবের সংক্রামক উত্তাপে আগে থেকেই দাউদাউ উদ্দীপিত থাকে। আমি উৎকর্ণ. কানকে আবার বিচারক করে পাঠাই অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব এবং দূত যুগপৎ কিন্তু পিঠে অস্ত্র লেখা না থাকলেও ফেরৎ বীর ফেরুরই পর্যায়ে গন্য করা সামরিক বিজ্ঞানের আইন, যদি আবার রণ দিয়ে সব দখলের আশা নির্মূল না হয়।

এতক্ষণে আমি উন্মর্গ চিন্তা ছেড়ে পরিবেশের দিকে বিশেষভাবে সচেতন হই, হঠাৎ নির্বাপিত রবের লাঙ্গুল কোন গর্তের মুখে বেরিয়ে আছে আবার টেনে বের করতে হবে সেই আশায়। জংগল এবার জুজুবুড়ির লেবাসে ভয়ের সুতো-বাঁধা পুতুলগুলোকে দেদোল দুলিয়ে দিতে লাগল যেন হাওয়া-ভিলাষী আমার চোখেমুখে তারা সহজেই ভেংচি কেটে পগার-পারন সেরে আবার তখনই হাজির হতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি তাই বাঁশি তথা মানুষ, মানুষের ঠোঁট সুকপাল হোলে।

গোটা মানুষটাই পেয়ে যেতে পারি, এমন স্বোয়াস্তিআনা বাঞ্ছা নিয়েই পায়ের পেশী তেজেল করতে লাগলাম। কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ রূপান্তরিত কাঠখণ্ড আমি দু'চোখ মেলে কেবল দেখতে থাকি, একটা কালো আজরাইল মোটা গর্দান, ঘাড় ঝোলা বাবরি কেশ ভীম ভীষ্ম উঁচুকদ্ জবা-লাল গাঁজানো চোখ তেরিয়া রঙে এগিয়ে আসছে, কুকাণ্ড একটা কিছু ঘটানোই যার অভিপ্রায়ের মোদ্দা কথা। কাপালিকের মত তার গলার গুঞ্জামালায় আমি আমার ফাঁসি-ঝোঝুল দেহটা আগে থেকেই অবলোকনের সুযোগ পেতাম, যদি না তার ভয়ঙ্কর কালো হাতে আড় কেষ্ট বাঁশিটি আকস্মিক আমার চোখে পিছল ছোবল মেরে সরসর পরিস্থিতি বেমালুম খুলে ধরত খোলা ঝাঁপি আর খাড়া নাগিনীর পাশে বসা বেদেনীর কায়দায়। ধড়ে বুকে বেবাক নিরাপত্তা ফেরৎ জান্ আবার আমাকে আরোহী বানিয়ে

তোলে যে জায়গায় ছিলাম ভারবাহী জানোয়ারের নমুনা কাঁপা-কাঁপা মন, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ার জন্য একটা অছিলা শুধু কোনো রমমে ঝটকা মারার প্রতীক্ষা।

আমি কখন থেমে গেছি, আমি নিজেই জানিনে বললে, যদি মনে করেন মিথ্যা কথন হলো, তাহলে জোড় হাতে ভাত নেই বলে অতিথি বিদায় দেওয়ার মত, আমিও পথের পাশে দাড়াব না শুধু, চোখ রাঙাব এবং বলব: সত্যিই আমি দাঁড়িয়ে পড়ে ছিলাম, যখন সে আমার সামনে এসে আমার রাস্তা বিহ্বল চেহারা দেখে ঝুপো গোঁফের ফাটলে ফাটলে অনেক হাসি ছিরছির চালিয়ে দিলে, পানির উপর যেমন ছেলেবেলায় খোলাম কুঁচি ছুটিয়ে দিতাম, কচি মগজে আর কিছু বের করতে না পেরে। ঘটোৎকচের থুতনির নিচে তপোবনের কোন কিশোর ঋষি পুত্রের ন্যায় আমি ভ্যাবাচ্যাকা ভাব কোন রকমে কাটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে হাসি অব্যাহত রেখে বললে, "কুথা থেকে এলি বাবু এই জংগলে এমন অকাল বেলায় যে জান দিবি নাকি, জান্‌ঘরে তখন তোকে বাঁচাবে কে শুনি?" কথার সব অর্থ মগজ তাঁবে করার আগে এবার সত্যি আমার মেরুদণ্ড ছেনে ছেনে ত্রাসের ছিলকাগুলো অন্যান্য শিরাপথে যদ্দুর সম্ভব অষ্টাঙ্গের ধারে গিয়ে আবার চোঁ চোঁ দৌড়ে গেল উৎপত্তি স্থলে, যেখানে দিশেহারা পরিস্থিতি পড়ে নিলে চটচট এবং জবাব দিলে যেন সেই বান্দা চেনা জায়গায় ঘুরছে মাত্র, শুধু ভুগোলের বিদ্যা নিয়ে পাহাড়ে উঠছে না, পায়ে জুতা আছে, সংগে অক্সিজেন রয়েছে।

"জান্‌ঘর কিরে?"

"জান্‌ঘর চেনেন না?"

"না।"

"জান্‌ঘর সাহেব, আপনেরা যারে মরগ মর্গ না কি যে বলেন।"

'মর্গ' শব্দে আমি কেয়ামতের পর পুনরুজ্জীবনের অধ্যায় সেরে আদমের মত আবার পৃথিবীতে নামছি, পাশ ঈভ-হীন, আর চন্দ্র সূর্য বোঁ বোঁ ব্যোমচারী হেঁকে উঠছে, 'কোথায় যাও, দুনিয়ায় অনেক ঝামেলা, তার চেয়ে এইখানে একটা ঈভ জোগাড় করে নাও, সব ঝামেলা ইতিমধ্যে মিটিয়ে নিতে পারো। তবু তুমি সত্যিই মাটির উপর পা রেখেছো এবার নিজের ইচ্ছায় চরে খাও।'

অর্থপূর্ণ অবসর যাপনের জন্যেই সব যোয়ার এই জন্যে পর্যটন এহেন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে মনের স্বস্তি লোপাট হতে হতে আবার খাড়া হয়ে উঠল একটি শব্দের কৃপা নাদে, যার যোজনা এই বিকেলে কোথায় কি যবনিকা নামাবে কে জানে? তাই আমি তার দিকে চেয়ে, ভান করে বসি, যেন ভয় পাইনি, তুমি এবং হাতিয়ারধারী দস্যু হলেও আমি রাজার প্রতিনিধি এবং আমি অস্ত্রসজ্জিত, তা ছাড়া আমার পেছনে আরো আছে যারা দরকার হলেই তোমার হিসেব নেবে।

"জান্‌ঘর কোথা?"

পরিবেশ আমার কবজে এসে গেছে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি, যখন আমার মুখ দিয়ে আরো জিজ্ঞাসা থলিক্রান্ত গোলআলুর মত হুড় হুড় বেরিয়ে আসার জন্যে দপাদপি করে এবং একটা বুলেটের মত ছিটকে প্রশ্নোবোধক চিহ্ন হয়, "তুমি কে?"

"আমি জান্‌ঘরের ডোম, আমার বাপের দেওয়া নাম হীরালাল ডোম, সারজন সাব বলেন, হীরু।"

"জান্‌ঘর কোথা?"

"ওই—"

ডোমের গাইড তর্জনী তার বাঁকা ঘাড়ের সঙ্গে গিয়ে থামল, আমার সম্মুখে ডানদিকে গাছপালার ঝাঁঝরির ভেতর দিয়ে একটা দালানের উপর, যার একতলা মূর্তি শেওলার মোড়কে হঠাৎ দাঁত বের করা চুনকামের শাদায় এবং ছাদে হুমড়ি খেয়ে পড়া ডালপালায় এই জয়ীফ বৈকালের চটা আলোয় শুধু প্রাগৈতিহাসিক বললে সঠিক জরীপ করা হবে না। দৈত্য-লণ্ডভণ্ড শৈলশিরার মত এই ইমারৎ কালিদাসী মেঘ নয়, তবু সুখী-জনের চিত্তশান্তি হজম করার জন্যে যথেষ্ট এবং ক্রমশঃ খতম-দিনের ভ্রূকু-টিতে ভয়ঙ্কর। সাত'শ রাক্ষস এবং সাত'শ রয়েল বংগল এক সঙ্গে বহুদিন উপবাসের পর একটি টিংটিঙে মানুষ দেখলে যেভাবে হুহুঙ্কারে চীৎকার প্রতিযোগ প্রতিযোগিতায় মত্ত হতে পারে আমার ত্রাস শিরার দল তেমনই আমার ব্যক্তিত্বঘাতী, বিরোধিতায় হু-হু সচল চঞ্চল আপন গতিপথে হন্যে। শিকারও চীৎকার দেয় শিকারির মত, তেমন আমি ভয়ার্ত স্বর গোটা এলাকা এবং গোধূলির নার্ভে ইনোকু্যলেট করতে পারতাম খুব সহজেই,

ডোমও বাদ যেতনা হয়ত। এই অনিশ্চিয়তা বাধা দিলে, বোমবাজির ভিজে সলিতা আগুন দেওয়ার পর মাঝপথে ফুসফুস বারুদ ছড়িয়ে আর না এগোলে বালক ফুঁ-দানে তা নিষ্পন্ন করতে গেলে গুরুজনেরা যেমন বারণ হানে অন্ধত্ব পংগুতার দোহাই টেনে, সেটুকু হিসেব মন অবশিষ্ট ছিল। নির্বন্ধ অবসর আবেষ্টনীর মোহে এতক্ষণে মজ্জমানের খড় ধরতে পেরেছে বিধায় আর সহসা একঘেয়েমির খোঁয়াড়ে ঢুকতে নারাজ নয় শুধু, যে-টোপ গিলেছে তা টাকরায় লাগলেও সহজে উগ্রে দিতে অনিচ্ছুক। সব ঝেটিয়ে গলা তাই পরিস্থিতির লাগাম হাতে নিয়ে ক্ষুদে-ভাঁটা চোখ ডোমকে বললে, "আমাকে ওইখানে নিয়ে চল—।"

হীরু সংক্ষেপে বয়ান করলে, এই নির্জন বিপদ একমাত্র কোন প্রাণতৃষ্ণাহীন প্রাণী অথবা মসিবত লোভী দুঃসাহসী, স্রেফ চোয়াড় ছাড়া কে আর চুলকে ঘা করার মত, খুঁচিয়ে গায়ে মাখতে যাবে, যখন খোদ সার্জন সাহেব গায়ে শামলা চড়াতে চড়াতে দোয়া দরুদ পড়েন এবং সাঁড়াশি কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় কি যেন উচ্চারণ করেন লাশের উপকার চাদর তোলার আগে, যেমন সেদিন নয় শুধু (এবার এক যুবক এসেছিল, তাকে খুন করে এক মেয়ের স্বামী যে ওই মেয়েকে উক্ত যুবকের সংগে একত্রে বিহার করত বিয়ে করার আগে, তখন ভোগ্যা ছিল বারবনিতা কাজেই তা সংগত ছিল এবং কবুলিত অনুসারে একের জমি অপরের দখল যখন অবিধেয়, তখন ছোরা দিয়েই আইন অক্ষত রেখেছিল, যদিও বৈধ বিবিকে ক্ষত করেনি শয্যাক্ষেত্র ছাড়া যেখানে নাকি সব মহাপুরুষই পুরুষ) বহুদিন তাকে এই করতে দেখা গেছে, তখন প্রেতের রাজ্যে ঘাড়ের হাড্ডি যাচাইয়ের জন্য প্রবেশ মূর্খতা যদিও সেত রোজ যায়, তা কেবল পেটের আঁকুশিতে, বিবির গঞ্জনায়, তদুপরি হাড়িয়া পচুই তাড়ির ভরভর গন্ধে যা ব্যতিরেকে দেহ দূরের কথা আকাশ খান-খান হয়ে যাবে ঈসরাফিলের শিঙগা ছাড়াই। কত মহেঞ্জোদাড়ো ওই ছোট দালানের মধ্যে আলিশ ভাঙে, কংকালে কংকালে ডুগি বাজিয়ে, কলসের পাশে পিপাসার্তের বল্লম গাঁথা দেহ হুমড়ে যেন অতর্কিত হামলা চিরাচরিত এই রাজ্যে, বিনা ঘোষণায় নৈরাজ্যের তরঙ্গ ধ্বসে দেহমনে। বেল্লিক দুঃসাহস যদি আমার বায়ে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে তা পারাপারের একমাত্র উপায়, কিছু কারণ-বারি—সমুদ্র সাঁতরানো যেন ডাঙা আর চোখে

পড়ুক, বা নাই পড়ুক, মাটিতে ঠেকুক বা নাই ঠেকুক, অনন্তকালে গিয়ে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারবো, টেরের প্রয়োজন হবে না।

অগত্যা তাতে স্বীকৃতি দিতে হলো আর এক গন্তব্যে পৌঁছে তা বুঝতে পারলাম, সেখানে জংগলের মধ্যে ছোট উঠান আর পিঁড়ির পরিবেশন দেখে এবং মাটির মালসায় সাদা ফেনা-ফণাধর তাড়ির বেদেনী বিভাস কানে শীষ দিচ্ছে টের পেয়ে, এবং অনুভব করলাম, এই বিজনে ডোমপাড়া যা আছে, তার সংখ্যা জনপদের নির্ভরতা নিসঙ্গতা দূর করে না, বরং শ্বাপদের লেজ আছড়ানি এবং নিংসৃত জিহ্বার হিসহিসানি লতায় বাতাসে আরোপ করে, ভয়াবহতা পুণ্যফলের মত সত্তর গুণ বাড়িয়ে তোলে এবং তুমি ভয় পাও আর না পাও মনে হবে তোমার ছায়া অন্ধকারেও তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আততায়ীর মত নয়, অক্টোপাশী মুলোও দংষ্ট্রার আকারে। কয়েক ঘোঁটের পরে জানতে পারলাম, ডিসপেপসিয়া রোগী কেরানির খোয়াবে অফিসর বনে যাওয়ার মত আমার সাহস মোটা পুরু, ভরসা এলাহি ছাড়াই, শূন্য ও গগনভেদী হচ্ছে, আর আমি নিজের খাপ থেকে বেরুনো এক বাঁকা তলওয়ার, যে কোন পাহাড় কেটে বেরিয়ে যাবো না কেবল, বরফের উপর স্কেটিং পর্যন্ত করতে পারব, তা এক ডাকে বলতে পারি, যা মাতালেরা হামেহাল করে থাকে। যে ডোমনী আবেহায়াত ঢেলে দিচ্ছিল তার দিকে আমি চাইতে সাহস পাইনি, শুধু তার মৌরসী বাঁধা যৌবনের জন্য নয়, যা এক লহমায় করে চুমুক মেরে নিয়ে ছিলাম, তার হাতের পেশী এবং বালা মাভৈয়ের ধারে কাছে যেতেও ঘাড় বাঁকায় অপিচ শাসানির শংকরচাবুক সদা ঝুলন্ত রাখে, যেন সার্কাস সিংহিনীর ট্রেনার, বশীকরণ গুরু। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, ধীরে ধীরে পানির সমতলের মত মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘুচে গিয়ে এক আবেগহুল্লোড় কলরবে সব টুইটুম্বর রূপ ধারণ করে এবং ইচ্ছা নিজের গতিপথে এমন বেগবান হয় যে অভিষ্ট কাজের দিকে হন্তে হয়ে ছুটতে থাকে, তা-ই আমাদের গ্রাস করছিল নিঃশব্দে, এক চুমুক এবং ফেন গুঞ্জরণের ব্যাঘাত ছাড়া। ওদিকে কালো ছায়া ফেলছিল রণ-পা দস্যুর মত স্থান এবং কাল ডিঙিয়ে খরা দিন, আমাদের এই আসরের অলীকতা প্রমাণ করবার জন্যেও বুঝিয়ে দিতে যে, উদ্দেশ্য এবং উপায় ঘুলিয়ে ফেলে ধার্মিক বা সমাজসংস্কারকের

যে দশা হয়, সেই বুমেরাং আমাদের ক্ষেত্রেও আত্মভেদী হতে বেশী দেরী নেই। তাই হঠাৎ মাটির মালসা আছড়ে রেখে 'জানঘর' এই রণ চীৎকার যোগে আমি উঠে পড়ে ডোমের অনুগমন ব্যবস্থা স্থির করব কি যে আমার হাত ধরে পথ সচেতন সবক দিলে এবং চলতে লাগল পেছনে ফেলে আসা মার্গের উদ্দেশ্যে, আমার গন্তব্য যেখানে আগেই সব মর্টগেজ দিয়ে বসে আছে রেহেনী করুণায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাল্লারত পা, চোখ হুমড়ি খাওয়া লতার আচ্ছাদন বাহু বন্য ঘাসের গতিহর ষড়যন্ত্র ঝেটিয়ে যখন মর্গের দরজায় থামল এবং হীরু ডোম মোটা সাত লিভারের তালা খুলতে, ভেতর থেকে একটা ভোদ্‌কা গন্ধ ঝেঁঝিয়ে নিশ্বাসে স্বাভাবিক ঝুঁটি-ঝাকানি দিল তখন অন্তস্থিত সোমরস পর্যন্ত চল্‌কে বাইরে আসার জন্যে আঁকু-পাকু করতে লাগল, যেন দোজখের দরজার মত এখানেও লেখা ছিল "প্রবিষ্ট-জন তোমার সমগ্র আশা পরিত্যাগ ক'রে এইখানে এসো"। কিন্তু কারণ-বারি আসলে হেতুজল, বিশ্বসৃষ্টির প্রথম হেতুর মতই রহস্য সজ্জিত, যার ঝাঁক ঝলক পরমাণু মুহূর্তেও নিবারণসাধ্য নয় বলে আমরা উভয়ে যখন ঢুকে পড়লাম, প্রবেশকণ্ঠ দিনের আলো চোখের ধাধায় মেঝের উপর দিয়ে আমাকে বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করলে।

বাতাসের সাহায্য নিতে হীরু ডোম একটা জানালা খুলতে, চোখ ও বুক একত্রে সহযোগী দেখতে লাগল, একটা হল্‌, তিন চারটে কংক্রিটের মেজ, পাশে ছোট কুঠরি যেখানে সার্জন বসেন সামনে টেবিল ও কিছু যন্ত্রপাতিসহ, যথা ফরসেপ, সাড়াশি ইত্যাদি ডেটল তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি বেসিনের কাছেই রাখা, যার কিছু দূরে শিলিং থেকে ঝুলছে একটা দেয়াল্‌গীর বাতি, বোধ হয়, কোন সময় রাতে দরকারে ব্যবহৃত হয়। তখনও বাইরে আলো আছে বলে এই সব জরীপ সম্ভব হচ্ছিল, যদিও টলোটলো মাথা এবং অভাবনীয়ের এমন সাক্ষাৎ ঘুলিয়ে তুলছিল ভয়াবহতা যার চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ, তখন যা মদিরা ঈক্ষণ মনে হয়েছিল মাত্র। একটা বাঁশের চোঙায় কোমরে গোজার, এত হুল্লোড়ের মধ্যেও স্থিতাবস্থা রচনার কারিগরি ইলেম প্রদর্শন। সে নির্বিবাদে এবার নিজের চোঙা নিঃশেষণে মন দিলে, যখন আমাকে অবান্তর ভেবে নাকচ করলে না শুধু, বরং চুপ করে গেল যেন আমি এবার এক লাশ, যাকে সে এইমাত্র কাঁধে বয়ে

নিয়ে এসে মেঝের উপর না ফেলে মেঝের উপর খাড়া করে দিয়ে বিশ্রাম করছে, এখনই যে ডাক্তার আসবে তারই অপেক্ষায়। বাইরে বনজ শব্দ চঞ্চলতা ছাড়া আর সব নৈঃশব্দের লেফাফাধীন সংকীর্ণতার, নিঃশ্বাসও যেখানে মজ্জমান আর তার তলায় আমি খাবি খাচ্ছি কোন উদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বরং সে দিকের ধারণা মনে বুদ্‌বুদ্‌ও তোলেনি। আমিও অনড় হয়ে গেছি, শুধ্‌ সকেটে চোখ ঘুরছে, আরো কিছু দেখার জন্যে নয় কেবল অর্থোদ্ধারের চেষ্টায়, যা বার বার প্রতিহত হচ্ছে আলো আধারির মাকু ঠেলায় এবং এই নির্জনতার আক্রমণে। হীরু এখন সেই গাঁঠরিবাহক যে মাল ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই খালাস, তার আধেয়ের খবরদারি নেওযার ধার তো ধারেই না, নিজের মজুরি গ্রহণের ব্যাপারেও চাড় দেখানোর বিরোধী। আমাকে তখন ঘরের মেঝে গিলে ফেলেছে গিরি-সর্পের মত কোমর পর্যন্ত, বাকী অর্ধাংশ আকাশে হাত তুলে বিপদত্রাণ প্রার্থনা করেছে ভক্ষকের নিকট, যেন ঈশ্বর আছে বা নাই—যাকে বানাই ব'লে আছে বা আছে ব'লে বানাই।

কিন্তু এই অনড় কালের পরিধিতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় কেবল-মাত্র অপেক্ষার জপমালা টিপে টিপে, যখন শরীর বাঁধে বাঁধা হলেও আবার যুগপৎ ডাঙায় তৃষ্ণার কাতর। খড়কুটো ধরার জন্যে যখন হাত বাড়িয়েছি সবে, তখন পূর্বমুখী এই ঘরের বায়ুকোণে দেখা গেল মেঝের উপর ময়লা চাদর ঢাকা কি যেন শোয়ানো আছে, যার অবস্থান দেখে কোন কিছু আন্দাজ আপাততঃ মুশকিল হলেও, মনের একটেরে তা চিহ্ন রেখে যেতে পারে ব'লেই আমি হীরুর খোঁয়ারিতে তুরপুন-যোগে হেঁকে উঠলাম (তখন অন্ততঃ তা-ই মনে হয়েছিল) নিজের জায়গায় যথারীতি খাড়া, "ওটা কী।"

ডোম-বংশের তার ধারেকাছে গেল না বরং চোঙা এক মেজের উপর রেখে আলিশ ভাঙলে, সারগাদার কুকুর যেমন বিবাহ ভোজের মেহ্‌মানি সেরে ঘুমের পর খাড়া হয় কুচকানো শরীর সটান করার জন্যে আগলি পিছলি ঠ্যাঙ দেহ ছাড়া করতে চায়, প্রায় তার অনুকরণ।

"ওটা কী" আমার জিজ্ঞাসা আবার অসমাপ্ত পথের অনুগমনে রত, তখন ডোম অট্টহাসি অমন হেসে উঠল যে, একতলা দালানটা থর থরাতে লাগল, যেন মশকবাহী এই আড্ডারই কম্পযোগে ম্যালেরিয়া শুরু হলো,

যার দাপট তপ্ত স্পর্শ স্রেফ বিকার,—মৃত্যুর মুখবন্ধ। আমি ভয় পাইনা বটে, কিন্তু মেরুদণ্ডে এক রকমের শিহর অনুভব করি এই ভেবে যে, এখন বিকটদর্শন ভীমাকৃতি নেশাসক্ত মানুষটা খুন করে বসলে, দেখার কোন লোক নেই এবং আমাকে মরতে হবে এক অপঘাতে মৃত্যু যার গ্লানি আত্মহত্যার মতই করুণ। কিন্তু হীরু সহসা হাসি থামিয়ে অভয় ছড়ালে না শুধু আমাকে নিছক শূন্য ভেবে নিজের মনেই বলে যেতে লাগল পাগ-লের স্বগতোক্তির মত, "পাঁচ মাইল ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এলাম, একটা লোকও নেই, উঃ ঘাড় পিঠ ব্যথা করছে, তারপর আবার এতো কথা, দুর ছাই সব ছেড়ে দিয়ে পালাব...।" আরো কত কি সে বলে যেত খোদা মালুম, আমি আবার বাধা দিয়ে বসলুম যেন সে আর মুখ খোলার একটু ফাঁক না পায়, "কি ওখানে?" তারপর একটানা চীৎকার দিয়ে ভয় ঘোচানো কায়দায় জিজ্ঞেস করে বললাম, যার মোদ্দা অর্থ তুমি যতক্ষণ না জবাব দিচ্ছ আমার মুখ আর থামবে না এবং এই উত্তর আমার চাই-ই।

কিন্তু শ্রীমান ডোম নিজের বন্দুকে মোতায়েনই রইল, মুখ খুললে না, বরং কাজে লেগে পড়ল এবং তার প্রথম কিস্তি দেখালে, চাদরখানা তুলে ফেলে এবং সংগে সংগে দ্বিতীয় কিস্তি ভেসে উঠল, যার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না বলেই চীৎকার করে উঠলাম, "না, না, ঢেকে দাও, ঢেকে দাও...।" বুকে ছোরা বিদ্ধ এক তরুণীর লাশ মেজের উপর ল্যাংগা পড়ে আছে, ঊর্ধ্বমুখ শয়নে, আপন ম্লান রূপের প্রদীপে জ্বেলে রেখেছে কৃশ চরণ শেষে ক্রমশঃ গঠন-মরিচীকার পশ্চাতে বেপথু উরুজীর গিরিভূমির পর সীনার উপত্যকা, যার মাঝখানে ক্রুশের মত ছোরার বাঁট খাড়া নাক এবং কালো কেশগুচ্ছের ঘনিমায় সমান্তরাল, আলতার মত রক্তের দাগে রঞ্জিত। মাটির সংগে গাঁথা আমি দেখছিলাম, দেখছিলাম চোখ মেলেই দৃষ্টির অর্থবোধ শক্তি ঘুচিয়ে যেমন আগুন ভেল্‌কি লাগায়, যখন সব পোড়ে অথচ তুমি দর্শক যেখানে তোমার শরীকদার হওয়ার কথা। চেতনা নিজের এলাকায় ফিরে এলে, তাড়ির নেশা আর থই না পেয়ে আমার গলায় চাপ দিতে লাগল, যার পেষণে চিৎকার,...কণ্ঠশিরার ভেতর দিয়ে ফেটে ফেটে বেরুতে লাগল, যেমন গ্রামারণ্যে...বাঁশের বুকে নির্গত ভয় এবং বিষণ্ণতাবাহী আওয়াজের কাতর।

মর্গ দেখার কথা, সেই জায়গায় লাশের সম্মুখীন আমার শরীরে তখন ঘাম ছুটছে এবং জানার কৌতূহল (পরে জেনেছিলাম এক রমণীর দুই গুণ্ডা প্রেমিক স্রেফ সম্পত্তির লোভে দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত এই খুনে নাটকীয়তার পরিণতিই অবধারিত করে তুলেছিল, আর কোন গত্যন্তর ছিল না) কবেই উবে গেছে যে শুধু এখান থেকে রেহাই পেতে আমি দরজার দিকে ছুটলাম, যা হীরু রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। দুই মেজের মাঝখানে আরো রোধ করলে না কেবল, আমার কাছে এক প্রস্তাব দিয়ে বসল সাহায্য পাওয়ার আশায়, তা টাকাকড়ি হলে আমি ত রাজি নয় তখনই পূরণ করে ফেলতাম। লাশটা সরিয়ে আর এক টেবিলে রাখতে হবে এই জন্যে যে, এই অবস্থায় নারী দেহ ফেলে রাখা তাদের শাস্ত্রে অশোভন এবং মুখটা ফিরিয়ে দিতে হবে যেদিকে ঈশ্বর আছেন মৃতজনের আত্মা কোলে তুলে নিতে বা তুলে নেওয়ার পক্ষে সহজ নয়।

"আমি পারব না, পারব না। তুমি ঢাকা দাও।" ককিয়ে উঠলাম ভয়ে এবং ডোমের ভাটা ঘূর্ণী চোখের উপর চোখ পড়া মাত্র দৃষ্টি সরিযে যেন আবার আদেশ ফরমান স্বরূপ মেজাজের লয় আরো বিষুবরেখার দিকে ঠেলে নিয়ে না যায়।

"শাস্ত্র মানো না?"

ঠোঁট থেকে এই বুদ্‌বুদটুকু তুলে ডোম যেন কালী সহায় ডাকিনীর মত আমার দিকে এমন মুখভংগী করে দাঁড়ালে, মনে হলো ওই তরুণীর বক্ষ ছোরা তুলে নিয়ে এখনই আমার বুকে বসিয়ে দেবে এক লহমায় যে আমার টের পেতেও বোধ হয় বিলম্ব ঘটবে যদিও তার জবাব আমি এখনও সরাসরি দেইনি।

মুমূর্ষ দিনের রশ্মি-মদৎ ত্রাসের মাত্রা উস্কে দিচ্ছে. যখন আমিও মরিয়া আখেরী চীৎকারে আবেদন ছুঁড়লাম, "না, না, আমি মুদ্দফরাস হতে পারব না, আমাকে যেতে দাও, যেতে দাও...।"

"মুদ্দফরাস হবে না?" দাসের উপর প্রযোজ্য এক রকমের ব্যঙ্গ কথা তিনটে উচ্চারণ করে, ডোম হা হা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, আবার ক্লেদোক্তির অনুকরণে দার্শনিক সেজেই গলা বদলে বললে, "জান্‌ঘরে অন্য রাস্তা নেই... হয় তুমি মুদ্দফরাস নয় লাশ..." কারণ-বারি সম্মানের বেড়াগুলো এমন

ভেঙ্গে দিয়েছে যে, ডোমটা এখন আমাকে আর ভদ্রলোক বলে মানে না বলেই সমানে সমানে আলাপ করতে লাগল, মাঝে মাঝে প্লীহা তড়পানো অট্টহাস্যের বহর অব্যাহত রেখে।

"না, না আমি মুদ্দফরাস হতে পারব না," আমার কথা চীৎকার এবং ভয়ার্ত মিনতির সমাহার, যখন যুগপৎ ডোমও হুঙ্কার ছাড়ে শাস্ত্র এবং আইনের দোহাই তেহাই রূপে মেরে।

"আমি আর কিছু যে কিছু হতে চাই, আমি রাজি আছি।"

"এই জান্‌ঘরে হয় তুমি লাশ, নেইত মুদ্দফরাস, অন্য রাস্তা বন্ধ।"

"ও আমি হতে পারব না।"

"তবে তুমি লাশ হও" ডোমটা একবার গুড়িলাফ খেয়ে বাহুর পেশী ফুলিয়ে যেভাবে আবার দাঁড়াল, তখন আমি কয়েক মুহূর্ত হতবাক থেকে পুনরায় চীৎকারে ফেটে পড়লাম। "আমাকে আর কিছু বানাও, আমি প্রস্তুত।"

"জান্‌ঘরে তুমি পোকা-মাকড় হতে পারো, যাদের দেওয়ালের গায়ে তাকালেই দেখতে পাবে।"

"না তা কি সম্ভব?"

"আর তুমি হোতে পার তেলেপোকা কি টিকটিকি।"

ডোমের মাথার রগ ক্রমশঃ যেন ফুলে ফুলে উঠছে গোটা কপাল জুড়ে আর দুই চোখ দোজখের লাটিম রূপে যেভাবে ধ্বকধ্বক করে উঠছে অক্ষি-কোটরের ভেতর থেকে, আমি প্রমাদ আর গুণতে পারছিলাম না, কারণ সে শক্তি উধাও...আমি থাপ্পড় লাগার পূর্বে গালের মত শিরশিরাণী অনুভব করতে লাগলাম।

আবার গর্জে উঠল নেশাজড়িমা কণ্ঠ, "তুমি কি হতে চাও?"

আর অনুনয় নয়, প্রাণরক্ষী আর্ত চীৎকারে আমি শ্বাসরোধী মর্গের মেঝের উপর পৃথিবীর শেষ মানুষের মত উচ্চারণ করলাম, "আমি মানুষ হতে চাই, আর কিছু না। আমি চাই পাখী গান যা এখানে নেই, আমি চাই ফুল বাগান, যা এখানে নেই, চাই দেহ—গোঁজনীড় বসুন্ধরার সর্বসাধ আতিথ্য, পাকাধানের সৌরভ, চাই সুহৃদ—যাদের কথা কবিতা, আলাপ উত্তাপে বসন্ত নিশ্বাস, আর আমি চাই নারী, স্বাস্থ্য নীড়, তাতাপ্রেমী

নারী...শ্রোণি স্তনভারে প্রপীড়িতা, যাকে নতজানু হয়ে আমি বলতে পারি ভদ্রে গগনে পাপ শশধর তোমার অভিসারের অন্তরায়, জমিনে তোমার স্তনভার তোমার গমনের বিরোধ কণ্টক, এসো ওই বক্ষবোঝা আমার করঞ্জালিতে ন্যস্ত করে পালক লঘু তুমি নিঃশঙ্ক হও পদক্ষেপে, বিশ্বাস রাখো, আশ্বস্ত হও আমি কোনদিন অঙ্গুলি ভঙ্গ করব না, যেহেতু রূপ ছাড়া আর কিছু আমার পূজ্য নেই পৃথিবীতে...।”

আমার নিজের খেয়াল ছিল না, কিভাবে বেরিয়ে আমি পরিচিত নির্জন পথে দৌড়াচ্ছিলাম, আর পেছনে কোন অনুসারক, ধাওয়াকারী না থাকা সত্ত্বেও বারবার কেবল মনে হচ্ছিল, জান্‌ঘরের ব্যাদন-ভয়াল হাঁ-মুখ দরজা দ্রুত ছুটে আসছে আজ্‌দাহার সাপের মত লালাসিক্ত লেলিহান জিহ্বায় আটকে আমাকে গ্রাস করার জন্যে, আমাকে গ্রাস করার জন্যে।

ছেদ

আবু রুশ্‌দ

আর পারা যায় না। নঈমা নিত্য গঞ্জনা দেয়ঃ নিজের বউ ছেলেকে খাওয়াবার মুরোদ নেই, মরদ হয়ে জন্মেছিলে কেন?

মরদ হয়ে জন্মালেই যে সব সময় বউ ছেলেকে খাওয়াবার মুরোদ হয় এই ধারণা নঈমা কোথা থেকে পেলো সে-ই শুধু জানে। তবে কেরানীর চাকুরী করে নজমুল যে বউ ছেলেকে যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াতে পারে না এটা ঠিক।

দশ বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে—ছেলে মেয়ে হয়েছে চারটি। প্রথম ছেলেটা নঈমার্ বাপের বাড়ীতে হয়েছিল। ছেলা হওয়ার সব কিছু খরচ তাঁরাই করেছিলেন। পরের তিনটির জন্য সেখান থেকে তেমন সাড়া না পাওয়ার দরুন দাইয়েরই শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। শেষের তিন বারের কোন বারই নঈমা একসঙ্গে দশ বার দিনের বেশী বিছানায় থাকতে পারেনি। দরকার হলেও বা ইচ্ছে করলেও সংসারের ঝামেলা তা হতে দেয়নি।

অথচ, এখানেই খোদার রহমতের আভাস, নঈমার শরীরটা এখনও অটুট। এমন কি কোথাও একটু ভাঁজ পড়েনি। কি করে কম খেয়ে নিত্য অভাবের সঙ্গে যুঝে নঈমা তার শরীরটা এখনও ঠিক রেখেছে নজমুল তা বুঝতে পারে না।

অবশ্য নঈমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ে—মাঝে মাঝে বিস্কুট-লজেন্স নিয়ে আসে। সেগুলি তো বাচ্চারাই খায়। আর নঈমাও যদি চুপি চুপি সেগুলোতে ভাগ বসিয়ে থাকে, তবে শুধু তাতেই তো তার দেহে এত পুষ্টি আসবার কথা নয়।

নিজের দেহ সম্বন্ধে, এই এত অভাবের সংসারের মধ্যে নঈমা বেশ সচেতন। বাজার খরচা থাকুক বা না থাকুক তার নারকেল তেল চাই-ই। নঈমাকে মাথার চুল শুকনো রাখতে নজমুল খুব কম দেখেছে।

একবার সপ্তাহখানেক এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেবার বড় ছেলে খালেদ, বয়স যখন তার বছর চারেক হবে, শীতে প্রায় সারাদিন শুধু একটা ছেঁড়া গেঞ্জী পরে থাকবার দরুন, কঠিন অসুখে পড়েছিল।

প্রথম তারা চালিয়েছিল হোমিওপ্যাথি—পয়সা কম লাগে বলে। তবে রোগের যখন তাতে কোন উপশম হল না তখন বাধ্য হয়ে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তারা আনিয়েছিল, বহু কষ্টে ধার জোগাড় করে।

ডাক্তার বললো নিউমোনিয়া। তবে সময় মত ধরা পড়াতে ভয়ের কিছু নেই।

সেবার একসঙ্গে সাতদিন নঈমা মাথায় তেল দেবার কথা ভাবতে পারেনি। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছেলের সেবা করেছিল। চুলে তখন তার বেশ জট ধরে ছিল বটে, তবে সেবার তা মা হিসেবে তাকে দেখতে নজমুলের চোখে আরও যেন ভাল লেগেছিল।

এক রাতে খালেদের অবস্থা খুব খারাপের দিকে গিয়েছিল। ডাক্তার আবার ডাকা হল, ইনজেকশন দেওয়া হল, ওষুধ আনা হল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রায় সারারাত জেগে অসুস্থ ছেলের সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল।

নঈমা তাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিতে বলেছিল—সারারাত জেগে শরীর যদি আবার ভেঙে পড়ে তবে আর এক মুসিবত।

—ঘুমোনো তোমারই বেশী দরকার! নইলে একা মানুষ এত ঝামেলা পোহাবে কি করে? স্বামীর কথা শুনে নঈমা হঠাৎ রেগে উঠেছিল: নিজের ছেলের সেবা করা ঝামেলা নাকি?

—তাই বললাম বুঝি, সংসারের কাজও তো আছে! জবাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নঈমা হঠাৎ স্বামীর খুব কাছে সরে এসে ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল: ছেলে আমার বাঁচবে তো!

স্ত্রীকে বাঁ হাতে বেষ্টন করে নজমুল গভীর আশ্বাসের স্বরে অভয় দিয়েছিল: আরে বাঁচবে না কেন, আজকাল নিউমোনিয়াতে লোক কি আর সহজে মরে? কত ভালো ওষুধ বেরিয়েছে।

ছেলে ভাল হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সে নৈকট্যবোধ আর বেশী দিন থাকেনি। আবার সেই দিনের পর দিন অভাব। ছোট মেয়েটা

একেবারে দুধ পায় না, মেজছেলের কামিজটা এত জায়গায় ছিঁড়েছে যে আর তালি দিয়েও পরবার উপায় নেই। নঈমার নিজের পরনের শাড়ী দুটোয় এসে দাঁড়িয়েছে– তার একটা আবার ছিঁড়ি ছিঁড়ি করছে।

অবিরত অভাবের এই ফিরিস্তি শুনে নজমুল এক একবার খেপে উঠতো : পয়সা কি আমায় চুরি করতে বলো ?

—তা আমি কি জানি, নঈমা উল্টো ঝেঁঝে উঠতো, তবে পয়সা কামাই করা তো মেয়েদের কাজ নয়।

—না-ই বা কেন ? শুধু পুরুষের ওপরই সমস্ত ঝক্কি পড়বে কেন, তুমি কিছু আয় করতে পার না। শেষের দিকে নিজের অজান্তেই নজমুলের গলার আওয়াজ একটু বেঁকে গিয়েছিল।

—কিভাবে আয় করবো ! পথ বাংলে দাও না।

—কেন সেলাই-টেলাই তো করতে পার।

—ওরে আমার মরদ রে, সেলাইয়ের দশটা কল যেন আমায় কিনে দিয়েছে। শরম হয় না নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপাতে ?

তার ভেতরটা তেতো হয়ে উঠলেও এর কোন জবাব নজমুল দিতে পারতো না--তাই চুপ করে যেতো। তবে এই যে চুপ করে যেতে হয় এটাতেই সব চেয়ে বেশী দাহন। মরদ হয়ে জন্মালেও সত্যি তার মুরোদ নেই।

একদিন দূরাত্মীয়টা এসে প্রস্তাব করে : চলুন দুলাভাই, আপাকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসি। 'মহল' ছবিটা নাকি বেশ ভাল হয়েছে।

সিনেমা দেখবার সখ থাকলেও সে নিজে গেলে সমস্ত খরচটা বাধ্য হয়ে তাকেই দিতে হবে এ-কথা মনে হওয়াতে নজমুল কথাটা একটু কৌশলের সঙ্গে ঘুরিয়ে নেয় : না ভাই, সিনেমা দেখা কি আমাদের পোষায়, তোমার আপা যেতে চাইলে তাকে নিয়ে যাও।

আর, নজমুল কিছুটা আহত হয়ে লক্ষ্য করে, নঈমাও সহজে রাজী হয়ে যায়। কিছুটা সেজে গুজে ক্যাম্বিশের জুতো পরে রিক্সায় চড়ে দু'জনে সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গেল—বাচ্চাদের তদারকের ভার নজমুলের ওপর ছেড়ে দিয়ে।

রাত নটায় সিনেমা থেকে ফিরে এলে নঈমাকে নজমুল বললো : এভাবে যে সিনেমা যাও লোকে জানতে পারলে কি বলবে ?

মধুর সরলতার সঙ্গে নঈমা জবাব দিলো : ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব তাতে দোষের কি আছে? তোমার মনটা দেখছি বড় ছোট। তারপর স্বামীকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললো, সত্যি 'মহল'-এ মধুবালাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে।

তাতেও নজমুল ঠিক প্রবোধ মানে না। ভাবে : সে যখন নঈমাকে ছেড়ে সিনেমা দেখে না, বন্ধুরা দেখাতে চাইলেও, তখন নঈমা তাকে ছেড়ে সিনেমা দেখতে গেল কি করে। তাও পরপুরুষের সঙ্গে।

ভোরে উঠে নজমুল দেখে মেজে ছেলে বিছানা ভিজিয়েছে। ভোরের যে হাওয়া মনকে কিছুটা সতেজ করতে পারতো প্রস্রাবের কটু গন্ধ তার সঙ্গে মিশে নজমুলের মেজাজটাকেই বিগড়ে দিলো। এ রকম প্রায় রোজই হয়। তবে গত রাতের কথা ভেবে মনটা আর সব দিনের চেয়ে একটু বেশী খিচিয়ে থাকে।

চিড়ে আর এক কাপ কম দুধের, কম চিনির, ধোঁয়ার বিস্বাদ চা খেয়ে, ভাঙা পাক-ঘর থেকে এখনও অবিরত আসা ধোঁয়া পান করে নজমুল নিজের সংসারের দিকে একবার চেয়ে দেখে।

দু'ছেলেই উদম হয়ে ঘুরছে, বড় মেয়েটির পরনে একটা ছেঁড়া জাঙ্গিয়া। ভিজে কাঁথা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বেলা ন'টার রোদ কাঁথার আর্দ্রতা সদ্য শুষতে আরম্ভ করেছে বলেই গন্ধটা তার এখন আরও কটু। ভিজে পুরনো নোংরা কাঁথার কাপড় এখন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে।

এই তা হলে তার মাসে তিরিশ দিনের কাহিনী।

ওদিকে নঈমা আবার তাড়া দিচ্ছে : খুব যে রোদ পোহাতে বসলে, বাজার করতে যেতে হবে না? ওদিকে অফিসে খেয়ে না যেতে পারলে তো আমার চৌদ্দ গুষ্ঠী উদ্ধার করবে।

মিথ্যে মিথ্যে গঞ্জনা, অভাবের দৈনিন্দন নিষ্করুণ পীড়ন, দিনে দিনে একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া। না, এ আর চলবে না। যেমন করেই হোক এ জীবন বদলাতে হবে। পরে যা ঘটুক, কুচ পরওয়া নেই। মুহূর্তে নজমুল নিজের মন ঠিক করে ফেলে।

ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের কেরানী বলে সুবিধে অনেক। প্রথম যেদিন সে দু'টাকা ঘুষ নেয় নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল

যে হাতে টাকাটা নিলো তাতে কয়েকটা আধা-লাল আধা-কাল কেঁচো ঢুকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরে তাদের পিচ্ছিল দেহ থেকে একটু একটু করে রস নিঃসরণ করে সমস্ত হাতটাকে দুর্গন্ধে ভরে দিয়েছে।

কিন্তু অফিস থেকে ফেরবার সময় বাবু বাজারের কাছ থেকে নঈমার জন্য সেদিন কিছু বেলফুল নিতে ভোলেনি।

নঈমা তাজ্জব হয়ে গেছলো। কবে যে এর আগে নজমুল তার জন্য ফুল এনেছিলো নঈমা সে কথা এখন আর মনে করতে পারে না। তবে তা নিয়ে এখন নজমুলকে গঞ্জনা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। স্বামীকে নিয়ে এখনও নঈমার মনে কিছুটা সাধ আছে। নিজের অটুট দেহসুষমা সম্বন্ধে সে সংসারের হাজার দীনতার মধ্যেও সচেতন না হয়ে পারে না। স্বামীর তরফ থেকে আজকাল তেমন সাড়া পাওয়া যায় না বলেই ইউনিভার্সিটিতে পড়া সেই ছোকরা আত্মীয়ের ওপর নঈমা সেটা পরখ করে মনে মনে খুশী হতো।

অথচ পরপুরুষকে নিয়ে অসতীত্বের কোন চিন্তা তার মধ্যে নেই। শুধু নজমুল যদি তাকে মাঝে মাঝে কাছে ডাকতো, কিছুটা আদর করতো কখনও কখনও চুলের ফিতা বা অন্য কোন চুটকি উপহার এনে দিতো, তবে তার নিজের মেজাজ এতটা খিটখিটে কখনও হতো না।

আজকে রাতে শুধু কয়েকটা বেলফুল—বড় জোর সব মিলে দু'আনা দাম হবে—নঈমার নিজের চুলে বেঁধেছে। তাতেই মনে কি অঘটন ঘটে যাচ্ছে।

বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা কামরাটা ফুলের গন্ধে ভরে গেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে, অনেক দিন পরে কামনা-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে নঈমা কয়েকটা গিনির মত উজ্জ্বল তারা দেখতে পায়। মনটা তাতে এমন ভরে যায়। সাধ হয়, নজমুলকে নিয়ে আসমানের অঙ্গনে তারা দু'জনে ঘুরে আসে, তারার ছোঁওয়া নিজেদের মধ্যে নিয়ে।

ওদিকে নমমুলও খুশী হয় অনেকদিন পরে নঈমাকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে। রাতের গোপনতায় বেলফুল কতটা মাদকতা সৃষ্টি করতে পারে সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ঘুষ নেবার কথা মনে পড়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে সেই কেঁচোর ছবি।

নঈমা লক্ষ্য করে সংসারের ছোটখাট অভাব এক এক করে সব দূর

হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের সার্টপ্যান্ট এলো, মেয়েদের ফ্রক। নজমুলের একটা নতুন ঠাণ্ডা স্যুট, তার নিজের তিন চারটে শাড়ী।

তাতে নঈমা কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেও কৌতূহলও তার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। একদিন নজমুলকে জিজ্ঞেস করেই বসে: আজকাল এত পয়সা আসে কোত্থেকে?

—আমরাও দরকার হলে কিছু পয়সা আয় করতে পারি গো। নজমুল অনেকটা দুর্বল কণ্ঠে বলে।

—আয়টা কিভাবে হয় তাই বল না কেন। নঈমা আরো পরিষ্কার জবাব চায়।

—টুইশানি করি আর গেট-এ ওয়ার্ড-এ মাঝে মাঝে টাকা পাই। নজমুলের নিজের কানেই নিজের কথাগুলো বড় ফাঁকা শোনায়।

সংসারে সদ্য আসা সচ্ছলতা লক্ষ্য করে বড় ছেলে মায়ের উপস্থিতিতে একদিন বাপের কাছে এসে দাঁড়ায়। পাড়ায় তারা একটি ক্রিকেট টিম করেছে। তবে 'ব্যাট' এ পর্যন্ত জোগাড় হয়নি। তার খেলার সাথিরা তাকে ধরেছে বাপকে বলে একটা ক্রিকেট 'ব্যাট'-এর টাকা জোগাড় করতে পারি কিনা। প্রথমে মাকে বলেছিলো। নঈমা জবাব দিয়েছিলো: তোর বাপকে বলতে পারিস না?

তাই সাহস করে ছেলে বাপের কাছে এসে প্রত্যাশার ভঙ্গীতে দাঁড়ায় কিন্তু আসল কথাটা মুখ ফুটে আর বলতে পারে না।

নজমুল ছেলেকে অভয় দেয়: কি, তোমার মতলব কি?

ছেলের দ্বিধা দেখে মা সে কথাটি জানিয়ে দেয়।

নিজের ছেলের প্রতি নজমুল সহসা গভীর মমতা বোধ করে। বড় সুবোধ, নম্র তার এই ছেলে। কখনও তেমন কিছু আবদার করেনা। আজ শুধু ক্রিকেট ব্যাট-এর জন্য বাপের কাছে আবদার করতে এসে দ্বিধায় কেমন জড়সড় হয়ে গেছে।

সারা ঢাকায় ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার ধুম পড়ে গেছে। যাদের বাপের অবস্থা ভাল হাফ সার্ট হাফ প্যান্ট পরে পায়ে প্যাড লাগিয়ে হাটন কম্পটন-এর নাম উচ্চারণ করে বেশ অভিজাত ধরনে এই খেলার অনুশীলন করে।

আর তার নিজের ছেলে বেচারা এ পর্যন্ত একটা ক্রিকেট ব্যাট জোগাড় করে উঠতে পারেনি।

নজমুল যখন তাকে সাতটি টাকা গুণে দিল, ছেলের মুখে তখন সে কি পুর্ণতার হাসি। নির্ভেজাল সুখ বলে যদি কিছু থাকে, এই রকমেই শুধু তা অনুভব করা যায়। সাফল্যের উজ্জ্বল হাসিতে তার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নজমুল পিতৃত্বের গাঢ় আনন্দ যেমন নিজের মধ্যে অনুভব করে, নিজের হারানো কৈশোরের কথা মনে করে তেমনি বেদনায় মন তার ভরে যায়।

নঈমাও আবদার জানায়: স্যাকরাকে একবার ডাক দাওনা। সালেহার (বড় মেয়ের নাম) জন্য দুটা সোনার চুড়ি গড়াই।

তার কোন পরিষ্কার জবাব না দিয়ে কিছুটা রহস্যের ভঙ্গীতে নজমুল জিজ্ঞেস করে: আর তোমার নিজের জন্য ?

থাক অত সোহাগে কাজ নেই--পরিমিত ধরনে ঝামটা নিয়ে নঈমা বলে—আমি চার ছেলের মা আমার এখন চুড়ি পরবার সখ নেই। তারপর কিছুক্ষণ থেমে—তার চেয়ে বরং এক কাজ কর, আমাকে আট আউন্স ভাল উল আর একটা ভাল প্যাটার্নের বই এনে দিয়ো। সামনে শীতের জন্য তোমার একটা সোয়েটার বুনে দেবো।

তাহলে ঘুষ খাওয়াটা একেবারে বিফল যাচ্ছে না দেখছি। মনে মনে নজমুল ভাবে, বউ ছেলে এখন কতটা আপন মনে হয়।

ধরা পড়ল আচানক। শেষের দিকে উপরি নেওয়া নজমুলের একটা গায়ে সয়ে গেছলো যে, এ ব্যাপারে আর কোন সাবধানতা সে দরকার মনে করতো না।

সারা অফিসে মস্ত হৈ চৈ। যারা ঘুষ নিতোনা তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তারা বেশী কিছু বক্র মন্তব্য করেনি—ঘুষ যারা হরদম খেয়ে আসছে তাদের মুখেই নীতিবাক্যের খৈ ছোটে একেবারে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমাদের মুখে একেবারে চুনকালি দিলো।

—একেবারে ভিজে বিড়ালটি বাবা, বাইরে থেকে মনে হয় খুব যেন সাধু পুরুষ।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি সহকর্মী রফিক করে—যে দু'তিনবার নজমুলের কাছে ধার চেয়ে পায়নি। হয়ত সে-ই পুলিশের খবর দিয়েছিল।

১১—

পরদিনই নজমুলকে সাসপেণ্ড করা হয়।

এটা এক ধাক্কা বটে। হয়ত পরে ধরাধরি করে নজমুল খালাস পেয়ে যেতে পারে কিন্তু এই যে সে ঘুষ নেয় এটা সারা অফিসের লোক জানতে পারলে সে লজ্জা সে ঢাকবে কি করে ?

নঈমার কাছ থেকে এই বিপর্যয়ের কথা বেশ কয়েকদিন লুকিয়ে রেখে-ছিল। তবে তিন চারদিন উপরি উপরি অফিসে যেতে না দেখে নঈমা তাকে একদিন শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো : আজকাল অফিসে যাও না যে বড়।

—অনেক ছুটি জমা আছে, না নিলে পচে যাবে।

অবশ্য সে জবাব বেশীদিন কার্যকরী হয়নি। মাসের প্রথম নজমুল শুধু পঞ্চাশ টাকা নঈমার হাতে এনে দিল তখন তার জবাবদিহি করতে গিয়ে নজমুলকে বলতে হয়েছিল যে অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে তার ঝগড়া হওয়াতে তাকে সাসপেণ্ড করেছে। সে তার বড়কর্তার বিরুদ্ধে মামলা করবে।

সে কথা শুনে নঈমা জ্বলে উঠলো একেবারে : মামলা করবে না ঠেঙা করবে। ফুটো কলসী তুমি, তোমার মুরোদ কত এই দশ বছরে সেটা কি আমি টের পাইনি, এখন কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে না খেয়ে মরো।

নজমুলও আর রাগ সামলাতে পারেনি। ঠাস করে নঈমার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললো : তোমার কি ভাবনা, তোমার তো নাগর আছে, সেই কাচ্চাবাচ্চাদের খাওয়াবে।

রাগে আর অপমানে নঈমার মুখটা তখন দেখবার মত—তার দৃষ্টি যেন আগুনের হল্‌কা।

কথা আর চাপা থাকল না। নজমুল ও নঈমার পরিচিত সকলেই জানতে পারলো নজমুল ঘুষ নিয়ে ধরা পড়েছে। যতদিন জানাজানি হয়নি ততদিন পরিচিতদের কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে নজমুল কোনমতে সংসারের খরচ জুগিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে একেবারে গুম-হয়ে যাওয়া নঈমা নিজে আধা উপোস করে আর সকলকে দু'বেলা অন্তত: ভরপেট খাইয়েছে।

নজমুল লক্ষ্য করে, ইদানীং ইউনিভার্সিটির সেই ছোকরা আত্মীয় আবার বেশ আনাগোনা আরম্ভ করে দিয়েছে।

সমস্ত বাসার আবহাওয়া কেমন যেন স্তব্ধ ও ভারী হয়ে উঠেছে। নঈমা

তার সঙ্গে আজকাল আর কথাই বলে না—নজমুল যেন খবিস নাপাক এক জীব। স্ত্রীর কোন কোমলতাই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় ছেলেটাও যে বাপের কাছে মাঝে মাঝে আবদার করতো—তারদিকে আর একেবারে ঘেঁষে না। বাপের দিকে মুখ তুলে চাইতেও তার যেন বড় বাধে। কখনও চোখাচোখি হয়ে গেলে তখনই চোখ নামিয়ে নেয়। নিশ্চয়ই ছেলেটা কারও কাছে বাপের কীর্তির কথা শুনেছে।

সহসা নজমুল আবিষ্কার করে এক এক করে তার সমস্ত আশ্রয় তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বউ এখন বেগানা আওরতের মত মনে হয়। নিজের বলে আর যেন মনে হয় না।

যাক্‌গে, শালার—যা হবার হবে। দরকার হলে, এই অবলম্বনহীনতা থেকে নিজেকে কি ভাবে বাঁচাতে হয়, তা নজমুল জানে।

ধারও এখন আর কারুর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সব কিছু জানতে পেরে নঈমার বাবা খবর পাঠিয়েছেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে নঈমা যেন দেশে চলে আসে—তু'বেলা তু'মুঠো খাওয়া সেখানে জুটে যাবে। নিজেই এসে তিনি তাদের নিয়ে যেতেন তবে সে-পথ জামাই আর রাখেনি।

নঈমা উল্টো খবর পাঠিয়েছিল: বিপদের সময় স্বামীকে একা ফেলে রেখে সে বাপের বাড়ী যাবে কি করে।

আজকাল ভাত ডালের সঙ্গে আলুভর্তাও আর নঈমা জোগাতে পারে না। এরি মধ্যে বিয়ের সময়কার আংটিটা তার গেছে।

ভাত খেতে বসে নজমুল কিন্তু মন্তব্য করতে ছাড়ে না: নিজের জন্য বুঝি মাছ তরকারী রেখে দেওয়া হয়েছে, আমি বাইরে গেলে সেই ছোকরার সঙ্গে বসে খাবে।

নঈমা চিলবিলিয়ে উঠে বলেছিলো: এবার থেকে নিজের ভাত নিজে রেঁধে খায় যেন। চুরি করে ধরা পড়ে আবার তেজ দেখো না। ওর জন্য ভাত আমি আর রাঁধতে পারব না।

তার জবাবে ক্ষিপ্ত হয়ে নঈমার দিকে বাসন-পেয়ালা ছুঁড়ে মেরে খালি পেটে নজমুল উঠে যায়। বাসন-পেয়ালা নঈমার হাতখানেকের ভেতর এসে কর্কশ এক শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়। ডালের ছিটায় নঈমার শাড়ীতে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া হলুদ-দাগ বসে যায়।

তারপর দু'দিন নজমুল বলতে গেলে বাড়ীমুখোই হয়নি—খায়ওনি। কিছুটা রাগ, কিছুটা হতাশা, নিজের প্রতি অশেষ কারুণ্য সব মিলে তার মনে বেশ একটা ঘোরের সৃষ্টি করেছিল। তবে খিদের জ্বালায় সেটা বেশীক্ষণ টিকতে পায়নি। দু'আনার চিনাবাদাম আর তার সঙ্গে গলা-ভরা পানি খেয়ে নজমুলের পেটের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল।

অদ্ভুত জিনিষ এই খিদে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নাড়ী পর্যন্ত একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথায় কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। চারিদিকে চোখ-আঁধার-করা শূন্যতা।

পেটে যে দু'দিন ধরে দানা পড়েনি—এর বাইরে নজমুলের কাছে আর কোনও সত্য নেই। ছেলেমেয়েদের খাওয়া জুটেছে কিনা সে সম্বন্ধে এখন তার, বাপ হয়েও, আগ্রহ নেই। কি করে নিজের পেটের খিদে মেটানো যায় সেটাই নজমুলের কাছে এখন একমাত্র চিন্তা।

নঈমাকে বললে নিশ্চয়ই সে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু নঈমা, তার স্ত্রী, তার এতদিনকার সাথী, তাকে সে যে কথা বলেছে তার পরে তার কাছ থেকে পুরুষ হয়ে, স্বামী হয়ে, চাওয়ার গ্লানি সে সইবে কি করে।

নঈমাকে সে কি বলেছে খিদের তাড়নায় নজমুলের অবশ্য সে কথা মনে থাকে না।

আচ্ছা সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছোকরাটার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখা যাক কিছু টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা।

সেই আশায় তাহেরবাগ থেকে বকসী বাজারের দিকে নজমুল হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। প্রথম কয়েক মিনিট ক্লান্তির ভাব তেমন ধরা পড়েনা, তবে টয়েনবি সার্কুলার রোড-এ পড়তেই পদক্ষেপ অনেকটা দ্বিধাজড়িত হয়ে আসে। জিন্নাহ্ এভিন্যুর কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে দুই-রিক্সাকে ছাড়িয়ে আশা একটি দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ীর হর্নের শব্দে হকচকিয়ে নজমুল প্রায় তাল সামলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাল সামলে দেখে তার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর হাত-পা'র ভাঁজে ভাঁজে কাঁপুনি।

—খুব বেঁচে গেছি, বাবা। পেটের খিদের কথাও ভুলে গিয়ে নজমুল নিজের মনে আওড়ায়। জিন্নাহ্ এভিন্যুর পরিপাটি লেবাসের দিকে চেয়ে

খিদের খোঁচা যখন আবার প্রবল হয় তখন আর্তনাদের ধরনে নজমুল নিজকে জিজ্ঞেস করে : কি থেকে বাঁচলাম ?

কার্জন হলের কাছে এসে নজমুলের আর হাঁটবার উদ্যম থাকে না। কম্পাউণ্ডের ভেতর গিয়ে এক পাশে ঘাসের ওপর চুপটি করে বসে কিছুটা জিরিয়ে নেয়। সমস্ত নাড়ী যখন ক্ষুধার জ্বালায় টনটন করে উঠছে তখন গাছের ওপর রোদের খেলা নজমুলের চোখে পড়ে। তারপর সযত্নে-রোপিত তৃণের ঘন শ্যামলিমার সঙ্গে স্তবকে-স্তবকে উন্মোচিত, হলদে, লাল, গেরুয়া রঙ-এর কিরণ-দীপ্ত মিতালী হঠাৎ যেন নজমুলের চেতনা জাগিয়ে তোলে। মনে হয়, মাটির সমস্ত নির্যাস তৃণ ও ফুল টেনে নিয়ে রোদ আর আকাশকে উপহার দিচ্ছে। এ-চিন্তাটা অদ্ভুত লাগে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মনে নয়—অনেকটা তার নিজের নাড়ীর জ্বালার মত।

ভদ্রলোক নজমুলের আসাতে খুশী হননি। কামরায় ঢুকেই সেটা নজমুল যেমন বুঝতে পারল তেমনি কোণের ছোট টেবিলে সাদা প্লেটের ওপর মুন্সীগঞ্জ-কলার হলদে নরম কাঁদি দেখে দৃষ্টি তার সেখানে একেবারে আটকা পড়ে গেল। বুঝতে পারল না কিছুক্ষণ : কলা চাইবে, না টাকা।

তবে দু'দিনের ওপর খালি পেটে কলা খাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ভেতর থেকে সহসা বমির ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই চট্ করে টাকাই চেয়ে বসলো : পনেরোটা টাকা যদি দেন, সামনে মাসে শোধ করে দেবো।

ভদ্রলোক তার দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন, পরে বললেন শীতল বৈষয়িক ভঙ্গীতে : পাগল হয়েছেন, মাসের শেষে অত টাকা পাব কোথা ?

জবাবটা আগে থেকেই নজমুল অনুমান করে রেখেছিল—পাগল বিশেষণটা ছাড়া—অতএব খুব বেশী হতাশ সে বোধ করে না। আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

বেরিয়ে আসবে এমন সময় পেছন থেকে ভদ্রলোকের গলা শুনতে পায় : পাঁচ টাকা হলে নিয়ে যেতে পারেন, আপনাকে আর শুধতে হবে না।

শেষের কথাটাই অনিশ্চয়তা বাধাল। শুধতে যখন হবে না, নেওয়াই যাক না কেন। পর মুহূর্তে ভাবে : এতে কি আর বেইজ্জতির বোঝা কমবে, আর এইভাবে গরমিল দিয়ে চলবেই বা ক'দিন ?

বাইরে বেরিয়ে দেখে : রাস্তার মাঝখানে এক মরা কুকুর পড়ে আছে। মুখ থেৎলে শুধু মাড়িটাই আলগা হয়ে খসে পড়েনি, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চোখে জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে দু'একটা দাঁড়কাক সেদিক এক পা এগুচ্ছে, এক পা পিছুচ্ছে।

এখন খিদের চেয়ে নিস্তেজ, নির্জীব ভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। গতিময় জীবনের প্রাণস্পন্দন চারিদিকে দেখেও মনে তেমন কোন অনুভূতি জাগে না। একটি ছোট মেয়ে এক দোতলা বাসার জানালা দিয়ে তার দিকে চেয়ে ভারী মিষ্টি ধরনে হাসছে। নজমুলের প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত : দুর শালী। হঠাৎ রাগে নজমুলের সমস্ত সত্বায় যেন আগুন ধরে যায় : বউটা মাগী, বাচ্চাগুলো কার কে জানে, আর সব বেটা দাগাবাজ, খল। এইভাবে বেঁচে থাকা। থু থু থু থু থু।

বাসার ধারে মুদীর দোকানের কাছে এসে নজমুল টলমলে মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। রাগ বেশীক্ষণ থাকেনি, কারণ খালি পেটে রাগ করতে গেলে মাথা তা বেশীক্ষণ বহন করতে পারে না। কিছু মুড়ী মুড়কী কিনতে পারলে বেশ হতো। পেট তাতে কিছুটা স্বস্তি পাবে। পকেট হাতড়িয়ে দেখে সেখানকার ভাঁজে কেমন করে যেন একটা আধুলি রয়ে গেছে। মুড়কীর সঙ্গে আরো কিছু কিনে বাসায় ফেরে।

খালি তকতপোষেই নজমুল গা এলিয়ে দেয়। খিদে এখন অনেকটা সয়ে গেছে। পেটে আর সে কামড়-খাওয়া ভাব নেই। শুধু নিঃসাড় অবশতা। ক্রমে ক্রমে গিলে-খাওয়া শূন্যতা।

কামরার বাইরে পরিচিত এক গুঞ্জন শুনে শেষবারের মত উদ্যম সংগ্রহ করে নজমুল কান খাড়া করে থাকে। সেই ছোকরা আবার এসেছে।

নঈমা বলছে আদরের ধরনে : এতদিন পরে মনে হল!

ছেলেটি বলে : এইত তিনদিন আগেই এলাম।

—আরে তাইত, এত ভুলো মন হয়ে গেছে ভাই। (ভাই আর কেন, নজমুল বিড় বিড় করে) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর ছেলেটি আবার বলে : এই কুড়িটা টাকা ভাই পাঠিয়ে দিলেন।

নজমুল ভাবে : রঙ্গটা বেশ জমেছে।

এবার নঈমা যা বললো তার জন্য নজমুলের মন ঠিক প্রস্তুত ছিল না :

বড় উপকার করলে ভাই, তোমার ভাই বোধ হয় আমার উপর রাগ করে দু'দিন না খেয়ে আছেন। নঈমার গলার স্বরে খেদহরণ মমতা। মন আবার জেগে উঠতে চায়. ছেলেদের মুখ মনে পড়ে, সেই ছোট মেয়ের মিষ্টি হাসি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। নঈমা, নঈমা...

আর্ত অনুভব কি যেন হাতড়ে বেড়ায়। কি যেন ফিরে পেতে চায়।

শেষ বারের মত নাড়ী নিঃসাড়তায় কুঁকড়ে ওঠে। একবার খেয়াল হয় কিছুটা মুড়কী খেয়ে নেয়—তাতে হয়ত চেতনার নতুন দু'এক তন্ত্রী বেজে উঠবে। তবে বাদুড়ের মত ডানা ঝাপ্টে কালো হতাশা দ্রুত আসে, আর তার তড়িৎ তাড়নায় হাতটি যায় 'র‍্যাটম'-এর প্যাকেট-এ।

এখন বাকী থাকলো কোনমতে এক গ্লাস পানি জোগাড় করা। তারপর পানির সঙ্গে 'র‍্যাটম'-এর সমন্বয় ঘটাতে যেটুকু দ্বিধা যেটুকু জ্বালা।

মেহেরজানের মা

মিরজা আবদুল হাই

রেল ইস্টিশানে হাটের ভিড়। সবগুলো গাড়ীতেই লোক ঠ্যাসা তবুও একটা পাওয়া গেল একেবারে খালি। বেশ সাফ সুতরা। গদি মোড়া। মাথার উপর বন্ বন্ করে পাংখা ঘোরে। তারই ভেতর ছোট্ট একটা কুঠরি। আয়নায় মুখ দেখা যায়। কল থেকে টিপটিপ করে পানি পড়ে। তারই ভেতর ধাক্কা দিয়ে রকীবাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে জমিলা বেরিয়ে গেল।

রকীবার পেটে-পিঠে, শাড়ীর নিচে, চটের থলিতে সুপারি বাধা, হাতে মবিলের টিন। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আয়নার ভেতর দিয়ে নিজের পেটের দিকে নজর পড়তে মনে হল যেন আট ন'মাস। মেরাজান যখন পেটে এসেছিল, তখনকার কথা রকীবার মনে পড়ল। অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। বুকের দুরু দুরু ভাব ছাপিয়ে কেমন যেন একটা সরম-রাংগা অনুভূতি তার মনের অতলে শিহরণ জাগাল।

দশটার গাড়ী ঝক ঝক করে এগিয়ে চলেছে। মানুষের হালে বেঁচে থাকার জন্য এই নতুন জীবিকার পথে নেমে পড়া। শুধু আজকের জন্য বেঁচে থাকা, কালের ভরসা কাল। গরীবের শুধু দিনের দিন বাঁচ, ভবিষ্যৎ তো শুধু বড়লোকের। রকীবার অন্তরলোকের টিড় খাওয়া ভাবনা।

রকীবার বুকে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ। প্রাপ্তির হিসাব পাঁচটার গাড়ীতে নাভারনে ফিরলে। এখন শুধু ভয়, মারধর আর জেল-ফাটকের ভয়।

জমিলারই মুখে শুনা, সব বেটাই না কি দু'পয়সা করে খাচ্ছে—তা সায়েব সুবা-ই হোক, আর মজুর ভিখিরী-ই হোক। মনকে যুক্তি দেখায় রকীবা।

বেনাপোলে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। থামার কিছু পরেই জমিলা বলে, নেমে একটু হাঁটাহাঁটি কর।

রকীবা বলে—ভয় করে, যদি ধরে।

ধরবার হলে কি আর আমি নামতাম? আর ধরলেই বা কি? ওযুধ

জানা আছে। চার আনা, আট আনা, বড় জোর এক টাকাই নিল। আর তাই বা নেবে কেন, খেপে খেপে যে পেট ভরাই, তাই বা কি এমনি নাকি। ধরবে কোন খানকীর পুত।

প্রতি মুহূর্তেই রকীবা ভাবে এই বুঝি একটা বিপত্তি বাধে। গাড়ী থেমেছে তো থেমেই আছে। নড়বার নাম করে না। ধরা যদি পড়ে তো কি হবে? খুব নাকি মারধর করে। কিন্তু কতজনকে মারধর করবে। জমিলাই দেখিয়ে দিয়েছে—ওরা সবাই। জমিলার মত প্রৌঢ়া তো আছে-ই, বুড়া বুড়ি, ছেলে মেয়ে যোয়ান অগুণতি। এদের ভরসাই বা কম কিসের।

গাড়ী ছাড়বার আগেই জমিলা বলে দিল—দেখ, ঘাটে ঘাটে গাড়ী থামবে, আমাদের দরকার মতই থামবে' এখান থেকে ছাড়বার পর, পয়লা দু'বারে নামবি না, তার পরের বার, বুঝলি?

রকীবা মাথা নাড়ে। এত বড় কলের গাড়ী যা গাঁয়ের পিসিডেন্ট কিম্বা থানার বড় বাবুও নাকি থামাতে পারে না, তাকে নিজেদের কথা মত থামাতে চালাতে পারে যারা নিজেকে তাদেরই একজন ভেবে রকীবা গর্ব অনুভব করতে লাগল।

তৃতীয় বার গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে রকীবা হাতে করে নেমে পড়ে।

ফাঁকা মাঠ। অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ নেমে ত্রস্ত পায়ে মাঠের দিকে দৌড়াল। রকীবা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। জমিলা তার কনুই চেপে ধরে বলে—দৌড়া, দাঁড়ালে চলবে না। বনগাঁয়ে জিনিস বেচাকেনার কারবারটা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। ভোগান্তি অনেক। যাদের মহাজন সঙ্গে—তাদের তো পোয়াবারো। আর যাওয়া-আসার হাঙ্গামা যতটুকু রকীবা আঁচ করে রেখেছিল—আসলে তার সিকিও নয়। ভয় শুধু মনেই।

পাঁচটার গাড়ীতে রকীবা যখন ফিরে এল, তখন তার কোমরে গোঁজা কিছুটা খুচরা পয়সা, আর টিনে ভর্তি সের চা'র সরিষার তেল। সেরে কমসে কম টাকা, দেড় টাকা পাবে। রকীবা শুধু হিসাব করে। আঙ্গুলের আঁকে আঁকে গুণতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

ঘরে ফিরবার সময় রকীবা যেন আর হাঁটতে পারে না। অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো বা শুধু পেটে ভাতে রাত দিন গৃহস্থের বাড়ী খাটনি, পান থেকে চুন খসলে অকথ্য অত্যাচার,

সব কিছু যেন অনেকদিন আগেকার দেখা দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। হাওলাদার বাড়ীর সেই কল্‌কী সেকার ঘাটা পিঠে অনুভব করতে চেষ্টা করল। না, জ্বালা আর আছে বলে মনে হয় না। দু' একদিন পরই সে মেরাজানের জন্য একখানা দশহাত শাড়ী কিনে আনবে। একটুকরা তেনা পরে থাকে মেয়েটা। ভাল করে পরলে নয় হাতে হবার নয়। তার যা বাড়ন্ত গড়ন। পাড়ার বদ ছোকরারা এখন থেকেই বদনজর দেবার তালে আছে। বুকে বুকে আগলিয়ে রাখে রকীবা। মান-ইজ্জতই যদি না রাখা যায় তবে দুনিয়ায় থেকে কি লাভ।

বজলটাকে নিয়েও চিন্তা কম নয়। ময়লা একটুকরা নেংটি পরে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে থাকলে রকীবার প্রাণে শান্তি থাকে। মেরাকে দেখবার একটা লোক থাকে। হোক না দুধের ছেলে। খোদাতালা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, বজলের জন্যও একটা লাল শার্ট আর একটা পেন্ট। পেটের দায়ে মেরাকেও ঘরে রাখা যায় না। লোকজনের বাড়ীতে এটা সেটা কাজকর্ম করতে হয়। বাধাধরা কিছু নয়, তবু রকীবার ভয় কাটে না। গাঁয়ের ড্যাকারগুলোর যা রকম-সকম।

মেহেরজানের শাড়ী হয়েছে। মাথায় নারিকেল তেল লেগেছে। বজলের পেন্ট শার্ট সব কিছু।

দিন গড়িয়ে চলে। ধুঁকে ধুঁকে বাঁচার দিন নয়, পেট ভরা, বেশ হাসি খুশীর দ্রুত চলমান দিন।

দিন কয়েক যেতেই রকীবা একদিন কালের পিছন ফিরে তাকায়। নিজের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়। ভাল করে যেন বুঝে উঠতে পারে না। কি করে বজল ও মেরা দুজনেই মায়ের সংগে কারবারে নেমে পড়েছে। নেহাৎ যেন একটা গতানুগতিক ব্যাপার। তার প্রথম দিনের অভিযানের মত এদের আসার কোন বৈচিত্র্য নেই। মনে রাখবার কিছু নয়।

তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের সংগে ভিড়ে গেছে। ঠিকা কাজে হাঙ্গামা যেমন কম, লাভও সেই অনুপাতে কম। তাই বা মন্দ কি, ঝক্কি যত মহাজনের ঘাড়ে।

ন'দশ বছরের বজল। ভয়ানক চটপটে। টিন হাতে সরিষার তেল আনাটা যেন তার ধাতে সয় না। দু'এক দিন টিন নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু

তারপরই বাদ দিয়েছে, হয়তো মহাজনের নির্দেশে। ফিরবার পথে লবণ নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর বেঞ্চের তলায়—সের কয়েক লবণ বিছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। ধরা পড়বার প্রশ্নই উঠে না। যায়ত শুধু মালই যাবে। গাড়ী যখন চলে বজল তখন গাড়ীর তলায়, একটা লোহার রডের উপর অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধবের সংগে বিড়ি টানে। লাল পাট সিল্কের একটা রুমাল গলায় বাধা, হাতে পিতলের একটা আংটি। কানে আধপোড়া বিড়ি। রকীবা যখন প্রথম শুনল যে বজল গাড়ীর তলায় বসে চলাফেরা করে, ভয়ে তখন সে প্রায় কঁকিয়ে উঠেছিল। বলা যায় না কখন কি হয়। বজল মায়ের কাছে কসম করেছে—গাড়ীর ভিতর বসেই সে যাওয়া আসা করবে। কিন্তু গাড়ী যখন চলে তখন গাড়ীর নিচটা দেখবার সুযোগ থাকে না বলেই রকীবা ভাবে মা অন্তপ্রাণ ছেলে নিশ্চয়ই মায়ের কথা রাখছে। মেহেরজানকে রকীবা চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সম্ভব আর হয় কই। বেনাপোলে গাড়ী থামলেই রকীবা মেয়ের খবর করে। রকীবা প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেয়—দেখিস, ঐ ছোড়াগুলির সংগে মিশবি না কিন্তু, বুঝলি।

মেরা বুঝেছে বলে মাথা হেলায়।

আর শোন, ঐ যে সেপাইগুলো, তা বেনাপোলেরই হোক, আর বনগাঁয়েরই, বুঝলি, সব বেটাই বদমাসের ধাড়ী। এ লাইনে সব শেয়ালের এক রা। খবরদার। বলে দিলাম।

উঠতি বয়সের মেরাজান বুঝে সব কিছুই।

সরসপুর ধরা সোজা কথা নয়। তা ছাড়া বৃষ্টি পড়লে, রাত্রে ঘরে ঘুমানো যায় না। ঝর ঝর করে পানি পড়ে।

মেরা বলে এখন আর সে রকম অভাব নেই, ঘরটাকে মেরামত কর।

সময় কোথায়? লোক লাগালে দু' তিন দিন কামাই দিতে হয়। রকীবা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়।

সন্ধ্যার দিকে আর রকীবা ঘর থেকে বের হয় না। মাঝে মোল্লা পাড়ার মজিদ আসে। অবস্থা মন্দ নয়। টিং টিং এ চেহারা। শেয়ালের মত পিটপিটে ধূর্ত চোখ। সারা গায়ে পাঁচড়া না কি, লোকে বলে খারাপ ব্যারাম। কোন জন্মের কুটুম্বিতা নেই, ঘেন্নাই করেছে হয়ত, এতদিন, এখন বলে—চাচি আছ কেমন? আর আড়চোখে মেহেরজানের দিকে তাকায়।

রকীবার হুকুম আছে—ঐ ছোকরা মজিদ এলে, খবরদার বলে দিলাম—ঘোমটা তুলবি না।

মেরা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তা এই ঘেয়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিস কেন? মেয়ে ও ছেলের হাত ধরে, রকীবা নাভারনের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় এসে উঠল। তালেব মিয়ার-ই কাজ করে সে। এই লাইনে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে মহাজনের আশ্রয়ে। কেউবা ইস্টিশনে, প্লাটফরমে, কিংবা কোন দোকানের বারান্দায়, রকীবাই ছিল দূরে। গরীব বলেই শুধু গ্রামে এত লোকের মাঝে নিজের ভিটায় থেকেও ছিল নির্বান্ধব। এদের মাঝে এসে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চারিদিকে শ'য় শ'য় যেন আপনার লোক। জমিলা, নন্দ, নিখিলের মা, জৈতুন এরা সবাই যেন কত কালের আত্মীয়। ব্যবসায়ীরা নাকি মিলেমিশে থাকতে পারে না অথচ আশ্চর্য, এরা সকলে একই কারবার করে কিন্তু অভিন্ন আত্মা। সুখে দুঃখে খবর করে, লাইনে কোন্ দিন কোন্ অফিসার চলে, কোথায় কিভাবে টিপলে কি ফল পাওয়া যায় সবাই সবাইকে বলে! দিল খুলে আলাপ আলোচনা করে। আশে পাশে সারা রাতই প্রায় বাতি জ্বলে। খোলা বারান্দাযও যেন ভয় নেই আর। গাড়ী ধরারও নেই তাড়াহুড়া।

বয়স যেন আর তাল সামলাতে পারছে না। মেরার শরীরের গড়ন বয়সকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে চলেছে।

বেনাপোলে বনগাঁয়ে ঠোঁট লাল করে পান খায় মেরাজান। রকীবার একদিন চোখে পড়ে গেল। দু'জন সেপাই মেরাজানের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। একজন বনগাঁয়ের আর অন্যজন বেনাপোলের। প্রায় সব সেপাইরই মুখ চিনে রকীবা। এদের কাছে পাকিস্তান হিন্দুস্থান সব এক। একজন সেপাই সরে গেলে পরে রকীবা জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেরাজানের চুলের মুঠি ধরল।

মেরাজান চমকে উঠল।

হিড় হিড় করে লোহার বেড়াটার কাছে টেনে এনে রকীবা চাপা গর্জন করে উঠল—হারামজাদী, এই সেপাই ষণ্ডা দুটোর সংগে কি করছিলি?

মুখের উপর কোন দিন মেরা উত্তর দেয় না, কিন্তু আজ দিল—তোর সব তাতেই সন্দ'। এত লোকের মাঝে চুল ধরে টানাটানি করিস না বলছি।

রকীবা কিছুটা থতমত খেয়ে গেল।

মেহেরজান ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে।

—বুড়ি হয়ে গেছিস, তাল মান টের পাস না। এদের সঙ্গে খাতির রাখতে হয়।

—তোর খাতির ধুয়ে পানি খা গে, যা। হাজার বার করে মানা করেছি, হারামজাদী'র কানে যায় না। ওই ড্যাকরা হাত বাড়িয়ে তোকে কি দিচ্ছিল?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেয়া বোধ হয় উত্তর ঠিক করল।—বাঃ রে, ও আবার কি দেবে। পান কিনেছিলাম, ওরাই বলল পান খাওয়াতে। তাই দিয়ে দিলাম একটা। আমিই ত দিলাম। পুলিশের লোক আবার কাউকে কিছু দেয় নাকি কোন দিন?

—কাজ নেই বাপু পান খাওয়ানোর। একটু বুঝে সুঝে চলিস—রকীবা দরদ মিশিয়ে বলে।

মাঝে মাঝে, `মাসে দু' মাসে, অনেকগুলি সেপাই আর বর্ডার পুলিশের বড় সাহেবরা এসে হানা দেয়। ধরপাকড় হয়, মারধর লাগে, কিন্তু কপালগুণে রকীবার কিছু হয়নি। একদিন ব্যবস্থাটা হল বড় কড়া রকমের। অন্যান্য দিন আগে থেকেই কিছুটা আভাস পাওয়া যেত কিন্তু সে দিন হঠাৎ যেন পৌষের আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। গাড়ীর পেছন দিয়ে নামতেই, লোহার বেড়ার অপর পাশের জংগল থেকে অনেকগুলি সেপাই মাথা তুলে দাঁড়াল। ক'জন বেড়া টপকিয়ে প্লাটফরমের ভেতর এসে পড়ল। হাতে লাঠি। যাকে ধরে তাকেই দু'এক ঘা লাগায়। হুলস্থুল ব্যাপার। রকীবা স্তম্ভিতের মত পেটে বাধা সুপারীর থলেটার উপর হাত রেখে এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন সেপাই বজলকে দৌড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। বজল লাফ দিল। তার পা-টা লোহার পাতের মাথা চোখা বেড়ার উপরটা অল্প স্পর্শ করল মাত্র। রকীবার বুকটা ধড়াস করে উঠল, বজল ততক্ষণে বেড়ার অপর পাশে জংগলের মাঝে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেছে। হতভম্ব রকীবা পাগলের মত বেড়ার দিকে দৌড়াল। পরক্ষণেই তার পিঠের উপর লাঠির একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সেদিন আর রকীবার বনগাঁ যাওয়া হল না। সুপারী, তেলের টিন,

ট্যাকে যা কিছু ছিল সর্বস্ব দিয়ে তবে নিস্তার। রকীবার মাথা টন টন করছে। পিঠে জ্বালা আর ব্যথা। হাত দিলে টের পাওয়া যায় পিঠের চামড়া যেন বাইন মাছের মত হয়ে ফুলে উঠেছে। প্লাটফরমের উপরই সে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফিরতি গাড়ীতে যারা বেনাপোলে নামল তাদের দেখে রকীবার মনে হল কেউই কমেনি। অন্যান্য দিনের মত পুরা দলটাই ফিরে এসেছে। এদের সংগেই মেরা ও বজল গাড়ী থেকে নামল।

রকীবা ছুটে গিয়ে বজলকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে —কোথাও লাগেনিত রে?

কানের আধপোড়া বিড়িটা ধরাতে ধরাতে বজল জওয়াব দিল—দুর, লাগবে কেন? দেখেছিলি না কি—আমার লাফ দেওয়াটা? বাবা, কত পেট্রিস করে শিখেছি। পুলিশের বাবার সাধ্য আছে ধরবে।

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফিল্মী কায়দায় ভংগী করে বজল।

ছেলের বীরত্বে রকীবাও যেন কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

মেরা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে পান চিবাতে চিবাতে বলে,—দেখি মা তোর কোথায় লাগল?

পরম স্নেহে মায়ের পিঠে বা হাতটা বুলায় মেরাজান।

রকীবা চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পর, মেরা আঙ্গুলের ডগা হতে বাড়তি চুনটুকু দাঁতে কেটে নিয়ে ঠোঁটটাকে একটু বাঁকিয়ে বলে—মা, তোরও যেমন, বললে তো শুনবি না। বলেছিলাম না, খাতিরে কাজ হয়। দেখলি, ধরতে পারল আমাকে? ফিক ফিক করে মেরা আত্মপ্রসাদে হেসে ওঠে।

রাগ করে রকীবা—ঝাড়ু মারি অমন খাতিরের মুখে। মুখপুড়ী, দাঁত সিটকাবী না বলছি!

তেরছা করে হেসে মেরা বলে—তা হলে পড়ে পড়ে মার খা'। যেমন আক্কেল।

বাড়ন্ত শরীরে একটা ঝাকানি দিয়ে মেরা টিন হাতে সরে পড়ে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে রকীবা পিঠের ব্যথায় কোঁকায় আর ইস্টিশনের দিকে চায়। ঘুম আসে না। বজল পাশে শুয়ে নাক ডাকায়।

মেরাজান আজ আর ফিরেনি। সেই যে বেনাপোলে দেখল, ফেরার আর পাত্তা নেই। জমিলা, জৈতুন এদের প্রায় সকলের কাছেই রকীবা খবর নিয়েছে কিন্তু সঠিক খোঁজ কেউই দিতে পারেনি। যে ব্যাপারীর ঠিকায় মেরা কাজ করে তার লোকজনের কাছেও খবর নিয়েছে। মেরা নাকি নন্দর কাছেই বেনাপোলে মাল সমঝিয়ে দিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। নন্দকেও খুঁজে পায়নি রকীবা। সে নাকি কিছুটা বাড়তি লবণ এনেছিল। তাই নিয়ে একেবারে যশোর চলে গিয়েছে। নাভারনের কাজটা ঠিকমতই সেরে দিয়ে গেছে। বেশ লেখাপড়া জানা ছেলে নন্দ, কিন্তু কেমন যেন পাগলাটে পাগলাটে।

রাত যতই বাড়তে লাগল, পিঠের ব্যথা ছাপিয়ে ততই মেরাজানের জন্য রকীবার দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। যদি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে থাকে? কাস্টমের অফিসারগুলি একদিক থেকে মন্দ নয়। এদের নিয়ে বড় মাথা ঘামায় না। তারা আছে তাদের তালে। গাড়ী শুধু তল্লাশীই করে। কি যে পায় তারাই জানে। খুব ভাল লোক কি না তাই বা কে বলতে পারে? সন্দেহ জাগে রকীবার মনে। ব্যাপারীর দালালদের সংগে হয়ত যোগসাজস আছে, তাই রা করে না। কিন্তু ঐ যে সেপাইগুলি, তা বনগাঁয়েরই হোক আর বেনাপোলেরই হোক ভালোর ভালো আর খারাপের খারাপ। দু' দেশের হিন্দু মুসলমানে এত যে মারামারি কাটাকাটি, এদের কাছে কিছু নয়। কেমন মিলঝিল। খাও দাও আর ফুর্তি কর, মাঝে মাঝে শুধু খবরদারী আর পয়সা কুড়ানো। কোন্ মেয়ের গতরটা একটু ভাল তাই খোঁজ নেওয়া; তা এপারেই হোক আর ওপারেই হোক। অবশ্য সাড়ে সতেরোয়া একদিন বড় সাহেবরা এলে তোড়জোড় করে লাঠির কেরদানী দেখানো। এদের বিশ্বাস করা যায় না। বদমায়েশের হাড্ডি সব। বিয়ে শাদী একটা মেরার না দিলে, মান-ইজ্জত আর রাখা যাবে না। বিয়ের কথা মনে পড়ায় রকীবার মনে অনেকটা স্বস্তি জাগে। দু' একদিন কথাটা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল কিন্তু এক নন্দ ছাড়া সবাই বলে আরও বড় হোক। নন্দ ছেলেটা লেখাপড়া জানে বলে মনে হয়, বড় বড় কথা বলে। বোধ হয় বই পুঁথির শেখা কথা। একদিন নিজেই সে বলেছিল—চাচি, তোর মেহেরকে বিয়ে দে। হিন্দু মুসলমান যাই হোক, ছেলে একটা

হলেই হল। আমাদের আবার জাত বেজাত কি? আগের কালে হিন্দুদের কাজ দিয়ে জাত ঠিক হত। কিছু দিন পর দেখবি—বনগাঁয়ে বেনাপোলের আমরা সবাই একজাত হয়ে গেছি। আমার ছেলে বা নাতির নাম হবে অমুক চন্দ্র স্মাগলার। এমনি সব পাগলাটে কথা। সব কথা গুছিয়ে রকীবার মনে পড়ে না। কিন্তু যে যাই বলুক, মেয়ের শাদী নিয়ে কথা—জাত বেজাতের প্রশ্ন আসে বৈকি। জাত ধর্ম তো আর দেশ থেকে উঠে যায়নি। এখনও চন্দ সুরুজ উঠে। রকীবা ভাবে, নন্দর সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কাল আরেকবার আলোচনা করবে।

রাত তিনটার গাড়ীর ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রকীবা উঠে ইস্টিশনের দিকে পা বাড়াল। এই গাড়ীতেও মেরা আসতে পারে।

আসুক হারামজাদী আজ। এত রাত বাইরে থাকা বের করছি। রকীবা মনে মনে গরজায়।

মেরা সত্যি সত্যি গাড়ী থেকে নামল। ঢুলু ঢুলু চোখ, শ্লথ গতি, কেমন যেন খোড়ার মত পা টেনে টেনে প্লাটফরমের বাইরে বেরিয়ে এল। রকীবা একটু অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। মেরা বাইরে আসতেই খপ্ করে খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

—হারামজাদী, বল—খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

হারামজাদী, বল, কোথায় ছিলি?

মেরা বোধ হয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল, ভড়কাল না। বরঞ্চ বেশ তিক্ত গলায়ই জবাব দিল—যেখানেই থাকি, তোর কি?

রকীবার মাথায় যেন খুন চড়ল। চটপট পিঠে মাথায় কিল-চড় চালাতে শুরু করল।

হারামজাদী খান্‌কী মান-ইজ্জত আর রাখলি না।

মেরা ফোঁপাচ্ছিল, খোঁৎ করে উঠল—ও বড় ইজ্জতওয়ালার চোরাই কারবার করেন—আবার মান।

কথা কইস না হারামজাদী. সারাদিন ছিনালী করে আবার তেজ দেখায়। খবরদার আমাকে আর মা বলে ডাকবি না। বারান্দায় আর উঠবি তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

থপ্ থপ্ করে পা ফেলে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল।

মেয়ের চরিত্রহীনতার অপমানে সারা অঙ্গে যেন সে বিছুটির জ্বালা অনুভব করছে। এমন মেয়ে পেটে ধরেছিল বলে তার নিজের সত্তাটাই যেন অপবিত্র-তার গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ পর টের পেল মেরা এসে ছোট ভাইয়ের কাছে শুয়ে পড়েছে। রকীবা চোখ মেলল না। একটা বোবা করুণা অবসাদের আকারে তাকে চেপে ধরে ঝিম লাগিয়ে দিয়েছে। সে নড়তেও পারল না। একখানা হাত রকীবার পিঠে পড়ল। ফোলা জায়গাটায় মেরা হাত বুলাচ্ছে। কাঁচের চুড়িগুলি টুনটান করে বাজে। রকীবা নির্জীবের মতই চুপ করে রইল।

এই মা, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

রকীবা চুপ।

খুব লেগেছিল, না-রে?

রকীবা উঃ করে শব্দ করল।

জানিস মা, ওই যে কপালে মোটা আচিলওলা সাদেক আর বনগ্রামের সুরেন্দ্র,—তারা বলেছে, আমাদের কোন ভয় নেই। বিপদে আপদে তারাই দেখবে।

পেট্রলের মধ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইর কাঠি ফেলে দিলে যেভাবে দপ করে জ্বলে উঠে, রকীবার মগজও যেন সেইভাবে জ্বলে উঠল। অন্ধকারে হাত নাড়ার সময় একটা আধপোড়া চেলার গায়ে হাত লেগেছিল—নিঃশব্দে তাই তুলে দমাদম মেরাজানের উপর চালাতে লাগল। চিৎকার করে মেরা অন্ধকারের ভিতর মিশে গেল। ঘুমন্ত বজলের উপরও দুই এক ঘা পড়েছিল, সেও কেঁদে উঠল। রকীবা সুর তুলে অশ্রাব্য ভাষায় মেরার উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে লাগল। সোরগোলে লোকজন উঠে পড়েছিল, তারা এসে জোট পাকাল। রকীবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

বাকী রাতটুকু রকীবা আর ঘুমাতে পারল না। বজলকে বুকের মাঝে চেপে ধরে পড়ে রইল। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। কিসের দুঃখ তার। রকীবা নিজের মনকেই প্রশ্ন করে। যে মেয়ে মান-ইজ্জতের ধার ধারে না, তার সংগে কিসের সম্পর্ক? সে যেখানে খুশী যাক, রকীবা আর তার মুখ দেখবে না। মেয়ের ইজ্জত বন্ধক দিয়ে পয়সা রোজগার করবার আগে যেন তার মরণ হয়। মেরাজান তার মেয়ে নয়: কোন

খানকীর মেয়ে হয়ত ভুল করে তার পেটে এসে জায়গা নিয়েছিল কে জানে। ভোরের দিকে রকীবার চোখ দুটা জড়িয়ে এল।

চলতি গাড়ীতে বসে, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখের কথা হয়। একদিন জমিলা বলে—মেরাকে কি সত্যি বিদায় করে দিলি নাকি? এই লাইনে এসব ধরলে চলে না। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো। বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন। গুম হয়ে থাকে রকীবা কিছুক্ষণ, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে—একটা কথা এতদিন তোকে বলিনি বু', মেরা আমার পেটের মেয়ে নয়। বিন্নার ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

শেষের কথাগুলি খুব কষ্টে উচ্চারণ করে রকীবা। গাড়ী চলার খট খট শব্দে গলার আওয়াজের বিকৃতি হয়ত জমিলা ধরতে পারেনি। শাড়ীর আঁচল দিয়ে রকীবা দু' চোখ চেপে ধরে। এক গাড়ী লোক। পায়ে পায়ে ঠাসা। একটা কঁকিয়ে উঠার শব্দ জমিলার কানে যেতেই সে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল—কি হল রকীবা! আঁচলের মধ্যেই মুখ রেখে রকীবা জবাব দিল—কিছু না, চোখে কয়লা পড়েছে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুয়ে রাতের আঁধারে বজলকে বুকে চেপে ধরে রকীবা চোখের পানি ফেলে। আঁচল আর চাপা দিতে হয় না। মেরা গেছে—যাক। বজল তার সোনামাণিক। ঘুমন্ত বজলের মুখটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে। যেন কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

একদিন বেনাপোলের ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে গাড়ীটা থামতেই হৈ হৈ একটা রব উঠল। একটি ছেলে কাটা পড়েছে। নীচের রডে বসে আরেকটি ছেলের সংগে বিড়ি নিয়ে ঝগড়া করছিল। ফল যা হবার হয়েছে। এতগুলি লোকের মুখে মুখে ছেলেটার পরিচয় তালগোল পাকিয়ে হোঁচট খেতে খেতে রকীবার কানে যখন পৌঁছল তখন গাড়ী আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে। 'শফিক, মনীন্দ্র না হয় বজল। এই তিনজনের মধ্যেই একজন। ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সীমানার পাথরটার কাছে। তেলের টিনটা হাতে নিয়ে রকীবা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। যে যার জায়গায় দৌড়া-দৌড়ি করে উঠে পড়ল। চলন্ত গাড়ী থেকে কয়েকটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল—ও রকীবা, তাড়াতাড়ি উঠে আয়। জলদি কর।

রকীবা পাথর।

গাড়ীটা যখন অনেকখানি এগিয়ে গেল, রকীবা তখন হাতের টিনটা সেখানেই ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে লাইন ধরে বনগাঁয়ের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

শুধু রক্ত আর রক্ত।

মানুষ বলে চিনবার যো নেই। থেতলিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। মনীন্দ্রেরও হতে পারে, শফিকেরও হতে পারে। হঠাৎ নজরে পড়ল একখানা অক্ষুণ্ণ হাত আর সেই হাতের আঙ্গুলে পিতলের আংটি। রকীবা আর কিছুই টের পায়নি শুধু সমস্ত রেল লাইনটা যেন ঘুরতে ঘুরতে একটা রক্তের বন্যার মত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পাশের গ্রামের একটা পড়ো দালানের দাওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় ক'দিন পড়ে ছিল রকীবা। হয়ত কোন সহৃদয় গ্রামবাসী লাইন থেকে উঠিয়ে এনেছে। টের পায়নি।

রকীবা ভাবে—মেরাজান খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসতো, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের গলাটা টিপে ধরে ভাবনাটার দম বন্ধ করে মারতে চায়। না, না, মেহেরজান বলে কেউ তার কোন দিন ছিলই না। ধুঁকে ধুঁকে মরবে—সেও ভাল।

এই ক'দিনেই যেন বয়স তার দশ পনর বৎসর বেড়ে গিয়েছে। পিঠটা বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। ভর না দিয়ে ভাল করে চলতে পারে না। রাস্তার পাশ থেকে একটা বাঁশের টুকরা কুড়িয়ে তাতেই ভর দিয়ে রকীবা কোণাকোণি পথে ভিক্ষা করে করে তিনদিনে সরসপুরে এসে পৌঁছল।

নিজের ঘরটার শুধু ভিটির চিহ্ন আছে আর কিছুই নেই, শুধু একটা পোতা। ক্লান্ত রকীবা পোতার উপর বসে পড়ে বজলের মৃত্যুর পর এই প্রথম চোখের পানি ফেলল।

কাজ পাবার আশায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে রকীবা। যেখানেই যায় সেখানেই প্রশ্ন হয়—আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রকীবা উত্তর দেয়—মরে গেছে।

আহা-হা, কি করে ম'ল।

গাড়ীতে কাটা পড়ে।

সবাই আহা-হা করে, কিন্তু চাকরি দেয় না কেউই। হয়ত বা সাত কলস পানি আর দুটা ঘর লেপানোর বদলে দেয় আধ থালা পান্তাভাত।

মুখে রুচে না, তবু ভুখের মুখে জোর করে গিলে। মজিদ একদিন বলে —ও চাচি, ওই যে বল্লি, মেহেরজান মারা গেছে—তা আমি যে সেদিন দেখে এলুম বনগাঁয়ে। কি সুন্দর যে লাগল কি করে বোঝাই, যেন ভদ্দরলোকের মেয়ে। তা ব্যাপারখানা কি বল দিখি ?

রকীবা ফ্যাল ফ্যাল করে চায়, যেন সে ধরা পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর উত্তর দেয়—তা বাবা, এত লোকের মাঝে কাকে দেখলে তার ঠিক নেই আর বলছ আমার মেরা। আমার মেরা যদি—

কথাগুলি বলতে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল—হঠাৎ হাউ হাউ করে রকীবা কেঁদে উঠল।

মজিদ থতমত খেয়ে রকীবার পিঠে হাত দিয়ে বলে—কেঁদে কি হবে চাচি, আল্লার মর্জি। মজিদ ভাবে হয়ত তার নিজেরই ভুল হয়েছে। এত মেয়েছেলের মাঝে কোথাকার কাকে দেখে সে হয়ত ভুল করে বসেছে।

শরীর কিছুটা সেরেছে কিন্তু আগের মত বল পাওয়া যায় না। বড় ক্লান্ত মনে হয়। শুধু দু'মুঠো পান্তাভাতের বদলে এত খাটনী আর রকীবার সহ্য হয় না। না খেতে পেলে শরীর সারবে কি করে। তবু মরি বাঁচি করে দিন কাটিয়ে দেয়। দীর্ঘ ক্লান্ত খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলা দিন।

শরীফ মোল্লাদের মস্ত বড় খামার। অর্ধেক রাত জেগে রকীবা তাদের প্রায় পনর বিশ টিন ধান একা সিদ্ধ করেছে। পরদিন রোদ উঠতেই উঠানে মেলে দিয়ে লম্বা বাঁশে হাঁস-মোরগ তাড়াচ্ছে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। তার উপরে ভ্যাপসা গরম। রকীবার এক সময় ঝিমুনি এল।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রবল ধাক্কা অনুভব করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই টের পেল পেটে পিঠে লাথি পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মালিকের তৃতীয় বউয়ের গর্জন—বুড়ি মাগী, কাইর কাইর ভাত খায় আর পড়ে পড়ে ঘুমায়। নাক ডাকায়। রাজ্যের সব মোরগ এসে আমার সব উজাড় করে দিল সে হুঁশ নেই।

রকীবার কপাল কেটে তখন রক্ত চুয়াচ্ছে।

শ্লথ পায়ে রকীবা বাড়ীর বাইরে এসে কাঁঠাল গাছটার নীচে স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। কেউ সমবেদনা জানাল না বা ফিরে যাবার জন্য

ডাকলও না। তারপর এক সময় রকীবা রাস্তা ধরল। কপালের রক্তের ক্ষীণ ধারাটি যেন তাকে লোহার লাইন পাথর আর স্লিপারের উপর ভেসে যাওয়া কোন বৃহত্তর রক্তধারার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। বজল গিয়েছে—সেও যাবে। কিন্তু মেরা গেল না কেন? সেও হয়ত গিয়েছে, কে জানে। কথাটার নৈশব্দিক উচ্চারণেই সে শিউরে উঠল। বালাই, ষাট, মরবে কেন—বেঁচেই বর্তে থাক। ছিনাল বেশ্যার পেশা নিয়ে যদি পেট চালাতে পারে—তবে তাই করুক। রকীবার তাতে কি? মেয়ে বলে স্বীকার না করলেই হল। মেরা তার কে! কিছু না, বিন্না ঝোপে পাওয়া—পালিতা মেয়ে।

প্রথম যৌবনের প্রথম পোয়াতি রকীবা মেরাকে পেটে ধরে যে অস্বস্তি অনুভব করত তেমনি একটা উপলব্ধির স্মরণে তার চোখ ফেটে পানি ছুটল। কপালে হাতচাপা দিয়ে সে ইস্টিশনের পথেই চলতে লাগল। নিশি-পাওয়া পদক্ষেপ।

একটা পেট বইত নয়। না হয় মহাজনকে বলে কয়ে দু'তিন দিনে একবার খেপ দিবে'। খোদার রাজ্যে বিচার যখন উঠেই গেছে, গতর খাটিয়ে যখন মানুষের মত মোটা ভাত কাপড়ে বেঁচে থাকা যায় না, তখন ওই চুরির পথই ভাল। যে পথে বজল গিয়েছে, সেই পথে সে-ও যাবে। পেট ভরা থাকলে লাথিটা চড়টাও খাওয়া যায়। রক্ত যদি ঝরে তবে চুইয়ে চুইয়ে ঝরবে কেন—গল গল ধারেই ঝরুক। এক সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাক। কিন্তু এই অবস্থা দেখে মেরাজান যদি এগিয়ে আসে। বলে তোকে কিছু করতে হবে না, আমিই তো আছি। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো। না—না, মেরা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতাই সে মনে স্থান দেবে না। মেরা তার কেউ না—কেউ না, কোন দিন কিছু ছিলও না।

এই বারে আর নাভারনের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দা নয়। সেখানে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। নূতন লোক জুটেছে।

অনেক হাঁটাহাঁটি করে কলিমুদ্দিনের সঙ্গে চুক্তি হল। তারই পড়ো গুদাম ঘরটার পিছনে একচালার জায়গাও পেল।

নূতন মহাজনের ঘর থেকেই পাওয়া গেল মবিলের টিন। কিছুটা চট জোগাড় করে, সূচ সুতলি চেয়ে এনে থলেও তৈরী হল।

আবার সেই দশটার গাড়ী।

প্রথম দিনেই বেনাপোলে চোখে পড়ল মেরাকে। চেনা যায় না যেন। নূতন লাল সবুজ চেকশাড়ী ব্লাউজ। একপোচ পাউডারও হয়ত লাগিয়েছে পুষ্ট মুখের উপর। চোখ ফিরানো যায় না। রকীবা চোরের মত সস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়—বিদ্রোহ করা মনটা হয়ত পাহারা দিচ্ছে। কখন ধরা পড়ে যায় কে জানে।

পুরানো পরিচিতরা ছেকে ধরে।

ছিলি কোথায় এ্যাদ্দিন ?

এমন হলো কি করে ?

রকীবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জওয়াব দেয়—যাব কোন চুলায়। অসুখ করেছিল।

গাড়ীটা ছাড়ছে না। কাস্টমের চেকিং শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু কেন দেরী করছে কে জানে।

রকীবা প্লাটফরমের পেছন দিকে—রেলিং-এর কাছে একটা নুড়ি পাথরের স্তূপের উপর একা একা বসে সুপারী চিবাচ্ছিল। পিছন থেকে মেরা এসে তার পিঠে হাত রাখল।

রকীবা নিরুদ্বিগ্নভাবে মাথা ঘুরাল।

এ্যাই মা !

প্রকম্পিত করুণ অথচ মিষ্টি দুটা শব্দ। বহু বছরের পরিচিত।

অন্তরের নিরুদ্ধ মণিকোঠার গলা টিপে রাখা অন্ধ মাতৃত্বটা যেন সশব্দে ঝলকিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশ করল।

মেরা।

কিন্তু পর মুহূর্তেই ঝটতি বেগে উঠে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ল—ছিনালীর আর জায়গা পাস না! মা ডাক গিয়ে যে বেবুশ্যে তোকে পেটে ধরেছিল, তাকে। কোথাকার কোন আস্তাকুড়ের ময়লা—আমাকে বলে কিনা মা।

রকীবা একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে সামনের দিকে হন হন করে এগিয়ে গেল।

দু'একজন ব্যাপারটা দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পিছু ধাওয়া করে রকীবাকে জেরা শুরু করল। সে একটি প্রশ্নেরও জওয়াব দিল না। রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দশটার গাড়ীতে যাওয়া আর পাঁচটার গাড়ীতে ফিরে আসা। জীবন সংস্থানের দুরূহ পরিক্রমা।

শরীরে যথেষ্ট বল হয়েছে। আর কিছু না হোক, হু'মুঠো ভাত তো পেট ভরে খাওয়া যায়।

আজকাল সকলের মুখে মুখে একটা কথা ঘুরে ফিরছে। সেপাইরা নাকি গুলি করে চোরাকারবার বন্ধ করবে। কাগজে নাকি লিখেছে। কেউ বলে গুলি করে ধরবে। নানা মুখে নানা কথা। তবে গুলি যে করবে এই সত্যটুকু সবার মুখেই এক—শুধু সময়ের তফাৎ। মহাজনেরা বলে—করুক দেখি, কত গুলি করতে পারে। বন্দুকের নলের মুখেও ছিপি আটা যায়, বুঝলি? চান্দির ছিপি। তোরা কিচ্ছু ঘাবড়াবি না।

রকীবার ভয় হয়, গুলির ভয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবে—করুক না গুলি। চুইয়ে চুইয়ে তো রক্ত পড়বে না—বজলের মত হয়ত লহমার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া এত শ'তে বিশতে যদি ভয় না পায়, তবে সেই বা পাবে কেন। গুজবটা উঠার পর থেকে কমেছে নাকি কেউ। না লাইন ছেড়ে দিয়েছে?

কিন্তু সত্যই একদিন ঝামেলা বাধল। বেনাপোলে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গেই ধুম ধুম করে শব্দ হল। লোকজনের চিৎকারে প্লাটফরম মুখরিত হয়ে উঠল। ছেলে মেয়ে বুড়া বুড়ী যোয়ান সকলেই প্রাণ হাতে করে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করছে। হাটের মধ্যে একটা পাগলা মহিষ ঢুকে পড়লে যে বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি হয় তেমনি যেন একটা কিছু হয়েছে। রকীবা গার্ডের গাড়ীর সঙ্গে লাগানো একটা কামরায় ছিল। মাটিতে নেমে হতভম্বের মত গাড়ীটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ত্রস্ত চিৎকার কলরবের মাঝে গুলি গুলি শব্দের কাটা আওয়াজ। রকীবার বুকে আত্মরক্ষার আকুল মত্ততা, চোখে মৃত্যুভয়ের বিভ্রান্তি।

রেলিং যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে সেপাই সান্ত্রী যেন অপেক্ষাকৃত কম। লোকজনও যেন সেদিকে দৌড়াচ্ছে না। এই কি সুযোগ। ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালনে হঠাৎ রকীবার নজরে পড়ল ইস্টিশনের প্লাটফরমের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মেরাজান এক সেপাইর সঙ্গে হেসে হেসে কি আলাপ করছে। মুহূর্তে রকীবার মনে পড়ল মেরার সেই কথাগুলি—"তারা বলেছে, বিপদে আপদে তারা দেখবে, আমাদের কোন ভয় নেই।"

না, না, মরণ—সেও ভাল। পেটের মেয়ের যৌবন বেচে বেঁচে থাকতে চাই না।

ধুম ধুম করে আরও কটা শব্দ হল। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পড়ে গেল। এমনিই কি সব লাল হয়ে যাবে। সীমানার পাথরের কাছে লাইন স্লিপার, পাথরের মত! রকীবা হাতের টিন ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলিং-এর শেষ মাথা পার হয়ে পাশের ঝোপের দিকে দৌড়াল। এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। না উঠে এই জায়গায় লুকিয়ে থাকলেও হয়। কথাটা মনে পড়তেই দেখল একজন সেপাই তারই দিকে ধাওয়া করেছে, হাতে লাঠি না বন্দুক কে জানে। রকীবা মরিবাঁচি করে দৌড়াতে লাগল। পরণের কাপড় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, কাঁটায় লেগে অনেক জায়গায় রক্ত ঝরছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েক পা যেতেই ঝোপের ভেতর থেকে আরেকজন সেপাই তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত এগিয়ে এল। লহমার মধ্যে রকীবা চিনতে পারল—কপালে সেই মোটা আঁচিল—কি নাম যেন তার। হাতে কি বন্দুক?

রকীবা রুদ্ধ নিশ্বাসে অতি কষ্টে যেন চিৎকার করে উঠল, "আমি, আমি মেরাজানের মা। চিনতে পারছ না!"

ইঁদুর

সোমেন চন্দ

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। ওদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মত ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তরতর করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোন বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোন বাক্স বা কোন ভারী জিনিসপত্র পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ঙ্কর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়ে যায়। ঘরে যে কয়েকখানা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কেরোসিনের অনেক পুরানো টিন, কয়েকটা ভাঙ্গা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুটখুট টুংটাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকি থাকে না যে, এক ঝাঁক ন্যুব্জদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হব না, নাও থাকতে পারে।

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি, একটা ইঁদুরের বাচ্চাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি তার চার হাত দূর দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য কেঁচো দেখলেই

ভয়ানক শিউরে ওঠেন, আবার এমন একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ ভয় পাই। ছোটবেলায় আমি যখন গরুর মত শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম তখন প্রায়ই মামাবাড়ী যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মত বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাপলা ফুল হাতের কাছে পেলে নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনো উপুড় হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনি আবার কেবলি মনে হয়েছে, এই বুঝি কামড় দিল।—আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণীর নয় বলে আপত্তি করবার কোন কারণ ছিল না, অন্ততঃ সে রকম আপত্তি, আশঙ্কা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগেনি।

সেই ছেলেবেলার বন্ধুরা মাঠে গরু চরাত। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মত দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রং বাদামী, চোখের রঙও তাই, পাগুলি অস্বাভাবিক সরু-সরু, মাঝখান দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা, পরনে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলি লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে, আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল, তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠত, অথচ আমি আমার সশ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না। তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত, আমার মুখ লাল হয়ে যেত। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ছিল ভীম। সে একদিন খোলা মাঠের নতুন জল থেকে একটা প্রকাণ্ড জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, খুকু, তোমার গায়ে ছুড়ে মারব।

আমি ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ভয়ে আমার গা শিউরে উঠল, আস্তে আস্তে বুদ্ধিমানের মত দূরে সরে গিয়ে বললাম, ছাখ ভীম, ভাল হবে না বলছি, ভাল হবে না! ইয়াকি, না?

ভীম হি হি করে বোকার মত হাসতে হাসতে বললে, এই দিলাম, দিলাম—

সেদিনের কথা আজো মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজো অবাক লাগে। অনেকের অমন স্বভাব থাকে—যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটখাট ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোন প্রভাব আছে কিনা বলতে পারিনে।

একথা আগেই বলেছি যে, আমার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুর যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশী। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নিচে কেমন করে জানিনে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিল। সে থেকে থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিল, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে থেকে ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে বললেন, সুকু! সুকু!

প্রথম ডাকে উত্তর না দেওয়া আমার একটা অভ্যাস, তাই উত্তর দিয়েছি এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

—সুকু? সুকু?

এবার উত্তর দিলুম, কেন?

মা তাঁর হলুদ-বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে চোখ বড়ো করে বললেন, ওই দ্যাখ!

আমি বিরক্ত হলুম। ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কি? এত ইঁদুর কেন? পরম শত্রু কি কেবল আমরাই? আমি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, আহা ধরিসনে, ওটা ধরিসনে।

—খেয়ে ফেলবে না তো!

—আহা, বাহাদুরি দেখানো চাই-ই!

—মা, তুমি যা ভীতু!

ইঁদুরটা অনবরত পালাবার চেষ্টা করছিল, বললুম—আচ্ছা মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পারো না? কোন্‌দিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করে দিয়েছে!

—আহা, মেরে কি হবে? অবোধ প্রাণী, কথা বলতে পারে না তো! আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায়? মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র

কাতর হল না, কোন বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাতর থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকেন না। তিনি অমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরনের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নীচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে তারা ফিস্‌ফিস্‌ করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আঠারো বছর বয়েস অবধি এ নিয়ে আবোল-তাবোল অনেক ভেবেছি, কিন্তু আবোল-তাবোল ভাবনা মস্তিষ্কের হাটে কখনো বিক্রি হয় না। ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস, দুই-ই প্রচুর ছিল, তাই ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পারি তেমন বর আমাকে দাও। রবীন্দ্রনাথের পরশমণি কবিতা পড়ে ভেবেছি, ইস্‌, একটা পরশমণি যদি পেতুম! সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে সত্যই জিজ্ঞেস করে বসেছি, আচ্ছা, পরশমণি পাথর আজকালও লোকে পায়? কোথায় পাওয়া যায় বলবে?

আমি যখন ছোট ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলির নির্মল দেহে তখনো অর্থহীনতার ছায়াটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙনের দিন তখনো ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়নি। শুরু না হওয়ার আমি এই মানে করেছি যে, তখনো অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যৎ স্মরণ করে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথচ সে সব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায়? আমি বলতে দ্বিধা করব না, সে সব শাখা-প্রশাখা তো ছড়ায়ইনি, বরং মাটির গর্ভে স্থান নিয়েছে। একটা সুবিধা হয়েছে এই যে, পারিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অক্টোপাশ থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পেরেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি আর থাকা যায়? ইঁদুররা আমায় পাগল করে তুলবে না? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স বা ভাঙা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুংটাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে? আমি অন্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে ধীরে একটা সঙ্গীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না হয়ে যায় না। ইঁদুরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সে রকম একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, সুকু! সুকু!

বলেছি তো প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।

মা আবার আর্তস্বরে ডাকলেন, সুকু!

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না করে নিজেকে মা'র কাছে যথারীতি স্থাপন করে তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিস্মিত হবার কারণ থাকে তবুও বিস্মিত হলুম না। দেখলুম কি, আমাদের কচিৎ-আনা দুধের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ দিয়ে একটি সাদা পথ তৈরী করে এক প্রকাণ্ড ইঁদুর দ্রুত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোন বিশেষ খবর শুনে কোন বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাব নেই বলেই বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার অভিনয় হবে না, একথা বলাই বাহুল্য। দেখতে পেলুম, আমার মা'র পাতলা মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চোখ দুটি গোরুর চোখের মত করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক ফোঁটা জল টলমল করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন। দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনো দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোন কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করবার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব

আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। মার ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর বিনিয়ে বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিল, আরও গভীর করে তুললো। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রচুর অগ্নিবর্ষণ করছে, নীচে পৃথিবীর ধূলিকণা আরও বেশী অগ্নিবর্ষী। আমার হৃদয়ের ক্ষেতও পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটি নীল উপত্যকাও দেখা যায় না, দূরে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই, মরীচিকা দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থরাজি কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অমূল্য। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণব্রতী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (তখনো ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনো শুরু হবে)। আমার মুখভঙ্গি চিন্তাকুল হয়ে এলো, হাঁটু দুটি পেটের কাছে এনে কুকুরের মত শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে নিয়েছি ভাল করে ভাবার জন্যে—ভাবতে লাগলুম, এমন কোন উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন—যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়—বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো!

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুকনো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারী জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃতপ্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম। এই ভেবে যে, ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা—যার কোন পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের সূত্রপাত হবে—সেই থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শিগ্গির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন: তোমরা পেলে কী? কেবল ফুর্তি আর ফুর্তি! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি? আমি কি মানুষ নই? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফুর্তিতে মেতে আছ। সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও। নইলে টিকে থাকাই দায় হবে।

আমার কাছে বাবার এই ধরনের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরনের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে বলে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যে অদ্ভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার সঙ্গে আমার একাধিকবার পরিচয় হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায়নি, বরং আশঙ্কার কারণ আরও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় তার ব্যর্থতার মাঝখানে এই নগ্নতার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবা বললেন, আর তর্ক কোরো না বলছি! এখান থেকে যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি!

মা বললেন, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে!

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মত ফেটে পড়ল।—তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কিনা বল? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগী। বাবা বিড় বিড় করে আরো কত কী বললেন, আমি কানে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম একটি অসাড় মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুল। বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোন কথা লেখা ছিল না। মনে হল যেন আজ এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলি চরম প্রহরী সেজে আমার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে অমন দেখিনি বা শুনিনি। তবু আমার অনুভূতির এই শিক্ষা কোত্থেকে এল? বলতে পারি আমার এই

শিক্ষা অতি চুপিচুপি জন্মলাভ করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমনভাবে শ্বাস ও রস গ্রহণ করেছে যাতে টু শব্দও হয়নি। ফুলের সুবাস যেমনি নিঃশব্দে পাখা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোখের পাখা দুটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত খেলার আয়োজন করতে ছাড়েনি। আরও বলতে পারি, আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড়ো হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজ কাজ দিল কই? বরং আরও কর্মহীনতার নামান্তর হল, আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিল জলে, দুই চোখকে বাষ্পাকুল করে কিছুক্ষণের জন্য কানা করে দিল। আমি কি করবো? আমার কিছু করবার আছে কি?

—শয়তান মাগী, যা বেরিয়ে যা।

আবার ভেসে এল অদ্ভুত কথাগুলি। এসব আমি শুনতে চাইনে তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কানের ভেতর ঢুকবে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

—যা বলছি!

গোলমাল আরও খানিকটা বেড়ে গেল। কিন্তু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, সুকু! সুকু!

ঠিক তখনি উত্তর দিতে লজ্জা হল, ভয় করল, তবু আস্তে বললাম, বলো!

মা বললেন, দরজা খোল্।

ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হল এই ভেবে যে এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই তারই সামনে এক গম্ভীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনা শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে।

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হল না! মা ঘরের ভিতর ঢুকতেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করল! কেমন অসহায় দেখাল ওঁকে। ছোটবেলায় যাঁকে পৃথিবীর মত বিশাল ভেবেছি, তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কত ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে। যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র, সে এখনো শৈশব অতিক্রম করতে

পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ, রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশীর দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ওই হরিণের মত ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কত শক্তিমান। আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারত, আজ লণ্ডনের কোন ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডোরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পায়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোন খাঁটি ইংরেজ মহিলার ধীর গম্ভীর পদক্ষেপ ভীরুর মত অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাঞ্চা করছে! এমন তো হতে পারত, তার সোনালী চুল, দীর্ঘ পক্ষাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ—আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা? সে এখন কই? আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ঐ ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে? এখান থেকে কত ছোট আর অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মা'র দিকে তাকালুম। ডাকলুম মা। ও-মা।

কোন উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোন ভগ্ন নারীকণ্ঠ আমার কানের দরজায় এসে আঘাত করল না। ঘুমিয়ে পড়েননি তো?

পরদিনও আবহাওয়ার গভীরতা কিছুমাত্র দূর হল না। মা'র এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাইবোনেরা প্রচুর আস্কারা পেয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তারা নগ্নগাত্র হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগল। স্কুলহীন ছোট বোনটি তার নিত্যকার অভ্যাস মত প্রেমকুসুমাস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড উপন্যাস নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে চাইবারও সময় নেই। সেদিন অনেক রাতে সারা বাড়ী গভীর ধোঁয়ায় ভেসে গেল, সকলের নাক-মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে এল। ছোট বোনদের খালি মাটিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখনো রান্না হয়নি, মা?

চোখের জলে ভিজে উনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে মা বললেন, না। এখন চড়াচ্ছি।

—এত দেরী হল কেন?

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম, এ জিনিস এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়—ঘুরেফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলেও হাত চেপে ধরে, কোন রকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করি তবে সারা জীবন লিখেও শেষ করতে পারব না, কেউ পারবে না, তাতে কতকগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর সৌখিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি, পাঠকশ্রেণী কে? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্নাকাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছুটা লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসি-মুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন—প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিত মশায় করেন—ঘরে অতি-শুকনো স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়েদের অভুক্ত রেখেও পথেঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কর্মচারী মদন—শূন্যতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনো পদ্মাসন কেটে বসে নিমীলিত চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এ ছাড়া আর উপায় কি? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা ঊর্ধ্বাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্ত নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধেঁায়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম: 'এরা কে জানো? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে, এরা তাই। এরা তৈরী করছে বাগান অথচ ফুলের শোভা দেখেনি। পেটের ভিতর সুঁচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়। পরিহাস। পরিহাস! ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, তাতে নিজের মনে মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাস-কৃশ বিধবারা তাঁদের

সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংসারযাত্রার পথ বেয়ে বেয়ে কোন রকমে কালাতিপাত করছেন, তাঁদের জন্যে করুণা যেমন হল, মনে মনে পুজো করতে লাগলুম আরও বেশী।

কিন্তু সে সব ক্ষণিকের ব্যাপার। শরতের মেঘের মত যেমনি এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল, মগজের মধ্যে জায়গা যদিও একটু পেয়েছিল, বেশীদিন থাকবার ঠাঁই পেল না। আজ ভাবছি, আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলে এক সম্পূর্ণ সংকীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকত, তখন সে ভাবনা নিয়ে মনে মনে পরিতৃপ্ত থাকতুম বটে, কিন্তু গতির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জরিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলুম। সেই দুপুরটিকে যা ভাল লেগেছিল কেবল মুখে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হল যে চোখের ওপর কে যেন কিছু শীতল জলের প্রলেপ দিয়ে দিলে। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম, চওড়া রাস্তার পাশে সারি-সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ, মেয়ে-পুরুষের মিলিত চিৎকারধ্বনি পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্রাক্টর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে—অবাধ্য জমিকে ভেঙে-চুরে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হল। একদা তা বাতাসে মাটির মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায়-পাতায়। কেউ শুনতে পায়? যারা শোনে তাদের নমস্কার।—তাই অলস মধ্যাহ্নকে মধুরতর মনে হল। দেখলুম এক নগ্নদেহ বালক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইটের টুকরো নিয়ে গভীর মনোযোগে আঁক কষছে।

কোন্ বাড়ী থেকে পচা মাছের রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে বেশ, সঙ্গীত-পিপাসুর বেসুরো গলায় গান শোনা যাচ্ছে হারমনিয়ম-সহযোগে এই

অসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর, ও-বাড়ীর এক বধূ রাস্তার কলে এইমাত্র স্নান করে নিজ বুকের তীক্ষ্ণতা প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকুচিত দেহে বাড়ীর ভিতর ঢুকল, দুটি মজুর কোন রকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লা-মলিন বেশে আবার দৌড় দিচ্ছে। এ দৃশ্য বড় মধুর লেগেছে—অবশ্য কোন বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র বলে নয়। এ চিত্র যেমন আরাম দেয়, তেমনি পীড়াও দেয়। আমার ভাল লেগেছে এই স্মরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজত্বে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছি বলে। চমৎকার! চমৎকার!

অনেক রাত্রে ইঁদুরের উৎপাত আবার শুরু হল, ওরা টিন আর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি শুরু করে দিল, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেঝে অতিক্রম করতে লাগল, কোথাও কোন বাক্সের ভেতর থেকে লেজ বার করে দারুণ উপহাস করতে লাগল।

রান্না শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, ওরে মন্টু, ওরে ছবি, ওরে নারু, ওঠ্ বাবা ওঠ্!

মন্টু উঠেই প্রাণপণ চিৎকার আরম্ভ করে দিল। ছবি যদিও এতক্ষণ তার উপন্যাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ছিল, এখন বই-টই ফেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

—ওরে ছবি, খেতে আয়, খাবি আয়।

বার বার ডাকেও ছবি টুঁ শব্দটি করে না।

মা ভগ্নকণ্ঠে বললেন, আমার কী দোষ বল্? আমার ওপর রাগ করিস্ কেন? গরীব হয়ে জন্মালে ..

মার চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ করে বললুম, আহা, ও না খেলে না খাবে, তুমি ওদের দাওনা!

মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর।

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছ?

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে। ভারি চমৎকার মনে হলো, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালবাসা কামনা করতে লাগলুম তার কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার

বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চিৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

—কনক! ও কনক!

প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না, কোনবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনবার উঃ-আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটল।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক সাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মত বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরী কুকুরদের সাময়িক নিদ্রাময়তায় এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ির ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাতের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙল: তিনি আবার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে ভালভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর এক অশিক্ষিতা নববধূর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন। অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালনে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি লক্ষ্য করলুম, দুজোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাবা গুণগুণ সুরে গান গাইতে লাগলেন। চমৎকার মিষ্টি গলা, বেহালার মত শোনা যাচ্ছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলি আরও সাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ রাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক রোজকার মত ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মত এমন মধুর ও গভীর আর কখনো শুনিনি। তাঁর মৃদু গম্ভীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে গেল। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিনকার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ির ইটগুলিও কাঁপছে। বাবা বললেন, পণ্ডিত মশাই, ও পণ্ডিত মশাই, উঠুন। আর কত ঘুমুবেন? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কি? উঠুন!

আমি অনেক কষ্টে চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনো হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিনা, এককুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে খুলতে বাবা বললেন, পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছো, সকলেরই ভোরে উঠবার অভ্যাস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও এমনি অভ্যাস ছিল। আমরা যত ভোরেই উঠিনা কেন, উঠেই শুনতে পেতুম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমিজমা অত টাকা-পয়সা করে যেতে পারেন! তিনি তো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিতমশাই, যারা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে জীবনে তারা কখনো উন্নতি করতে পারে না।

অতটা মাতব্বরি সহ্য হয় না, জীবনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়িসুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন।

সমস্ত বাড়িটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল। ওদিকে মন্টু সেলুনে চুল ছাঁটাবার জন্য পয়সা চাইতে শুরু করেছে, ঘণ্টাখানেক পরেও পয়সা না পেলে মেঝেয় আছাড় খেয়ে তারস্বরে কাঁদবে। নারু পক-পক বাক্যবর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে। ছবি এইমাত্র তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়নঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠছে।

বাবা দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এঘর-ওঘর পায়চারি করতে লাগলেন। এক সময় আমার কাছে এসে বললেন, তোমরা থিয়োরিটা বার করেছ ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না, আজকাল ওসব ভালোমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হলো লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিতমশাই?

আমি মনে মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন, তা এমনভাবে বলেন যে, মনে মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কি জানি কেন ধারণা

হয়েছে, আমরা সব ভালোমানুষের দল, নিজের খেয়ে পরের চিন্তা করি, শুষ্কমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচ্যুত, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ আবিষ্কারে মত্ত।

আবার বললেন, তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুরই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয়নি। কেবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড় সাধু ছিলেন, যেমন টলস্টয় ছিলেন। কিন্তু ওঁরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কী? কখনো নয়।

বলতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার! এমন স্বকীয়তা, এমন নতুনত্ব আর কোথাও চোখে পড়েছে? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। তিনি একবার যা বলেন তা ভুল হলেও তা থেকে একচুল কেউ তাঁকে সরাবে, এমন বঙ্গসন্তান ভু-ভারতে দেখিনে। এক হিটলারের দম্ভে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু একমাত্র আশার কথা এই যে, এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সীরিয়স্ নন, একবার যা বলেন দ্বিতীয় বার তা বলতে অনেক দেরী করেন। নইলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নাই।

ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের ওপর দুই গাছি খড়ের মত চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরনে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পা দুটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত শীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নারুকে ডেকে বললেন, নারু, তোমার কী চাই বলো?

নারু তার ছোট ছোট ভাঙ্গা দাঁতগুলি বের করে অনায়াসে বলে ফেলল, একটা মোটর-বাইক। সার্জেন্টরা কেমন সুন্দর ভটভট করে ঘুরে বেড়ায়, না বাবা?

কিন্তু মন্টুর কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। সে হঠাৎ পেছন ফিরে মুখটা নিচের দিকে নিয়ে কামানের মত হয়ে বললে, বাবা, এই দ্যাখো?

দেখতে পাওয়া গেল, তার পিছনটা ছিঁড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে

গেছে। বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, বাঃ বেশ তো হয়েছে, মন্টু বাবুর যা গরম, এবার থেকে দুটি জানালা হয়ে গেল, বেশ তো হল। এবার থেকে হু-হু করে কেবল বাতাস আসবে আর যাবে, চমৎকার, না?

মন্টু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মত হেসে উঠল, নারু তার ভাঙ্গা দাঁত বের করে আরও বেশী করে হাসতে লাগল, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমাদের সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে নেচে উঠল, গুমগুম করতে লাগল।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম, আনন্দের এই নির্মল মুহূর্তগুলি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশীর আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হল রান্নাঘরে। একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে বাবা বললেন, আজ কী রাঁধবে গো?

মুখ ফিরিয়ে অজস্র হেসে মা বললেন, তুমি যা বলবে!

বাবাকে এবার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। আমি যা বলব ঠিক তো? বলি, রাঁধবে মাংস, পোলাও, দই, সন্দেশ? রাঁধবে চাটনি, চচ্চড়ি, রুই মাছের মুড়ো? রাঁধবে? রাঁধবে আরও আমি যা বলব?

—ও মাগো! থাক থাক, আর বলতে হবে না! মা দুই হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, দুজনের দিকে দুইবার চেয়ে তারপর মাকে মুচকে হাসতে দেখে বললে, মাগো কি হয়েছে? অমন করে হাসছ কেন? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে?

—আরে, না রে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেলগে যা—বাঁ হাত তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, আচ্ছা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে?

একটু চিন্তা না করে মা বললেন, আমার ওসব মনে-টনে নেই।

—আহা, বিলের ধারে মাঠে সেই যে গরু চরাচ্ছিলে?

মার চোখ বড় হয়ে গেল: ওমা, আমি কি ভদ্দরলোক নই গো যে মেয়েমানুষ হয়েও মাঠে মাঠে গরু চরাব?

গরু চরানোটা কি অপরাধ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়ে চেড়ে দিলে দোষ হয়? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে। ইচ্ছে করেই কেবল যা-তা বলছ।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব মনে আছে, সব মনে আছে।

মৃদু মৃদু হেসে বাবা বললেন, নৌকো থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে, একটি মাত্র দীপ-শিখার মত। নৌকো থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াচ্ছে না বা পাখির মতো বাড়ির দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না, বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে. অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবী-প্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঙা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও সেই একই মেয়ে, কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মত লজ্জায় একে-বারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।—বাবা হা-হা করে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে বললেন, তোমার কী চাই—বললে না?

—আমার জন্য একখানা রান্নার কাপড় এনো।

—লাল রঙের?

—হ্যাঁ।

তারপর কার জন্যে কী এনেছিলেন খবর রাখিনি, কিন্তু নিজের জন্যে দু'আনা দামের একজোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র দু'আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া বলে কুকুরের আশংকাও করেছেন।

কুকুরের কথা জানিনে, তবে কয়েক দিন পরেই জুতো-জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য!

পরদিন দুপুরবেলা রেলওয়ে ইয়ার্ডের উপর দিয়ে যেতে কার ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকালুম। দেখি শশধর ড্রাইভার হাত তুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিল এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তখন গম্ভীরভাবে শশধর বলেছিল, দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিল।

—কেন ?

শালা বলে কিনা, ড্রাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুস্কিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর বলে এলুম, সায়েব, আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো, করো। এই বলে তখুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম। আসবার ভঙ্গি দেখাবার জন্যে শশধর হেঁটে অনেক দুর পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এল। আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার সেই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর-স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, উঠুন। সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিল। তারপর একটা বিড়ি হাতে দিয়ে বললে, খান সুকুমার বাবু।

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করবার ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকালো, কেউ তাকালো না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েন্টস্‌ম্যান গানারদের চিৎকার আর হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এতদিন পরে ছুটি থেকে ফিরেছে দেখলুম। আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, ওরা কি বলছিল জানেন ?

হেসে বললুম, কী ?

বলছিল, আপনি একটা ব্যারিস্টার হলেন না কেন ?

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল, আমিও হাসতে লাগলুম।

সেই সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, তোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিঞা। আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তোমায় স্কুলে পড়াতে চাই।

এবার হাসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবাই বসে পড়ল।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, বাঃ, বাঃ, বাঃ, খালি ঠাট্টা আর ঠাট্টা, না! চারটে পয়সা দিয়েই খালাস, না? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে, না? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না?—একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে। গল্পটি হচ্ছে এই: সে এবার বাড়ি গিয়ে তাঁর গাঁয়ের চাষীদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। সেই বৈঠকে যে লোকটা বক্তৃতা করেছিল, সে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বললে, ভাই ইয়াসিন, তোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই? ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, আলবত আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুক-পকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দিল। লোকটা তখন ভয়ানক খুশী হয়ে বলেছিল, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন! তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মত হেসেছিল।—দুনিয়ার সবাই এক রকম একজোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকব, না? চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না? বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘর্মাক্ত মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক ঠক শব্দ করে কাজ করতে লাগল।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মত আশা, তার সোনার মত ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে শেড-ঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে বেশ। আমি বাঁ দিকে শেড-ঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলুম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের উপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বসেছে যেন। আমার কাছে ওদের মানুষের মত প্রাণময় মনে হল। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কত রকমের হাড়—কত কল-কব্জা, মাথার ওপর ওই একটি মাত্র চোখ, কিন্তু কত উজ্জ্বল? মানুষ ওদের সৃষ্টিকর্তা। হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মত রাগ। এমন বিরাট কর্মীপুরুষ আর আছে! সত্য কথা বলতে কি, এত কলকব্জার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হল। আমি হতভম্ভ হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে এলুম।

কয়েকদিন পরে কোন গভীর প্রত্যুষে একটি ইঁদুর-মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মন্টুও তাঁর দুই আঙুল ধরে বানরের মত লাফাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরেই আরও অনেক ছেলেপুলে এসে জুটল। একটা কুকুর দাঁড়াল এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি কেউ বড়-বড় ইট নিয়ে বসল রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।

রোকেয়ার নিজের বাড়ী

আবদুল হক

শহরের প্রায় উপকণ্ঠে বাড়ী। পাশাপাশি তিনটি কামরা, হাবিব তারই শেষেরটি পেয়ে গেল। নিতান্ত অবস্থাগতিকে হাসেম সাহেব এই ঘরটি সাব-লেট করলেন। অল্প মাইনের ছা-পোষা কেরানী তিনি, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া দিতে হয়, নিতান্ত নিরুপায় বলেই দিতে হয়। সেই বাড়ীর এক-তৃতীয়াংশ ভাড়া দিয়ে অর্ধেক টাকা ঘরে ফিরে আসা কম কথা নয়।

ঘরটিতে মাঝারি সাইজের একটি চৌকির জায়গা হয়, তারপর কিছু জায়গা ফাঁক থাকে, তবে আরেকটি চৌকি রাখা চলে না। চৌকির এক মাথায় দু'একটি বাক্স, আরেক মাথায় একটি ছোট্ট টেবিল এবং একটি চেয়ার মাত্র রাখা যায়। এ ঘর দেখে রোকেয়ার খুশী হওয়ার কথা নয়, কারণ মফস্বল শহরে বাড়ীঘরের ব্যাপারে সে সুখের মুখ কিছু দেখেছে, তবু এই ছোট ঘরটি পেয়েই সে খুশী হয়ে গেল। সামান্য তাদের জিনিস-পত্র, সামান্যই আসবাব, তাকেই রোকেয়া পরিপাটি ক'রে সাজাল। ঘরে দু'দিকে দু'টি মাত্র ছোট ছোট জানালা, রোকেয়া তাতে পর্দা টাঙিয়ে দিল। হাসেম সাহেবের পাকঘরের লাগালাগি জায়গাটুকুতে দরমা দিয়ে একটা নতুন পাকঘর তৈরী করা হয়েছিল, লেপে-পুছে রোকেয়া তাকে ঝকঝকে ক'রে তুলল।

হাবিব আর রোকেয়ার সংসারযাত্রা শুরু হল।

এইটুকু ঘর হাবিবের নিজেরই পছন্দ নয়, কিন্তু উপায় কি। ঢাকায় বাড়ী ভাড়া পাওয়াই যায় না, আর পেলেও বাড়ীওয়ালার যে হাঁকডাক। চার বছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে, তারমধ্যে তিন বছরই কাটল বাড়ী ভাড়া নেওয়ার জন্য রোকেয়ার অবিশ্রাম তাগাদায় ও পত্রাঘাতে। সেই সঙ্গে ছিল হাবিবের প্রচুর অধ্যবসায়। তারই ফল ঘরটুকু।

সংসার গোছানো শেষ হল। সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়ার পর হাবিব বলল, "এইটুকু ঘরে তোমার অনেক অসুবিধা হবে।"

রোকেয়া বলল, "অসুবিধা আর কি। এটা আমার নিজের বাড়ী, এর চেয়ে বেশী সুখ আর কোথাও আছে নাকি ?"

"কিন্তু যেমন বাড়ী তুমি মনে মনে কল্পনা করেছিলে তেমনটি নিশ্চয়ই হল না।"

"শুধু বড় বাড়ী হলেই কি সুখী হওয়া যায় ? আর আমাদের বড় বাড়ীরই বা কি দরকার ? এখন এই যথেষ্ট, দরকার হলে পরে সুবিধামত বড় বাড়ী নেওয়া যাবে। কিন্তু বাপের বাড়ীতে আর নয়। বাবাঃ, আজ চার বছর যা কষ্ট তুমি আমাকে দিয়েছ।"

হাবিবের নিজের বাড়ী বা বাপ-মা কেউ নেই বলে বিয়ের পর চার বছর ধরে রোকেয়া বাপের বাড়ীতেই কাটাল।

হাবিব বলল, "আচ্ছা, বিয়ের পরই তোমরা মেয়েরা বাপের বাড়ীকে পরের বাড়ী মনে কর কেমন করে, বল দেখি ? এর আগে কোনদিন তো আমাকে দু'চোখেও দেখনি।"

"দেখেছি গো, দেখছি," রোকেয়া রহস্যময় কণ্ঠে বলে।

"কোথায় দেখেছ ?"

"বলব না," বলে রোকেয়া কিছুক্ষণ হাসে। তারপর বলে, "বাবুলকে একটু আদর কর দেখি, ও বেচারা এখনও তোমাকে দেখে কেমন যেন লজ্জা করছে। এতদিন তো দূরে-দূরেই রাখলে।"

রোকেয়া বলেছিল এটা তার নিজের বাড়ী, কিন্তু সত্যিই যে নিজের বাড়ী নয় তা বুঝতে বেশী দিন লাগল না।

রোকেয়া সহজাত বুদ্ধিতেই টের পায়, হাসেম সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম বিবি যেন কেমন নজরে তার দিকে তাকান। মরিয়ম বাড়ীর বড় অংশ এবং আসল অংশ দখল করে আছেন, আর রোকেয়া দখল করে আছে ছোট অংশ, এতে উভয়ের মর্যাদা ও অধিকারেরও যেন তারতম্য ঘটে গেছে। হাবিব বলতে গেলে হাসেম সাহেবের অনুগৃহীত ও আশ্রিত এবং তাঁর 'প্রজা' তো বটেই। হাসেম সাহেব ইচ্ছা করলেই একদিন হাবিবকে উঠে যেতে বলতে পারেন। এ কথা সব সময় মনে রাখতে হয়, এবং

সেইভাবে চলতে হয়। এই বারান্দা, এই আঙিনা, ওই কূপ, আর ওর পাশে দরমা দিয়ে ঘেরা গোসলখানাটা, প্রত্যেকটিতে মরিয়ম বেগমের অগ্রাধিকার, রোকেয়ার দাবীটা কনিষ্ঠ। এই চিন্তা রোকেয়ার মনে সব সময় খচখচ করতে থাকে।

কিন্তু আরেকটা বড় অসুবিধা দেখা দিল গরমের দিনে। রাত্রে ঘর যেন দোজখ। অথচ মাঝারি সাইজের একটিমাত্র চৌকিতে তিন-তিনজন। ছেলেটা অতবড় হয়ে উঠল, রাত্রে কখন জেগে ওঠে, চোখ মেলে তাকায়, তার কি ঠিক আছে। আর চোখ মেলে তাকায়ও তো কোন কোন রাত্রে। তাই ওকে দু'জনের মাঝখানেই রাখতে হয়। বাবুল ঘুমের ঘোরে গরমে ছটফট করে আর একবার বাপের গায়ে এবং আরেকবার মায়ের গায়ে পা উঠিয়ে দিয়ে ঘুমায়।

রোকেয়া একদিন বলল, "বাসা কি আর দেখবে টেখবে, না এখানেই চিরকাল থাকবে ?"

"না না, তাই কি থাকি ? বাসার খোঁজে আমি সব সময়েই আছি, পেলেই এ বাসা ছেড়ে দেব।"

রোকেয়া হাবিবকে পরামর্শ দেয়, "একটা বড় বাসাই দেখ না, একটা অংশ না হয় ভাড়া দিয়ে দেব, যেমন হাসেম সাহেব দিয়েছেন। এভাবে পরের মুখ তাকিয়ে পরের প্রজার প্রজা হয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না।" রোকেয়া মাঝে মাঝেই তাগাদা দিতে থাকে।

হাবিব বলে, "অধৈর্য হয়ো না। ঢাকায় বাড়ী পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়।"

"খুব লেগে-পড়ে চেষ্টা করে দেখই না।"

"চেষ্টা কি আর করছি না। কিন্তু এ শহরে চেষ্টা করাও যা, না করাও তা।"

"হ্যাঁ, তাই বুঝি ? তাহলে হাসেম সাহেব কেমন করে বাড়ী পেয়েছেন ? আসলে তুমি তেমন খেটে খুটে দেখ না, কুঁড়ের বাদশা তুমি,"—রোকেয়া একটা খোঁচা দিতে ছাড়ে না।

কিন্তু খোঁচায় কোন কাজ হয় না, বছর হয়ে আসে তবু হাবিব কিছুমাত্র সুবিধা করতে পারে না।

হাবিব মাঝে মাঝেই বাসায় এসে গল্প করে, তার মত বেতনেরই কত ছোট কেরানী বুদ্ধি করে শুরুতে সস্তা দামে চার-ছ' দশ কাঠা জমি কিনেছিল, সেই জমিতে তারা বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দিয়ে চল্লিশ থেকে দু'শো চারশো টাকা মাসে উপরি আয় করছে। আর টাকার অভাবে হাবিব শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকছে।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল স্বয়ং হাসেম সাহেব কোথায় চার কাঠা জমি কিনেছেন, যেমন-তেমন একটা টিনের বাড়ী তৈরী করে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সেখানে উঠে যাবেন।

রোকেয়া ধরে বসল, হাবিবকেও জমি কিনতে হবে। "যাক গে, তোমাকে আর বড় বাসার জন্য চেষ্টা করতে হবে না, তুমি জমিরই চেষ্টা দেখ। আধপেটা খেয়ে হলেও জমি কিনে একটা যেমন-তেমন নিজের বাড়ী তৈরী করে তারপর এখান থেকে উঠে যেতে হলে নিজের বাড়ীতেই উঠে যাব।"

ভীষণ উৎসাহ, গভীর পরামর্শ, কিন্তু টাকা? টাকা এখন পর্যন্ত হাবিব কিছুই জমাতে পারেনি। স্থায়ী চাকরিই তার হল না, টাকা জমবে কেমন করে? সিভিল সাপ্লাই, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, জুট কোম্পানী এই ক'রে বেড়াতে হচ্ছে আজ কয় বছর থেকে। এমন কি মাঝে মাঝে বেকারও থাকতে হয়। মেরে-কেটে মাসে মাসে দু'দশ টাকা ক'রে হয়তো জমানো যায়, কিন্তু জমির দাম দিন দিন হু-হু ক'রে বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হাবিবের কর্ম নয়।

দু'চার দিন পর জমি কেনার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়। দিন দশেক পরে রোকেয়া হাবিবের হাতে কড়কড়ে দেড় শো টাকা তুলে দিয়ে ওকে তাজ্জব করে দেয়।

"কোথায় পেলে এ টাকা?" হাবিব হর্ষ ও বিস্ময়-মাখানো ফিস ফিস স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

টাকা প্রাপ্তির কথাটা রোকেয়া হেসে হেসে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা করল।

জমি কেনার কথা যেদিন ওঠে, সেদিন থেকেই রোকেয়া মনে মনে ভাবছিল বাপ-মার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করা যায় কি না।

বাপের অবস্থা তেমন ভালো নয়, তিনিও ছোট কেরানী, তবে বয়স বেশী হয়েছে বলে বেতন কিছু বেড়েছে এই যা, কিন্তু সংসারের খরচও তেমনি বেড়েছে। রোকেয়ার বড় ভাই কলেজে পড়ছে, ছোট বোনের বিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে এল, তার ছোট আরও তিনটি ভাই-বোন ইস্কুলে পড়ছে, সংসার চলাই কঠিন। তবু রোকেয়া ইনিয়ে-বিনিয়ে মাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। অনেক কাটাকুটি করা প্রথম মুসাবিদাটা সে রেখে দিয়েছিল হাবিবকে দেখিয়ে মজা পাবার জন্য, সেটি এখন দেখাল। চিঠিখানা এই :

"আম্মাজান,

শত-সহস্র আদাব জানিবেন। আমি বড় মুছিবতে পড়িয়াছি। মনের ভুলে বাক্স খুলিয়া রাখিয়া পাশের বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কে ঘরে ঢুকিয়া বেতনের প্রায় সব টাকাই চুরি করিয়া লইয়াছে। আমার দোষে চুরি হইযাছে তাই ভয়ে বাবুলের আব্বাকে বলি নাই। আমি এক পড়শীর কাছে টাকা ধার করিয়া খরচ চালাইতেছি। টাকা শীঘ্র জোগাড় করিতে না পারিলে বাবুলের আব্বা জানিয়া ফেলিবে এবং খুবই বকাবকি করিবে। কিছুদিন হইতে মেজাজ যেন কেমন হইয়াছে, তাই ভয়ে-ভয়ে আছি। টাকা জোগাড় করিতে না পারিলে সংসারও চলিবে না, কি করিব ভাবিয়া দিশা পাইতেছি না। শীঘ্র আমার নামে দেড় শ' টাকা বা যা পারেন পাঠাইবেন, না হইলে খুব বিপদে পড়িব"...ইত্যাদি।

হাবিব বলল, "আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, না? আর চুরি-টুরি সম্বন্ধে এত মিছে কথা নিজের বাপ-মাকে কেমন করে লিখলে?"

রোকেয়া কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলল, "এসব কথা না লিখলে মা-বাপ টাকা দিত মনে করেছ? আমার ভাই-বোন কয়টি সে খেয়াল আছে? এখুনি কেড়ে-কুড়ে না নিলে পরে আর আদায় করতে পারব কিছু?"

হাবিবের ভাগ্য ভাল। শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে কাঠা পাঁচেক জমি সস্তা দরে পাওয়া গেল। জমির খানিকটা বাস্তুভিটা, বেশ উঁচু, মালিক মারা যাওয়ায় অভিভাবকহীন দুর্গত পরিবারটি বহু দূরে কোন আত্মীয়ের কাছে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কাজেই এই জমিটুকু বেচে দিচ্ছে। জমিটা কিনতে আনুষঙ্গিক খরচসহ মোট পাঁচ শো টাকা খরচ, কিন্তু হাবিবের সম্বল মোটে তিনশো, অতএব রোকেয়ার কয়েকখানি চুড়ি বিক্রি করতে হল।

রোকেয়া বলল, "গয়না পরে হবে, কিন্তু এমন সুযোগ আর পাবে না। খরচ তো বেড়েই চলেছে, ভবিষ্যতে আরও বাড়বে, তখন আর তুমি জমি কিনতে পারবে না।"

সাংসারিক ব্যাপারে রোকেয়া বুদ্ধিমতী, তবে এইখানে যে ইঙ্গিতটা সে করল তার অর্থ তার আবার ছেলেপুলে হবে।

হাবিবের জমি কেনা হয়ে গেল।

"একটা কাজের মত কাজ হয়ে গেল, বুঝলে রোকেয়া ?" —হাবিব বলে : "ওই পাঁচ কাঠা জমিতে বেশ ভাল একটা বাড়ী তৈরী করা যাবে। প্রথমে ছোটখাট একটা কুঁড়েঘর তুলে আমরা বাস করতে আরম্ভ করব, বাড়ীভাড়া বাবত যে টাকা বাঁচবে তা দিয়ে বাড়ী তৈরী করব, এক পাশে থেকে বাকিটা ভাড়া দেব, আর সেই ভাড়ার টাকা জমিয়ে বাড়ীকে দোতলা করব। তারপর দোতলা বাড়ীর ভাড়া জমিয়ে তিনতলা বাড়ী তৈরী করব। আর জানো তো, আজকাল ঢাকায় বাড়ীভাড়া কি রকম।"

রোকেয়া বলল, "তবে চল না শীগগির, এখানে পরের বাড়ীতে আর ভাল লাগে না।"

হাবিব বলল, "আর কিছুদিন সবুর করো। ওইখান দিয়ে একটা বড় রাস্তা তৈরী হওয়ার কথা, সেটি আগে হয়ে যাক। হলে তখন সাইকেলে যাওয়া-আসা করা যাবে, এমনকি বাস সার্ভিসেরও ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু এখন তো এতদূর থেকে যাওয়া-আসা করার মত পথ নেই, শুধু ধানক্ষেত।"

"বড় রাস্তা তৈরীর কত দেরী ?"

"বেশী নেই বলেই তো শুনছি। প্ল্যান তৈরী—প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই ওই এলাকায় জমি কেনার খুব হিড়িক পড়ে যাবে শীগগির, শুনলাম। যে জমি আজ পাঁচ শো টাকায় কিনলাম, বড় রাস্তাটা তৈরী হলে আর ঢাকা শহর আরো খানিকটা বড় হলে একদিন সেই জমিরই দাম হবে পাঁচ হাজার টাকা।"

"সত্যি !" রোকেয়ার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় আর আনন্দ উপচে পড়ে।

কিছু দিন পরে মাস দুয়েকের জন্য রোকেয়া বাপের বাড়ী বেড়াতে গেল। ঢাকায় আসা অবধি সে ওখানে আর যায়নি, তবু যাওয়ার তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভেবে দেখল, দু'মাস বাপের বাড়ীতে থাকলে এখানে কিছু টাকা

বাঁচবে এবং সে টাকা ভবিষ্যতে (অর্থাৎ বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে) খুবই কাজে লাগবে। যাবার সময় বলে গেল, "দেড় মাস পরে তুমি দু'হপ্তার জন্য ছুটি নিয়ে অবশ্যই আমাকে আনতে যাবে। আহা, ছুটি পাও কিনা চেষ্টা করেই দেখো আগে। আর শোনো, রেশনে ভাল চাল পেলে এক ছটাকও ছেড়ে দিও না, সব জমা করে রেখো। নইলে যখন শুধু খারাপ চাল পাওয়া যাবে তখন ভারী কষ্ট হবে। খারাপ চালের ভাত বাবুল একেবারেই খেতে চায় না।"

রোকেয়া চলে গেল। ওইটুকু তো ঘর, বিছানা আর আসবাবে ঠাসা-ঠাসি, তবু কত শূন্য মনে হয়। সময় সময় মনে হয় ওরা যায়নি, হয়তো পাশের বাড়ী গেছে, এখুনি ফিরে আসবে আর ওদের কণ্ঠস্বরের স্পর্শে বাতাস কথা কয়ে উঠবে। দিন দশেক পরের কথা, অফিস থেকে বাড়ী ফিরতেই ঘরের দুয়ার খোলা দেখে হাবিবের বুক ধক্ করে উঠলো। সে কি দুয়ারে তালা লাগিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল? বাক্সের মধ্যে টাকা ছিল ..কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল, রোকেয়া বাবুলকে জামা-কাপড় পরাচ্ছে।

"তোমরা!" হাবিব আশ্চর্য হয়ে গেল। রোকেয়ার মুখ মুহূর্তের জন্য বুঝি রাঙা হয়ে উঠল, তারপর একমুখ হাসি হেসে বলল, "ভাল লাগলো না। বাব্বাঃ, দু'—মা—স!"

কয়েক মুঠো মুড়ি আর চা নিয়ে এল রোকেয়া। কথা তার পেটের মধ্যে খৈয়ের মতো ফুটছিল, চেপে রাখতে পারল না। বলল, "এবার আব্বার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করেছি।"

"কেমন করে?"

"বললাম চিঠি পেয়েছি, বাবুলের আব্বার অসুখ, হাতে তেমন টাকা-পয়সা নেই, এমন খালি হাতে বিদেশে, একা, কে দেখে, যদি অসুখ বেশী হয়"—এই বলে রোকেয়া খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল।

"আবার মিছে কথা বলেছ?"

"নইলে কি টাকা আদায় হত মনে করছ? আমার কয়টা ভাই-বোন তা খেয়াল আছে?"

হাবিব চা খায় আর রোকেয়ার দিকে দেখে, আর রোকেয়া বসে বসে দেখে হাবিবের খাওয়া।

"গাল যেন ফোলা-ফোলা মনে হচ্ছে। এই কয় রাত একা একা খুব মজা করে ঘুমিয়েছ, না?" রোকেয়ার ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

"হ্যাঁ, কয়েক দিন আরাম করা দরকার, নইলে—"

রোকেয়া ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যে-ইশারা করল তার অর্থ পাশের ঘরের কেউ শুনতে পাবে।

বাপ-মাকে মিছে কথা বলে রোকেয়া কিছু টাকা আদায় করে নিয়ে এলো বটে, কিন্তু ছোটখাট বাড়ী তৈরী করতেও যে কি পরিমাণ টাকার দরকার সে সম্বন্ধে রোকেয়া বা হাবিব কারোই আন্দাজ ছিল না। অতএব হাবিব কার কাছ থেকে একটা প্ল্যান তৈরী করিয়ে নিয়ে এসে এবং দু'একজন কন্‌ট্রাক্টরের সাথে পরামর্শ করে যা বলল তাতে খুশী হবার কথা নয়। একখানা ছোট্ট বাড়ীর জন্য হাবিব আর রোকেয়ার যে সামান্য বাসনা তাকে এক বন্ধুর সুপারিশে কোন স্থপতি খসড়া প্ল্যানের রূপ দিয়েছেন। তিনখানি ছোটখাট ঘর, তার মধ্যে বসবার ঘরটি তো একেবারেই ছোট, একটি ঘর শোবার জন্য এবং আর একটি আত্মীয়-স্বজন এলে তাদের থাকবার জন্য (এই কয়খানি ঘর নাহলে চলে কেমন করে?)। তবু এটুকুই চলতি বাজার-দর হিসেবে হাজার আটেক টাকার ধাক্কা। হাবিব তখন ঘরকে আরো ছোট করল, একটি ঘর এবং দেওয়ালের ঘনত্ব কমিয়ে দিল, ছাদ আপাততঃ টিনেরই করা হবে বলে স্থির করল, তবু পাঁচ হাজারের নীচে নামে না।

এক বছরে তারা মাত্র দু'শো টাকা জমাতে পারে। সে হিসাবে পাঁচ বছর লাগবে এক হাজার টাকা জমাতে এবং পঁচিশ বছর ধরে জমালে তবে জমবে পাঁচ হাজার।

"ততদিনে আমরা বুড়িয়ে যাব," রোকেয়া প্রায় আর্তস্বরে বলল। "আর পঁচিশ বছর ধরে আমরা কুকুরের মত কুঁকড়ে থাকব বুঝি এই গর্তে?"

"জমি যখন কিনেছি তখন বাড়ী একটা করবই, আর তার উপায়ও একটা হবেই," রোকেয়াকে হাবিব আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করে।

স্বপ্ন যেন ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসেছিল ওই প্ল্যানটির মধ্যে, কিন্তু মনে কষ্ট হলেও কয়েকদিন পরে সেটিকে বাক্সবন্দী করতেই হল। ওই খসড়া প্ল্যানটি তৈরী করার জন্য স্থপতিকে সরেজমিনে নিয়ে যাওয়া, তাঁর চা

খাওয়া আর তার কাছে ছুটোছুটি করা বাবত এই অভাবের দিনে কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল, কিন্তু কোন কাজ হল না।

কিন্তু আরো কয়েকদিন পরে হাবিব আর রোকেয়া খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বড় রাস্তাটা তৈরী করতে সরকার নাকি দৃঢ়সংকল্প। এই খবর পেয়ে হাবিব একটা নতুন ফন্দি করেছে। আপাততঃ দরমার বেড়া এবং পুরনো টিনের চালা দিয়েই সে পাশাপাশি ছোট ছোট দু'টি বাড়ী তৈরী করবে। মাত্র কয়েক শো টাকা খরচ। একটিতে সে নিজে থাকবে, আরেকটি ভাড়া দেবে। তার নিজের পঁচিশ টাকা প্রতি মাসে বাঁচবে এবং সেই সঙ্গে আরো পঁচিশ টাকা ভাড়ার দরুন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মাসে পঞ্চাশ টাকা আয় বৃদ্ধি। বছরে ছয় শো টাকা। দু'বছর পরে সে বাড়ী তৈরী শুরু করবে। এক বছরে শুধু ভিত, আরেক বছরে দেওয়াল, তৃতীয় বছরে ছাদ, চতুর্থ বছরে......

উৎফুল্ল হয়ে উঠতে হাবিব আর রোকেয়ার বিলম্ব হয় না।

সে প্রফুল্লতা অবশ্য বেশীদিন টেকে না। কয়েক সপ্তাহ পরে খবর পাওয়া গেল, বড় রাস্তা তৈরী করার যে প্ল্যান ছিল তা নাকি বাতিল করা হয়েছে এবং সরকার অন্য দিকে রাস্তা তৈরীর নতুন প্ল্যান করছেন। অথচ ওই রাস্তার ভরসাতেই না হাবিব অতদূরে জমি কিনেছিল। নইলে অমন এলাকা থেকে নাকি অফিসে যাওয়া-আসা করা যায়। তেমন কোন রাস্তা নেই, বর্ষার দিনে দূরে থাক শুকনোর দিনেই সাইকেল চালানো কঠিন।

"তবে অমন জায়গায় জমি কিনলে কেন? শহরের কাছাকাছি ভাল জায়গা দেখে কিনলে না?"

"তেমন জায়গায় জমি কিনব এত টাকা আমাদের কোথায়? যে দর, ওই পাঁচশো টাকায় এক কাঠা জমিও পাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া ওখান দিয়ে বড় রাস্তা তৈরীর কথা ছিল।"

কেমন যেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। যথেষ্ট টাকা নেই বলে কাছাকাছি জমি কেনা গেল না, আর অত মেরে-কেটে জমি যদি কেনা গেল তো সে জমি কাজে এলো না।

হাবিব তবু উৎসাহ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। বলে, কলকাতার মত শহর, সেও একদিন ছিল অজ পাড়াগাঁ, আর ঢাকা তো বেশ বড়

শহর। যে হারে শহর বাড়ছে, তাতে কয়েক বছরের মধ্যে শহর আমাদের জমির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবেই, তুমি দেখো। রাস্তা তখন তৈরী করতেই হবে। আপাততঃ একটা বড় কাজ তো এগিয়ে থাকল।

বানে ভেসে গেল শহরতলি, মূল শহরেও বান উঠি-উঠি করছে। দল দামে ধানগাছে কচুরীপানায় ভরে উঠল চারদিক, তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোটবড় নৌকা চলাচল করে, কত দূরের গাঁও-গেরাম থেকে কত নৌকা কাঠ বিক্রি করতে আসে শহরে।

রোকেয়া একদিন বলল, "আচ্ছা, কোথাও যাওয়ার জন্য নৌকা ভাড়া পাওয়া যায় না ?"

"কেন পাওয়া যাবে না ? কোথায় যেতে চাও ?"

"চল না একদিন জমিটা দেখে আসি। অনেক দিন থেকে ঘরের বার হইনি, কোথাও যাওয়ার তো উপায় নেই।"

হাবিব এক কথায় রাজী হয়। মাঝে মাঝে জমির খোঁজ-খবর নেওয়া ভাল।

নৌকায় উঠে সবচেয়ে খুশী বাবুল। ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে সে পানি ছুঁতে যায়, কচুরীপানার ফুল আর পাতা ছিঁড়তে চায়। ওকে সাবধানে শক্ত করে ধরে থাকতে হয়।

জমিটা সত্যি ভালো। বেশ উঁচু, বিশেষ করে সেই অংশটুকু যেখানে একটা মাটির ঘর ধসে পড়ে গিয়েছিল। মাটি সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, ঘর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে-যাওয়া মাটি। চারদিকেই আগাছার সতেজ জঙ্গল, কিন্তু এই জায়গাটুকু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। চারদিক থেকে দূর্বাঘাসের সরু সরু শাখাগুলি একদল কেঁচোর মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, তবে মাটি এখনো সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেনি। অল্প দূরে দূরে গাঁয়ের গৃহস্থদের কুটির। এই পোড়োভিটেয় অপরিচিত যুবক-যুবতীকে আসতে দেখে সেই সব বাড়ীর নারী-পুরুষ আর ছেলেমেয়েরা সকৌতূহলে চেয়ে রইল।

রোকেয়া তার উৎসুক চোখ দুটি চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খানিক দেখল, তারপর বলল, "প্ল্যানটা বের করে বুঝিয়ে দাও তো, কোন্ দিকে কোন ঘর হবে।"

"প্ল্যান, ? প্ল্যান তো আনিনি।"

"নিশ্চয়ই এনেছি। তোমার বাঁদিকের পকেটে রেখেছি, তুমি এখনো দেখনি ?"

সত্যি হাবিবের বাঁদিকের পকেটে সেই সুপরিচিত ঈষৎ ময়লা-হয়ে-যাওয়া কাগজটা।

"তুমি তো আচ্ছা হুঁশিয়ার লোক দেখছি," হাবিব বলে।

"হুঁ, আমি তোমার মত বেহুঁশ-বেখেয়াল কিনা," রোকেয়া তার অভিজ্ঞ গৃহিণীপনার ঘোষণা জানায়।

ঘরটা কিভাবে উঠবে তা পরিষ্কার হয়ে উঠতে দেরী হয় না। যেখানে মাটির ঘরটা পড়ে গিয়ে ভিটাকে উঁচু করেছে সেখানেই হবে ওদের শোবার ঘর। স্থপতি কেবল ইটের ঘরটারই নক্‌শা এঁকেছিলেন, রোকেয়া তার সঙ্গে যোগ করল তার নিজের প্ল্যান : কোন্‌খানে হবে গোয়াল-ঘর, কোথায় শাক-সব্‌জীর ক্ষেত, কুমড়া-কদু-শসার চাল।

"তোমার গাইয়ের দিকে আবার কে দেখবে," হাবিব বলে।

"সে তোমাকে দেখতে হবে না। কত ফ্যান-ভাত আর কত তরি-তরকারির খোসা আমি রোজ ফেলে দেই। আর, একটা বড় রশীতে বেঁধে দিলে চারদিকের এত ঘাস খেয়ে দেখো গাই আমার সাত দিনেই ধুমসী হয়ে উঠবে। দুধ-টুধ কিছুই খাও না তুমি, শরীরটা কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। দুধ না খেলে কি শরীর ভাল হয়। আর এখন তো শুধু বাবুল, এর পর যে আরেকটি দুনিয়ায় আসছে সেটির তো দুধ চাই। অত দুধের পয়সা পাবে কোথায়। হ্যাঁ, একটা কথা। আব্বার ওখানে আমি কিন্তু চার মাসের বেশী কিছুতেই থাকব না। আমি যেতে চাচ্ছি যদি এই চার মাসে তুমি কিছু পয়সা বাঁচাতে পার, নইলে যেতাম না।"

চার মাস পরে দু'মাসের মেয়ে কোলে করে রোকেয়া যখন ফিরে এলো তখন কে কোন্‌খানে শোবে তাই একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। চৌকিটাতে চারজনের জায়গা হয় না, আবার আরেকটি চৌকি যে পাতা যাবে তারও জায়গা নেই। অতএব দু'জনকে চৌকিতে শুতে হয়, দু'জনকে মেঝেতে। কারা চৌকিতে শোবে এবং কারাই বা মেঝেতে ?

রোকেয়ার মতে, মেয়েমানুষ শোবে উপরে আর বাড়ীর মালিক নীচে, তা হয় না। হাবিবের মতে, রোকেয়ার পোয়াতী শরীর, খুকীও কচি শিশু, মাটির মেঝেতে ওদের শোয়াই চলে না।

হাবিবের মতটাই টিকলো, তবে সাময়িকভাবে। ঠিক হল, রোকেয়ার শরীর ভাল হলে আর খুকী একটু বড় হলে তখন ওরা মেঝেতেই শোবে।

ছোট্ট ঘরটিতে এখন গলার আওয়াজ পরিমাণের দিক দিয়ে বেড়ে গেছে। ইস্কুলে যায় বলে বাবুল চেঁচিয়ে পড়ে, এবং খুকী ট্যাঁ ট্যাঁ করে প্রায়ই কাঁদে।

রোকেয়া একদিন পাশের সংসারের দিকে ইশারা করে মৃদু কণ্ঠে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "বিবি-সাহেব কি বলছিল জান?"

"কি বলছিল?"

"বলছিল, এই ঘর একটা কাঁদুনে কারখানা হয়ে উঠেছে।"

"তাই নাকি?" হাবিব ব্যথিত হল।

"খুকীকে আমি চুপ রাখবার এত চেষ্টা করি, তবু পারি না। আমি কি করি, বল তো?" রোকেয়া শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলল।

হাবিব খানিক চুপ করে থেকে বলল, "ওদের মেহেরবানীর উপর ভরসা করে আছি, কিছু তো বলতে পারি না।"

"তোমার বাড়ী তৈরীর কদ্দূর কি?" রোকেয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল।

"বাড়ী?" গত কয়েক মাস থেকে হাবিব ওকথা আর ভাবেই নি। বলল, "বাড়ী তৈরী হতে অনেক দেরী।"

"তবু কত দেরী শুনিই না?"

"কেমন করে বলব? শহর অতদুর গিয়ে পৌঁছতে, আর ওখান দিয়ে রাস্তা তৈরী হতে পাঁচ বছরও লাগতে পারে, দশ বছরও লাগতে পারে।"

"অতদিন!" রোকেয়া যেন আর্তনাদ করে উঠলো। "অতদিনে তো বুড়িয়ে যাব।"

রোকেয়া যখন একথা বলছিল তখন তার বয়স ছিল তেইশ, পাঁচ বছর পরে আটাশ বছর বয়সে তার বুড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়, তবু তাকে গতযৌবনার মত দেখায়। তার কারণও যথেষ্ট। এই পাঁচ বছরের মধ্যে বাবুলের আরও

দুটি ভাইকে পৃথিবীতে আনতে হল, স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের মূল্য দিয়ে। এর মধ্যে একটি ছেলে দেড় বছরের জন্য পৃথিবীতে থেকে একটা শোকাবহ স্মৃতি রেখে গেছে মাত্র। সেই সঙ্গে স্ত্রীসুলভ কি একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে রোকেয়াকে ধরল স্থায়ীভাবে, এবং মাথার চুল অর্ধেক উঠে গেল।

ইতিমধ্যে হাবিব দু'বার বাসা বদল করতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম বার, যখন হাসেম সাহেব নিজের জমিতে বাড়ী তৈরী ক'রে সেখানে উঠে গেলেন। কারণ, বাড়ীওয়ালা হাবিবকে ভাড়াটে বলে স্বীকার করতে চাইলেন না, এবং নতুন যে ভদ্রলোক বাড়ী ভাড়া নিলেন তিনি হাবিবকে অংশীদার হিসাবে নিতে চাইলেন না।

ভাগ্য ভাল ছিল, হাবিব আরেক ভদ্রলোকের বাসায় একপ্রান্তে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু বছর দুয়েক পরে একইভাবে হাবিবকে উঠে যেতে হয়েছিল, এমনকি দু'মাসের জন্য রোকেয়াকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল, এবং নিজে থাকতে হয়েছিল মেসে। তারপর অনেক চেষ্টা করে দু'শো টাকা সেলামী দিয়ে সে তার বর্তমান অর্থাৎ তৃতীয় বাসাটা পেয়েছে। ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা। এত টাকা সেলামী দেওয়া এবং ভাড়ার এই হার উভয়ই হাবিবের প্রায় সাধ্যাতিরিক্ত, কিন্তু রোকেয়া কিছুতেই বাপের বাড়ীতে থাকতে চায় না। তার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে, কেন সে থাকবে বাপের বাড়ী?

এ বাসাও আরেকটি বাসার অংশ মাত্র, এবং ভাড়া বেশী হলে কি হবে এ বাসা আগের দু'টির থেকেও খারাপ। চালা টিনের, বেড়া দরমার, মেঝে মাটির। কিন্তু বাসা নিয়ে অভিযোগ করা রোকেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ বাসায় ভাল বাতাস পাওয়া যায় না, গরমের দিনে দম বন্ধ হয়ে আসে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা উঠাবসা করা যায় না, পানির অসুবিধা, আরও কত কি। এ-সব অভিযোগ কানে যেতেই মূল ভাড়াটে করিম সাহেবের স্ত্রী রহিমা বিবি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, অসুবিধাই যদি হয় হাবিবেরা যেন উঠে যায়।

অন্যত্র উঠে যাওয়ার কথা রোকেয়া বলেছিল হাবিবকে, হাবিব বলে দিয়েছে, ঢাকায় থাকতে যদি অসুবিধা হয় রোকেয়া যে-কোন সময় বাপের বাড়ী চলে যেতে পারে।

বাসা সম্বন্ধে রোকেয়ার সেই ছিল শেষ অভিযোগ। তারপর থেকে সে একেবারে চুপ মেরে গেছে। হাজার অসুবিধার মধ্যেও আর কিছু বলে না। তার যেন চাইবার আর কিছু নেই। দুনিয়ার অতি সংকীর্ণ এক কোণে স্বামী আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে যে এক সঙ্গে আদৌ মুখ গুঁজে পড়ে থাকবার সুযোগ পাচ্ছে এজন্যই তাকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মনে হয়।

এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত আস্তে আস্তে আরেকটি ব্যাপার ঘটে গেছে: কেনা জমিতে বাড়ী তৈরীর কথা সে আর বলে না, হাবিবও বলে না। কেননা যা হবার নয় তা বলতে বলতে একদিন ক্লান্তি আসেই, ফাঁকা উৎসাহকে বেশী দিন ঠেকা দিয়ে রাখা যায় না।

সেদিন বেশ রাত হয়েছে, এ-সংসার ও-সংসার সর্বত্র সবাই ঘুমিয়ে গেছে, রোকেয়া যথারীতি ছোট ছেলেটিকে নিয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে, বর্ষার রাত্রে বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে, হঠাৎ রোকেয়া আর্ত চীৎকার করে ছেলে-কোলে হাবিবের বিছানায় উঠে পড়ল।

"কি হল, কি হল," বলে হাবিব জেগে উঠল।

"কি যেন কিলবিল করে বিছানায় উঠল!" রোকেয়া কাঁপছে।

টেবিলের উপর মিটমিট করছিল লণ্ঠনটা, সেটা নিয়ে রোকেয়ার বিছানা পরীক্ষা করা হল, কোথাও কিছু নেই।

রোকেয়া বলল, "কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে হল যেন কয়েকটা কেঁচো আমার বিছানায় উঠেছে।"

"কিন্তু একটাও তো দেখা যাচ্ছে না। কেঁচো তো আর দৌড়ে পালাতে পারে না। আর এ ঘরে কেঁচোই বা আসবে কেমন ক'রে?"

"তুমি জান না, আজকেই এই ঘর থেকে আমি একটা কেঁচো ফেলে দিয়েছি।"

"হতে পারে।" হাবিবের ধারণা হল, দিনে কেঁচো দেখেছে বলেই রোকেয়া এখন কেঁচোর স্বপ্ন দেখছে।

রোকেয়া আর কিছুতেই মেঝেতে শোবে না, হাবিবকেও শুতে দেবে না। বলল, কেঁচো যদি আসতে পারে তবে সাপও আসতে পারে। বিছানার পায়ের দিকে গুটিশুটি হয়ে সে শুয়ে রইল। কিন্তু সে-রাত্রে তার ভাল ঘুম হল না। অনেক দিন থেকে তার তলপেটে বেদনা, ছেলে-পিলে

ঘুমের ঘোরে লাথি মারলে অসহ্য ব্যথা হয়, তাই নিজের আর কোলের ছেলেটির মাঝখানে একটা পাশ-বালিশ দিয়ে সে মেঝেতে শুয়ে থাকত। এখন সে সুযোগ আর রইল না।

চৌকিটাতে জায়গা হয় না। অতএব সেটি বিক্রি করে অপেক্ষাকৃত অপরিসর দুটি চৌকি পরদিন কেনা হল, তাতে বিছানার আয়তন কিছুটা বাড়ল, কিন্তু ঘরের একপাশে যে জায়গাটুকু খালি থাকত তার আয়তন সেই পরিমাণে কমে গেল।

ঘরের শ্রী যেটুকু ছিল তাও কমে গেল।

ঘরটা এমনিতেই ঠাসাঠাসি ছিল, এখন আরও ঠাসাঠাসি দেখায়।

বহুদিন পরে রোকেয়া আবার বলতে লাগল তাদের সেই কল্পিত বহু আকাঙ্ক্ষিত বাড়ীর কথা। বাড়ীর প্ল্যানটা বাক্স থেকে বার করে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে শুধুই দেখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাড়ীর আলোচনা আর জমে না।

হাবিব অফিসে কাজ করছিল, বেলা তখন আড়াইটার মত। করিম সাহেবের চাকর (হাবিবের কোনদিনই চাকর নেই) তাকে গিয়ে খবর দিল, "আপনাগো বিবি সা'ব বেহুঁশ হয়্যা পইড়্যা আছে, আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলেন।"

চাকরটা হাঁপাচ্ছিল।

হাবিব সেদিনকার মত ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল। বাবুল ফরিদা আর হাবুল তখন মূর্ছিতা মায়ের পাশে বসে আকুল স্বরে কাঁদছিল। রহিমা বিবি বললেন, রোকেয়া কুয়া থেকে পানি তুলে এক গাদি কাপড় কাঁচছিল, হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। এখনও হুঁশ হয়নি।

কোন্ এক ভাবীকালে বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন নিয়ে খেয়ে না-খেয়ে রোকেয়া যে টাকা জমাচ্ছিল সেই টাকা খরচ করে হাবিব ডাক্তার ডাকল এবং ঔষধ-ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করল।

সেদিন রাত্রে যতক্ষণ ঘুম না এল ততক্ষণ বাবুল আর ফরিদা ভীত বিষণ্ণ হয়ে চুপচাপ মায়ের দিকে চেয়ে রইল, নিজেকে অত্যন্ত অনাদৃত মনে করে প্রাণপণে কাঁদলো শুধু দু'বছরের হাবুল।

হাবিব সে রাত্রে ঘুমোতে পারেনি। রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময়ে রোকেয়া মারা গেল।

সকালে ছেলেপিলেকে রহিমা বিবির হাতে সঁপে দিয়ে প্রায়-উদ্‌ভ্রান্ত হাবিব বের হল শহর পরিক্রমায়। খবর দেওয়ার মত আপনজন তার তেমন ছিল না, অতএব খবর দেওয়া শেষ হতে দেরী হল না।

গোরস্থানের গেটে কর্তৃপক্ষের অফিস। সেখানে দাফন-সম্পর্কিত কথা বলে হাবিব গেল গোরস্থানে। কোথায় যেন সে পড়েছিল শ্মশানে এলে সকলে সমান হয়। কিন্তু গোরস্থানে এলে কি সকলে সমান হয়? কারো কবরের শিয়রে কংক্রিটের ফলকে নাম খোদাই করা; কারো কবর ইটের অনুচ্চ দেওয়ালে ঘেরা, কারো কবর ঘেরা মোজাইকের অনুচ্চ দেওয়ালে; কারো ইট দিয়ে বাঁধানো, কারো মাটির কবর ধসে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। নীচে সকলেরই মাংসহীন কঙ্কাল ফসিল হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে, সকলেরই চোখ গর্ত হয়ে গেছে এবং দাঁত-বের-করা মুখ নিঃশব্দে অট্টহাসি হাসছে, কিন্তু কবরের উপরে বিত্তের স্তরভেদের চিহ্নটা অভ্রান্ত।

দাফন করার ছয় মাস পরে প্রত্যেকটি সাধারণ কবরই খুঁড়ে ফেলে নষ্ট করে দেওয়া হয় নতুন লাশের জায়গা করার জন্য। শুনে হাবিবের মন খারাপ হয়ে গেল। যাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট কাঠ-খড়-কেরোসিন পোড়ানো হয় তারাই শুধু শুয়ে থাকতে পারে ইট বা মোজাইকের অনুচ্চ দেওয়াল-ঘেরা স্মৃতিফলক-চিহ্নিত মাটির গর্তে।

খানিক দূরে যেন কবর খোঁড়া হচ্ছে। হাবিব সেখানে এগিয়ে গেল। কোদালে যা উঠছে তা শুধু ভেজা মাটি নয়, প্রায় কাদা। গতরাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল, তার ওপর বানের সময়। ১৯৫৪-৫৫ সালের মত বান হয় হয় এমন অবস্থা, ঢাকা শহরে নীচু অঞ্চলগুলিতে বানের পানি ঢুকেছে। কবর আরো খানিকটা খুঁড়লে হয়তো মাটির নীচ থেকে সেই বানের পানিই পরিস্রুত হয়ে উঠতে থাকবে।

হঠাৎ হাবিবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল কবরের পাশের দেওয়ালের দিকে। একটা কেঁচো মুখ বাড়াচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, তাই তো, ছোটো কেঁচোটা পেশীতে বলপ্রয়োগ করে শরীরকে গর্তের মধ্য থেকে বার করবার চেষ্টা করতে করতে আলগা হয়ে টুপ করে পড়ে গেল কবরের মেঝেতে।

এই কেঁচোর ভয়ে রোকেয়া একদিন ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে উঠেছিল, কাঁপতে কাঁপতে ছেলে কোলে করে হাবিবের বিছানায় উঠে বসেছিল, কিছুতেই নীচে শুতে রাজী হয়নি, সে তো এই সেদিনের কথা। সেই রোকেয়া এখন শুয়ে থাকবে মাটির বিছানায়। যে হারে বান বাড়ছে তাতে এই মাটি আর মাটি থাকবে না, কাদা হয়ে যাবে, পানিতে ডুবে যাবে। এবং তারপর ধীরে ধীরে তার রক্তমাংসের শরীরটাও মাটি হয়ে যাবে এবং ছয়মাস পরে কঙ্কাল উঠিয়ে ফেলে দেওয়া হবে আর কোন লাশের জায়গা করার জন্য ··

হাবিব বাসায় ফিরে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে জানালো, রোকেয়ার দাফন হবে হাবিবের নিজের জমিতে।

কাফনে ঢাকা রোকেয়ার লাশ নিয়ে হাবিব নৌকায় করে নিজের জমিতে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার অনুমান ভুল হয়নি, এই জমিটা আজিমপুরা গোরস্থান থেকে উঁচু। এ জমি বানে ডুবলে ঢাকা শহরের কোন এলাকাই আর পানির উপরে থাকবে না। বাস্তুভিটার সবচেয়ে উঁচু জায়গা-টুকুতে—যেখানে একটি মাটির ঘর হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটি অনুচ্চ স্তূপের সৃষ্টি করেছিল সেখানে—রোকেয়ার কবর খোঁড়া হল। জমি এখানে আজিম-পুরার থেকে অনেক শুকনো। এই কবরে রোকেয়া পেল তার স্থায়ী আশ্রয়। যতই খরচ হোক, হাবিব কবরটি বাঁধিয়ে দেবে।

এই উঁচু জায়গাটিতে বসে চারদিকে চেয়ে চেয়ে রোকেয়া একদিন নিজের বাড়ীর স্বপ্ন দেখেছিল।

আঁধি

সাম্‌স্‌ রাশীদ

জনশিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শরীফ খান ও সেক্রেটারী নিজামউদ্দীন অফিসে বসে কথা বলছিলেন। চেয়ারম্যানের সামনে একখানা টেলিগ্রাম—খুলে পড়া হয়েছে কিন্তু খামে ভরা হয়নি।

নিজামউদ্দীন টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে আর একবার পড়লেন। হেসে বললেন—ভাববার কিছু নেই স্যার—সব ঠিক আছে। তলিয়ে আর দেখতে যাচ্ছে কে—শুধু একটা ধূলোঝড় তুলে দেওয়া বৈত নয়।

শরীফ খান মৃদু হাসলেন। বললেন—বেশ বলেছেন—ধূলোঝড়, এ্যাঁ, একেবারে আঁধি!

হ্যাঁ স্যার, আঁধিতে পড়ে পালাতে পথ পাবে না—তারপরই সবার জন্য পথ পরিষ্কার।

—ফাইন্যান্স ও অন্যান্য ডিরেক্টররা শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকবেন তো?

—নিশ্চয়ই স্যার। তা ছাড়া পারচেজ অফিসার ইজ্জতউল্লা তো আহাদ সাহেবের জ্বালায় অতিষ্ঠ। ভদ্রলোক নিজেও উপোস থাকবে অন্যকেও উপোস রাখবে—বলুন তো কি অবিচার।

—ও সব কথা এখন থাক না—শেষ পর্যন্ত কাজটা হলেই হয়।

—হতেই হবে। না হলে যে মহাবিপদ হবে। আপনার টেনিওর শেষ হতে আছে আর মাত্র ছ'মাস—সিনিয়র ডিরেক্টার আহাদ সাহেবের আছে এক বছর। এখন তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করতে পারলে আপনার বদলে তিনিই যদি প্রমোশন পেয়ে···!

হেঃ হেঃ করে হেসে নিজামউদ্দীন বলেন—থাক স্যার, ওকথা বলতেও চাই না—ভাবতেও চাই না। তার আগেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। নিন এবার ডেকে পাঠান। দেখা যাক ভয় পান কিনা।

শরীফ খান বললেন—শুধু ভয় পাওয়ানোর তো কথা নয়। কথা হল কেসটাকে মজবুত হাতে দাঁড় করানো।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কেসতো দাঁড়িয়েই আছে—এবার...

চেয়ারম্যান বেল টিপলেন। পিওন এল।

একটু পরেই সিনিয়র ডিরেক্টার আবদুল আহাদ সাহেব এসে ঢুকলেন—হাত তুলে আদাব জানালেন।

চেয়ারম্যান টেলিগ্রামখানা হাতে তুলে নিয়ে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। আহাদ সাহেবও সেদিকে এগিয়ে গেলেন। নিজামউদ্দীন কিছুটা এগিয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন।

শরীফ খান দু'হাতে মেলে ধরলেন টেলিগ্রামখানা।

আবদুল আহাদ মনোযোগ দিয়ে পড়লেন সেখানা। ভ্রূদুটি তার কুঞ্চিত হল।

বললেন—এ টেলিগ্রাম বিলেত থেকে এসেছে ; কিন্তু কবে এল ? হ্যামিল-টন এণ্ড হেয রেয়ন সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে তা আমাকে বলছেন কেন ? রেয়ন তো আমার ডিরক্টরেটের অধীনে নয়।

—ওসব কথা রাখুন। পড়ে দেখুন এখানে স্পষ্ট লেখা আছে আপনার নাম। আপনি নাকি তাদের টেণ্ডার উইথড্র করতে বলেছেন—আপনি টেণ্ডার উইথড্র করতে বলবার কে ?

—কি বিপদ! আমি কেন তাদের ও কথা বলতে যাব—রেয়নের টেণ্ডার রেয়ন ডিরেক্টার জানেন—তাঁকে বলুন না, নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়ে থাকবে।

—দেখুন, সরকারের ইণ্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, আমি কচি খোকা নই। এসব ব্যাপারে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই সেটুকু বুঝবার জ্ঞান আমার হয়েছে। আপনি তাদের এ কথা না বললে তারা এ টেলিগ্রাম পাঠাবে কেন ? এটা একটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স তা জানেন ? অফিসে এ ব্যাপার নিয়ে মহা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি হয়েছে। সবাই জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা—ছি ছি ছি...

আবদুল আহাদ বললেন—আমাকে কি করতে হবে বলুন—কি করলে আপনি বিশ্বাস করবেন—আমি এ টেণ্ডারের ব্যাপারে কিছু জানি না ?

—শুধু আমি বিশ্বাস করলেই তো হবে না—সারা অফিসে ব্যাপারটা

জানাজানি হয়েছে—তাছাড়া টেলিগ্রামের কপি মিনিস্ট্রিতেও এসে থাকতে পারে।

নিজামউদ্দীন মাঝ থেকে বলে—হ্যাঁ স্যার, কপি আমি দেখে এসেছি।

শরীফ খান বলেন—ওই শুনুন—তবে আর করবার কি-ই বা আছে। আপনার নামে যে বদনাম রটেছে সেই জন্যেই বলছি—আপনার কিছু দিন এখন অফিসে না আসাই ভাল।

—অফিসে না আসা? কিন্তু আমি তো বলছি, আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না।

শরীফ খান একটু নরম হয়ে বললেন—সে তো আমি জানি। কিন্তু এ কর্পোরেশনের এতগুলি অফিসার এত লোকজন—এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এতগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবেন কি করে? তার চেয়ে আপনি বরং কিছুদিনের ছুটি নিয়ে...মানে একটা দরখাস্ত লিখে দিন—আমি এক্ষুণি স্যাংশন করে দিচ্ছি।

ছুটি নেবার কথায় আবদুল আহাদ সাহেবের চোখের সামনে একটি চিত্র ফুটে উঠল। তাঁর স্ত্রী মুনীরা অনেকদিন থেকে অসুস্থ, রক্তাল্পতায় ভুগছেন। তাঁকে নিয়ে একটু হাওয়া বদল করতে যাবেন, এই অফিসের কাজের চাপে তা এতদিন হয়েই ওঠেনি। এত ওষুধপত্র চলছে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি হচ্ছেনই না। ভালই হল—ছুটি নেবার সুযোগ হল একটা, মন্দ কি?

আহাদ সাহেব বললেন—ঠিক আছে—দরখাস্ত লিখে আনছি তবে টেণ্ডারের ব্যাপারে মিজানুর রহমানকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখবেন। রেয়ন তো তারই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার।

চেয়ারম্যান নিজের চেয়ারে ফিরে যেতে যেতে বললেন—তা তো নিশ্চয়ই করব। দেখুন দেখি কি গণ্ডগোল, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ঘটে থাকবে।

আহাদ সাহেব চিন্তিত মুখে চেয়ারম্যানের কক্ষ ত্যাগ করলেন। তাঁর স্ত্রী মুনীরা শিক্ষিতা তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারিণী নন। তা সত্ত্বেও কতকগুলো জিনিস তিনি ঘরে বসেই বুঝতে পারেন এবং সে সম্বন্ধে স্বামীকে সাবধান করে দেন পূর্বাহ্ণেই। এই ছুটি নেবার ব্যাপারে মুনীরা সব সময়ই বলে এসেছেন—ছুটি নিয়ে কাজ নেই। ছুটি নিলেই অফিসে একটা গোলমাল হয়ে যাবে। পাকা চাকরী তো নয়—টেনিওর এ্যাপয়েন্টমেন্ট। ছুটি-ছাটার

বায়নাক্কা করলে আর একটা টার্ম পাবার আশা নির্মূল হয়ে যাবে। কেউ কাঠি ঘুরিয়ে চাকরিটা বাগিয়ে নেবে। তাঁদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে—মেয়ে তিনটিই বড়—ছেলে দুটি নেহাৎই ছোট। চাকরি না থাকলে ওদের মানুষ করবেন কি করে? সেই ছুটিই তিনি নিতে চলেছেন—মুনীরাকে বলাও হল না।

নিজের কামরায় এসে স্ত্রীর অসুখের অজুহাতে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে ফেললেন আহাদ সাহেব। তারপর সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন—টাইপ করে আনুন।

মনে মনে ভাবতে লাগলেন—একবার মুনীরাকে টেলিফোন করে বলবেন নাকি? কিন্তু কি বলবেন—ওসব কথা ফোনে বলা উচিত হবে না। থাক, বাড়ী গিয়েই বলবেন সব। চেয়ারম্যানের ব্যবহারের কথা শুনলে সেও নিশ্চয়ই বলবে—ছুটির দরখাস্ত দিয়ে ঠিকই করেছ। মানুষের আত্মসম্মানের বড় আর কি আছে?

সেক্রেটারী দরখাস্ত টাইপ করে নিয়ে এল। বলল—এ সময় ছুটি নেওযাটা কি ভাল হল স্যার?

—ছুটির আবার সময় অসময় কি?

—এটা অসময় স্যার—টেনিওর শেষ হয়ে যাবে বছরখানেকের মধ্যেই...

—হ্যাঁ, তা আমি জানি। টেনিওর শেষ হলেই বেঁচে যাই। এ সব জায়গা থেকে যত তাড়াতাড়ি রেহাই পাই ততই ভাল।

—স্যার, আপনি চলে গেলে আমাকেও চাকরি ছাড়তে হবে। আমার তো আর কোন সঙ্গতি নেই। এখান থেকে চাকরি গেলে আর কোথাও কিছু পাব না।

আবদুল আহাদ সেক্রেটারীর কথা শুনে বললেন—এ দুর্ভাগা দেশে চাকরী যাবে বারবার, এ সত্য যত তাড়াতাড়ি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব ততই মঙ্গল। আপনার বয়স কম—একটা চাকরী গেলে আর একটা কিছু পেয়েই যাবেন—ভাববেন না।

—শুধু নিজের কথা ভাবছি না স্যার। অফিসে যে চক্রান্তের মায়াজাল বিছানো হয়েছে তা তো বুঝতে পারছি। আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—আপনার প্রতি একটা বিরাট অন্যায় হচ্ছে। অফিসের লোকগুলো সব

জেনেশুনেও চেয়ারম্যান আর সেক্রেটারী সাহেবের চাটুকারিতা করছে—মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করছে—এ সব দেখে-শুনে সহ্য করতে পারছি না—আপনি একটা কিছু করুন স্যার !

—থাক ওসব কথা। আমার করবার কিছুই নেই।

আবদুল আহাদ দরখাস্তটা সই করে নিয়ে চললেন চেয়ারম্যানের কামরায়।

চেয়ারম্যান শরীফ খান মনোযোগ দিয়ে পড়লেন দরখাস্তটা তারপর বললেন—এঃ, একি করেছেন। মাত্র তিরিশ দিনের ছুটি নিচ্ছেন—তিরিশ দিনে অফিসের লোকেরা সব ভুলে যাবে—আপনি পাগল হয়েছেন ?

আহাদ সাহেব বিব্রতমুখে বললেন—তবে ত্রিশ কেটে ষাট করে দিই ?

—না, অন্ততঃ তিন মাসের ছুটি না নিলে অসুবিধা হবে।

আহাদ সাহেব দরখাস্তটা টেনে নিয়ে ফাউন্টেন পেন দিয়ে ত্রিশের 'তিন' কেটে 'নয়' লিখে দিলেন।

শরীফ খানের চোখে মুখে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেক্রেটারী নিজামউদ্দীন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। আহাদ সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—এই বেশ হল স্যার। শত হোক আপনি মানী লোক। মানী লোকের মান বাঁচাতেই চেয়ারম্যান সাহেব আপনাকে ছুটিতে পাঠাচ্ছেন। কিছুদিন কোথাও গিয়ে ঘুরে আসুন—লোকে সব ভুলে যাবে।

সেক্রেটারীর গায়ে-পড়া উক্তিতে আহাদ সাহেব বিরক্ত বোধ করলেন। বললেন—আমি তো জানি না লোকের কি আছে ভুলবার—কি ঘটেছে এমন ?

শরীফ খান বললেন—কি ঘটেছে সেটা তো তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু অফিসময় যে একটা ধুলোঝড় উঠেছে যে আপনি হ্যামিলটন এণ্ড হেয কোম্পানীকে তাদের টেণ্ডার তুলে নিতে বলেছেন—তাতে আপনার পোজিশনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে—সেই জন্যই আপনাকে ছুটিতে যেতে বলছি—নইলে আমার আর কি !

—কিন্তু আমি তো বলছি আমি টেণ্ডার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

—সে কথা আর কে শুনছে—আঁধিটা সাবসাইড করতে দিলে তবেই তো সত্যটা প্রকাশ হবে।

—ঠিক আছে, সত্যটা প্রকাশ হোক এই শুধু আশা করে থাকব।

আবদুল আহাদ নিজের কামরায় চলে গেলেন। টেবিলের সামনে বসে

ভাবতে লাগলেন—মনুষ্যচরিত্র দুর্জ্ঞেয়—কিন্তু তা বলে এতটাই অর্থহীন যুক্তিহীন বিবেকহীন হতে হবে তাকে! আশ্চর্য! পাঁচটা পর্যন্ত বসে রইলেন। মনটা খানিকটা স্থির হলে বাড়ী গিয়ে বেগমকে কি বলবেন মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে একসময় বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে।

বাড়ী পৌঁছে বেগমকে ডাকলেন—নীরু, কোথায় তুমি! আজ একটা সুখবর আছে। এদিকে এস।

মুনীরা তাড়াতাড়ি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।—কি ব্যাপার, এত হাঁকডাক কিসের, যুদ্ধ জয় করে এলে নাকি?

—না যুদ্ধ আর করব কার সঙ্গে? বলছিলাম কি, এক মাসের ছুটি নিয়ে এলাম। কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশুই রওনা হয়ে যাব কক্সেস-বাজার। বল খুশী হয়েছ?

—হঠাৎ ছুটি নিলে, আমাকে কিছু বলনি তো। অফিসে সব ঠিকঠাক আছে তো?

—হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক আছে, একেবারে বিলকুল খায়রিয়ৎ। লঘু হবার চেষ্টা করেন আহাদ সাহেব।

বলেন—কাজ কাজ কাজ। এত কাজ করে করে মাঝে মাঝে নিজের ছেলেমেয়েদের নাম মনে আসে না—তাই ভাবলাম, একটু ওদের নিয়ে বেড়িয়ে আসি—তা ছাড়া তোমাকে চেঞ্জে নিয়ে যেতে চাই একটু তাও হয়ে ওঠেনি এতদিন। ছেলেরা সব কোথায়?

—বাইরে খেলা করছে বোধ হয়—মেয়েরা ঘরে। ডাকব ওদের?

—না, ওরা খেলছে খেলুক। কক্সেসবাজার গিয়ে ওদের একটু কাছে পাব—কি বল?

চা খেতে খেতে আলোচনা চলতে লাগল স্বামী-স্ত্রীতে—বাচ্চাদের জন্য কি কি জিনিষ নেবেন সঙ্গে।

পরদিন সারাদিন ধরে চলল গোছগাছ—তারপরদিন সকালের ট্রেনেই যাওয়া।

রাতে ক্লান্ত দেহে শুতে গেলেন আহাদ সাহেব। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সবেমাত্র একখানা বই খুলেছেন—এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল।

মুনীরা বললেন—এতরাতে আবার ফোন করল কে?

আহাদ সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। মুনীরার বড় ভাই ডাক্তার রহমান ফোন করেছেন।

অনেকক্ষণ ধরে কথা চলতে লাগল। আহাদ সাহেব নিজে বলার চেয়ে শুনছিলেনই বোধ হয় বেশী। উত্তরে শুধু—না তা হয় না—হয়, হম্ হম্—না এখন আর তা কি করে হয়—সে দেখা যাবে—এই সব শুনতে লাগলেন মুনীরা।

ধীরে ধীরে উঠে এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। শুনতে পেলেন আহাদ সাহেব নীচুস্বরে বলছেন—ছুটি আমি নিজের ইচ্ছেয় তো নিইনি—তারাই পাঠাচ্ছে। না না এতরাতে আবার আসবেন কেন—ঠিক আছে, ভেবে দেখছি।...বলিনি, তবে আজ রাতে বলব ভেবেছিলাম। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।

এরপর আর মুনীরাকে সব কথা না বলে উপায় রইল না। মুনীরা বললেন—টেলিগ্রামখানা বাড়ীতে আনলে না কেন?

—ও বাবা, সেটিই তো তাঁদের মূল্যবান সম্পদ। সেটি তো চেযারম্যান নিজে হাতে ধরে রেখে আমাকে শুধু পড়তে দিয়েছেন—হাতেও দেননি।

মুনীরা গম্ভীরভাবে বললেন—কাল কক্সেসবাজার যাওয়া হবে না।

—সে কি? কেন?

—না, এখানে থেকে এ ব্যাপারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

—রহস্য টহস্য কিছু নেই—কি নাকি ধুলোঝড় উঠেছে সেটা স্তিমিত হলেই তা সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ধুলো যখন উঠেছে—তখন সে ধুলো কে উড়াল কেন উড়াল সে সব ভাল করে না জানলে চলবে কেন? কোথাও যাব না এখন—এখানেই থাকব।

আহাদ সাহেব বললেন—ছেলেমেয়েদের কি বলবে? ওরা এত আশা করে আছে।

—সে আমি সামলে নেব—ও নিয়ে তুমি ভেব না।

মুনীরা স্বামীকে সারাক্ষণ পরামর্শ দেন—বলেন, অন্যায় সহ্য করা মহাপাপ। বাড়ী বসে থেকে লাভ নেই। উকিল ব্যারিস্টারের পরামর্শ নাও। তুমি যখন নির্দোষ তখন বৃথা বদনাম নিয়ে কর্পোরেশন থেকে বেরিয়ে যাবে কেন?

কিন্তু আবদুল আহাদ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তিনি ও টেণ্ডার-ফেণ্ডার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—কোন দরকার নেই উকিলের পরামর্শের। তা ছাড়া ও টেণ্ডার তাঁর ডিপার্টমেন্টেরও নয় যে তাঁর মাথা ঘামাতে হবে।

মুনীরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। বলেন—তুমি চুপ করে বসে থাকলে চাকরী যাবে—মুখে চুনকালি পড়বে যে। কেন বৃথা বদনাম নিয়ে বেরিয়ে যাবে—কিছু তদ্বির কর।

আহাদ সাহেব তাঁর কাঁচাপাকা চুলগুলোতে আঙুল ঢুকিয়ে বলেন—নীরু, চাকরী এমনিও যাবে—অমনিও যাবে। বৃথা কেন তদ্বির করতে এর ওর খোশামোদ করা। জগতের মানুষ সব একই গোত্রের, সবাই চেয়ার-ম্যানের চেয়ারকে সালাম করে—ন্যায় অন্যায় জ্ঞান কারও নেই।

বল কি? চাকরীটা সত্যি যাবে? কেন যাবে?

আহাদ সাহেব শান্তভাবে বলেন—যাবে, যাবে—কারণ শরীফ খানের পাঞ্জা হল বাঘের থাবা। যার কাঁধে ও থাবা পড়েছে সে বিষের ঘায়ে জ্বলে পুড়ে মরেছে—একজনও নাকি রেহাই পাইনি।

—কি বলছ তুমি এসব—ব্যাপার সত্যি এত গুরুতর?

—হ্যাঁ, সবাই বলেছে, ওনার হাত থেকে রেহাই নেই।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সত্যের নিজস্ব একটা শক্তি আছে, বিশ্বাস কর?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আহাদ সাহেব বলেন—সবই বিশ্বাস করি বেগম—কিন্তু মনে মনে আমি ক্লান্ত তিক্ত। এ সব শক্তিশালী নীচাশয় ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করে নিজেকে আর খাটো করতে চাই না—অপমান করতে চাই না তোমাদের...

—কিন্তু যে মালিন্য তোমাকে স্পর্শ করেছে—সেটা ধুয়ে ফেলতে হবে যে। ধুয়ে সাফ করতে হবে। ধুলো উড়েছে এটাই যখন চিন্তার বিষয়—সত্য সন্ধান নয়—তখন ধুলো অন্তত ধুয়ে ফেল।

—কি করব আমি?

—হ্যামিলটন এণ্ড হেয-এর অফিসে চিঠি লিখে খবর নাও—এরকম টেলিগ্রাম তারা পাঠিয়েছে কি-না—পাঠালে টেলিগ্রামের কপি চাই।

—তাতে কি ফল হবে?

—অনেক কিছু।

—তারপর আর তো কিছু করতে বলবে না?

মুনীরা কাছে এসে স্বামীর পাশে বসলেন। বললেন—পরের কথা আগে কি করে বলি? আমার কথা শুনে কখনও বিপদে পড়েছ কি?

—না...

—তবে আমার কথা শোন—নিশ্চয়ই সুফল পাবে।

আহাদ সাহেব ছুটোছুটি শুরু করলেন হ্যামিলটন এণ্ড হেয-এ। মাসখানেক পরে খবর এল—হ্যাঁ, এরকম টেলিগ্রাম তারা পাঠিয়েছে বটে—তবে তার কপি আহাদ সাহেবকে দেওয়া সম্ভব নয়।

মুনীরা বললেন—ব্যাপার সুবিধে নয়। তুমি ওদের দূতাবাসে খবর নাও—চেষ্টা করলে তারাই আনিয়ে দিতে পারবে।

দূতাবাসেই গেলেন আহাদ সাহেব। দূত মহাশয় মহদাশয় ব্যক্তি। সব রকম সাহায্যের ওয়াদা করলেন তিনি।

সপ্তাহখানেক পরে আবার গেলেন আহাদ সাহেব। দূত বললেন—খবর পাঠিয়েছি—এই এল বলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তার মাসখানেক পর এক স্থানীয় কোম্পানীর মালিকের স্ত্রী মিসেস খান এলেন মুনীরার সঙ্গে দেখা করতে। মুনীরা নতুন মেহমান দেখে হাতের বোনাটা রেখে দিয়ে আপ্যায়নে রত হলেন। চা-বিস্কুট খাওয়ালেন, অনেক রকম গল্প করলেন।

বিদায় নেবার আগে মিসেস খান বললেন—আপনার আতিথ্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি—আপনি ভারী চমৎকার মহিলা। আপনার কাছে একটা আরজ পেশ করতে পারি?

মুনীরা অবাক চোখে চেয়ে রইলেন।

ততক্ষণে ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে মুনীরার সামনে রাখলেন মিসেস খান।

মুনীরা বললেন—এ কি?

—এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে—রেয়নের টেণ্ডারটা আমাদের কোম্পানী পেলে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না আশা করি।

মুনীরা গম্ভীরমুখে বললেন—আপনি মহাভুল করছেন—আমার স্বামীর এ

টেণ্ডারের ব্যাপারে কোন হাত নেই। টাকাটা আপনি যথাস্থানে নিয়ে যান।

মিসেস খান বললেন—সব ডিরেক্টারদেরই দেওয়া হয়েছে টাকা।

হঠাৎ মুনীরার মনের পর্দায় টেণ্ডারের রহস্যটা যেন কিছু পরিষ্কার হয়ে এল। বললেন—আপনি বসুন, আমি আসছি। সিটিংরুমের সংলগ্ন ডাইনিং-রুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে মুনীরা ফিরে এলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—অন্য ডিরেক্টারদের কত করে দিয়েছেন ?

—সাত হাজার করে।

—চেয়ারম্যানকে দিয়েছেন কিছু ?

—হ্যাঁ, দশ হাজার।

—তবে আমাদের এত কম দিচ্ছেন কেন ? এ টেণ্ডার আপনারা পাবেন—কিন্তু আমাদের ঠকাবেন কেন ? এ টেণ্ডারের জন্য আমরা অনেক ভুগেছি তা জানেন ? এতদিন এলেন না কেন—এখনই বা এলেন কেন ?

মিসেস খান বললেন—মিসেস আহাদ, আপনারা তো অরিজিন্যাল টেলি-গ্রামের কপি পেয়ে গেছেন—তাতে আহাদ সাহেবের নাম ছাড়া আর সবার নামই তো আছে। দয়া করে ও টেলিগ্রামের ব্যাপারটা প্রকাশ করবেন না। টেণ্ডার উইথড্র করিয়েছেন চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী এবং আমাদের কোম্পানীর স্বার্থেই তা করা হয়েছে—আমি স্বীকার করছি। টেণ্ডার খুলবার আর মাত্র অল্পদিন বাকী—আহাদ সাহেবকে বলুন—তিনি যেন সব কথা ভুলে যান—আমি পনের হাজার টাকা দেব আপনাদের।

আমাদের টাকা দিতে হবে না। টেণ্ডার আপনারা এমনিতেও পেয়ে যাবেন—এত ঘুষ বৃথা যেতে পারে না।

—ছিঃ, ঘুষ বলছেন কেন ? আপনি আমার উপকার করবেন—আর আমি অকৃতজ্ঞের মত শুধু হাতে সব কিছু নেব—তা কি হয় ?

—সরকারের কাজ করে মাইনে নিচ্ছি আমরা—তার উপরে আর কৃতজ্ঞ-তার দান নেওয়া তো উচিত নয়।

মিসেস খান মুনীরার নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন। এসব গোঁয়ার মানুষদের নিয়েই যত জ্বালা। বললেন—আপনি দুনিয়ার হালচাল কিছু বোঝেন না মনে হচ্ছে।

—ঠিক ধরেছেন, বুঝলে আর আমার স্বামী এমন একটা কৃত্রিম ধুলো-ঝড়ের শিকার হতেন না।

—আপনি দেখছি পুরো ব্যাপারটাকে সামান্য একটা ধুলোঝড় ভেবেই নিশ্চিন্ত। আচ্ছা চলি।

দূতাবাসে টেলিগ্রামের কপি এসেছে—একখানা নয়, তিনখানা ভিন্ন ভিন্ন টেলিগ্রাম যা আদান-প্রদান হয়েছে জনশিল্প কর্পোরেশন ও হ্যামিলটন এণ্ড হেয কোম্পানীর মধ্যে।

কপি তিনখানা নিয়ে আহাদ সাহেব পৌঁছলেন বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে।

মন্ত্রী বললেন—আপনি তো আচ্ছা লোক। এই বিপদ ঘাড়ে তুলে নিয়ে কেউ ছুটি নেয়? ছুটি নিয়েই তো আপনি প্রমাণ করেছেন আপনি দোষী। ব্যাপারটাকে 'ফেস' করতে চাননি, পালিয়ে গেছেন। টেলিগ্রামের কপি দেখে আর কি হবে?

—পারবেন না তা হলে?

—আপনার চেয়ারম্যান তো আর আপনাকে ফেরৎ চান না—আমি কি করব।

—বিনা দোষে আমাকে বরখাস্ত করলে আমি কেস করতে বাধ্য হব।

—তাতে চাকরী ফিরে পাবেন? কেসে জিতলেও আপনাকে চাকরীতে বহাল করার অথরিটি কোর্টের হাতে নেই তা ভুলে যাবেন না।

—চাকরী যদি না-ও পাই—অন্তত প্রমাণ করতে পারব—আমাকে তাড়াবার জন্যই চেয়ারম্যান চক্রান্ত করে আমাকে জোর করে ছুটিতে পাঠিয়েছেন।

—প্রমাণ আছে?

—ছুটির দরখাস্তখানা তো আপনার কাছেই এসেছে, ওটা খুলে দেখুন, তিরিশ কেটে কলম দিয়ে নব্বই করা হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেলিগ্রাম পড়ে দেখুন। তাতে শরীফ খান ও নিজামউদ্দীন যে টেণ্ডার উইথড্র করতে বলেছেন তা স্পষ্ট লেখা আছে।

মন্ত্রী টেলিগ্রাম তিনখানা পড়ে দেখলেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন, শরীফ খান তো ঘুষখোর নয়, সে করাপ্‌শনের উর্ধ্বে, তার সার্ভিস রেকর্ড অতি পরিচ্ছন্ন !...ঠিক আছে, আপনাকে কেস টেস করতে হবে না, আমি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি আপনি অফিসে জয়েন করবেন

সামনে মাসের প্রথমেই। ছুটির আর বাকী তিন সপ্তাহ ক্যানসেল করে দিই। কেমন খুশী তো ?

—যা আপনার ইচ্ছে।

মাসপয়লা অফিসে হুলুস্থুল পড়ে গেল। শরীফ খান নিজে আহাদ সাহেবের অফিসে এসে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। বললেন—আপনি অফিসে জয়েন না করা পর্যন্ত টেণ্ডার খুলব না ঠিক করে রেখেছিলাম, খুলিওনি—পরশুদিন হবে কি বলেন ?

নিজামউদ্দীন শরীফ খানের ছায়া। তিনিও বললেন—হ্যাঁ, পরশুদিনই হবে। আহাদ সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন—দেখুন চেয়ারম্যান সাহেবের কথাই ঠিক হল। ছুটিতে গিয়ে আপনার সব বদনাম নির্মূল হয়ে গেল, ক্লীন শ্লেট আরও ক্লীন হল।

আহাদ সাহেব নিজামউদ্দীনের মিথ্যা চাটুবাক্যে কান না দিয়ে বললেন—ও টেণ্ডার ক্যানসেল করে দিন। নতুন টেণ্ডার কল করুন। ধুলোঝড় ভালভাবে পরিষ্কার হবে।

চেয়ারম্যান শরীফ খান বললেন—ঝড় তো থেমেই গেছে—ভাবছেন কেন ?

এমন সময় পিওন একখানা চিঠি এনে শরীফ খানের হাতে দিল। সারমর্ম হল—ক্যানসেল দ্য স্ক্যানডালাস টেণ্ডার...

এরপর চেয়ারম্যান সেক্রেটারী ও অন্যান্য ডিরেক্টাররা সুখে স্বচ্ছন্দে অফিস করতে লাগলেন বললে গল্পটা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা হল না—বাদ সাধলেন মুনীরা।

তাঁর মাথায় এক পরিকল্পনা—তিনি একটা ডিনার পার্টি দেবেন। বেশী লোকজন নয়—কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেক্রেটারী অন্যান্য ডিরেক্টাররা ও মুনীরার ভাই ডাক্তার রহমান।

সেদিন সকাল থেকেই রান্নাবান্না, ঘর সাজানো, ফুল সাজানো নিয়ে মুনীরা মহা ব্যস্ত।

সন্ধ্যেবেলা অতিথিরা এসে উপস্থিত হলেন। ডিনার টেবিলে সকলেই রান্নার তারিফ করতে লাগলেন—ডিনার শেষ হল। সকলে সিটিংরুমে এসে বসলেন। মৃদু সঙ্গীত চলছিল টেপ রেকর্ডারে। কফি খেতে খেতে সকলেই গল্প করতে ব্যস্ত। মুনীরা উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

হঠাৎ গান থেমে গিয়ে কিছু কথা কানে এল—সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—

—অন্য ডিরেক্টারদের কত করে দিয়েছেন ?

—সাত হাজার করে।

—চেয়ারম্যানকে দিয়েছেন কিছু ?

—হ্যাঁ, দশ হাজার।

সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আহাদ সাহেব অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—মুনীরা !

কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

টেপ তখনও বেজে চলেছে—টেণ্ডার উইথড্র করিয়েছেন চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী...আমাদের কোম্পানীর স্বার্থেই তা করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান শরীফ খান আহাদ সাহেবকে বললেন, এত নীচ আপনি—এই জন্যই দাওয়াত করে এনেছেন ?

আহাদ সাহেব বললেন—বিশ্বাস করুন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না—ব্যাপারটা কি !

নিজামউদ্দীন টেপটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

পরদিনই চেয়ারম্যান শরীফ খান তাঁর চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। অফিসময় ঝড় উঠল—সবাই বলাবলি করতে লাগল হঠাৎ কেন চাকরি ছাড়লেন—কি ব্যাপার !

কেউ কেউ বলল—ধুলোঝড়—আঁধি উঠেছে বোধ হয়। সামলে নিতে পারলেন না আর কি।

খুন

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

আবু তালেব মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দীন সাহেব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করাটা পারিবারিক ফরজ হিসেবেই দেখেন। যতদিন দুনিয়াদারীর কাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন ততদিন সে কর্তব্যটি ইচ্ছানুযায়ী পালন করতে পারেননি। আজ তাঁর দায়িত্বের ভার অপেক্ষাকৃতভাবে লঘু হয়েছে বলে সে কর্তব্য পালনে বাধা-বিপত্তিও কমেছে।

সালাহ্‌উদ্দীন সাহেব যখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তার পূর্ব-আয়োজনটি রীতিমত সফরের আয়োজনের মতই মনে হয়। বিনা খবরে ঝট্‌ করে কারো বাড়ীতে তিনি উপস্থিত হন না। দেখা করতে আসবেন বলে আগাম খবর পাঠান দিন কয়েক আগে। সময়-প্রহর জানান, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি চা-মিষ্টি কিছুই গ্রহণ করেন না, পান-দোক্তা তামাকের অভ্যাসও তাঁর নেই। তাছাড়া ডাক্তারের কড়া নির্দেশ পথ্য করেন বলে খানার দাওয়াতও গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ এক গ্লাস পানি ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয় না। তবু অসিদ্ধ পানিটা রোগ-ব্যাধির ভয়ে পান করেন না বলে তা-ও কচিৎ স্পর্শ করেন।

তাঁর আত্মীয়-স্বজনের চক্রটি কম বড় নয়। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত সে পরিবারের লোকসংখ্যা অগুণতি মনে হয়। তবু তাঁর বয়সের জন্যে এবং তাঁর সমৃদ্ধিসম্পন্ন আর্থিক অবস্থার জন্যে তিনি নিজেকে তাদের সকলেরই মুরুব্বী বলে মনে করেন এবং পদ্ধতিক্রমে বছরের মধ্যে একবার-দু'বার দেখা করে আসেন তাদের সঙ্গে। তবে আত্মীয়-স্বজনের চক্রটি বৃহৎ বলে তাঁকে একটা সীমারেখা টানতেই হয়। যারা সে চক্রের বহির্ভূত, নিয়মিত-ভাবে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎটা করেন না। সব কিছুতেই কোথাও-না-কোথাও একটা সীমারেখা টানতেই হয়।

অতএব সেদিন অপরাহ্ণে বিনা খবরে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব যখন দেখা-সাক্ষাতের চক্রের বহির্ভূত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেরের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন ঘটনাটি নেহাতই বিস্ময়কর মনে হয়। তিন দিন আগে কাদেরের ষষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বলে তিনি যে দুঃখ প্রকাশের নিমিত্তি এসেছন তা মনে করা সম্ভব হয় না। সালাহ্ উদ্দীন সাহেব নিজেই গভীর শোকগ্রস্ত। প্রায় একই সময় তিন দিন আগে প্রসবকালে তাঁর অতি আদরের ছোট মেয়ে খালেদার মৃত্যু ঘটে।

ক্ষুদ্র বৈঠকঘরে একমাত্র পিঠখাড়া চেয়ারে আসন গ্রহণ করে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব লাঠির মাথায় তাঁর হাত দুটো জড়ো করেন। একটু দূরে শীতল পাটি বিছানো চৌকিতে কাদের মিয়া বসে। তার মুখে কৌতূহলের স্পর্শ। ঘরে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করে।

অবশেষে উচ্চস্বরে গলা সাফ করে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব একনজর তাকান কাদেরের দিকে। তারপর অল্পক্ষণের জন্যে তাঁর চোখ ক্ষুদ্র ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। স্বল্পবেতনের কেরানীমানুষ কাদেরের বাড়ীতে সর্বত্র দারিদ্র্যের ছায়া। ঘরে আসবাব বলতে নড়বড়ে চেয়ারটি এবং চৌকিটি ছাড়া আর কিছু নেই। ছাতাপড়া দেওয়ালে শোভার খাতিরে একটি কেলেণ্ডার টাঙ্গানো। তাতে নদীর বুকে রক্তিম সূর্যাস্তের ছবি। তবে সেটি দু-বছরের পুরানো। অপরাহ্ণের সূর্যের তীর্যক আলোয় তাতে জমে থাকা ধুলা নজরে পড়ে। ওপাশে, ভেতরের দরজার কাছে, মাটিতে বসে একটি বছর চারেকের মেয়ে বাটি থেকে মুড়ি খাওয়ায় রত। মুড়ি মুখে যতটা না যায় ততটা ছড়িয়ে পড়ে তার চারপাশে। গায়ে তার একটি অপরিচ্ছন্ন ফ্রক। মুখেও সর্বত্র ময়লার স্পর্শ।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব যা দেখেন তাতে তিনি নারাজই হন। যে প্রস্তাবটি নিয়ে তিনি কাদেরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন সেটি উত্থাপন করা সমীচীন হবে কিনা সে বিষয়ে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর মনে একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, সেটি উত্থাপন না করে উপায় নেই।

আবার গলা সাফ করে সোজা তাকিয়ে এবার তিনি বলেন, আপনার কাছে একটি কথা নিয়ে এসেছি। আমার নাতিকে দুধ দেবার কেউ নেই।

এইটুকু বলেই তিনি থামেন। তাঁর কথাটির মর্মার্থ বুঝতে কাদেরের

বিলম্ব হয় না। তবু সালাহ্ উদ্দীন সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি বলে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

প্রস্তাবটি খুলে বলতে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব সময় নেন। কাদেরের স্ত্রীকে তিনি কখনো দেখেননি। তবে শুনেছেন, সে বড়ই স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। পাঁচ ছেলেমেয়ের মা, তবু কখনো রোগ-ব্যাধিতে ভোগেনি। তাছাড়া বুকের দুধ দিয়েই সে পাঁচটি ছেলেমেয়েকে হাঁটাতে শিখেয়েছে, তাদের মুখে কথা ফুটিয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও ভাল। দরজার কাছে বসে থাকা মেয়েটি অতিশয় নোংরা হলেও রোগা-পটকা নয়। তাছাড়া কাদেরের স্ত্রী সম্বন্ধে এ-কথাও শুনেছেন যে, সে নাকি অতিশয় দয়ালু মানুষ: পরের জন্য তার দয়া-মায়ার শেষ নেই। এ সব অতি উত্তম কথা। তবু কাদের এবং তার স্ত্রীর বর্তমান শোকের কথা ভেবেই তিনি কথাটা খোলাখুলিভাবে বলতে দ্বিধা করেন। তবে সে দ্বিধা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শুনেছি আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খোদার ফজলে ভালোই। ভাবছিলাম, আমার মা-হারা-শিশু-নাতিকে তার বুকের দুধ দিতে রাজি হবেন কি? হলে বাচ্চাটিকে এখুনি নিয়ে আসি। সালাহ্ উদ্দীন সাহেব একবার চোখ বন্ধ করেন কেবল খুলবার জন্যেই। একটু হুকুমের কণ্ঠে বলেন, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসবেন?

কাদের চলে গেলে লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে বসেই তিনি মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তবে প্রথমে আরেকবার ঘরটির চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, নোংরা মেয়েটির দিকেও একবার ক্ষিপ্রভাবে তাকান। তাঁর মুখে আবার অসন্তুষ্টির ভাবটি জাগে। প্রস্তাবটি করে ভাল করেছেন কি? অনিশ্চয়-তার একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। তবে তিনি বোঝেন, প্রস্তাবটি যখন একবার করেই ফেলেছেন, তখন সে কথা ভাবার কোন অর্থ নেই।

কাদের প্রত্যাবর্তন করলে তিনি উদ্বিগ্নভাবে তাকান তার দিকে। তার মুখের ভাব দেখে পরমুহূর্তেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। লাঠিটা মেঝেতে দু'-একবার ঠুকে তিনি উঠে দাঁড়ান। এ বয়সেও তাঁর পিঠ বিস্ময়করভাবে ঋজু।

দরজার নীচেই আধা পাকা রাস্তা। সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তিনি কি ভাবেন। তারপর যে ব্যাখ্যা প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল সে ব্যাখ্যাটি এখন দেন অযাচিতভাবে।

ডাক্তার অবশ্য বোতলের দুধ দিতে বলে। ওসব আধুনিক পন্থায় আমার বিশ্বাস নেই। দুধের শিশু বুকের দুধ খাবে, প্রকৃতির রীতিই তাই।

তারপর আচম্বিতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করেন। গভীর শোকেও তিনি এমন সংযম দেখাতে পারেন, তার কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তিনি একথা শিখেছেন যে, মানুষের জীবনে যখন নিদারুণ দুঃখকষ্ট নামে তখন মানুষকে তার কর্তব্যের কথাই প্রথমে ভাবতে হয়। তখন ভেঙ্গে পড়লে চলে না।

এ-সময় জামাইর কথা মনে পড়তে তিনি ভ্রূকুটি করে ওঠেন। শোকে সে দুর্বল তৃণের মত ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি কী করেন? তাঁকেই সব কথা ভাবতে হয়, যা করবার তা করতে হয়।

গাড়ীতে চড়বার আগে বলেন, বাচ্চার সঙ্গে একটি দাই আসবে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সালহ্ উদ্দীন সাহেব তাঁর শিশু-নাতিকে নিয়ে আসেন। সঙ্গে দাই। দাই শিশুকে ভেতরে নিয়ে গেলে তিনি বৈঠক ঘরে বসে কান খাড়া করে রাখেন। কাদেরের স্ত্রীর মতটি ইতিমধ্যে বদলায়নি তো? শোকগ্রস্তা মেয়েমানুষের কথা বলা যায় না। তারপর একটু পরে দাই এসে ভেতরের দরজার পাশে নিঃশব্দে এক পাটি কাল দাঁত দেখিয়ে দাঁড়ালে তিনি বুঝতে পারেন, কাদেরের স্ত্রী শিশুকে প্রত্যাখ্যান করেনি। অবশ্য সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। দুধের শিশুকে কেউ কি ফেলতে পারে? যে মানুষ সদ্য সন্তান হারিয়ে শোকাপ্লুত, সে-ও পারে না।

গাড়ীতে চড়তে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব বলেন—আপনার স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের দরকার হলে ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।

তাঁর কণ্ঠে গভীর তৃপ্তির আভাস। এত গভীর শোকের মধ্যেও একটু সার্থকতার, একটু আনন্দের, একটু সুকীর্তিজাত সন্তোষের অবকাশ আছে। সব খোদারই অসীম মেহেরবানী, তিনি ভাবেন।

গাড়ীতে চড়ে তিনি ঋজু হয়ে বসেন, দৃষ্টি সম্মুখ দিকে।

কাদেরের স্ত্রী মাজেদার সত্যিই উত্তম স্বাস্থ্য। মানুষটি ছোটখাট হলেও তার দেহ কোথাও অসম্পূর্ণ নয়। পাঁচ ছেলের মা বটে, তবু সে-দেহ আট-সাঁট, সামান্য মেদবহুল হলেও তাতে কোথাও ঢিলেঢালা ভাব নেই।

দাই ঘরে এলে মাজেদা প্রথমে নিস্তেজ দৃষ্টিতে দাই-এর কোলে কাপড়ের বাণ্ডিলের দিকে তাকায়। সে বাণ্ডিলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুখ। শিশুর চোখ গভীর ঘুমে নিমীলিত। তমিস্রাময় গর্ভের নিদ্রা তার এখনো শেষ হয়নি। তারপর মাজেদার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে অধীরভাবে বলে, দাও, আমাকে দাও।

আজ সকাল থেকে মাজেদা বুঝতে পারে, তার স্তন যেন ভারী, স্ফীত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ থাকে না যে কুচাগ্রের পশ্চাতে রহস্যময়ভাবে বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থ জমছে নতুন এক জীবনের জন্য। তাই যে-শোকটা তিন দিনে কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছিল, সে শোকটা আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কার জন্যে তার স্তন এমন ভারী হয়ে উঠেছে? তার গর্ভের সন্তানটি তো আর বেঁচে নেই। প্রকৃতি কি এতই অন্ধ? সে কি কিছুই দেখতে পায় না? শুধু তাই নয়, প্রকৃতি যেন শোকাপ্লুত মায়ের প্রতি বিদ্রূপ করছে। এক সময়ে তার মনে হয়, এ অন্যায়, অতি নিষ্ঠুর। মনে হয় সে তার দুধভারে স্ফীত স্তন যেন সহ্য করতে পারবে না। তারপর সালাহ্ উদ্দীন সাহেব প্রস্তাবটি নিয়ে এলে সহসা সে তার ভারী স্ফীত স্তনের মধ্যে একটি গুপ্ত নির্দেশ দেখতে পায়। না, প্রকৃতি খোদার সৃষ্ট বলে তার সহস্র চোখ; মানুষ যা দেখে না বোঝে না তাও সে দেখে, বোঝে।

বুকের কাছে ধরে মাজেদা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিশুটির পানে, একটা অদম্য আবেগে তার সমগ্র দেহ কেঁপে ওঠে বার বার। শীঘ্র শিশুটি চীৎকার শুরু করে। প্রথমে মাজেদা চমকে ওঠে। বাণ্ডিলের শিশুটি যে কাঁদতে পারে সে কথা সে যেন ভাবে নাই। তার সন্তান একটু শব্দ না করেই যে অন্তহীন অন্ধকার থেকে সে এসেছিল, সে অন্ধকারেই প্রত্যাবর্তন করেছিল। মাজেদা কি ভেবেছিল সে তার মৃত সন্তানকেই কোলে নিয়েছে? অদূরে মেঝেতে বসে দাই কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে পান-দোক্তা খুলে মুখে ভরে। সে বলে,—বাচ্চার ভুক লেগেছে। দুধ দাও।

মাজেদার চোখ আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে, মুখে অস্পষ্ট কোমল হাসির রেখা জাগে। হাঁ, সে দুধ দেবে বৈকি। তার উন্নত স্ফীত স্তনে ঝরণার মত আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা।

সে বেদনা জীবনেরই বেদনা; বুকে যা জমেছে দৃষ্টির অন্তরালে তা স্নেহ-মমতার সুধা। মনে আছে তার অন্যান্য সন্তানের বেলায় যখনই শিশুর কান্না তার কানে পৌঁছুত, তখনই কুচাগ্র দিয়ে দুধ বেরিয়ে আসতো, পেটের নিচে কেমন সংকোচন-প্রসারণ শুরু হতো। তার এখন মনে হয়, কোলের শিশুটির কান্নার আওয়াজে কুচাগ্র যেন তেমনি সিক্তিত হয়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্কোচন-প্রসারণও শুরু হয়েছে পেটের তলে। শিশুটি যে তার নয়, তাতে বাধা পড়েনি।

দাই আবার বলে,—বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে গেল। মা-হারা শিশুকে দুধ দেবে না?

এবার ক্ষিপ্রভঙ্গীতে জীর্ণ, কিছু ঘর্মাক্ত কড়া লাল রঙের ব্লাউজের বোতাম খুলে মাজেদা একটি স্তন উন্মুক্ত করে। কুচাগ্রটি ক্রন্দনরত শিশুটির কাছে ধরলে অধীরভাবে সে তা মুখে ধরে।

কিছুক্ষণ পর শিশুটি হঠাৎ তীক্ষ্নকণ্ঠে চীৎকার শুরু করে। সে চীৎকার বঞ্চনা-নিষ্ফলতাই ঘোষণা করে। দাই ভ্রূকুটি করে মাজেদার দিকে তাকায়। যে দৃশ্যটি সে দেখে তাতে আর ভ্রূকুটি আরো গাঢ় হয়। মাজেদা সামনের দিকে তাকিয়ে কেমন নিস্পন্দ হয়ে বসে, কোলের শিশুটির কান্নায় তার কান নেই যেন।

কি হল? দাই প্রশ্ন করে।

মাজেদা সহসা উত্তর দেয় না। তারপর তার শুষ্ক ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। ক্ষুদ্র কণ্ঠে সে বলে—দুধ জমে গেছে।

শিশুটি এক ফোঁটা দুধ পায়নি। মাজেদার মনে হয়, তার স্তন দুটি জমাদুধে হঠাৎ পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠেছে।

পরদিন ফজরের নামাজের পরই সালাহ্ উদ্দীন সাহেব খবর নিতে আসেন। কাদের বৈঠকখানায় এলে তিনি অন্যদিনের মত লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে তার দিকে একবার তাকান, কিন্তু সরাসরি কোন প্রশ্ন করেন না। প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। শিশুটির ক্রন্দন শোনার জন্যে কান খাড়া করেন একবার। ভেতর থেকে কোন শব্দ না এলে নীরবতার অর্থ শিশুটির ভোজনতৃপ্তি হিসেবেই গ্রহণ করেন। কাদের তার স্ত্রীর দুধ দেবার ব্যাপারে অক্ষমতাটির কথা এখনো ভাল করে বোঝেনি বলে সে-ও কিছু বলে না।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব লাঠিটা একবার সশব্দে ঋজু করেন। আজ তিনি আর বসবেন না। উঠি-উঠি ভাব করে কাদেরের দিকে না তাকিয়ে বলেন, ফজরের নামাজের পর ওজিফা খুলবো এমন সময় একটি কথা মনে হল। মুন্সীরহাটে আমার কিছু জমি আছে, ধান-ফসলের জমি। তার একটি অংশ আপনার স্ত্রীর নামে লিখে দিতে চাই। আশা করি তিনি গররাজি হবেন না।

কথাটা বলেই কাদেরকে কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। রাস্তায় গাড়ীর ইঞ্জিন জীবন্ত হয়। শীঘ্র জ্বলা-পেট্রলের ঝাঁঝালো-মিষ্টি গন্ধে বৈঠকখানা ভরে যায়।

গাড়ীতে উঠবার আগে অকারণেই লাঠিটা আকাশের দিকে তুলে তিনি বলেন, কদিন মাছ-গোস্ত, শাক-সব্জীটা আমার বাড়ী থেকে আসবে। দাই ভালো রাঁধতে জানে।

অপরাহ্নের দিকে ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে দাই পিছনের সরু বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে, মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ। আজো বার বার চেষ্টা করেও মাজেদা শিশুকে দুধ দিতে সক্ষম হয়নি। আজ শিশুর চতুর্থ দিন। জন্ম হবার পর থেকে তার পেটে এক ফোঁটা দুধ পড়েনি। দাই তাকে চামচে করে পানি দিয়েছে কিছু, কিন্তু পানিতে ক্ষিধে যায় না। অবশ্য সে জানে, নবজাত শিশু না খেয়ে কয়েকদিন দিব্যি সুস্থ দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। তবু চার দিনেও শিশুর মুখে একটু দুধ না পড়লে তা চিন্তারই কথা।

ভেতরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে মাজেদা নিথর হয়ে থাকে। তার চোখ নিমীলিত; ঠোঁট শুষ্ক। একটু আগে শিশুকে আবার দুধ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে ব্লাউজের বোতাম দেয় নাই। উন্মুক্ত স্তন এখন তার কাছে পাথরের মত ভারী মনে হয়। এ বিষয়ে তার মনে এখন কোনই সন্দেহ নাই যে, স্ফীত স্তনে দুধ জমে গেছে বলেই কিছু নিস্থত হচ্ছে না। কিন্তু কেন তার স্তনের এই অবস্থা হয়েছে? এ কী সম্ভব যে, যে দুধ তার সন্তানের জন্যেই এসেছিল, তার সন্তানটি আর নেই বলে সে দুধ জমে গেছে?

কথাটি মনে হতেই তারই অজান্তে একটি বিজয়ের ভাব রক্তের মত তার ধমনীতে স্রোতশীল হয়। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেই মাত্র। কথাটি যে অতিশয় নির্মম তা তার বুঝতে দেরী হয় না। তাই শীঘ্র একটি তীব্র অনুশোচনার জ্বালা সে বোধ করে। কি করে সে এমন নির্মম কথা ভাবতে পেরেছে?

শিশুটি নিজের গর্ভের না হোক, তবু সে শিশু। তাছাড়া মা-হারা অসহায় শিশু। এমন শিশুকে কেউ কখনো দুধ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। নিষ্ঠুর মানুষও পারে না। তাছাড়া কথাটি যে সত্য নয় তার প্রমাণ সে নিজেই দেখতে পায়। শিশুটিকে স্তন দেবার জন্যে সে মনে-প্রাণে দেহে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে। সে আকাঙ্ক্ষা কি ভুল হতে পারে?

কিন্তু শক্ত কঠিন স্তন ভারী হয়ে থাকে। বাইরে শিশুটির কান্নাও শোনা যায়।

কেন তবে তার বুকে এমনভাবে দুধ জমে গেছে?

এবার আরেকটি আরো নির্মম আরো নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কথা তার মনে জাগে। তার মনে হয়, শিশুটিকে স্তন পান করাবার জন্যে সে যে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, সেটি আসল সত্যটি ঢাকবার জন্য তার মনেরই একটি কৌশল মাত্র। আসল সত্যটি এই যে, তার নিজের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে সে চায় না যে, পরের শিশু বেঁচে থাক। সে জন্যেই তার বুকভরা দুধ এমন জমে পাথর হয়ে গেছে।

কথাটি কিন্তু তার সমগ্র অন্তর তীক্ষ্ণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, বুঝি শ্বাসরোধ হবে। একটি অদম্য কান্নার বেগে তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে।

কাদের আপিস থেকে ফিরেছে কি অমনি বাইরে সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। আজ সে শব্দ কানে আসতেই একটা গভীর আতঙ্কে মাজেদার ক্লান্ত মন ভরে ওঠে। শিশুর কথা না ভেবে আজ সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের কথাই সে সর্বপ্রথম ভাবে। সে যে তাঁর শিশু নাতিকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারে নাই, সে কথা তিনি এখনো জানেন না। দাই এখনো কথাটা প্রকাশ করেনি। কিন্তু সে কতক্ষণ আর কথাটা প্রকাশ না করে পারে? কাদের তার অক্ষমতার কথাটা এখন জানলেও সে-ও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার পক্ষেও বেশিক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব নয়। কথাটা জানতে পেলে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব কী ভাববেন? তাছাড়া, তিনি যদি শিশুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান তবে সে কি লজ্জায় মরে যাবে না?

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসে মাজেদা তার স্বামীকে ডাকে। গভীর উৎকণ্ঠায় তার মুখ বীভৎসভাবে রক্তশূন্য দেখায়। কাদের এলে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ওকে

এখনো বলো না, বুঝলে? শিশু আজ রাতেই দুধ পাবে। আমি জানি। বুকের ব্যথাটা বড় বেড়েছে আর দেরী হবে না।

কাদের স্ত্রীর অনুরোধটি রক্ষা করে। তবে সে সালাহ্ উদ্দীন সাহেবকে বলে, মাজেদাকে একটু ডাক্তার দেখানো দরকার।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব ঈষৎ শঙ্কিত হন।

কেন?

তার শরীরটা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর মাজেদাকে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার একটি অপ্রত্যাশিত খবর দেয়। সে বলে, মাজেদার দুধ এখনো আসেনি। সেটা নাকি বিচিত্র নয়। আকস্মিকভাবে গভীর আঘাত পেলে দুধ আসতে দেরী হয়। মাজেদার খেয়ালটার কোন ভিত্তি নাই। সে কথাও সে বলে। দুধ ব্যতীত স্তনের স্ফীতির কারণও ডাক্তার দুর্বোধ্য-প্রায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ডাক্তারের আবিষ্কার মাজেদাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। দুধ একেবারে আসেনি সেকথাটি দুধ জমে যাওয়ার চেয়েও অধিকতর ভীতিজনক মনে হয় তার কাছে।

ভীতির কারণ আছে বৈ কি। এবার সে বুঝতে পারে, তার মনের নির্মম কথাটি সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এবার মনের প্রান্তে একটি নির্লজ্জ কণ্ঠধ্বনি স্পষ্টভাবেই সে শুনতে পায়। সে কণ্ঠ বিজয়ীর সুরে বলে, নিজের সন্তান মরে গেছে তো বুকে দুধ আর আসবে কেন।

অবশ্য কথাটি পূর্বের মত এবারও তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করে। অবশেষে মাজেদাকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়। সে জানে তার সময় নেই। ডাক্তারের কথা শুনে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব আর দেরী করবেন না। এবার তাঁর শিশু-নাতিকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মা-হারা অসহায় শিশুকে বুকের দুধের জন্যে তার কাছে এসেছিলেন কিন্তু তিনি নিরাশ হয়েই ফিরে যাবেন।

অবশ্য মাজেদা এবার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে যে, সবটাই তার জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। তার সন্তানের মৃত্যু, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের শিশু-নাতী নিয়ে আসা, এমন কি ডাক্তারের মত—সবই পরীক্ষা। এবার তার চোখে তার সন্তানের মৃত্যু অসত্য রূপ ধারণ করে, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের আবির্ভাব গূঢ় উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং ডাক্তারের মতটি

ধোঁকাতে পরিণত হয়। ধোঁকা নয় তো কি? তার যে স্তনভরা দুধ, সে কথা কি সে জানে না? আজ সন্ধ্যায় তার স্তন আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। দুধ যেন আর ধরে রাখা যাবে না। তাছাড়া তার স্তন আর তেমন শক্ত কঠিন নয়। তাতে দুধ আর জমে নেই। বরঞ্চ তরল দুধে তার স্তন টলমল করছে।

তবে কুচাগ্রে কী যেন আটকে আছে বলে দুধটা সরছে না। বোতলের গলায় ছিপি আটকে গেলে যেমন কিছু সরে না, এও তেমনি হয়েছে।

মাজেদা হঠাৎ ধীরস্থিরভাবে উঠে বসে। তার মুখে একটি বিচিত্র শান্তির ভাব। সে জানে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তার মাতৃত্বের দাবী স্থাপিত হবে, তার মৃত সন্তানও ফিরে আসবে।

মাজেদা আর দেরী করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউ-জের বোতাম খুলে প্রথম ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নীচে থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়। তারপর নিষ্কম্প হাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্র-ভাবে বসিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ একটি সুতীক্ষ্ণ ব্যথা তীরের মত ঝলক দিয়ে ওঠে। সহসা চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তবে সে টু শব্দটি করে না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে। আবার সে মর্মান্তিক ব্যথাটি জাগে। ক্ষণকালের জন্য তার মনে হয়, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে সে নিজেকে সুস্থির করে। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নাই।

বাইরে এবার সালাহ্উদ্দীন সাহেবের গাড়ীর আওয়াজ শুনা যায়। মাজেদা সে আওয়াজে এবার আতঙ্ক বোধ করে না। তার স্তন থেকে যখন ঝরতে শুরু করেছে তখন আতঙ্কের আর অবকাশ নেই। তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল।

স্রোতের মুখ

মুখ

ইসহাক চাখারী

প্রয়োজন বস্তুটা সংসারে কার কিসের কি কারণে এবং কখন এসে দেখা দেবে অঙ্কের পক্ষে তার খতিয়ান কষতে যাওয়াটা বোধ করি ব্যর্থ প্রচেষ্টা-গুলোর মধ্যে অন্যতম। সে প্রচেষ্টা এখানে করতেও যাওয়া হচ্ছে না। শুধু এইটুকু জানালেই যথেষ্ট হবে যে ষাট বছর বয়সে এসে হাজী সাহেব হঠাৎ গভীরভাবে অনুভব করলেন বিয়ের প্রয়োজনটা।

কাজে কাজেই, প্রয়োজন যখন হল, পাত্রীরও অভাব ঘটল না। আর পাত্রীর ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্পূর্ণত যখন অভিভাবকের উপরই নির্ভরশীল, তেমনটা ঘটতে যাওয়া তখন আদৌ সমীচীনও নয়।

এ ক্ষেত্রেও পার্শ্ববর্তী গ্রামের নঈমুদ্দীনের পনেরো বছরের কিশোরী কন্যা নঈমার শুভাশুভের হিসাবটাও নঈমুদ্দীন নিজেই মিলিয়ে নিল। অবিলম্বে একটা পাকাপাকি দরদাম হয়ে গেল তার হাজী সাহেবের সঙ্গে। হাজী সাহেবকে অবশ্য বয়সের কিছুটা খেসারত স্বীকার করতে হল। কেননা, ষাট বছর আর পনেরো বছরের ব্যবধান বোধ করি কিছুটা আছেই। এবং টাকা হলে সে ব্যবধান অবশ্যই দূরীভূত হওযা সম্ভবপর। এ স্থলেও তাই হল।

হাজী সাহেব স্ত্রী লুলু বিবির কাছ থেকে রাজীনামা নিলেন। অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে কথঞ্চিৎ ভূমিকা সম্পন্ন করে নিয়ে আসল কথায় এসে পৌঁছলেন—তবেই বুঝে দেখ, এই বুড়ো বয়সে এসব কি আর আমি সাধ করতে যাচ্ছি না সে সাধের দিনই আমার আছে। এ শুধু তোমার জন্যই! মেয়ে দুটো আজ বাদে কাল পরের ঘরে চলে যাবে। তখন কেইবা তোমাকে দেখবে শুনবে আর কেইবা তদ্‌বির-তদারক করবে। অথচ আমার টাকাকড়ি থাকতেও, শুধু লোকের অভাবে শেষ বয়সে এই রোগা শরীরে তুমি দুঃখকষ্ট পাবে, এ-ও কি আমি চোখের ওপর সহ্য করতে পারব? তাছাড়া, আমি নিজেও তো এক রকম—আচ্ছা যাকগে—নিজের জন্যে আমি কিছুই

ভাবছিনে, ভাবনা শুধু তোমার জন্যেই। ছেলেটার বিয়ে দিয়ে অবশ্য ঘরে বউ আনতে পারি কিন্তু তা আমি চাইনে। আমি চাই ও ভালভাবে পাসটাস করুক, ওকে বিলেত পাঠাব—তারপর ওর বিয়ে। তুমি কি বল?

লুলু বিবি কিছুই বললেন না। মুখখানি যেমন অন্যদিকে ঘুরিয়ে ছিলেন তেমনি রইলেন। হাজী সাহেব পুনর্বার বললেন—আমি জানি, তোমার অমত থাকতে পারে না। আর থাকবেই বা কেন—সংসার তো তোমারই হাতে। কেউ কি আর তোমার ওপর দিয়ে যেতে পারবে? আমি চাই, এই অসুস্থ শরীরে তুমি অন্তত একটু শান্তিতে থাক, আরামে খোদার বন্দেগী কর, এই আর কি!

এবারেও লুলু বিবি নিরুত্তর। হাজী সাহেব বুঝে নিলেন, তার পুরো সম্মতি আছে। উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর এতক্ষণে লুলু বিবির মুখ থেকে দারুণ অস্বস্তিকর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। গলাটা তাঁর বেজায় শুকিয়ে উঠেছে। কন্যাদের উদ্দেশ করে বললেন—একটু পানি দেতো মা।

পানি হাতে তার একটি মেয়ের সঙ্গে অপরটিও কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি মুখ তুলে আর তাকাতে পারলেন না তাদের মুখের পানে।

হাজী সাহেবের প্রকৃত নাম হেকমত খাঁ। তিনি পরিপক্ক বয়সে একবার পবিত্র হজ সম্পন্ন করেছেন। আর শাদী করেছেন তিনটি।

প্রথম শাদী করেন ষোল বছর বয়সে। প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে ঘরও করলেন আট-ন বছর। পরে হঠাৎ তিনি একদিন আবিষ্কার করেন—পরিবারটি একেবারেই অকেজো। যে স্ত্রীলোক সন্তানধারণ করে না, তার আবার মূল্য কি! এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যৎবিহীন একটা বেহুদা সংসার ঘাড়ে করে বেড়ানোরই বা সার্থকতা কতটুকু? কিছুই না! সুতরাং, তিনি পুনশ্চ বিয়ের বাসনা প্রকাশ করলেন। এ বাসনায় বাদ সাধলো তাঁর স্ত্রী। তাঁকে তৎক্ষণাৎ তালাক দিয়ে তিনি নিজ বাসনা চরিতার্থ করলেন।

দ্বিতীয় পরিবারটি কিন্তু সম্পূর্ণ কাজেরই হলেন। বছর দশেকের মধ্যে তিনি একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা সন্তান দান করলেন। তবে দুর্ভাগ্য, পুত্রসন্তানটি ব্যতীত তিনটি কন্যাই জন্মের পর পর ফেরত চলে গেল। গেলেও, স্ত্রীর কাছে নিরাশ হওয়ার মত কিছুই ছিল না। তবুও নিরাশ হলেন হেকমত খাঁ। উদ্যোগী হয়ে উঠলেন তৃতীয় দফার জন্যে এবং সেটা

অচিরেই কার্যকরী হয়ে গেল। দ্বিতীয় জন তখন লজ্জা-ঘৃণায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নববধূর গৃহপদার্পণের পূর্বেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বসলেন। বোধকরিবা বাড়াবাড়িই করলেন তিনি।

তৃতীয়জন—অর্থাৎ লুলু বিবিও অকাজের হলেন না। দেড় বছরেই তিনি মা হলেন এক কন্যাসন্তানের। ঠিক এমনি সময়ে হেকমত খাঁর একদিন মনে হল, তিনি অনেক পাপ করে ফেলেছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কোন হেতু নেই সে জন্যে। পাপ থাকলে পুণ্যও আছে। পাপী থাকলে আছে পুণ্যস্থানও। সত্বর তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত হলেন। অবশেষে একদিন পরিবারবর্গের কাছে বিদায় নিয়ে পবিত্র পুণ্যস্থান মক্কা শরীফের উদ্দেশে করলেন দেশত্যাগ। অতঃপর একদিন আবার উদ্দেশ্য হাসিল করে এক শুভলগ্নে পুনরায় তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। নিয়ে এলেন এক মহা সম্মানিত স্বর্গীয় খেতাব—হাজী! সম্বোধিত হলেন হাজী সাহেব বলে। হেকমত খাঁকে মানুষ ভুলেই গেল এক রকম।

যাহোক, তাঁর হাজীত্ব লাভের পরেই লুলু বিবির গর্ভে আর একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তারপর একটানা কতকগুলো বছর তাঁর অতিবাহিত হয় নিরবচ্ছিন্ন এক পরম শান্তির মধ্য দিয়ে। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসে তিনি হঠাৎ আবার প্রবল অশান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন—অর্থাৎ স্ত্রী লুলু বিবি নিতান্তই স্বাস্থ্যহীনা হয়ে পড়লেন। পাঁচটা বছর পর্যন্ত তাঁকে এ নিয়ে দুর্ভাবনাই করতে হল অনুক্ষণ। সর্বশেষ ষাট বছরের সীমায় পৌঁছে অকস্মাৎ একদিন তিনি পথের সন্ধান পেয়ে গেলেন। সে খবরও দেওয়া হয়েছে আগেই।

চতুর্থবার বর সাজলেন হাজী সাহেব। অবশ্য সাজা বলতে যা বোঝায় তা নয়। শুধুমাত্র সুন্নতী পোশাকটাই টেনেটুনে একটু ফিটফাট করে নিলেন। এর অধিক কিছু বাহুল্য মাত্র। প্রথম কথা, তিনি পুরনো লোক—মেয়ের বাপদের কাছে তাঁর নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, ষাট বছরের চেহারাখানই তাঁর অভিজ্ঞতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। বরযাত্রীর ভিড়ও কিছুই হল না। নেহাত দু'চারজন হিতৈষীকে সঙ্গী করে তিনি পদব্রজেই যাত্রা করলেন বিয়ে করতে। কেননা, পার্শ্ববর্তী গ্রামটি একেবারেই পার্শ্বে। সে জন্যে পালকি-বেহারার ব্যবস্থা নিতান্ত অনাবশ্যক।

তাঁর যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত গ্রামবাসীদের কাছে খবরটা প্রায় গোপনই থেকে গিয়েছিল। এবারে জানল। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনার ওপর কারুর তেমন কিছু বক্তব্য থাকল না। তবে একটা বিস্ময়কর চিন্তা প্রায় সবার মনেই উঁকি মারলো যে মাঝখানের দীর্ঘ কটা বছর সেরেফ বেহুদাই কেটে গেছে।

শুভ কাজ সুসম্পন্ন করে হাজী সাহেব ফিরে এলেন গ্রামে। নিজে হেঁটেই এলেন তিনি, নববধূকে অবশ্য সোয়ারী করে আনা হল।

এর পরের কার্যক্রমও অতি সংক্ষিপ্ত। একজন প্রতিবেশিনী এসে নঈমাকে ঘরে তুলে দিয়ে গেল।

সে তো গেল, কিন্তু হাজী সাহেবের বয়স্কা কন্যা দুটি হঠাৎ এক চরম বিপদের সম্মুখীন হল। লজ্জায় মানুষের সামনে বের হতে পারল না তারা। কিন্তু কিসের লজ্জা, তা তারা বোঝে না। বোঝে এইটুকুই যে, যে-মেয়েটি তাদের চেয়েও বয়সে ছোট হবে, কিভাবে তারা তাকে মা-রূপে গ্রহণ করবে!

অন্যদিকে তাদের জননীর মানসিক অবস্থাটা একেবারেই অজ্ঞাত। নববধূর গৃহপদার্পণের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই যে দেয়ালের দিকে মুখ করে শয্যায় পড়ে রইলেন, সারাটা দিনের মধ্যেও তার আর অন্যথা হল না। কন্যাদ্বয় বারকয়েক আহারের জন্যে পীড়াপীড়ি করেও উঠাতে পারল না তাঁকে।

রাত হল। ধীরে ধীরে তা বেড়েও চলল। সেই সঙ্গে নঈমার দোলায়মান অন্তরেও প্রকট হয়ে উঠতে থাকল শাহনজরের দৃষ্ট সেই বিকট মুখচ্ছবি।

ক্রমে চারদিক ঘিরে নেমে এল রাতের নীরবতা। হাজী সাহেব এসে নঈমার কক্ষে দেখা দিলেন। খাটের এক কোণে উপবিষ্টা নঈমা জড়োসড়ো—থরোথরো সংকুচিতা। একান্তে এগিয়ে এলেন হাজী সাহেব। পত্নীর একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন আস্তে আস্তে। কঠিন স্পর্শে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল নঈমার। বেজায় শক্ত করে রাখলো সে হাতখানাকে।

বিরত হলেন হাজী সাহেব এ প্রচেষ্টা থেকে। শুরু করলেন তিনি আত্মকাহিনী। অতীতের দাম্পত্যজীবনের নানান অসার, দুঃখময় ইতিহাস

বিবৃত করে চললেন নবীনার সমক্ষে। ঘন ঘন চোখের কিনারাও মুছে নিতে লাগলেন পাঞ্জাবীর হাতায়। কিন্তু তবুও নঈমার অন্তরের আতঙ্কের ছাপ এতটুকুও মুছল না।

অগত্যা, প্রাচীন অভিজ্ঞ বাহু প্রসারিত করে দিয়ে তিনি নঈমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে খাটের বাজুর ওপরে মস্তকটি লুটিয়ে দিল নঈমা। শশব্যস্ত, শঙ্কিত হয়ে উঠলেন হাজী সাহেব : কি ব্যাপার, কি হল, অসুস্থ লাগছে ? অসুখ করেছে ?

নঈমা নিরুত্তর। বারংবার শুধু কপালের ওপর হাত বুলোতে থাকল।

—ও, মাথা ধরেছে বুঝি ? খুব বেশী ধরেছে কি ? আচ্ছা আচ্ছা—বিশ্রাম করো তবে।

সমস্ত রাত ধরে নঈমার মাথাধরা বাড়লো বই আর কমলো না একটুও।

পরদিন দিবাভাগেও নঈমার শিরঃপীড়ার উপশম হল না কিছুমাত্র। পান-আহার করানোও তাকে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। খবরটা লুলু বিবির কানে পৌঁছল। আস্তে আস্তে বুকটা তার ভারী হয়ে উঠল। চোখ দুটো ভরে এল অশ্রুতে। নঈমাকে তিনি চোখে দেখেননি তখনো পর্যন্ত। তবু কোথা হতে যেন একখানি কচি কোমল ও অসহায় মুখচ্ছবি অত্যধিক করুণ ও বিষাদপ্রতিমার মত ভেসে উঠল তাঁর মানসপটে। ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর স্নেহময়ী জননী হৃদয়টা কোথাও তাকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যে।

পুরো তিনটি দিন নঈমার অসুস্থতা অব্যাহত থাকল। দারুণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লেন হাজী সাহেব।

চতুর্থ দিনের সকালে নঈমার নাইওর যাত্রা। যাত্রার পূর্বে লুলু বিবি এসে নঈমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। সে জানতে পারল না তা। হঠাৎ কাঁধের ওপর স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠল। লুলু বিবি মুখখানা তার টেনে তুললেন চোখের সামনে। খানিক নিরীক্ষণ করে শেষে বললেন : এবারটা না হয় মাথা ব্যথার দোহাই দিয়ে কাটালি, কিন্তু পরে কি করবি ?

বিস্ময়ে চক্ষুস্থির। কোত্থেকে সহসা যেন একরাশ পানি চোখের কোল ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল। আকুলভাবে সে মুখখানাকে লুকিয়ে ফেলল রুগ্না সতীনের বুকের মাঝে। এতখানি দরদ যে তার জন্যে এখানে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারে এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। লুলু বিবি তার মাথায়

হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : কেঁদে কি হবে, অদেষ্টে যা এনেছিস, তাই তো ভোগ করবি।

তিনি থামলেন। ভেবে নিলেন যেন কি একটা কথা। তারপর কঠিন স্বরে বললেন : বরং যদি পারিস তো নিজের কপালটা নিজের হাতে পুড়িয়ে দিস্।

বলেই নঈমাকে ঠেলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন তিনি।

নঈমা তার নিচের ঠোঁটটাকে দাঁতের নিচে সজোরে চেপে ধরে গিয়ে সোয়ারিতে উঠে বসল।

কন্যার মুখপানে তাকিয়েই মায়ের বুকটাতে যেন শেল বিদ্ধ হল একটা। বুকখানা তার হাহাকার করে উঠল। একটা জীবন্ত বিভীষিকার ছাপ ব্যতীত তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না কন্যার মধ্যে। মুখফুটে কোন একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারলেন না কন্যাকে। গোটাকতক দীর্ঘশ্বাস শুধু নিজ অন্তস্থলে সঞ্চয় করে রাখলেন।

বরং যদি পারিস তো নিজের কপালটা নিজের হাতে পুড়িয়ে দিস— সতীনের এ কথাটা যেন মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে নঈমাকে। অন্তরে তার প্রচণ্ড আলোড়ন। অতীত আর ভবিষ্যতের একটা অবিশ্রাম সংঘর্ষে মন থেকে তার বর্তমানটা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। উপেক্ষিত মসিলিপ্ত অতীতটাই দুর্জয় শক্তিতে ঘুরেফিরে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

নঈমার একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল খিড়কির পুকুরঘাট। প্রয়োজন অপ্রয়োজনে বারে বারেই এসে দাঁড়ায় সে ঘাটপাড়ে। ভয়ানক উদ্বিগ্ন মন, সতর্ক চাঞ্চল্য, সচকিত দৃষ্টি। এমনি একটা ভাব তার বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্তও ছিল। কিন্তু সেদিন আর এদিনের মধ্যে দেখা দিয়েছে পরিপূর্ণ এক বৈপরীত্য।

পিত্রালয়ের প্রথম দিনটা নঈমার এমনিভাবেই কাটল। গেল আর একটা দিন। তার পরের দিনটাও গেল।

একটু সুগভীর নৈরাশ্যের পাষাণ যেন তিলে তিলে নিষ্পেষিত করে তুলল তাকে।

চতুর্থ দিনের বিকেল বেলা নঈমা পুকুরঘাটে। বিষণ্ণ, হতাশ। সময়

কাটে তো কাটেই। এক সময় হঠাৎ ভেসে আসে একটা শব্দ। শব্দটা নঈমার পরিচিত। শুকনো পাতা মাড়িয়ে কেউ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পুকুরের ওপার থেকে। উৎসুক হয়ে উঠল নঈমা। পরক্ষণেই চোখে পড়ে তার পরিচিতজনকেই।

গ্রামের একটি যুবক। অন্যমনে এগিয়ে যাচ্ছে পুকুরের ওপার থেকে। নঈমার চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। মলিন ভাব, অর্থহীন ফাঁকা দৃষ্টি। আবার সে নিজের মতই এগিয়ে চলে।

অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে নঈমা। এমনটা সে আশা করেনি। আজ চারদিন ধরে যে জিনিস সে মনেপ্রাণে কামনা করে এসেছে, তা যে উঁকি মেরেই বিদায় নিয়ে যাবে, তার এমন পরিবর্তনের কথা নঈমার চিন্তাতেই স্থান পায়নি কখনো। চিন্তার অবকাশও ছিল না যার। আন্দোলিত হৃদয়ে ত্রস্তপদক্ষেপে সে ওপারে এগিয়ে চলল।

অভাবনীয়রূপে হঠাৎ নঈমাকে পথ আগলিয়ে দাঁড়াতে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল যুবকটি। চোখ তুলে সে বোকার মত তাকিয়ে রইল নঈমার মুখের দিকে। গত দু-তিনটি বছর ধরে যার একটুখানি প্রসন্নতা-লাভের আশায় পেছনে ছুটে ছুটে শুধু ঘৃণাই কুড়িয়ে এসেছে, সে কিনা নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে আজ তারই সম্মুখে। এ কি সত্যি, না দৃষ্টিভ্রম?

আর নঈমা? সত্যি মিথ্যে বলে দুটো বস্তুই তার কাছে আজ চরম হাস্যকর।...

তাদের পুকুরপারের এই পথটা কোন চলাচলের রাস্তা নয়। প্রতিবেশী দু-চারজন শুধু পথ-সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে থাকে এখান থেকে। সবাই তারা নঈমার পরিচিত। পরিচিত তার এ প্রতিবেশী যুবকটিও।

নাম কালা। ততোধিক কালা গায়ের রঙ। বয়সে জোয়ান। বিকৃত চেহারা। আরো বিকৃত কণ্ঠস্বর।

সে অনেক পেছনের কথা। পুকুরঘাটে গোসল করে কাপড় ছাড়ছিল নঈমা। হঠাৎ চোখ পড়ল গিয়ে ওপারে ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকা কুৎসিত চেহারা, লুব্ধদৃষ্টি কালার দিকে। ক্রোধে আর ঘৃণায় রী-রী করে ওঠে তার দেহমন। গায়ে কাপড় চেপে দ্রুত সরে যায় সে ঘাট থেকে। না জানি লোকটা এমনিভাবে কতদিন তাকে দেখে থাকবে।

নঈমা বেজায় সতর্ক হয়ে ওঠে। ঘাটের কাছে দৃষ্টি তার সজাগ হয়ে থাকে চতুর্দিকে। কালার দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারে না একদিনের তরেও। বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তার মনটা। দারুণ বিরক্তি আর ঘৃণা ছড়িয়ে ছুটে পালিয়ে আসে সে ঘাট থেকে।

এইভাবে কেটে যায় অনেকগুলো দিন।

পরে একদিন ঘটনাটা অন্যরূপ দাঁড়ালো। ঘাটের কাজ শেষ করে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে নঈমা। ঠিক সামনেই মুর্তিমান কালা। নঈমা শঙ্কিত হয়ে উঠল। কেঁপে উঠল তার সমস্ত শরীর। তবু সতেজ কণ্ঠে বলল: পথ ছাড়ো বলছি!

বিনা বাক্যব্যয়ে পথ ছেড়ে দিল কালা।

আরেকদিন কালা আরেকটু এগিয়ে এল। চট্ করে সে একখানা হাত চেপে ধরল নঈমার। স্তম্ভিত নঈমা হঠাৎ কিছু ভেবে উঠতে পারল না। তারপর এক ঝটকা টানে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতেই কালার পেটের ওপর মারলো এক সজোর ধাক্কা। সামলাতে না পেরে মাটিতেই পড়ে গেল কালা। ক্রোধে ফুলতে ফুলতে ঘরে চলে এল নঈমা।

এইভাবে আরো একদিন যখন কালা এগিয়ে এল সেদিন আর তেমন সুযোগ দিল না নঈমা। কঠিন স্বরে ধমক দিয়ে উঠল: আবার! খবরদার বলছি!...

কালা আর কাছে ঘেঁষতে পারল না সেদিন, দাঁড়িয়ে পড়ল অদূরেই। কিন্তু মুখ খুললো সে সেদিন প্রথমবারের মত: তুই অমন করিস কেন রে, নঈমা? আমি কি জুলুম করছি তোর ওপর? তোকে না দেখে থাকতে পারিনে, তাই—

—কিন্তু আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, ভাল চাও তো এখানে আর এসো না! আমি বলে দেব সবার কাছে।

রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিল নঈমা। কিন্তু এ শাসানিতে কালার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়নি। রোজই সে এসেছে। সেই কুৎসিত চেহারা, লোলুপ দৃষ্টি আর বিকৃত কণ্ঠস্বর—দিনের পর দিন পীড়া দিয়েছে নঈমাকে। তবু সবার কাছে তার কোন কিছু বলা হয়ে ওঠেনি। বলার কথা ভাবতেও তার খারাপ লাগতো। যাকে সে এতটুকুও সহ্য করতে পারে না, সে যে

এহেন অপ্রিয় উপায়ে প্রত্যহ তার সংস্পর্শে আসছে এ কথা অপরকে জানানোর চিন্তায় তার ঘৃণাই বোধ হত। তাই দু-তিনটে বছর তার সব রকম জ্বালাতন সে প্রাণপণে হজম করে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, তারই সম্মুখে আজ সে যেচে এসে দাঁড়িয়েছে।

নঈমার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা চোখের পানে বোকার মত তাকিয়ে থেকে এক সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল কালা : নঈমা! তুই ?

—হ্যাঁ, আমিই তো। কেন, এ কদিনেই কি চিনতে পারছো না যে অমন অবাক হয়ে গেলে ? জওয়াব দিল নঈমা।

কালা কেমন ইতস্তত করে বারকয়েক ঢোক গিলল, মাথা চুলকাল —তারপর বলল : না না, তা কেন—মানে ইয়ে—বলছিলাম, তুই—মানে হঠাৎ আমার কাছে—

পুরোপুরি কিছুই সে বলতে পারল না। তার ভাবভঙ্গি দেখে একটু শুকনো হাসির রেখা নঈমার ওষ্ঠে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

—হ্যাঁ, কালু ভাই, তোমার কাছেই এসেছি আমি। তুমি কি আমাকে না দেখে থাকতে পারতে না—কত না কথা বলতে চাইতে আমার সঙ্গে ?

হতচেতন কালা উত্তর করল—বোধকরি বা বোকার মতই : কিন্তু তোর না বিয়ে হয়ে গেছে—তুই তো এখন পরের বউ।

—হলোইবা, তা বলে কি কথা বলা যাবে না ?

—গেলেও তা উচিত না।

বলল কালা। তার কথায় কেমন একটা চমক লেগে যায় নঈমার। হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে তার হাজী সাহেবের পাকা চেহারার পাশা-পাশি এই অপদার্থ, অসুন্দর লোকটার চিত্র ফুটে উঠল।

—তবু আমার যে বলতেই হবে, কালু ভাই। নঈমার চোখেমুখে দৃঢ় অভিব্যক্তি।

—আমার সঙ্গে আবার কথা কি তোর ?

—না থাকলে কি আর এসেছি। কিন্তু আর এখানে তো দাঁড়ানো যায় না, কেউ দেখে ফেলবে। একটু আড়ালে এস, কালু ভাই।

এক রকম হাত ধরেই নঈমা তাকে নিয়ে গেল জঙ্গলের সম্পূর্ণ আড়ালে। কেমন একটা সম্মোহিত অবস্থায় পড়ে গেল কালা। নঈমার ঠোঁটেও জেগে

উঠেছে একটা দৃঢ়তার ছাপ। কথা আর কিছু জুগিয়ে উঠল না তার মুখে। কিন্তু কালা হেসে ফেলল একটুখানি। বলল: এখন বুঝি আর আমাকে তোর ভয় নেই, না? বিয়ে হয়ে গেছে, তাই?

—না, কালু ভাই, ভয় আমি কোনদিনই করিনি তোমাকে, আজও না। শুধু—আচ্ছা আজ থাক সে কথা।

চুপচাপ কাটতে থাকল মুহূর্তগুলো। নঈমার মনে আলোড়নের আর শেষ নেই। কি একটা বলতে উদ্যত হতেই চোখ নত হয়ে গেল হঠাৎ। ঠোঁট কেঁপে উঠল বারকয়েক।

—নঈমা!

—কি, কালু ভাই?

—তোর কাণ্ডটা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে!

আবার কয়েক পলক নীরবতা।

—কালু ভাই।

—উঁ।

—তুমি তো আমাকে ভালবাসতে, না?

কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল কালা এ প্রশ্নে। বলল: আর সে কথা কেন, নঈমা?

নঈমা যেন শুনতেই পেল না একথা। বলল: তুমি আজো আমাকে ভালবাস, কালু ভাই?

—কি পাগলামো করছিস, নঈমা!

—হোক পাগলামো, তবু উত্তর দাও আমার কথার।

—কি কথার?

—ভালবাস কি না?

—বাসলেই বা, এখন আর তাতে লাভ কি?

—লাভ আর না-ই বা কেন! কালু ভাই, তুমি ছাড়া আমার আর বাঁচার উপায় নেই—আমি যে ভালবাসি তোমাকে।

টিপ্‌টিপ্‌ করে উঠল কালার বুকের ভিতরটা। মুখে ফুটে উঠল আবার হাসি: তুই কি সত্যি পাগল হলি?

—পাগল? সেতো তোমার জন্যে! মনের কথা কি আগে জানতে পারে

সবাই? বিয়ে হতেই না বুঝলাম, তোমাকে আমি কত ভালবাসি! তাই তো পাগল হয়ে গেছি আজ!

মনের একান্ত বিরোধী কথাগুলো বলে গেল নঈমা। কালার বুকের টিপ্‌টিপ্‌ বেড়ে গেল আরো কয়েকগুণ। তাকে আরো তাজা করে তুলল নঈমা। দুখানি হাত বাড়িয়ে কালার হাত দুখানিকে চেপে ধরে তার আরো কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। কালার সমস্ত শরীরে জেগে উঠল ঘন কম্পনের দোলা। কিন্তু তবু সে বলল, সেই গোড়ার কথাই বলল আবার: তাহলেই আর কি—এখন যে তুই পরের বউ।

—হোকনা পরের বউ. পরের বউয়ের কি পরের দরকার পড়ে না? তোমাকে যে আমার বড দরকার, কালু ভাই!

কালা চিন্তিত, গম্ভীর। নঈমা আরো একটু নিবিড় হয়ে উঠল তার। বলল: বিশ্বাস করো, কালু ভাই, তিনটে দিন আমি সেরেফ অসুখের দোহাই দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি—গায়ে আমার হাত দিতে দিইনি তাকে। এ শুধু তোমার জন্যই তো!

কালা বলল: কিন্তু সত্যি কি তুই আমাকে ভালবাসিস, নঈমা?

—তাকি তুমি এখনো বুঝতে পারছো না?

—পারছি! কিন্তু—

—আবার কিন্তু কেন, কালু ভাই?

—সত্যি কি, কিন্তু নেই কোন?

—না!

—সত্যি?

—হ্যাঁ!

হঠাৎ নঈমার সবটা দেহ যেন কালার বুকের মধ্যে নিমিষে মিলিয়ে গেল। অমনিভাবেই কাটল অনেকটা সময়। তারপর আলগা হয়ে এল দুজন। আবার চলল বাক্যালাপ।

সকালবেলা সারাটা গ্রাম মুখর উঠেছে মুখরোচক খবরে: নঈমাকে নিয়ে কালু হঠাৎ কোথায় উধাও হয়েছে—অথবা নঈমা করেছে কালুর সঙ্গে কুলত্যাগ।

রসের বন্যায় ভেসে যাওয়ার মত হল গ্রামখানির অবস্থা। এরি মধ্যে নঈমার পিতা কপালে সজোর করাঘাত হেনে দুনিয়ার অভিসম্পাত বর্ষণ করে চলল কুলত্যাগিনী কন্যার উদ্দেশে।

সংবাদটা যথাসময়ে হাজী সাহেবেরও কর্ণগোচর হল। কপালে করাঘাত করে তিনিও বলে উঠলেন—ইয়া আল্লাহ, তুমিই মেহেরবান, মানীর মান তুমিই রাখনেওয়ালা! হাজার শুকুর তোমার দরগায় যে আমার এই পাক খান্দান নাপাক হবার আগেই তুমি শয়তান তফাৎ করে দিয়েছ!... ছি ছি ছি! কি শরম, কি বেইজ্জতির কথা—সমাজে আমি মুখ দেখাবো কি করে?...তওবা! তওবা! নাউজোবিল্লাহ!

প্রচুর খেদোক্তি উচ্চারণ করে তিনি উপস্থিত প্রতিবেশীদের সম্মুখেই শুভ্র শুশ্রুমণ্ডিত মুখখানাকে উঁচু করে ধরলেন।

মা

সরদার জয়েন উদ্‌দীন

ঝাঁকড়া মাথা নারিকেল গাছটার ছায়া একপায়া মেঠো পথের মত সরু হয়ে হয়ে এগিয়ে গেছে। অনেক দূরে মাথার দিকটা শতছিন্ন একটা ছাতার ছায়া হয়ে তরতর করে কাঁপছে। হয়ত উপর দিয়ে এখন বাতাস বইছে। কিন্তু নিচে যা অবস্থা তাতে মনে হয় না পৃথিবীর কোথাও একটু বাতাস আছে। চিমসে গুমোট গরম। গা দিয়ে তাপ বেরুচ্ছে। চৈত্র মাস প্রায় অর্ধেক হয়ে এল, এ সময় এ রকম হয়-ই।

যারা ছায়ায় থাকে, পাখার বাতাস খায়, তারা ছাড়া আর কেউ এ নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবে না। কিন্তু কালুর কাছে এটা একটা বেশ লোভনীয় সময়। সারা বছর ও তাকিয়ে থাকে গরমের এই কয়টি দিনের জন্যে। এ সময় তাপে তেতে গা দিয়ে সহজে ঘাম বেরিয়ে আসে। আর সহজেই মুখ চোখের অবস্থা বেশ ব্যথাকাতর ও করুণ করে তোলে। তাতে পথিকজনের দয়া উদ্রেক করতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় না। দু'বার মুখ বিকৃত করে একটা বেদনার্তস্বরে হাত বাড়ালেই তাতে টুপটাপ দুটো একটা পয়সা পড়ে যায়। কিন্তু আজ গরমটা যেন আর সব দিনের চেয়ে খুবই বেশী। তাই কালু মাঝে মাঝে প্রায়ই ঐ ছায়াটুকুর দিকে লোভনীয় দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল। ভাবছিল, পাছাটা ছেঁচড়ে টেনে ওদিকে একটু সরে যাবে কিনা। কিন্তু সময়টা যে রমজান মাস, তায় চৈতি দুপুর। কাজেই ছায়ার লোভে গায়ের ঘাম শুকানো ঠিক হবে না ভেবে সেখানেই আরও গোঁজ হয়ে বসে কালু। মানুষ আসছে দেখলেই তার অকেজো চোখটা, যেটা ফকির-ব্যবসায়ী চান মিয়া তপ্ত লোহা দিয়ে গালিয়ে দিয়েছিল, কাত করে সামনে এগিয়ে ধরে। সামনের পথে মেলে রাখা শুকনো পা-টা নাড়ে আর অদ্ভুত কায়দা করে 'হু আল্লাহু' বলে বিকৃত শব্দ করে। টুপটাপ দুই একটা পয়সা এসে যায় টিনের থালিখানায়।

সময়ে যখন রাস্তায় পথিক বেশী থাকে না, তখন ডান দিকের ভাল চোখটায় শিকারীর দৃষ্টি নিয়ে কালু তাকায়। নিশানা এগুতে এগুতে একেবারে শাখারী বাজারের মোড় তক গিয়ে পৌঁছায়। লক্ষ্য করে, আর কে কে এ সীমানায় ঢুকে কালুর কাজে বাধা সৃষ্টি করছে, কিংবা কোন ভাল লোক এদিকে আসছে কি না। লোক দেখলেই টের পায় কালু। একলা হোক আর অজস্র জনতায় মিশে থাক, পলকে তার শিকারী চোখে পথিকের মুখ থেকে হৃদয় তক দেখে নেয়। তারপর মুহূর্তে সাপ যেমন ফণা টেনে নেয় তেমনি ডান চোখটা টেনে নিয়ে অকেজো বাম চোখটা মেলে ধরে। খোঁড়া পা টা কাঁপিয়ে মুখে সেই অদ্ভুত 'হু আল্লাহ্' শব্দ তোলে।

আগের দিনে বাসায় ফিরে গল্প বলতো, কার সাধ্য পয়সা না দিয়ে পাশ কাটায়। আজকাল কিন্তু প্রায়ই বলে, লোকজন সব কসাই হইছে।

কোর্টের ঠিক পিছনে, এই নারকেল গাছটার এপাশ-ওপাশ বিশ বিশ হাত জায়গা জুড়ে কালুর সীমানা। এর মধ্যে কারো প্রবেশাধিকার নেই। গোলমাল এ নিয়ে অনেক হয়েছে। একটা পা খোঁড়া হলেও অসুরের তাকত কালুর শরীরে। হাত দুখানা দৈত্যের হাতের মত। ওর কবজায় পড়লে জানে বাঁচার সাধ্য কারো নেই।

"গায়ে দানবের তাকত বলে কি দু'নের রাজত্বটাই তার। কথা শুনে আহ্লাদে আর বাঁচিনা," বলেছিল একদিন ছোনেকা। কালু অমনি হাতের কাছের আস্ত ইটটা তুলে ছোনেকার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল। 'ভাগ বদমাস, জান খারাপ করে দেব, ফের লাগবিতো।' অল্পের জন্যে ছোনেকার পা-টা ভাঙ্গেনি; একটু থেঁতলে গিয়েছিল। ছোনেকাও কম যায় না, লাফিয়ে গিয়ে নিজের সীমানায় দাঁড়িয়ে সাধ মিটিয়ে গালি দিয়েছিল। তারপর আপোষ হয়েছিল, ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে ওখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, এক জায়গায় বসে ভিক্ষে করতে পারবে না। সেই থেকে এ এলাকা কালুর।

মফঃস্বল এলাকা থেকে যত লোক মামলা-মোকদ্দমায় শহরে আসে তাদের প্রায় সকলকেই এ পথে যাতায়াত করতে হয়। তাই কালুর এ দুর্ভিক্ষের দিনেও দু'পয়সা হয়। কিন্তু আবার বা-হাঁটুর ঘা-টা শুকিয়ে এল। আবার গাছ-গাছড়ার জাব বাঁধা, আবার জ্বলুনি-পুড়ুনি। বার বার

এত আর এখন সয় না। কিন্তু ঘা-টা দগদগে লালা-ঝরা না থাকলে শুধু খোঁড়া একটা পা আর গলা একটা চোখ অমন শরীরে মানায় না। তার আবার ভিক্ষে। কথাটা প্রথমবার জাব বাঁধবার সময় বলেছিল চান মিয়া, সেই কলকাতার বুদ্ধু ওস্তাগার লেনে থাকার সময়। কালু এখন ভাবে, চান মিয়া ঠিকই বলেছিল। তাই ঘা-টা একটু শুকিয়ে এলেই কি কি সব গাছের পাতায় চুন লাগিয়ে জাব বাঁধে কালু। দু'দিন জ্বলুনি-পুড়ুনি, তৃতীয় দিনে খোল, মাছি-পড়া পচা দগদগে ঘা। কুষ্ঠটা শুকায় না তাই দু'পয়সা পাবার পক্ষে ভাল। কালু একবার ভেবেছিল ও কথাটা। কিন্তু আঙ্গুলগুলি এক এক করে খুলে খুলে পড়ে। মানুষ নাকি বাঁচেনা শেষতক, তাই ওটা আর বানাতে সাহস করেনি সে।

যেদিন ঘা-টা শুকিয়ে আসে, ভিক্ষেও তেমন পায় না, সেদিন আস্তানায় ফিরে ফতেজানকে নিয়ে পড়ে: 'আন্ দেখি কত পালি!'

কথার ভাব দেখেই ফতেজান টের পায়, ওর আত্মা শুকায়, মনে মনে বলে, আজ মিনষে লাগবে পিছনে। ফতেজান কথা না বলে আঁচলের গিঁট খুলে কালুর সামনে ঝেড়ে দেয়। ঝনঝন করে কয়টি দু'পয়সা আর কতকগুলো ফুটো পয়সা ছিটকে পড়ে।

কালু বলে, 'হু। বেগ কতো! দেখি ও আঁচলা।' সে আঁচল খুলে মেলে ধরে ফতেজান, সিকিটাক পচা খোরমুজা।

'দে খাই।' খেতে খেতে বলল কালু, 'পয়সা-টয়সা আজকাল যে তোর মিলেই না, ব্যাপারখানা কি?' আবার আপন মনেই বলে, 'মিলবে কি। আজতক একটা বাচ্চা বিয়োতে পারলি না, আজকাল বাচ্চা ছাড়া কামাই নেই।'

রাগলে কালুর ঐ এক কথা, 'বাচ্চা বিয়োতে পারলি না।' সে আফসোস কি ফতেজানেরই কম। কাঠি কাঠি হাত-পা, পেটটা ইয়া মোটা ছোনেকার লেড়কার মত একটা লেড়কা যদি থাকতো ফতেজানের তাহলে সে কারো পরোয়া করতো না। সেটা অভুক্ত আছে বলে নানাজনকে দেখিয়ে অনায়াসে ফতেজান দু'পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু তা হয় কৈ? হয় না সে দোষ ফতেজানেরই হবে। কালু তো মরদ কম নয়, যার সাথে ফতেজান প্রায় বারোটি বছর ঘর করছে। তাই কালু ও কথা বললে ফতেজান

জবাব খুঁজে পায় না। বরং মনে মনে অনুতপ্ত হয়। অনেক সময় কাঁদে। কিন্তু ওর নিজেরই বা দোষ কত, দোষ ওর অদৃষ্টের। না হলে হয় না কেন? তাই আজ কালু গালাগালি দিতেই আর সকলের সাথে যেমন মুখে মুখে লড়ে তেমনি মুখে লড়াই নিয়ে তেড়ে উঠল ফতেজান, 'অসুরের যদি আমায় দিয়ে না চলে তবে আর একটা জুটায়া নিক!'

'তবেরে' বলেই কালু বোগল তলার লাঠি তুলে অমনি পিঠের উপর দড়াম করে বসিয়ে দিল দু' ঘা। ফতেজান চীৎকার দিয়ে ছাউনীর নিচে থেকে বেরিয়ে গেল মুখে মুখে কালুকে চিল-শকুনের মুখে উৎসর্গ করতে করতে। কালু এবার থামল, বৃথা খিস্তি-খেউড় করে লাভ কি হবে। কিন্তু ফতেজান কিছুতেই থামতে পারছে না। ওর অভ্যাসটাই এই। একবার রাগলে আর সহসা স্থির হতে পারে না। তাই একা একাই বক্ বক্ করে চলেছে, পুরানো কাসুন্দি ঘাটছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কালুর বাপ-মা চৌদ্দগোষ্ঠী তুলে গালিগালাজ করছে। না, আর ধৈর্য রাখা যায় না, এর মধ্যে বাপ-মা আসে কেন? বাপ-মাকে কালু কোনদিন চোখে দেখেনি, দেখলেও মনে নেই। কোন্ ছোটবেলায় দক্ষিণ কলকাতার ওদিক থেকে চান মিয়া তার মার কোল খালি করে কালুকে নিয়ে এসেছিল। সেই নিষ্পাপ বাপ-মা, তাদের কথা বলে গালি! কালু শুয়ে শুয়েই বলল: 'এই, এই। বজ্জাতী থামলি না?'

'বজ্জাতী তোর মা, ফুফু, তোর চৌদ্দগোষ্ঠী।'

'তবেরে ঢেমনি,' বলেই কালু হাতে ভর করে ডেকে ডেকে পাঁয়তারা কষলেও এক পশলা বৃষ্টির বেশী কিছু হল না। কোথা থেকে বাউলী বাতাস এসে কোথাকার মেঘ কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। পলকে আকাশ ভরা রেশমী চুড়ির চুমকীর মত হাজার তারা ফুটে উঠল। তাই রাত্রিটা বেশ শান্ত। ঝিরঝিরে বাতাসে আমেজী ঠাণ্ডা। ছেঁড়া চট আর চাটাই ঘেরা ঘরের কথা ভাবছিল কালু। ঝড় এলে কোথায় উড়ে যাবে এসব। কিন্তু এ ভাবনা মন থেকে না মুছতেই চোখ ভরে গভীর ঘুম এসে গেল।

তখন অনেক রাত। কালুর পায়ের প্রায় পাশে বসে বসে চিন্তার সূতোয় নিজের অদৃষ্টকে দোলাচ্ছিল ফতেজান। দু'মুঠো ভাত, একটু সুখের আশায় কি-না করলো তারা। কিন্তু কৈ, না নিজের না ঐ মানুষটার জীবনে এক

তিল সুখ-শান্তি হল কোনদিন। বুকের মধ্যে যে দুঃখে-ঝলসানো হৃদয়টা সেটা পর্যন্ত আবেগে ঘেমে উঠছিল। কোন এক মুহূর্তে কালুর পায়ের উপর হাত রাখল ফতেজান। পা-টা যে শুকনো তা এতক্ষণে খেয়াল হল তার। কালুর শুকনো পা-টায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে আদর জানাতে লাগল ফতেজান। এ পরশে কখন যেন কালুর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, বড় আরাম লাগছে, তাই কোন কথা বলছিল না ও। কিন্তু এই আরামের নীরবতা অধিক সময় ভোগ করতে পারল না কালু: কেমন যেন লাগছে নিজের মনের মধ্যে। আহা বেচারী; আমার বলতে দুনিয়ায় কেউ নেই। আজ দশ বারোটা বছর সুখে দুঃখে ছায়ার মত কালুর পিছনে পিছনে ঘুরছে, কিসের মায়ায় তা কে জানে। তা ছাড়া ও না হলে চান মিয়ার বুদ্ধ, ওস্তাগার লেনের জেল থেকে হয়ত কালু কোনদিনই মুক্তি পেত না। সারাজীবন সেই বদ্ধ গুমোট ঘরে খেয়ে না খেয়ে কাটিয়ে দিতে হত। এটুকু ভাবতেই কালু হাতে ভর করে উঠে বসল, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে ফতেজানকে কোলের ভিতর গুঁজে নিল। 'কেন তুই রাত জেগে জেগে বসে আছিস, ঘুমাবি না?'

ফতেজান কোন কথাই বলতে পারল না, কেবল দু'চোখের পানি গড়িয়ে কালুর প্রকাণ্ড লোমশ বুকখানা ভাসিয়ে দিতে লাগল। কালু ওর চিবুক ধরে আদর করে বলল, 'কাঁদিস না, কাঁদিস না মিছের মা।'

ঐ নামে সবাই ওকে ডাকতো, বাচ্চা নাই তার 'মিছের মা'। কালুও অনেক সময় ডাকে, ডাকলে ফতেজান খুশী হয়। তোকে একটা বাচ্চা আমি এনে দেব, তা যেমন করেই হোক।

এ কথায় ফতেজান একেবারে যেন গলে গেল। বলল, 'সত্যি সত্যি আমি একটা বাচ্চা পাব? তাহলে দেখব কেমন ঐ ছোনেকা আমার চাইতে বেশী আনে। তাছাড়া তোমাকেও আর জাব বেঁধে হাঁটুতে ঘা বানাতে হবে না। আমার একার কামাইতেই দিন চলে যাবে।'

'তাই হবি মিছের মা, তুই কাল সকালে আমার বোগল তলার লাঠিখানা সারায়া আনবি। আমরা আর এখানে থাকছি না। চলে যাব এমন জাগায় যেখানে কেউ আমাগরে চেনেনা, বুঝলি? তারপর...।'

'তারপর কি?' ফতেজান কালুর বুক থেকে মাথাটা উচু করে তুলে জিজ্ঞেস করে।

'সে সব কথা এখন থাক, তুই ঘুমা,' বলেই কালু দু'বাহু দিয়ে ফতেজানকে বুকের সাথে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল।

পরের দিন সত্যি সত্যি এ আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল কালু। যা কিছু সামগ্রী নেওয়া যায়, একেবারে যা না হলে চলেই না, যেমন পানি খাওয়ার দুধের টিন, ভাত খাওয়ার মাটির সানকি, ভিক্ষে করার ডালডা টিন, এসব পোটলা করে বেঁধে নিল ফতেজান, গায় দেওয়া কাঁথাখানা ঝোলা করে পিঠে ঝুলাল কালু। তারপর বোগলে লাঠি চেপে ট্যাঙস মেরে মেরে আজব ধরনে হাঁটতে শুরু করল সে। পিছনে পড়ে রইল দু'তিন বছর ধরে কত চেষ্টা কত যত্নে গড়ে তোলা সংসার—ক'টা ভাঙ্গা ইট, ছেঁড়া চাটাই, পুরানো তরজা আরও কত কী। যে সব সংগ্রহ নিয়ে ফতেজান কত জনের সাথে কতদিন লড়াই করেছে। একখানি কঞ্চি কি বাঁশের ভাঙ্গা বাখারী হয়ত তিন মাইল দূর পথ থেকে বয়ে এনেছে ফতেজান ভাঙ্গা বেড়াটায় তালি দেবে বলে।

'বলি ও ছোনেকা, কাল সন্ধ্যায় এটা কোটে আনলাম, বাহারের কোটেটা। গোলগাল সুন্দর দেখতি। ধুয়ে নিলি পানি খাওয়া যায় বেশ। এইখানে থোলাম, নিল কোন নির্বংশী।'

'অমন করে গাল দিও না মিছের মা,' ছোনেকা বুকের ব্যথায় গর্জে উঠল। তার একরত্তি বাচ্চা তাকে নিয়ে সকলের চোখ টাটায়।

ব্যস, লাগলো আগুন। এ আগুন দাউ দাউ করে জ্বলবে হয়ত দু'তিন দিন পর্যন্ত। সে সব কথা মনে হল ফতেজানের। সে সবই পড়ে রইল পিছনে। তাই বার বার তাকিয়ে দেখল পেছনে ফেলে আসা ঘরবাড়ী জিনিসপত্র। ঝগড়ার সাথী ছোনেকা, মায়মনা, মশার মা আরও সব যারা ছিল। একবার মনে হল পেছন থেকে সটকে পড়ে সে। যাদের ফেলে এল তাদের জন্যে মনটা কেমন করছে। কিন্তু মনে এ ভাবনা ভাবলেও পা দুটো তার ঠিক কালুর পিছন পিছন সমান তালেই এগিয়ে যাচ্ছে, একটুও থামছে না। কি জানি এ কিসের টান, কালুর ঐ পাষাণ হাতের দমকা কিল, চড়চাপড়, লাথি, কত গালি উপেক্ষা করে এ টান ফতেজানকে আজ দশ বারো বছর ধরে একইভাবে টানছে।

ফতেজানকে স্টেশনের পিছনে ভিক্ষেয় বসিয়ে রেখে কালু সারাটা দিন ধরে কেবলি ঘুরে বেড়ায়, পই পই করে ঘুরে বেড়ায় এ রাস্তা সে রাস্তা, চেনা-অচেনা কত কানাগলি ধরে ভোর পাঁচটা থেকে রাত নটা তক কালু পাহারা দিয়ে বেড়ায় যেন। তার ভাল চোখের দৃষ্টিটা স্টীমারের সার্চ লাইটের মত ঘোরায় পছন্দমাফিক একটা শিশু পাওয়া যায় কিনা। জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই কালুর। শুধু ফতেজানকে একটা শিশু জুটিয়ে দিতে পারলে, সে নিজে একটু শান্তিতে অন্ততঃ এক বেলা ঢুটো ভাত মুখে দিতে পারবে। তাই হন্যে হয়ে ঘুরে ফেরে কালু। চাটগাঁর উঁচু নিচু রাস্তায় চলতে চলতে হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু না, কোথাও কায়দা মত একটা শিশু পাওয়া যায় না। কোনটা হয়ত ফুটফুটে সুন্দর, কোনটা হয় ত বড্ড নাদুস-নুদুস, কোনটা হয়ত বড় হয়ে যায় একটু। তু'একটা পছন্দ মত পাওয়া গেলেও কালু যদি হাত ইশারা দিয়ে ডাকে, একটা শিশুও আসে না। কালুকে দেখে ভয়েই সব পালিয়ে যায়। সারাদিন শেষে সন্ধ্যার আঁধারে ঝিমুতে ঝিমুতে ফিরে আসে কালু। বলে, 'না মিছেব মা, আজকেও কিছু করতে পারলাম না। চান মিয়া ফকির বলতো, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে একটা ছেলে তুলে আনতে পারি আমি। সত্যি সে পারতো, এক তুই করে কলকাতার বুদ্ধু ওস্তাগার লেনের সেই ঘরটা ভরে তুলতো, তারপর কোথায় যেন দিত চালান করে, বড় চালাক ছিল লোকটা, তার কাছে মানুষ হলাম অথচ তার একটু গুণও পালাম না।'

ফতেজানের আড়ষ্ট ভাবটা কাটে। দূরে কালুকে আসতে দেখলেই তার হৃদয়টার ধড়ফড়ানি কেমন বেড়ে যেত। মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠত। হয়ত সে কোন মায়ের সর্বনাশ করে ফিরে আসছে। ফতেজানের কানে সে মায়ের আকুল কান্না উদাম হয়ে উঠত। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, না, কালুর পেছনের ঝোলার মধ্যে কিছু নেই। তাই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, স্বস্তি অনুভব করে। কালুকে বলে, 'না পারলে চল ঢাকায় ফিরে যাই। যেমন করে দিন আগে চলছিল, তেমন করেই না হয় চলবি। কাম নাই আমার ছেলে দিয়ে।' ফতেজানের বিশ্বাস, কোন মায়ের কোল খালি করে অভিশাপ কুড়িয়ে লাভ হয় না। বরং ভোগান্তি অনেক। কিন্তু সে কথা সে কালুর মুখের ওপর বলারও সাহস পায় না। কি জানি

যদি অসুরটা ক্ষেপে যায়, তাহলে তার আর নিস্তার থাকবে না। তাই কৌশলে ওকে নিরস্ত করতে চায়।

কিন্তু কালু বলে, 'না, যেমন করেই হোক একটা বাচ্চা আমি আনবই। তুই ঘাবড়াস না।' এ কথায় ফতেজানের মুখ শুকায়, মন আরও ঘাবড়ায়।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বিচিত্র জায়গা। কত হাজার লোক সমাবেশ হয়। কত দেশ থেকে কত লোক আসে, কত দেশে চলে যায়। কতজনে পুত্র পরিজন নিয়ে তীর্থযাত্রীর মত বেহুঁশ হয়ে পড়ে ঘুমায়। তারপর কখন সব গুছিয়ে গাছিয়ে জায়গা খালি করে চলে যায়। সে জায়গাটা শূন্য খাঁ খাঁ করে। আবার পলকে সরগরম। কোথা থেকে লোকজন এসে ভরে গেছে। কালু ভাবল, এখান থেকে চট করে একটা নিয়ে সটকান দিলে মন্দ হয় না। ঘুমন্ত মায়ের কোল থেকে ঝোলায় কিংবা কাঁধে তুলে যে কোন গাড়ীতে উঠে চলে যাও।

কালু সারারাত ওৎ পেতে থাকল, কিন্তু কোন কাযদাই হল না। একদল ঘুমায় তো আর একদল জেগে বসে কথা কয়। সারারাত কালু দু' চোখের পাতা এক করল না। ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে রইল, কিন্তু ফল কিছুই হল না। ভোরের গাড়ী ভোঁ বাজিয়ে এসে দাঁড়াল যথারীতি।

কালু ফতেজানের কানে কানে বলল, 'দেখ মিছের মা, এক কাম করলে তুই পারিস। চুপ করে শুয়ে থাকবি, তারপর রাত যখন একটু নিঝুম মারে, লোকজন যখন ঘুমে বিভোর হয় তখন গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে কাছ ঘেঁষে শুবি। তারপর—তারপর বুঝলি।' কালু বুঝিয়ে দেয়, 'বাচ্চাটা বুকের সাথে ধরে এক পলকে হাওয়া, পরের স্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধরব।'

শিউরে ওঠে ফতেজান, মনে মনে বলে, 'না, না, আমি এসব পারবো না। আমার পরাণডায় কেমন লাগে। বুকটা কেমন ধড়ফড়ায়।' প্রকাশ্যে কিন্তু কোন কথাই বলে না, ঘাড়টা নিচু করে গুম হয়ে থাকে।

কালু আবার বলে, 'বুঝতে পারছিস। আমি এই ঠিক এইখানে বসে বসে তোর অপেক্ষা করব। তোর দিকে নজর রাখব। ভয় পাবার কিছু নেই।'

এ কথা শুনে ফতেজান আরও ঘাবড়ে গেল, মিনষে আবার চেয়ে থাকবে। আগে ভেবেছিল, কোন মতে কাছে শুয়ে থেকে সকালে এসে

বলবে, খুব চেষ্টা করলাম, তা পারলাম না। এখন দেখল, শিকরেটা ওর উপর নজর রাখবে। এক পা এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। একটু ফাঁকি দেবার যো নেই। তা হলে পিঠের ছাউনি খুলে ফেলবে পাষাণটা। তাই মনে মনে ভাবতে লাগল, কি করে সে বাচ্চাটা চুরি করতে পারবে। আর চুরি করাব পর কি করবে। মনে একটু তাকত এনে ফতেজান বলল, 'আমি কিন্তু এনেই তোমার কাছে দেব।'

'সে দেখা যাবে'খন। এখন থাম,' বলল কালু।

আজ আর সন্ধ্যার পরই শুল না ওরা। এদিক-ওদিক পায়চারী করে ফিরল ফতেজান, কালু ঠিক তার পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা দখল করে বসে রইল।

রাত দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। কালু লাঠিতে ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে আগে আগে আর মাঝে মাঝে তাকাদা দিচ্ছে ফতেজানকে, 'পা চালায়া আসতে পারিস না? পাহাড়তলী যায়া ভোর গাড়ীটা ধরবো।' ফতেজান কেন যেন মোটেই হাঁটতে পারছে না, গাটা কেমন কাঁপছে। পায়ের পাতায় ভর করে শরীরটাকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছে না। বুকের সাথে থলথলে শিশুটাকে দু'হাতে আগলে ধরে ফতেজান কোন রকমে পথ এগুচ্ছে। শিশুটির স্পর্শে ফতেজানের বুকটা কেমন নরম নরম লাগছে। তার বুকে যদি দুধ থাকত তাহলে সে এক্ষুণি ঘুমন্ত বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিত। মাঝপথে রাস্তায় একটা আলো। কালু চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। না, ওটা মিউনিসিপ্যালিটির কেরাসিন বাতি একটা খুঁটির মাথায় জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে বাতিটার কাছে দাঁড়াল কালু। ফতেজান এলেই বলল, 'দেখিতো কেমনরে।' গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'না ভারী নাদুস-নুদুস। না খাইয়ে রাখতে হবে অনেকদিন, তারপর একটা হাত মুচড়িয়ে ভেঙ্গে নিলেই চলবে। একটা চোখ গালিয়ে নিলে আরও ভাল হয়।'

ফতেজান হাঁ না কিছুই বলতে পারল না, কেবল ওর নিঃশ্বাস কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কালু তার চোখটা একটু বুজে জন্তুর মত হেসে উঠল। সে হাসিতে ফতেজানের যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। অসুরটা কি এখনি হাতটা মুচড়িয়ে চোখটা তুলে নেবে এই দুধের বাচ্চার। ফতেজান মাথা তুলে ওর দিকে চাইতে পারল না।

কালু তখনও হাসছে। সেই বীভৎস হাসি যেন আপাদমস্তক চাবুক মেরে

ফতেজানকে একটা নতুন চেতনায় জাগিয়ে দিল। কালু তো মানুষ নয়। দয়ামায়াহীন জন্তু একটা।

কালুর সঙ্গে গত দশ বছরের জীবন অসহ্য ক্লান্তিকর মনে হল ফতেজানের। অনেক অত্যাচার সে করেছে। তবু রাতের নির্জন প্রহরে কালুর বলিষ্ঠ স্পর্শে তার মনের কিছুটা উত্তাপও খুঁজে পেয়েছে ফতেজান। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনে হল একটা জন্তু তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে বারো বছর ধরে।

ফতেজানের ভাবান্তর লক্ষ্য করেনি কালু। নিজের খুশীতে যে সে তখনো হাসছে, হেসেই চলেছে। ক্ষুধার্ত জন্তু যেন রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে।

নিদারুণ ভয়ে শিশুটিকে বুকের ওপর নিবিড় করে চেপে ধরে ফতেজান। তারপর হঠাৎ একদিকে ছুটতে আরম্ভ করে দেয়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে ভয়ার্ত জননী, বুকে তার বিপন্ন সন্তান।

দুঃখে যাদের জীবন গড়া

শোএব আহমদ

জনবহুল মহানগরীর ছোট-বড় কতকগুলো রাস্তার এক সংযোগস্থল। ওদিকের বড় রাস্তাটার বুকের উপর দিয়ে একটা ট্রাম লাইন কিছু দূর এসে এক জায়গায় বেঁকে পুলের উপর দিয়ে সোজা এসপ্ল্যানেডের দিকে চলে গেছে। এদিক থেকে আর একটা ট্রাম লাইন আবার তারি সাথে এসে মিশে গেছে। ট্রাম লাইন দুটো যেখানে এসে এক হয়ে গেছে তার কিছু দূরে বাঁ হাতে ফুটপাথের উপর একটা সেড। তার নীচে বসে একটা লোক সাময়িক পত্রিকা আর দৈনিক খবরের কাগজ বিক্রি করছে। তার সামনে দু'দিকের ফুটপাথ ঘেঁসে ট্রাম-বাসের জন্য অপেক্ষমান জনতার ভীড়। পিছনে গোটাকয়েক পান-বিড়ির দোকান আর একটা হোটেল। ওদিকের ফুটপাথের উপর বসে কতকগুলো অল্পবয়সী ছেলে মনোহারী জিনিস বিক্রি করছে। তার হাত পাঁচ-ছয় দূরে ফুটপাথের গা ঘেঁসে কাঠের একটা ঠেলাগাড়ী দাঁড় করানো। তার উপরে হরেক রকমের খেলনা স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। গ্যাসপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ীর মালিক—রহিম। খালি পা। পরনে ছেঁড়া-ময়লা পাঞ্জাবী-পাজামা। লম্বা লম্বা মাথার চুলগুলো রুক্ষ-উস্ক-খুস্ক। কাঁধের উপর দিয়ে কোণাকুণিভাবে ঝোলানো ছেঁড়া একটা চামড়ার ব্যাগ। বাঁ হাতে বাঁদিকের কানটা ঢেকে ডান হাতখানা দুলিয়ে দুলিয়ে সে অনর্গল বলে চলেছে: যা লেবে লাও ছে আনা—মেকারয়ালা ছে আনা—হাঁতী-ঘোড়া ছে আনা—সুবিস্তাওয়ালা ছে আনা। কে শুনছে, কে শুনছে না সেদিকে তার কিছু-মাত্রও খেয়াল নেই। আপন মনেই সে বলে চলেছে। মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে—তবুও বিরাম নেই। অকস্মাৎ রহিমের হাত দোলান বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল তার ছন্দবদ্ধ বুলি। মুখের মধ্যে জমা থুথুর রাশি ফচ্ করে ফেলে দিয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল। দু'হাত এবং পাছায় ভর দিয়ে একটা লোক কোনমতে পথ বেয়ে বেয়ে আসছে।

পংগু পা দুটো সামনের দিকে প্রসারিত। ছেঁড়া লুঙ্গিখানা গুটিয়ে ছোট করে পরা। গায়ে নানা রংয়ের—নানা রকমের বহু তালিসংযুক্ত ময়লা একটা শার্ট। মাথায় একটা তুর্কী টুপী। উপুড করা দু'হাতের তালুতে তার দুটি খড়ম। সম্ভবতঃ পথের আবর্জনার হাত থেকে হাত দু'টিকে বাঁচাবার জন্যই। লোকটির পিছনে পিছনে আসছে আপাদমস্তক ঢাকা—এক নারী। কোলে তার ছোট একটি ছেলে। ডান হাতে তোবড়ানো এলুমিনিয়ামের একটা পাত্র। পুরুষটি করুণ কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে (গান কি কান্না বোঝবার উপায় নেই), আর মাঝে মাঝে ডান হাতখানা কপালে এনে ঠেকাচ্ছে। রহিম তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর মুখ নীচু করে সে ব্যাগ থেকে একটা দু'আনি বের করে এলু-মিনিয়ামের পাত্রটার মধ্যে ঠক করে ফেলে দিল। —জীও বেটা, জীও! বাঁচকে রহো বেটা! খোদা তেরা জান মাল আচ্ছা রাখে। বোরখার ভিতর থেকে কৃতজ্ঞ নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হল। নিঃশ্বাস ফেলে রহিম আপন মনেই বল্লে: নসীব, নসীব! সব কুছ তেরী শান, খোদা। একটা পানের দোকান থেকে দোদুল্যমান একটা জ্বলন্ত দড়ির অগ্নিসংযোগে কানের পাশে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা ধরিয়ে লম্বা একটা টান মেরে নাকে মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সহকর্মী ভুল্লুয়াকে প্রশ্ন করল রহিম: কেয়া খবর, ভুল্লু ভেইয়া। ঠোঁট উল্টে ভুল্লু মিয়া উত্তর দিল: বহু—ৎ খাবাব। বাজার একদম ঠাণ্ডা। হঠাৎ রহিম কি জানি কেন চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে শশব্যস্তে বলে উঠল: সামালকে ভুল্লু ভেইয়া! শালা হাওলাদার লোগ আতা হ্যায়। সংগে সংগেই সে গাড়ীখানা ঘুরিয়ে ত্রস্তে পাশের একটা সরু গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভুল্লু মিয়াও রহিমের পথ অনুসরণ করল। মিনিট পনের পর রাস্তার উপর গাড়ীখানা যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে সে আগের মতই দুলে দুলে বলে চলেছে: সুবিস্তাওয়ালা ফিন আগিয়া--যা লেবে লাও ছে আনা---

রহিম যখন ঘরে ফিরে এল তখন অলিতে গলিতে মানুষের ছায়া পর্যন্তও দেখা যাচ্ছে না। সদর রাস্তাগুলোও প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। শেষ ট্রামখানা অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রহিম ডাকল—কলমী!

ভেইয়া! ঘরের ভিতর থেকে জ্বলন্ত কেরোসিনের ল্যাম্প হাতে আট-ন'

বছরের ফুটফুটে মেয়ে কলমী বেরিয়ে এল। মুখ ভার করে অনুযোগের সুরে সে বল্লে: এতনা রাত হোগিয়া—তবভি তুম ঘরমে লউটতা নহি। হামকো রাত বহুত ডর লাগতা।—আরে পাগলি! কলমীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রহিম বল্লে: ডর কেয়া? কিস্‌কা ডর?—নেহি ভেইয়া! ঠোঁট ফুলিয়ে কলমী বল্লে: ডর লাগতা হ্যায়। কালসে তুমকো জলদি জলদি ফিরনাই চাহিয়ে। নেহিতো... —নেহিতো কেয়া? বাধা দিয়ে রহিম প্রশ্ন করল।—নেহিতো রোটি পাক্কেগা নেহী। দালভি। রহিম সশব্দে হেসে উঠে বল্লে: আরে বাপ! তবতো জলদি ফিরনাই হ্যায়। বহুৎ আচ্ছা। কালসে হাম সামকো আগে আগে লেউটেঙ্গে। হাঁ রোটি খা লিয়া?

—নেহি। তুমহারা সাথ সাথ খায়েঙ্গে, ভেইয়া!

খাওয়া-দাওয়ার কাজ সারতে রাত প্রায় বারোটা বেজে গেল। কলমীকে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে রহিম বল্লে: আব্ তুম নিঁদ যাও। রহিমের গলাটা জড়িয়ে ধরে কলমী বল্লে: একঠো গানা গাওনা, ভেইয়া! ওহি গানা—খানকা বিবি মোটি—এহি গানা তুমহারা ইতনা আচ্ছা লাগতা? হেসে রহিম বল্লে: বহুৎ আচ্ছা। পরক্ষণেই সে আরম্ভ করল—

খানকা বিবি মোটি
খায় চানাচুর রোটি
বাবু আয়া খেল্‌কে—
রোটি পাকায়া বেলকে—
এক সের মোরগা দো সের ঘি—
উঠরে বাবু সুরুয়া পী—

শুনতে শুনতে কলমী কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার গলা থেকে পা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিয়ে মশারীটা ফেলে তার চারপাশ ভাল করে গুঁজে দিয়ে রহিম খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল। সমস্ত বস্তী-পল্লী যেন সীমাহীন নৈঃশব্দের মাঝে আত্মগোপন করেছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার ভিতর গ্যাসের আলোগুলো অস্পষ্টতায় মিটমিট করছে। মেঘমুক্ত নীলাকাশে অসংখ্য তারার দীপালী। রহিম অনেকক্ষণ ধরে সেই দিকে অপলকে চেয়ে রইল। তারপর কোন এক সময় সে জানালা বন্ধ করে সরে এল।

রহিম। ফেরিওয়ালা রহিম। আজ এ ছাড়া তার কীইবা পরিচয় আছে আর। স্বজন-বান্ধববিহীন সে, দুনিয়ার একমাত্র অবলম্বন ছোট বোন কলমীকে বুকে করে সংঘাত-সংকুল সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল আট বছর আগে। কাণ্ডারীবিহীন তরী আর স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের পানে। প্রতি মুহূর্ত ছিল তার ভরাডুবির আশঙ্কা। কোলকাতার কোন এক বস্তীর নোংরা স্যাঁৎসেঁতে পায়রার খোপের মত অন্ধকার একটা ঘরে এই দু'টি প্রাণীর অর্ধাহারে অনাহারে কেটেছে বহুদিন। মহানগরীর জনারণ্যে অজ্ঞাত অখ্যাত এই দু'টি জীবনের নিশ্চিত বিলুপ্তিরই আশঙ্কা ছিল, যদিনা তাদের উপর দৃষ্টি পড়ত এই বস্তীরই এক বৃদ্ধ খেলনাকারের। এই বৃদ্ধের সাহচর্যে এসে তারই সাহায্যে রহিম আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। এখন সে নিজেই খেলনা তৈরী করে বিক্রি করে। তার খেলনা বিক্রির স্থান এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। খেলনা বোঝাই গাড়ীখানা নিয়ে সে গোটা শহরের বুকটাই চষে বেড়ায়। এমনি করে চলেছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর। এবং আজও চলেছে।

সেদিন চৌরঙ্গীর মোড়ে রহিম তার দোকান পেতেছিল। একজন ভদ্রমহিলা অনেকগুলি জিনিসপত্র নিয়ে ছোট একটি মেয়ের হাত ধরে সেখান দিয়ে চলেছিলেন ; খেলনাগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়তে মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বল্লে : মা, মা, কী সুন্দর খেলনাগুলো! আমায় একটা কিনে দেবে! ঐযে—ঐটে—নেব আমি। ভদ্রমহিলা যেন বিব্রত বোধ করলেন। নীচু হয়ে একটু তিরস্কারের সুরেই তিনি বল্লেন : ছিঃ খুকু! রাস্তাঘাটে এমন করতে নেই। এখন আর পয়সা নেই। দেখছনা, কত সব জিনিস কিনে ফেলেছি। আজ আর নয়। আর একদিন কিনে দেব, এস লক্ষ্মীটি। মেয়েটি কিন্তু এক পাও সেখান থেকে নড়ল না। ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত রেগে মেয়েটির গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্লেন : অসভ্য মেয়ে—কথা বল্লে শোনে না। চড়টা যেন রহিমের গালেই এসে পড়েছে, এমনিভাবে সে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে সে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বল্লে : ই কী কোরচেন মা! উয়ার কী বুদ্ধি আছে, মা! উতো নাদান আছে। পরক্ষণেই সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। টুপ করে সে মেয়েটিকে

কোলে তুলে নিয়ে গাড়ীর কাছে এসে বল্লে : কোনঠো লিবে খোঁকী, আপনা হাঁতসে লিয়ে লাও। সংগে সংগেই সে নীচু হয়ে খেলনাগুলো মেয়েটির আয়ত্তের মধ্যে এনে দিল। রহিমের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখের দিকে একবার চেয়ে মেয়েটি তার ইপ্সিত বস্তুটিকে তুলে নিল। মেয়েটিকে নীচে নামিয়ে দিয়ে হাতজোড় করে রহিম বল্লে : হামার কসুর মাফ করে লিবেন, মা! আপনারা ভদরলোগ আছে—হামি তো ছোট আছেন, মা। ভদ্র-মহিলা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতই রহিমের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তিনি বল্লেন : না, না। তা কেন। কোলে নিয়েছ বলে তো তুমি কোন অন্যায় করনি, বাবা। কিন্তু এ তুমি কী করলে বলত? গরীব মানুষ—খেলনাটার জন্য তোমাকে কিছু লোকসান দিতে হবেতো? একমুখ হেসে রহিম বল্লে : কুছ লোকসান হোবে না, মা। ভদ্রমহিলা আর কিছু বল্লেন না। কন্যার হাত ধরে তিনি নিঃশব্দে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়েই কি জানি কেন তিনি আবার পিছন ফিরে চাইলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ফুটপাথে ভীড়ের মধ্যে তিনি সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

টাওয়ার ক্লকটায় বারোটা বেজেছে। দুরন্ত রৌদ্রে পুড়ে রাস্তা ভয়ানক গরম হয়ে উঠেছে। পীচগুলো পর্যন্ত গলতে আরম্ভ করেছে। গাড়ীখানা ঠেলতে ঠেলতে রহিম রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠল। তারপর দু'পয়সার চানাচুর কিনে গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে সে একটি একটি করে চানাচুর মুখে দিতে লাগল। হঠাৎ ডুম ডুম শব্দে চকিত হয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—রাস্তার ওপাশে খানিকটা খোলা জায়গায় একটা লোক বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে ডম্বরু বাজাচ্ছে। একে একে লোকের জমায়েত হচ্ছে সেখানে। অবশিষ্ট চানাচুরগুলো এক সঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে রহিম গাড়ী নিয়ে সেইখানে যেয়ে উপস্থিত হল। লোকটা তখন ডম্বরু বাজনা বন্ধ করে একটা বাঁশের বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে। পাশেই তার প্রকাণ্ড এক ঝুলি। ছ'সাত বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে বসে আছে সেখানে। বাঁশী বাজানো বন্ধ করে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে : বেটা!

—ওস্তাদ! মেয়েটি উত্তর দিল।

—ইতনি বাবুলোগ কিসলিয়ে আয়া হ্যায়?

—খেল দেখনেকো লিয়ে।

—খেল দেখনেকো লিয়ে? কেয়া খেল?

—যাদুকা খেল। খেল দেখলাও—বাবুলোগসে ইনাম মিলেগা।

—হাঁ, হাঁ। মিলেগা।

লোকটি ডম্বরু বাজাতে বাজাতে বৃত্তাকারে আর একবার ঘুরে নিল। তারপর উবু হয়ে বসে ঝুলির ভেতর থেকে এক এক করে তার খেলার সরঞ্জামগুলো বার করতে লাগল। সবার শেষে বার করল একটা মড়ার মাথা আর একটা হাতখানেক লম্বা জানোয়ারের হাড়। একটা জায়গায় হাড়ের দাগ কেটে একটা বৃত্ত রচনা করে সে মড়ার মাথাটা সেই বৃত্তের মধ্যে রাখল। তারপর একটা রুমাল কোণাকুণিভাবে ভাঁজ করে একটা কোণ তার একটু উঁচু করে রেখে সে বল্লে: বেটা!

—ওস্তাদ।

– ই কেয়া হ্যায়, জানতা?

—উতো কাপড়া হ্যায়।

—নেহী, নেহী। কাপড়া নেহী। নাচনেওয়ালী।

—নাচনেওয়ালী?

—হাঁ, হাঁ। নাচনেওয়ালী। হাম বাঁশী বাজায়গে আউর উ নাচেগা।

—হাঁ? তবতো বহুত আচ্ছা খেল হ্যায়। দেখলাও দেখলাও। বহুত ইনাম মিলেগা?

লোকটি খানিকটা ধুলো মুখের মধ্যে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলে জানোয়ারের হাড়টা মুখের উপর বারকয়েক ঘুরিয়ে ফুঁ দিয়ে মুখের ধুলোগুলো উড়িয়ে দিল। তারপর রুমালের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে সে বাঁশী বাজাতে লাগল। দেখা গেল রুমালের উঁচু করে রাখা কোণটা বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। তাজ্জব ব্যাপার। রহিমের দু'চোখই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল: বাঃ বাঃ! বড়ি আচ্ছা খেল হ্যায় তো। তারপর আরো অনেক রকমের খেলা দেখান হল। কাঠের ঘোড়া পানি খেল, টাকা পয়সা তৈরী হল, মার্বেল ওড়ানো হল। এমনি তরো কত কি। অতঃপর খেলা সাংগ হল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জায়গাটা একেবারে খালি হয়ে গেল। রহিম তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কী মনে করে সে এগিয়ে এসে বল্লে: তুমহারা ঘর কাঁহা, ভেইয়া?

ঘর? লোকটি হাসল। সব জাগামে হামারা ঘর হ্যায়, বাবুজি। এত্যা বড়া দুনিয়ামে ঘরকা কুছ কমতি হ্যায়? যাহা রাহেগা ওহিতো হামারা ঘর। আও বেটা। চল। ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে লোকটি তারপর গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করল।

রহিম সেদিন যখন ঘরে ফিরল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। চিরাচরিত নিয়মে সে ডাকল: কলমী। উ, করে কলমী সাড়া দিল বটে, তবে আগেকার মত আর ছুটে এল না। নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে রহিম একটুখানি বিস্মিত না হয়ে পারল না। ঘরে ঢুকতে ঢুকেতে সে বল্লে: কা হুয়ারে? শোকে হ্যায় কেও?

বোখার হুয়া ভেইয়া। চাদরের ভিতর থেকে মুখ বের করে কলমী বল্লে।

বোখার হুয়া? উবু হয়ে রহিম কলমীর বিছানার গা ঘেঁসে বসে তার গায়ে কপালে হাত দিয়ে ভয়ানক চমকে উঠল। উঃ গা যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। কপালে হাত বুলুতে বুলুতে রহিম বিচলিত কণ্ঠে বল্লে: কব বোখার হুয়া? সাবেরমে হামকো তো কুচ নেহী বোলা তুম?

কেইসে বোলেগা ভেইয়া? তুম ঘরসে নিকালনেকা সাথ সাথ বোখার আয়া, সিনেমে বহুত দরদ লাগতা, ভেইয়া। বলেই কলমী খুক খুক করে কাশতে আরম্ভ করল। কলমীর হঠাৎ অসুখে (অসুখটা কিন্তু হঠাৎ হয়নি। তিন-চারদিন আগে থেকেই কলমীর অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে। কিন্তু ছেলেমানুষ সে, খাওয়া বন্ধ হওয়ার ভয়ে রহিমকে কিছু বলেনি। সুতরাং রহিমও এ বিষয়ে অন্ধকারেই ছিল)। রহিম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিকটেই একটা ডাক্তারখানা ছিল। সেখানে যেয়ে সে ডাক্তারকে সব কথা খুলে বল্ল: শুনে ডাক্তার বল্লেন: এক দফে দেখনে পড়েগা। নেই তো দাওয়া দেনা মুসকিল হ্যায়।

ঠিক হ্যায় হুজুর। চলিয়ে আভভি। বলেই রহিম নীচে নেমে দাঁড়াল। ডাক্তার এসে দেখে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে বল্লেন: সিনেমে বহুত কফ জমা হো গিয়া। নিকালনেসে আচ্ছা হো যায়গা, ঘাবড়াও মৎ।

তারপর চিকিৎসা চলতে লাগল। রহিমের খেলনা বিক্রি করা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। হাতে নগদ টাকা-পয়সা যা ছিল চার পাঁচ দিনের মধ্যেই তা নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, শেষে নিরুপায় হয়ে রহিম খেলনা শুদ্ধ গাড়ীখানি বিক্রি করে দিল। সেই টাকায় আর কয়েকদিন চিকিৎসা চলল।

কিন্তু কলমীর অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে চলল। নিঃসহায় নিঃসম্বল রহিম দু'হাত পেতে উপরের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেল্লে : এ্যায় মেরে পরওয়ারদিগার। এ্যায় রহমানের রহিম, তেরে লাচার বান্দার পর রহম হো যা! বাঁচা দে মেরে পিয়ারী বহিনকো। ভিখদে মেরে দেলোকো...এ্যায় মাহবুব, এ্যায় মেরে হাবিব...হঠাৎ রহিমের দৃষ্টি পড়ল কলমীর চোখের দিক। চোখ দু'টো কেমন যেন তার ঘোলাটে হয়ে এসেছে।

ভে-ই-য়া। শেষবারের মতই কলমী বুঝি ডাকল। সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানা তার বিকৃত হয়ে উঠল। অসহ্য বেদনায় কচি দেহখানা তার একবার কুঁকড়ে উঠেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ভেইয়ার কোলে মাথা রেখে কলমী শেষ নিঃশ্বাস ফেল্লে।

কলমী চলে গেল। কাল সে ছিল—কিন্তু আজ আর নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাতি পাতি করে খুঁজে ফিরলেও কলমীর ছায়া পর্যন্ত দেখা যাবে না। কিন্তু রহিম রইল বেঁচে। এবং বাঁচতেও হবে তাকে আমৃত্যু। কিন্তু বাঁচবার মত বাঁচার অধিকার তো নেই তার। বাঁচতে হবে তাকে ধুঁকে কেঁদে ককিয়ে পৃথিবীর গলগ্রহ হয়ে...এক একটি অন্নের বিনিময়ে দিতে হবে তাকে এক একটি রক্তবিন্দু...দুঃখ কষ্ট দৈন্য দুর্দিনের মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তাকে, চালাতে হবে জীবনব্যাপী সংগ্রাম; কিন্তু তাতেই বা দুঃখ কিসের? জন্ম-অভিশপ্ত যারা তাদের দুঃখ করবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবারও অধিকার নেই যে। সহ্য করার জন্যই এসেছে তারা—নিজের টুঁটি ছিঁড়ে নিজেরই রক্তপান করবার জন্যই জন্ম তাদের। অতএব—এই দুঃখ—এই ফরিয়াদের বিলাস-ই বা কেন?...

স্বষ্টি

হামেদ আহমদ

স্বষ্টি,—জগতের, মনের, জীবনের অদ্ভুত একাগ্রতায় পূর্ণ।

সন্ধ্যা হয়ে এল, আলো জ্বালিয়ে দিলে। আঁকা তার শেষ হয়েচে। পটের ওপর এঁকে যায়। এই তার জীবিকা। ছোট্ট একটা দোকান।

এলোমেলো চুলগুলো দুহাতে গুছিয়ে নিয়ে মাথার পেছনের দিকে উল্টিয়ে দিলে। সেই মেয়েটি সামনের বাড়ীর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে। তার পরিপূর্ণ আভা মেয়েটির কমনীয় মুখের ওপর অপূর্বরূপে ফুটে উঠেচে। বোধহয় চুল এখনি বেঁধেচে। সিক্ত চুলের ওপর চাঁদের আলো মনোরম হয়ে উঠেচে। মেয়েটি আকাশের দিকে চেয়ে। সে বুঝতে পারে না, সত্যি সত্যি সে আকাশের দিকে চায় না, না— একটা সিগারেট বের করল। আগুন ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল। আজ চৈতালী পূর্ণিমা তাই এত মধুর লাগচে তার আলো। মেয়েটি এখনো দাঁড়িয়ে। ও স্কুলে পড়ে। গাড়ী আসে রোজ ন-টায়। বাসে ওঠার সময় একবার এদিকপানে চায়। সে চায় তখন ওদিক পানে।

সবেমাত্র শেষ করা ছবির দিকে চেয়ে। এত সজীব করে ছবি সে আঁকতে পারে! রেখার সীমায় অসীম প্রাণের চেতনা সে কী আনতে পারে? এত সহজভাবে! এত সম্পূর্ণরূপে! তার হৃদয় আনন্দের শিহরণে আত্মহারা হল। তন্ময় হয়ে তাই দেখচে। এ দেখার শেষ কোথায়?

মেয়েটি কিন্তু নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে এতটুকু চঞ্চলতা নেই। চপলতা নেই। নীরব নিবিড় একটা স্বপ্ন যেন।

বছর দুই সে দোকান দিয়েচে। ওরা বোধ হয় আরো আগে হতেই আছে। ত্রিশ দিন বারো মাস—এমনিভাবে দুটো বছর কেটেচে। বিজ্ঞাপনে যে সব মুখচ্ছবি সে এঁকেচে তা অধিকাংশ এরি মডেলে আঁকা।

এমনিভাবে এ দুটি বছরে অনেকখানি সুনাম কিনেচে। তার হৃদয়ের গভীরে যে সুরের ঝরণা, রঙের আলপনা, স্বপ্নের মাধুর্য তার তুলনা হয় না।

মেয়েটি চলে গিয়েচে। খালেদ উঠে পড়ল। দোকান বন্ধ করবে। তালাটা লাগিয়ে পিছু ফিরে চাইলে; মেয়েটি ফিরে এসেচে। খালেদ রাস্তায় নামল। পিছনে মেয়েটিকে ফেলে মনে তার স্মৃতি নিয়ে ফিরে চলল বাসায়। নাকটা টিপে গলির মোড়টা কোন রকমে সে পার হয়ে গেলেই যেন বাঁচে। তার বাসায় ঢোকার গলির মোড়টা এমনি একটা ঘৃণ্য দোজখ। অথচ এমনিভাবেই তারা আজীবন আবর্জনার পাশে পাশে থেকে নিজেদের অবমাননা শুধু করেছে।

বাসার কাছে আসতেই তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। হাসি-নার কথা মনে পড়চে। তার ছোট বোন। পাগল। মা-বাপ কেউ নেই। মাথা মাঝে মাঝে খারাপ হয়। অদ্ভুত রোগ। কোনমতে সারলো না। যখন সে অসুস্থ মনে করে তখন তার ভীষণ কিছু করতে ইচ্ছে হয় বোধ হয়। চার বছর পূর্বে একবার তার মাকে সে মারে। মানসিক অসুস্থতার মুহূর্তে অভাগী পরে বুঝতে পেরে ডুকরে কেঁদে বলেছিল: আচ্ছা ভাইয়া, আমার বেঁচে কী হবে? মা, আমার মাকে আমি মেরেছি! উঃ পানি, আমার মাথায় পানি ঢালো ভাইয়া। আমার মৃত্যু কবে আসবে বলতে পারো?

অভাগী আজো কাঁদে। খালেদের চোখের পানি শুকিয়ে গিয়েচে।

দোরে ঘা দিল। হাসিনা এসে দরজা খুলল। তার রাঙা ঠোঁট ভর নির্মল হাসি ফুটে উঠল। এ হাসিতে চোখ জুড়োলেও মন জ্বালা করে। এই তার চিরন্তন অভিনন্দন তার ভাইয়ের প্রতি। হাত বাড়াল। খালেদ নিঃশব্দে তার নিজের হাতখানা এগিয়ে দিল। পাগলী এমনিভাবে এতদিন ধরে অভ্যার্থনা করে এসেচে। হাসিনা নিজের দুঃখ না বুঝুক তার ভাইয়ার দুঃখ বোঝে।

খাবার দিয়ে হাসিনা ভাইয়ের সামনে বসল পাখাটা হাতে নিয়ে। তার পিঠ বেয়ে চুলের স্রোত নেমে এল। করুণ মুখে রাঙা ঠোঁটে আবার হাসি ফুটিয়ে বল্ল: ভাইয়া, আজ মায়ের জন্য মনটা কেমন করছিল, সারা দুপুরটা কেঁদেচি। কত ডেকেচি তাঁকে আর খোদাকে। আচ্ছা ভাইয়া, মৃত্যুর পরে কবরে ওই ঘুটঘুটে অন্ধকারে থাকতে কেমন ভয় করে, না?

খালেদ মুখ তুলে চাইলে।

তারপর—

আরম্ভ করে আবার হাসল। কিন্তু মুহূর্তে হাসি থামিয়ে শুরু করলে।

শোন ভাইয়া, তোমায় বিয়ে করতে হবে।

আমিতো বিয়ে করব না, একথা বলিনি।

আমি ভাবিকে পছন্দ করেছি। আজ যখন ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলাম তখন ও বাড়ীর ছাদে একটি মেয়েকে—না না সে আমার ভাবী হবে। সত্যিই ভাইয়া, আমি কখনোই ভাবির সাথে ঝগড়া করবো না। তুমি দেখে নিও।

আগে তোর বর জুটাই তবে তো।

ঘাড়টা শক্ত করে মুখটা একটু ফুলিয়ে হাসিনা বললে, না ভাইয়া, আমি বিয়ে করবো না। মেয়ে মানুষ বিয়ে করে না, তার বে দিয়ে দেয়।

তারপর হাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসি থামিয়ে বললে: আমি কেন বিয়ে করব? আমার যে রোগ রয়েচে। এ রোগ তো সারার নয়। উঃ মাথাটা বড্ড ধরেছে। মাথাটা ধুয়ে আসছি। হাসিনা উঠে ভেতরে গেল। আর এল না। খালেদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তবু বসে রইল। মানুষের বাঁচার পিপাসা কী দুর্বোধ্য।

ঘুম কোন মতেই আসচে না। অনেকক্ষণ ধরেই সে বিছানায় জেগে পড়ে রয়েচে। রাত অনেক। ঠিক কত তা জানার উপায় নেই। দেয়ালে সেই পুরোন ঘড়িটা টিক টিক করচে। তার চলার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত কখনো বাজি রেখে দৌড়য়, কখনো বা খরগোসের মত ঘুমিয়ে চলে। হঠাৎ দরজায় আঘাত। ভাইয়া, খোল। হাসিনা ডাকচে। দরজা খুললে। হাসিনা ভেতরে এসে খালেদের বিছানায় বসে বললে: সত্যিই ভাইয়া, আমার বিয়ে দেবে? না বিয়ে দিয়ো না। আমার আম্মা কোথায়? না না, আমি বিয়ে করবো না। তোমরাও বিয়ে দিয়ো না। আমার মা, আমার মা কোথায়?

বেরিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিছানায় আবার গড়িয়ে পড়ল খালেদ। তার চোখে পানি, মনে জ্বালা, আর দিগন্তে রাত্রির ছায়া। চাঁদের আলোও পারেনি সেই ছায়া আলোকিত করতে।

মন দিয়ে চেহারাখানা আঁকচে। একটা তেলের বিজ্ঞাপনের জন্য। মেয়েটি আজ দাঁড়ায়নি। খালেদের আঁকতে ভাল লাগচে না। লেখাগুলো লিখলে কিছুক্ষণ। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

ভাবতে ভাবতে মন হোঁচট খায়। চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। তবু সে আনমনে রেখা আঁকে। শুধু রেখা নয় প্রাণ আঁকে। হ্যাঁ, প্রাণ সে আঁকতে পারে। তার নিজের যে অফুরন্ত প্রাণ। চেহারাখানা আঁকা হয়ে গিয়েচে। কাল ভদ্রলোকটি আসবেন। না দিলে চলবে না। মেয়েটি না থাকা সত্ত্বেও, ভাল লাগল না, তবুও সে আঁকল। তার আঁকা শেষ হল।

পাশেই একটা ছুতোরের দোকান। সাদেক তার নাম। সে এসে ঢুকল, তার মুখে একটা বিড়ি। খালেদের সামনে এসে বিড়িটা মুখ থেকে নামিয়ে বল্ল: আগুন আছে, দেশলাই?

খালেদ দেশলাইটা বের করে দিল। সাদেক শুধাল, তুমি খাবে না? না ভাই, এইমাত্র একটা খেয়েচি। সাদেক পটের কাছে এসে দাঁড়াল। খালেদের দিকে চেয়ে বল্ল: কী হাত নিয়েই না জন্মেচ। তোমার আঁকার মধ্যে প্রাণ আছে।

খালেদ কিছু বলল না। চুপ করে রইল। সাদেক আরম্ভ করলে: হ্যাঁ শোন, আমার চাচাত ভাই সিনেমা হলে কাজ করে। সে বলেছিল তোমার মত একজন লোকের দরকার তাদের। হলের গায়ে এবং বাইরে এসব আঁকার জন্য। আমি তোমার কথা বলেচি। করবে তো? খালেদ হাসল। বল্লে: আচ্ছা। তোমার সহানুভূতির মর্ম কী আমি বুঝিনা?

ওই দ্যাখো আবার কী সব বকচে।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার কথাই সই।

হ্যাঁ ভালো হবে কিন্তু।

সাদেক চলে গেল। খালেদ একা গালে হাত দিয়ে বসে রইল। ঝকঝকে সুনীল আকাশ আবার কাঠ পুড়ানো রোদ। নির্নিমেষ চোখ দুটো মেলে দিয়ে ও চেয়ে রয়েছে। সুনীল আকাশের অন্তরতম কোণ হতে প্রখর রোদ মন্থন করে শান্তি নেমে এল মনে। চোখে তার অপূর্ব প্রাণ টলমলিয়ে উঠল। 'ওগো, শুনচো? একটা পয়সা দাওনা বাপ।'

একটি বুড়ি। জীবন্ত কঙ্কাল যেন। ক্ষীণস্বরে ডাকচে। খালেদ পকেট

হতে একটা দুয়ানি বের করলে। ওর হাতে ওই উঠল। দুয়ানিটা ফেলে দিল বুড়ির দিকে ছুঁড়ে। বুড়ি কুড়িয়ে নিল। খালেদের পানে একবার চাইল। যা বলে বলে মুখস্থ হয়েচে তাই বল্লে মিনিটখানেক। তারপর চলে গেল। খালেদ সবটা শুনেনি। শুনলে হয়ত বুঝত বুড়ি অনেকখানি বলেচে। যা মুখস্থ হয়েচে তার চেয়েও বেশী। কতদিন সে ওই 'বাপ' কথাটা শোনেনি। সে আজ কতকাল হয়ে গিয়েছে! 'মা-গো বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। একটা মোটর এসে থামল সামনে। স্কুলের মোটর। মেয়েটি নামল রোজকার মত। আজো একবার চাইল।

আর একটা কাজ ধরল। সেই সাবানের জন্য। সে লোকটাও তো পরশু আসবে। মুখটা শুধু একটানে এঁকে নিল। তারপর নাক, ঠোঁট, চোখ—পরপর এ সবগুলো আঁকল। ওধার হতে গান ভেসে আসচে। মেয়েটি গাইচে। কী করুণ সুর। কী মিষ্টি গলা। খালেদের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। আঁকা যখন শেষ হল তখন দেখল চোখদুটো কী করুণই না হয়েচে। এমন সম্মোহিত রূপ বোধ হয় কখনো কোন নারীর সে দেখেনি।

তার মনে আজ বেদনার সাগর ফুলে ফুলে কাঁদচে। তার মা নেই, তার বোন পাগল। আকাশ শুধু নীল। তার রেখায় যে ছবি ফোটে তাও ক্রন্দন-সিক্ত।

নিয়তির নির্মম নিষ্ঠুর হাসি শিল্পীর 'মোনালিসার' হাসির চেয়েও যে বড় দুর্বোধ্য! এ হাসির কী শেষ নেই? রাত্রি যদি নেমে আসে, জীবনে আলো কী আসবে না? পথ যদি হারিয়ে ফেলি, পথ কী আবার ফিরে পাব না। যুগ-যুগান্তের মানুষ সবাই এসে ভিড় করেচে খালেদের মনে। তাদের ব্যর্থ জীবনের কান্না ফেলে গিয়েচে। কিসের জন্যে তারা ব্যর্থ? তা কি কেউ জানতে পারেনি? মানুষের ইতিহাস কী এ কথা অস্বীকার করে, যে সভ্যতা মানুষ গড়েচে, সেই সভ্যতাই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে?

আর আঁকা হয় না। তার বোনের জন্যে মন কেমন করে উঠল। দুটি ভাই-বোন, হোক না সে পাগল। মানুষের হাতে দৈনন্দিন অপমান, নিয়তির কাছে চিরন্তন পরিহাস—এদের চেয়েও উর্ধ্বে তার বোন। এদের চেয়েও উর্ধ্বে সে নিজে। তার সভ্যতা তো তার চেয়ে বড় নয়।

খালেদ বাসায় ফিরল ক্লান্ত মনে শিথিল দেহে। হাসিনার কথাই তার

বার বার মনে পড়ছে। তার বিয়ে দেয়া যাবে না। সে তো ভাল করেই বোঝে। করিমের ছেলে রফিকের সাথে হাসিনার বিয়ে দিলে হয়। ছোড়াটা হাসিনার প্রতি সুনজর দিয়েচে। যদি বিয়ে হয় হাসিনা সুখীই হবে। হাসিনার ঘরটায় ঢুকে দেখল হাসিনা বসে রয়েচে জানালার কাছে। একরাশ চুল পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে তক্তপোষটার ওপর পড়েচে। হাতের তালুর ওপর মুখের থুতনীটা রয়েচে। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়চে। নির্মল, স্বচ্ছ, তপ্ত অশ্রু।

খালেদ নিকটে এসে ডাকলে, হাসিনা! হাসিনা মুখ ফিরিযে চাইল। কোন চঞ্চলতা নেই! নীরব নিথর। তার চোখ দুটোর দিকে চাইলে মনে হয়, সে খালেদের দিকে চেয়ে নয়, তাকে অতিক্রম করে কোন অতিক্রান্ত-লোকে তার দৃষ্টিপথ হারিয়েচে।

হাসিনা—

উঠে দাঁড়াল।

হাসিনা, কাঁদছিস কেন বোন?

রফিক আজ মারা গিয়েচে।

হাসিনার দিকে চাওযা যায় না। বেদনা এমন করুণ হয়ে উঠেচে এবং এমন কোমল হয়েচে যে ওর পানে চাওয়া যায় না। বাইরে চাইল। অস্তমুখী সূর্যের বিদায় মুহূর্ত। দিগন্তের শ্যামলিমায় রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েচে। মনে হচ্ছে হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েচে। সঙ্গীতহারা, সুর নেই, ভাষাহীন বোবা মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েচে অনন্তের পদতলে! রহস্য উদ্‌ঘাটন করে আমায় মুগ্ধ কর—মনে মনে তার ভাষা গুমরে মরছে: তোমার মধ্য দিয়ে দেখব তোমার ওপরে কী রয়েচে। আশাহত জীবনের প্রাঙ্গণে নীল আকাশের বেদনা উপুড় হয়ে নেমে আসবে গোধূলীর ধূসরতায়। আমি তাই সইব। আমি বোবা। কিন্তু আমার অনুভূতি রযেচে।

কাঁদিসনে বোন, কাঁদিসনে।

খালেদের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। হাসিনা কাছে সরে এল। ওপাশে রাস্তার মোড় থেকে বেহালার সুর বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে এসে এদের মনের দোরে আঘাত দিচ্ছে। বোবা বুঝি আর পারচে না ব্যথার ভার সইতে।

তোমার করুণায় মানুষকে মুক্ত কর। মানুষের কাছে মানুষের নালিশ শোনাও। হৃদয় তোমার পবিত্র। তাকে আঘাত হেনে ভেঙে ফেল না।

ভাইয়া—

কী বোন?

চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। যেখানে মা নেই, রফিক নেই, সেখানে আমি কী করে থাকব?

অধীর হয়ো না।

সান্ত্বনা দিয়ো না। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে জীবনের অপমান আমি চাইনে। সত্যকে চাই।

তাই হোক, তবে তাই হোক।

বিকেলের শেষ রোদ তার দোকানটায় করুণ হয়ে উঠচে। আঁকা শেষ হয়েচে। ভাঙা বেহালার নীরব মূর্ছনা তার মনের অলিতে গলিতে মা-হারা শিশুর মত ঘুরে বেড়াচ্চে। বাদল রাতের অবিরাম বর্ষণের মত করুণ যেন তার আজকের মনের সুর।

সামনের বাড়ীর জানালা-কপাট সব বন্ধ। কাল ওরা চলে গিয়েচে। আর হয়তো ফিরে অসেবে না। যাবার মুখে যারা যায়, তারা আর ফিরে আসে না। যারা চলে গিয়েচে, তারা নতুন আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত। সিনেমার কাজটা সে পায়নি। সাদেক চলে গিয়েচে। তার দোকান চলল না। খালেদ আপন মনে একটা সিগারেট ধরাল। গোল করে করে ধোঁয়া ছাড়চে। কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁযা হাওয়ার আঘাতে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্চে—সৃষ্টির পূর্বের নীহারিকার অবস্থা যেন। তার মনে সমস্ত চিন্তা জোট পাকিয়ে যাচ্চে। নতুন পরিকল্পনায় সে যাত্রা করবে নতুন আশার জন্যে।

চিরকালের যাত্রী যে মানুষ সে মানুষ আজ খালেদের মনে জেগেচে। সৃষ্টি চাই, নতুন সৃষ্টি। নতুন আলোকে সৃষ্টি উঠবে ফুটে। দিগন্তের শ্যামলিমায় হাসবে সোনালী প্রভাত।

খালেদ উঠে পড়ল। সন্ধ্যে পার হয়ে গিয়েচে। সারা আকাশ জুড়ে রাত্রি পাখা ছড়িয়ে দিয়েচে। খালেদ তারি ছায়াতলে বেরিয়ে পড়ল। অমৃতের যারা পুত্র তারা আঁধারে ভয় করে না।

দ্রুতপদে কম্পিত হৃদয়ে খালেদ পৌঁছিল। ঘরের মধ্যে বাতি জ্বলচে। স্তিমিত আলো। খালেদের হৃদয় কেঁপে উঠল—হাসিনা, ডাকলে খালেদ।

সমস্ত ঘরময় শব্দটি ঘুরে বেড়াল। প্রতিধ্বনি হল; কিন্তু সাড়া কেউ দিল না। সাড়া দেবার কেউ ছিল না।

হাসিনা চলে গিয়েচে।

খালেদ তা জানে না। সেও জানায়নি। তার যাবার সময় এসেছিল। তার যাওয়া রোধ করতে কেউ পারেনি। পাশের ঘরটায় একজন পিয়ন থাকে। কোন সদাগরী অপিসে কাজ করে। সে এসে দাঁড়াল দোরগড়ায়। এস, আমার এখানে এস।

কেন?

দেখবে না?

কাকে?

তোমার বোনকে—হাসিনাকে?

সে কেমন আছে?

ভালই। পুকুরে ডুব দিয়েছিল—

বাঁচাতে পারনি?

বাঁচেনি।

সৃষ্টি কী থেমে গিয়েচে? নতুন সৃষ্টি হবে। নতুনতরো। প্রবাহ বয়ে যায়। মানবজীবন পরিবর্তনের আঘাতে নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করে।

অপূর্ব সৃষ্টি!

খালেদ কঠিন হয়ে বসে রইল। তার বাঁচার প্রয়োজন বেশী। তারায় ভরা আকাশ অশ্রুল হয়ে উঠল শুধু।

অপূর্ব সৃষ্টি!

ডাহুক

টিপু সুলতান

বিকেলের একটা ম্লান ধূসর ছায়া নেমে এসেছে চম্পাপুর গ্রামের উপর। আর সেই ছায়া আরো ম্লান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে একটা সরু মেঠো পথের উপর। পথের দু'পাশে ঘাসের উপর হলদে হলদে এক রকম ফুল ফুটে আছে। বাতাসের মধ্যে ভেসে রয়েছে একটা উগ্র জংলা গন্ধ। তবু ভাল লাগছিল। মন্থর পদক্ষেপে হাঁটছিলাম পথের উপর দিয়ে। হাতে আছে আমার 'পয়েন্ট টু-টু' বোরের রাইফেল। পাখী মারার নেশা উঠলেই আমি আমার ওই রাইফেলটা হাতে নিয়ে অপরিচিত পথ ধরে চলতে থাকি বন-বাদাড়ের দিকে। পরিবেশ অপছন্দ হলেও তখন আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। সমস্ত পরিবেশটা তখন রচনা করি নিজের মনের মধ্যে। তাই তখন আমার ভাল লাগে। যেমন এখন। কিন্তু এদিক ওদিক গাছের ডালে কোন পাখীই দেখতে পেলাম না। শেষে হাঁটতে হাঁটতে একটা কাঠের পুলের উপর এসে উঠলাম। পুলের দু'পাশে লোহার রড দেওয়া। একটা রডের উপর বসে ছোট একটি মেয়ে কামড়ে কামড়ে কাঁচা পেয়ারা খাচ্ছিল। আমি কাছে আসতেই একবার আমার মুখের দিকে আর একবার আমার রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ছোট গোল ফর্সা মুখটা বিষন্ন করে ফেলল। পেয়ারাটা দু'হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রেখে নীরবে বসে রইল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। তারপর ঢালু পথে নেবে গেলাম নীচের দিকে। কিন্তু গাছে পাখী কোথায়! পেছনে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি তেমনি বসে থেকে আমাকে দেখছে। আরো কিছুদুর এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। চারদিক একেবারে নিঃশব্দ। বুঝতে পারলাম এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। রাইফেলটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিয়ে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিতেই হঠাৎ একটা পাখীর অদ্ভুত ডাক শুনে চমকে উঠলাম। কোয়াক কোয়াক কোয়াক,

কাঁউ-উক কাঁউ-উক কাঁউ-উক। দেখতে পেলাম সামনের পিপুল বন থেকে একটা ডাহুক বেরিয়ে এসে বাঁশের কঞ্চির উপর বসল। সাদা আর কালোর সুন্দর মিশেল গায়ের রঙে। লম্বা দুটো পা। মসৃণ পালকে ঢাকা সরু বাঁকা গ্রীবা। চিকণ একটা ঠোঁট। আর নিরীহ মুখের মাঝে ছোট্ট গোল কালো কালো এক জোড়া চোখ। দেখে বড লোভ হল। আমার থেকে গজ দশেক ওর দূরত্ব হবে। নিশানার জন্য রাইফেলটা তুলে ধরলাম। এমন সময় আমার পেছনে একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই মেয়েটি ভীষণ জোরে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। মেয়েটি বুঝি ভয় পেয়েছে। কিন্তু এদিকে তাকিয়ে দেখি ডাহুকটি আর সেখানে নেই। আশে পাশে কোথাও নেই। কিছু পরে ঘন পিপুল বনের মধ্যে ওর ডাক শুনতে পেলাম। কোয়াক কোয়াক কোয়াক, কাঁউ-উক কাঁউ-উক কাঁউ-উক। তারপরেই নিশ্চুপ। বোল্ট খুলে গুলীটা বের করে নিয়ে কাঠের পুলের উপর উঠে এলাম। রাইফেলটাকে লোহার রডের সাথে হেলান দিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম। সামনেই দেখি মেয়েটির আধ-খাওয়া পেয়ারাটা পড়ে আছে। মাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, ও সত্যিই ভয় পেয়েছে। নইলে অমন চীৎকার করে ছুটে পালাবে কেন? একে বয়স কম তার উপর গাঁয়ের মেয়ে। রাইফেল দেখে একেবারে ভড়কে গেছে। আপন হাসিতে নিজের ঠোঁটটা নড়ে উঠতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল। দেখলাম সামনের মাঠের উপর দিয়ে একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে এদিকে। তার পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে সেই মেয়েটি। লোকটা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর একেবারে পুলের উপর উঠে এল। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে তার ফেলে যাওয়া পেয়ারাটা আবার কুড়িয়ে নিল। লোকটা মধ্যবয়সী, ভগ্নস্বাস্থ্য। মুখের কাঠিন্য আর দেহের গড়ন সঙ্গতিপূর্ণ। কপালের ডান দিকে ভূরুর উপরে একটা কাটা দাগ। গায়ে সার্ট, পরনে আধ-ময়লা পাজামা, পা দুটো খালি। লোকটা একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একটা প্রদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠল: তাহলে ওটাকে মারতে পারোনি? ওর বরাত বলতে হবে। কিন্তু শহর থেকে রাইফেল নিয়ে গ্রামে শিকার করতে এসে পিপুল বন আর বাঁশের ঝোপ খুঁজে

ওই ডাহুকটাকে বের করলে কেন বলত? অমন একটা নিরীহ পাখীকে কেউ কখনও মারে নাকি? ও যে উড়তেও জানে না। ওকে দেখে তোমার ভারি লোভ হয়েছিল তো! কিন্তু ওর জীবনটা বড় দুঃখের জান। বিল-টিলের দিকে গেলেও তো পারতে। সোনা বক, চখা পাখি, পানকৌড়ি, দল পিঁপড়ি এমন কি দু'একটা বালিহাঁসও দেখতে পেতে। তুমি এখানে তো নতুন, তাই সব জায়গা হয়ত চেননা। চলো তোমাকে বিল দেখিয়ে দিচ্ছি। এস আমার সঙ্গে।

মনে হল এর সঙ্গে ওর একটা বেদিশে প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। তাই ওর কথার কোন বাদ-প্রতিবাদ না করে নীরবে ওকে অনুসরণ করে চললাম।

মাঠের উপর দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। আমি হাঁটছি ওর পাশা-পাশি। আর ওই ছোট্ট মেয়েটি আসছে আমাদের পেছনে পেছনে। গম্ভীর পদক্ষেপে চলতে চলতে হঠাৎ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে লোকটা বলে উঠল: আমাদের পেছনে পেছনে তুই কোথায় যাচ্ছিস? যা বাড়ী যা।

সংগে সংগে মেয়েটি পথ কেটে ছুটে পালাল। তারপর আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল: শহরে কি করা হয়?

—আমি থাকি ঢাকায়। সংবাদপত্রে চাকরী করি।

—একেবারে ঢাকায়! তা হলে তো দেশের মধ্যবিন্দুতে বসে আছ কি বলো! এখানে বুঝি আত্মীয় বাড়ী আছে?

—হাঁ, এখানকার সরকারী ডাক্তার আমার খালু।

—ও: আচ্ছা!

এ পর্যন্ত আমি তাকে একটি প্রশ্নও করিনি। তাই প্রথম প্রশ্নটিতে আমি যা জানতে চাইলাম, সচেতনভাবে সে কথা সে এড়িয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি এ গ্রামে কি করেন?

উত্তরে সে বলে উঠল: না না, আবার আপনি কেন? তোমাকে তো প্রথমেই তুমি বলেছি। বয়সে সামান্য বড় হলেই কি আর আপনি হওয়া যায়? তার উপর তুমি হলে শহরের শিক্ষিত যুবক। তোমারও তো একটা মান-সম্মান জ্ঞান আছে। আমি একটা গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ। আমাকে আপনি বলতে যাবে কেন? তুমি বললেই হবে। তাই যথেষ্ট।

বুঝলাম লোকটা সহজ নয়। মানসিকতা জটিল। কারণটা হয়তো আরো দুর্বোধ্য। কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটতে লাগলাম। তারপর সে আবার প্রশ্ন করল : আচ্ছা, শহরের মানুষদের চেহারা আজকাল কেমন হয়েছে ?

ওর প্রশ্নটা হেঁয়ালি হলেও আমার উত্তরটা অত্যন্ত সহজ। সহজ কণ্ঠেই বললাম : চেহারাতো ভালোই। তবে মানুষের চেহারা একটু কম দেখা যায়।

শুনে হেসে উঠল : কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলল : বছরে বছরে বদলায় না ?

বদলায়। আর বছরের পর বছর যত বদলাচ্ছে ততই মানুষের চেহারা মুছে যাচ্ছে মানুষের মুখ থেকে।

এবার সশব্দে হেসে উঠল সে। সামনেই একটা বিল দেখতে পেলাম। আস্তে আস্তে আমরা বিলের পাড়ে উঠে এলাম। বিলটার চারপাশে জঙ্গল। ধারে লম্বা লম্বা ঘাস। মাঝে ঘন কচুরিপানা। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কাল পানি। বিলের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে সে বলল : এই বিলে কিছু পাখী দেখা যায়। তা-ও সব সময় থাকে না। মানুষের ক্ষুধা এত বেশী বেড়ে গেছে যে, নিরীহ পাখীগুলোও শান্তিতে এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকতে সাহস পায় না।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম বিলে একটি পাখীও নেই। সূর্য অস্ত গেছে কিছু আগে। তখন বিলের চারপাশ ঘিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি সে নীরবে চেয়ে আছে শান্ত নিঃশব্দ বিলটার দিকে। কেমন যেন অন্যমনস্ক। আমি ওকে বললাম : এখন বাসার দিকে ফেরা যাক। পাখী তো আর চোখে পড়ছে না। সন্ধ্যা হয়ে এল। অনেকক্ষণ পর সে আমার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল : বেশ, তাই চল। পাখী চোখে পড়বে না।

রাতে খেতে খেতে গল্প করছিলাম বিলকিসের সাথে। আমার এই কিশোরী বোনটি এত কাঁচা বয়সে এমন সুনিপুণ গিন্নী যে কি করে হল সেটা আমার কাছে রীতিমত একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। ওরা এই বিদ্যাটা বুঝি আগে থেকেই কোথা হতে শিখে আসে। কাউকে শেখাতে হয় না। পাঁচ তরকারীর পাক খাওয়াতে বসেছে বিলকিস। আর খাওয়াতে সে কি উৎসাহ আর আনন্দ। আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। বিলকিস একটু হেসে

বলল : ছাই, তুমি শিকার করতেই পার না। আজ একটা পাখীও তো মারতে পারলে না।

—তোদের এখানে যে কোন পাখীই নেই রে।

—মারতে জানলে তো!

—আচ্ছা বেশ, কাল তুই আমার সাথে বেরোস। তুই পাখী দেখিয়ে দিবি, আমি মারব।

—না বাবা, আমি ওসব পারব না।

ঘরে এসে বিলকিস প্রশ্ন করল : আচ্ছা ওই মাস্টারের পাল্লায় পড়লে কি করে?

—মাস্টার। মাস্টার কে?

—ওই যে যার সঙ্গে বিলের ওদিক থেকে ফিরছিলে। আমি দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম কি-না।

—কিসের মাস্টার ও।

—এখানকার হাইস্কুলের।

—তাই নাকি?

স্কুলের মাস্টার সে। অথচ এই পরিচয়টা যে সে কেন আমার কাছে গোপন করে গেল, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ক্রমেই ওর প্রতি আমার উৎসাহ বাড়তে লাগল। ওকে জানার জন্য মনটা বেশ যেন সজাগ হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটার জীবনে নিশ্চয় কোন একটা গভীর বিষণ্ণ চমৎকারিত্ব আছে, যাকে সে আজো সযত্নে জিইয়ে রেখেছে নিজের মধ্যে। বিলকিসকে প্রশ্ন করলাম—

—তোদের মাস্টার কি করে রে?

—মাস্টারী করে।

—তা তো বুঝলাম। আর কি করে?

এবার বিলকিসের চোখে-মুখে একটা চতুর হাসির ঢেউ খেলে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা মিট মিট করে আবার একবার হেসে বলল : বলত তোমার কথা বলি ওকে। তা হলে বুঝতে পারবে ও কি করে।

—আহা, বল না।

—ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে বেড়ায়।

—সে কি ?

—সত্যি বলছি। এ পাড়ার ছেলের সঙ্গে ও পাড়ার মেয়ের। এ গ্রামের মেয়ের সঙ্গে ও গ্রামের ছেলের। দিনরাত এই নিয়েই তো থাকে।

চমৎকার একটা মনস্তত্ত্ব। শুনে আমার বেশ ভাল লাগল। ওকে চেনবার সুবিধে হচ্ছে।

কোয়াক কোয়াক কোয়াক, কাঁউ-উক কাঁউ-উক কাঁউ-উক! হঠাৎ ডাহুকের ডাকে নিজের অজান্তেই যেন চমকে উঠলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বিলকিস বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল—

—কি, অমন করে উঠলে কেন! ওটাতো ডাহুক ডাকছে।

—হ্যাঁ ডাহুক ডাকছে। আচ্ছা, তুই এখন যা। আমি শোব।

—জানালাটা বন্ধ করে দিই ? রাতে ঠাণ্ডা আসবে।

—না থাক। তুই যা।

বিলকিস দরজাটা ভিড়িযে দিয়ে চলে গেল। আমি শুয়ে রইলাম। রাতে আরো কয়েকবার ডাহুকটার ডাক শুনতে পেলাম। শেষ রাতের দিকে চোখ দু'টো বুঁজে এল ঘুমে।

সকালে একটু দেরীতে ঘুম থেকে উঠলাম। মুখ হাত ধুয়ে বসতেই বিলকিস ডিমের অমলেট, দুধের সেমাই আর চা এনে দিল। ওগুলো শেষ করে উঠতেই বাইরে কার ডাক শুনতে পেলাম। বিলকিস দৌড়ে গিয়ে দরজার আড়াল থেকে দেখে এসে বলল : যাও, তোমার মাস্টার বন্ধু ডাকছে।

বেরিয়ে দেখি সত্যি। আমাকে দেখেই হেসে উঠে বলল : চা খাওয়া শেষ হয়েছে ?

—এই খাচ্ছিলাম। এস, চা খাও।

—না না, ওসব চা-টা আমি খাই না। ওসব তোমাদের শহুরে নেশা। আমার ওসবের বালাই নেই। চল, একটু বেড়াতে যাব।

—বেশ চল।

চলতে চলতে আমার হাতের দিকে একবার তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল : তোমার রাইফেলটা আজ সঙ্গে নিলে না ?

—না।

—তুমি শিকার করতে এলে গ্রামে অথচ এ পর্যন্ত একটি পাখীও তো মারলে না।

—থাক না, পরে মারা যাবে। আমিতো আর এমন শিকারী নই যে, শিকার না পেলে রাতে ঘুম হবে না!

তারপর সে আমাকে এনে দাঁড় করাল একটা উঁচু গড়ের উপর। এখানে এসে ওর পদক্ষেপটা এমন মন্থরভাবে থেমে গেল যেন এর বেশী যাবার বাসনা তার নেই। এইটুকু এল যেন এখানে আসারই জন্য। সামনে দেখতে পেলাম এক বিরাট জমিদার বাড়ীর ধ্বংসপ্রাপ্ত ভীতিময় রূপ। মাস্টার সেইদিকেই তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর যেন আপন মনেই সে বলতে লাগল: এটা একটা জমিদার বাড়ী। এককালে এ বাড়ীতে কি-ই না হত। আর আজ? ধ্বংসের জমাট অন্ধকারকে ভেদ করে বাইরের বাতাসও বুঝি ভেতরে ঢুকতে পারে না। মানুষের ইতিহাস বড় করুণ। মানুষ শত সংগ্রাম করেও তার কীর্তিকে চিরস্থায়ী করতে পারল না। অথচ সারা জীবন মানুষ ছুটে মরে তার কীর্তির পেছনে। যেমন করেই হোক কীর্তি একটা তার রেখে যেতেই হবে। নইলে জীবনটাই যে ব্যর্থ। কিন্তু কীর্তি যে তার জীবনের মতই সময়ের মন্থর তরঙ্গের মাঝে বিলীন হয়ে যাবে সেটা তার জীবিত মন বুঝতে পারে না। তাই জীবিত কালে তার মাঝে থাকে কীর্তির পেছনে ছুটবার অশান্ত অন্ধগতি। এ গতি যেদিন হঠাৎ থেমে যায় সেদিন একটা অন্ধকার এসে ওকে গ্রাস করে। ওর কীর্তিকে কালো ডানার আড়ালে ঢেকে দেয়। সে অন্ধকারের কোন গতি নেই। সে অন্ধকার নিস্তব্ধ, অটল এবং শাশ্বত।

ওর কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগছিল। ওর বিচারশক্তির সূক্ষ্মতায় বিস্মিত হলাম। এত গভীর যার উপলব্ধি সে যে সাধারণ হতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে জন্ম নিল সেই মুহূর্তেই।

—আচ্ছা, এ বাড়ীতে এখন কোন মানুষ থাকে না? আমি প্রশ্ন করলাম।

—মানুষ! মানুষ কোথা থেকে আসবে? যে জীবগুলো থাকে তাদের মধ্যেই তো সর্বক্ষণ হিংস্র লড়াই চলে। পেঁচার ভয়ে পায়রাগুলো সব পালিয়ে গেছে। ভেতরে যখন শিয়াল ডেকে ওঠে, কুকুরগুলো ছুটে গিয়ে তাড়া করে। মাটির গর্ত, দেয়ালের ফাটল আর অন্ধকার ছাদ থেকে

যখন বিরাট কুটিল কালো কালো সাপগুলো বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে আসে তখন বাদুড় আর চামচিকেগুলো প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়। দৃশ্যটা ভারী চমৎকার তাই না?

—হ্যাঁ, ভারী চমৎকার!

—জমিদারের এক যুবক ছেলে আছে বুঝলে। লেখাপড়া শিখতে ওর বাবা ওকে বিদেশ পাঠিয়েছিল; কিন্তু বিদেশ থেকে ও আর ফেরেনি। মৃত্যুশয্যায় ওর বাবাকেও দেখতে আসেনি। বিদেশী মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। ও কিন্তু বেশ সুখেই আছে। বেঁচে গেছে ছেলেটা জমিদার বাড়ীর বাইরে থেকে। নইলে ওকেও মরতে হত ওর বাবার মত করে। এদিক থেকে ও খুব ভাগ্যবান। কিন্তু ওর জন্যও ভয় আছে। ও কি সারা জীবন সব ভুলে থাকতে পারবে? যেদিন সে তার জন্মকাহিনী জানবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে? এই সব জমিদারদের কাহিনী আমার খুব ভাল লাগে বুঝলে। সব কাহিনীর শেষে দেখবে—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কথা শেষ না করেই থেমে গেল সে। দেখলাম হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কাল বিলের পাড়ে যেমন হয়েছিল। একটা বিষণ্ণ ছায়া যেন নেমে এল ওর মুখের উপর। জমিদার বাড়ীর গেটের উপর একটা পাথরের ঘাড়-ভাংগা সিংহমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

বিকেলেও সে এল। আমাকে নিয়ে কেন যেন বেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে নিয়ে আমার অস্থিরতাও কম নয়। তবে সে অস্থিরতা প্রকাশে আমি প্রথম থেকেই সংযমের আশ্রয় নিচ্ছি। ওর সংযমটা কিন্তু বাঁধ মানতে চাইছে না। এসে ডাকল। আমি বেরিয়ে এলাম। হেসে বলল: বেড়াতে যাবে না? চলো ওদিকটায় ঘুরে আসি।

—চলো। আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

—সত্যিই?

—সত্যি।

সেই কাঠের পুলটার উপর এসে দাঁড়ালাম। আমার এখানে দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল না। সে-ই থেমে পড়ল হঠাৎ। দেখলাম ওর চোখের মধ্যে একটা ভীরু চঞ্চলতা কেঁপে উঠল আপনা থেকেই। কয়েকবার চোখ দু'টো পলকে ঘুরিয়ে পিপুল বনের দিকে তাকাল। বুঝতে পারলাম ও

ডাহুকটার কথা ভাবছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা, ওই ডাহুকটার কি ব্যাপার বলোতো। তুমি অমন করে ছুটে এসেছিলে কেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে সে একবার তাকাল। তারপর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির ভাঁজ ফেলে বলল: ওর উপর তোমার বড় লোভ হয়েছিল, না? ভালই করেছ ওকে না মেরে। মারার পর ওর করুণ মৃতদেহটা দেখে তোমারই দুঃখ হত। ভালই করেছ না মেরে। আর ওটা আমার পোষা ডাহুক কি-না।

—পোষা! তোমার!

—হ্যাঁ আমার পোষা। ওর ভারী দুঃখ, জানো। জুড়িটা মরে যাওয়ার পর একমাস সে শুধু কেঁদেই কাটিয়েছে। গাছের ডালে মাথা আছড়াতে আছড়াতে গলার সব পালক ঝরে গেছে। দেখতে চাও? দেখবে? দাঁড়াও একটু।

এই বলেই সে ঢালু পথে নীচে নেমে গিয়ে মাথাটা নুইয়ে সোজা পিপুল বনের মধ্যে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে দু'হাতে ডাহুকটাকে ধরে নিয়ে সে বেরিয়ে এল। দেখলাম ওর দু'হাতের মুঠির মধ্যে চুপ করে বসে আছে ডাহুকটা আর ছোট কালো গোল চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সত্যিই, ওর গলায় একটিও পালক নেই।

—দেখলে? কি নিরীহ একটা জীব! এবার ওকে রেখে আসি কেমন?

তারপর আবার পিপুল বনে ঢুকে, ডাহুকটাকে ওর বাসায় রেখে, গায়ের কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এল।

নীরবে ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ও কথাই বলল না। ধীর পদক্ষেপে শুধু হাঁটতে লাগলাম। সে আপন মনেই হাঁটছে। আমি শুধু ওকে অনুসরণ করছি। সে পথ থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে চলতে লাগল। মনে হল বিলের দিকেই যাবে। সামনেই বিল। হঠাৎ ওকে প্রশ্ন করলাম: তোমার ডাহুকটা পুরুষ, না?

—হ্যাঁ! মেয়েটাইতো মরেছে।

আবার নীরব। গম্ভীর হয়ে চলতে লাগল। মাথা নীচু করে। তারপর বিলের পাড়ের উপর এসে দাঁড়াল। একটা প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বিলের চার-পাশের নির্জন পরিবেশটা একবার দেখে নিল। দু'চোখে যেন এক গোপন অভিব্যক্তি প্রকাশের স্পন্দনে কাঁপছে। অন্যদিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থেকেই অপ্রত্যাশিত এক প্রশ্ন করে বসল আমাকে।

—তুমি কি একা ?

—একা মানে ?

—একা মানে—এই আত্মীয়-স্বজন, বাইরের বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও অনেকেরই নাকি একান্ত আপন মানুষ থাকে। তোমার কি তেমন কেউ—

—না।

—তাই বলো। সত্যিই, ওসব থাকে না।

এবার সে মাটির উপর বসে পড়ল। আমিও। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল বিলের ওপারের দিকে। তারপর বলে উঠল : আমার কি মনে হয় জান ?

—কি ?

—মনে হয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, প্রাচীন আধুনিক, প্রত্যেক মানুষেরই মনের গভীরে একটা পারত্রিকতা লুকিয়ে থাকে। আর সেই পারত্রিকতাই তার জীবনের শূন্য মুহূর্তে তাকে এক নির্জন নিঃসঙ্গতার পথে টেনে নিয়ে যায়। তখন সেই মানুষ পারিপার্শ্বিকতার সব কিছু থেকেই আলাদা হয়ে যায়। তখন তার এক সুন্দর মুক্তি।

আমি কোন কথা বললাম না। সে থামল। তার চোখ হু'টোও স্থির হয়ে থেমে আছে বিলের কালো পানির উপর। ওর অলক্ষ্যে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নীরবে বসে বসে ধোঁয়া ছাড়ছিলাম মুখ দিয়ে। অনেকক্ষণ পরে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল : কি, কথা বলছ না যে। কি ভাবছো ?

—না, ভাবছিলাম তুমি শহর ছাড়লে কবে ?

—কি বললে ? মুখটা হঠাৎ ওর কঠিন হয়ে উঠল।

—শহর ছেড়েছ কবে ?

—না না, তুমি শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করছো। আমি শহরে থাকতে যাব কেন ? কোনদিনও শহরে ছিলাম না। কি আছে শহরে ? হিংসা, বিদ্বেষ, লড়াই, হানাহানি। হিংস্র সম্পর্ক মানুষে মানুষে। কুটিল প্রতিযোগিতা। ওখানে জায়গা পাওয়া কঠিন। কেউ কারো দিকে তাকায়ও না। অথচ ওরা নাকি মানুষ। না না, তুমি মিথ্যা সন্দেহ করোনা আমার উপর। আমার সম্বন্ধে জানতে চেওনা। আমার মধ্যে কিছু নেই। তুমি ওসব জানতে চেওনা। কি হবে জেনে ?

আকাশের পশ্চিম কোণ থেকে একটা কালো মেঘের পাহাড় প্রবল বেগে উপরের দিকে উঠতে লাগল। ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে খেয়ে সারা আকাশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল সে মেঘ। বিলের উপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল জোরে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম সে নীরবে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম: এখন ওঠা যাক এখান থেকে।

—কেন, মেঘ দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি? আস্তে বলল সে।

—না, ঠিক ভয় নয়। তবে হঠাৎ বৃষ্টি এলে ভিজতে হবে।

অনেকক্ষণ পর মুখটা আস্তে আমার দিকে ঘুরিয়ে শান্ত স্বরে সে বলল: তুমি যাও। আমি একটু পরে উঠব। হঠাৎ বেশ ভাল লাগছে পরিবেশটা। মেঘ-বৃষ্টি বা ঝড়ের জন্য নয়, শুধুমাত্র ওকে এখন বিরক্ত না করার জন্যই আমি চলে এলাম। ওকে এখন একা থাকতে দেয়া উচিত। ওর মুখের উপর ওই মেঘরঙের ছায়া আর চোখের ওই নিঃসঙ্গ সুদূরতা ওর যে একান্ত আপন। ও তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

রাতে ঝড় হল। বৃষ্টি হল। গ্রামবাসীর ঘরের চাল উড়ে গেল। বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ল। ভীষণ শব্দে দূরে কোথাও বজ্রপাত হল। মাঝরাতের দিকে বৃষ্টি থেমে গেল। কিন্তু সারারাত ধরে বাইরে বইতে লাগল এক অশান্ত বাতাস। সারারাত বিছানায় শুয়ে জেগে রইলাম। আর ভাবতে লাগলাম ডাহুকটার কথা। এই দুর্যোগের রাতে না জানি ওর কি হল। আজ একটিবারও ওর ডাক শুনলাম না।

এখান থেকে ছ'মাইল পথ টমটমে গিয়ে স্টেশনে ট্রেন ধরতে হয়। ঠিক করলাম আজই চলে যাব। রাত সাড়ে তিনটেয় টমটমে উঠতে হবে। ভোর পাঁচটায় স্টেশনে ট্রেন। আর শহরে পৌঁছতে প্রায় আটটা বেজে যাবে। বিলকিস বুঝতে পেরেছে যে, এখানে আমার মন টিকছে না। তবু জেদ করল আর ক'টা দিন থেকে যাবার জন্য। আবার আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ওর জেদ থামাতে পারলাম। বিলকিস তখন হেসে বলল: মাস্টারের মত একটা বন্ধুতো তোমার রইলোই। আর অসুবিধা হবে না।

মাস্টারের প্রসঙ্গ পেয়ে ভালই হল। ওর সম্বন্ধে একটা জিনিস আমার জানা বাকি আছে। জানিনা বিলকিস সে-কথা জানে কি-না। তবু ওকে প্রশ্ন

করলাম : আচ্ছা, তোদের মাস্টারের সঙ্গে একটা ছোট্ট মেয়ে থাকে, ও কে জানিস নাকি ?

—জানবোনা কেন ? ওকে মাস্টার নিজের কাছে রাখে। ছ'বছর হল ওর বাবা মারা গেছে। ওর বিধবা মা থাকে ওই পাড়ায়।

ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও মনে মনে যা আন্দাজ করলাম, সে সম্বন্ধে বিলকিসকে আর বেশী প্রশ্ন করতে পারলাম না।

রাতে ঘুমোতে পারিনি। তাই দুপুরের খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়লাম। সারাটা দুপুর ঘুমেই কেটে গেল। বিকেল পাঁচটায় বিলকিসের ডাকে ঘুম ভাংলো। চোখ খুলে দেখি বিলকিস হাতে একটা কাগজের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি উঠে বসলাম। আমাকে কাগজটা দিয়ে বলল : মাস্টারের চিঠি। ওই ছোট্ট মেয়েটি এসে দিয়ে গেল।

দেখলাম চিঠিটাতে কোন সম্বোধন নেই। সোজাসুজি ক'টা লাইন লেখা : শুনলাম আজ চলে যাচ্ছ। আমাকে বলোনি। জানলাম টমটমওয়ালার কাছ থেকে যাকে বলে রেখেছ তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। আমার এখানে একবারও এলেনা। এত কথা শুনলে আমার অথচ আমার ঘরে আসবার ইচ্ছে তোমার একবারও হল না। আশ্চর্য তুমি। আজ সন্ধ্যায় এস কিন্তু। অনুরোধের পেছনে আমার কোন দাবী নেই। তোমার দাবী আছে একে রক্ষা করে একজনকে কৃপা করার। তুমি কি আসবে না ? শরীর খারাপ, নইলে নিজে গিয়ে আনতাম। এস ভাই, এস।

ওর ঘরটা আমি ঠিকই চিনতাম। সামনে একটা কাঠমালি ফুলের গাছ আছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। আমাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। বোধ হয় মাস্টারকে খবর দিতে। আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম মাস্টার বেরিয়ে এল। একটু হেসে বলল : এসেছ তাহলে।

—তোমার নাকি শরীর খারাপ ? কি হল আবার ?

—না, তেমন কিছু নয়। কাল রাতে হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, এই আর কি। এস, ভেতরে এস।

—তোমার অনুরোধ রক্ষা করতেই এসেছি। আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।

—তাই বলে অনুরোধ রক্ষা করা আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করাতো এক কথা নয়।

ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম একটা ছোট টেবিলের উপর কয়েকটা থালা ঢাকা অবস্থায় সাজানো। পাশে এক কাঁদি পাকা কলা। পানির গেলাস। একটা লণ্ঠন জ্বলছে টেবিলের উপর। ওর এত সব ব্যবস্থা দেখে হাসিই পেল। তাই হেসেই বললাম: এগুলো সব আমার জন্য নাকি?

—হ্যাঁ, তোমার জন্যই। চলে যাচ্ছ এখান থেকে, তাই তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে হল তবু যদি তোমার স্মৃতিতে আমার একটু জায়গা থাকে।

মুখটা ওর আজ বড় শুষ্ক। কণ্ঠস্বর নিস্তেজ। চোখ দু'টো অনেকখানি গর্তে ডুবে গেছে।

—কি খাবার তৈরী করেছ দেখি। এই বলেই একটা থালার ঢাকনা তুলে ফেললাম। দেখলাম মাংসের লাল ছোট ছোট টুকরো। ভুনা পাক।

—এটা কিসের মাংস? আমি ওর দিকে তাকালাম।

—শিকারের। অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল সে।

—কি শিকার?

—ডাহুক। ওর উপর তোমার লোভ হয়েছিল। তাই তুমি ওকে মারতে চেয়েছিলে। তাই—

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আশ্চর্য, আমি ভাবতেও পারিনি! ক্রোধের সাথেই যেন বলে উঠলাম: একি করেছ তুমি? এ আমি খেতে পারব না। ডাহুকটাকে তুমি হত্যা করেছ। এমন একটা অমানুষিক—

কথা শেষ করতে পারলাম না। দেখলাম নিষ্প্রাণ একটা মূর্তির মত সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ওর দুই চোখের মধ্যে যেন ডাহুকের একজোড়া অসহায় চোখ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

মানুষ

ফতেহ লোহানী

দিগন্তবিস্তৃত বিশাল মাঠ, তারই বুক চিরে আঁকাবাঁকা গতিতে চলে গেছে ধূলিধূসর পায়েচলার পথ। আরও কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই গ্রামের পথ শেষ হয়ে যাবে, শুরু হবে কালো কালো পাথরকুচির শহুরে রাস্তা। সর্পিল মেঠোপথের ওপর দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলছে ওরা দুজনে।...

কালো রাত্রির পরিত্যক্ত ছায়ার মত ওরা চলছে প্রভাতের দিকে বর্ণহীন তরল আবছায়ার মধ্যে দিয়ে। ওরা এগিয়ে চলে, কিন্তু দেহ ওদের গতি-ভঙ্গীহীন নিস্পন্দ। শুধু চারটি ত্রস্ত-পদের উদ্দাম চঞ্চলতা, অবিরাম ওঠা আর নামা। প্রায় প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনেই চোখ তুলে তাকায়, চেয়ে দেখে দিগন্তের দিকে কখন উঠবে পুব আকাশে লাল সূর্যের প্রথম রেখা। কখন জাগবে ফিকে আকাশের বুকে সমস্ত দিনের গভীর আশ্বাস।

দুজনে দ্রুত পদবিক্ষেপে পাশাপাশি এগিয়ে চলে। একজন নর আর একজন নারী।

মেয়েটি ওপরকার দাঁতের বন্ধনীর তলায় চেপে ধরে নীচেকার ঠোঁট দৃঢ়-ভাবে। কষ্ট হলে দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরা মেয়েটার স্বভাবজাত অভ্যাস। দুজনেই ভিন্ গাঁয়ের বাসিন্দা, মাত্র ঘণ্টাখানেক পূর্বে এই সরু-পথের গোড়ায় ওদের প্রথম সাক্ষাৎ। পরিচয়ের সূচনা অতি সাধারণ।...

রাত তিনটে থেকেই তো আরম্ভ হয় এই মেঠোপথের বুকে এ রকম বহু অভাবগ্রস্থ নরনারীর চঞ্চল পদক্ষেপ, গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে সারা-দিনের আহার্য সংগ্রহ করার দুরন্ত অভিযান। নির্জন মাঠ, রাত্রির গভীর অন্ধকারে মানুষের কলকণ্ঠে আর কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর, প্রভাতের ক্ষীণ-আলোর সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর মিছিল কমতে থাকে, ক্রমেই বিজন হয়ে পড়ে এই দীর্ঘ মেঠোপথ। মেয়েটি বোধ হয় একটু দেরী করেই পথে বের হয়, অত লোকের ভীড়ে ওর চলতে ইচ্ছে করে না হয়ত।

একঘেয়ে পথে একা অনেকবার চলেছে সে, গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বিবর্ণ প্রেত-ছায়ার মত। প্রথম প্রথম গা' ছম্‌ছম্‌ করত, আজকাল কিন্তু ভয় ওর কাছে নিছক কল্পনা বলেই মনে হয়। এই নির্জন মেঠোপথে মাঝে মাঝে সঙ্গিনী জুটে যায়, কোনদিন জোটে পুরুষ সহযাত্রী। আজও তেমনি জুটেছে পাশের গাঁয়ের এই লোকটি।

দাঁতে ঠোঁট চেপে এগিয়ে চলে সে, এভাবে ক্রোসের পর ক্রোস অতিক্রম করতে কষ্ট হয় বৈ-কি। পদক্ষেপ শ্রান্ত শিথিল হয়ে পড়লে জোর করে পা টেনে টেনে চলা ছাড়া আর গতি কি। নাকীসুরে আপন মনে অস্পষ্ট অনুযোগ করতে ভাল লাগে ওর, জোর করে কাঁদতে তো আর পারে না '

"হ্যাগা, গতরটা একটু জিরিয়ে ল্যাও না হেথা," রহিম বকশ মেয়েটার দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

ওছিমন কথা কয় না।

দুজনে আবার এগিয়ে চলে।

মাঠ পেরিয়ে রেল লাইনের কাছে এসে ওরা যখন ওঠে তখন তামাটে সূর্য ওদের মুখোমুখি। সিকি পথ ওরা অতিক্রম করেছে মাত্র, দীর্ঘ রেল লাইন তির্যক গতিতে চলে গেছে বিরাট মাঠের কোল ঘেঁষে। রেল লাইনের ওধারে অনেক দূরে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে শহর। সূর্যের আলো আর বিলীয়মান অন্ধকারে বহুদূরে শহরের ঘিঞ্জি ঘরবাড়ী ঝাপসা দেখা যায়। কতক স্থানে দেখা যায় কাল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। ক্রমশঃ অন্ধকার তরল হয়ে আসে।

ওছিমন ভাল করে চেয়ে দেখে ওর সাথীটিকে। সূর্যের আভা রহিমের পাণ্ডুর মুখে রক্তের ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চোখ দুটি যেন জমাট অবসাদে মুষড়ে পড়ছে, তাতে নির্জীব ঘোলাটে দৃষ্টি। মনে হয়, দেহটাকে যেন বিপুল শক্তিতে এক জোড়া পায়ের ওপর ঋজু রেখে কোন রকমে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে সে, অতর্কিতে একটু তারতম্য ঘটলে অবসাদগ্রস্ত দেহ লুটিয়ে পড়বে হয়ত মাটিতে।

"পেরথম্‌ বাড়ীডায় কিছু পাওয়া যাবে'খন, রজবের মা ওখেন থেকে পেরতি দিন চাল আর ডাল বেইন্দে নিয়ে আসে সেরখানেক কইরে"—ওছিমন বলে ওঠে। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ রহিমের উত্তরের আশায়।

"আর ক'জনা ওই একই কথা কয়, ওখেনে হাত পাতলি খাওয়ার জন্যি কিছু না কিছু মিলবেই নিচ্চে।"—ওছিমন নিজের কথা শেষ করে।

সম্মুখে পাকা বাড়ী, টালির ঘর, আর টিনের আটচালার মাথায় লাল সূর্য উঠে আসে ধীরে ধীরে। আরও ওপরে পুঞ্জীভূত ধূসর মেঘ রক্তিম আলোয় পোড়া তুষের ধোঁয়ার মত আকাশে ইতস্তত: তালগোল পাকিয়ে ভাসে।

"দেখি চেষ্টা কইরে, কিছু পাওয়া যায় কি-না।" —আঁচলের গিঁঠ খুলে পয়সা ছ'আনা ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বাঁধতে বাঁধতে বলে ওঠে ওছিমন। পয়সা ক'টা দিয়েছিল গাঁয়ের ছমির মুন্সীর ছোট ছেলে, যার বৌ ফাঁস নিয়ে মরেছে গেল বছর। হঠাৎ ওছিমনের ভ্রূ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ফাঁসির কথা ভেবে গতরটা শিউরে ওঠে একবার।...

রহিম দিনের আলোতে ভাল করে চেয়ে দেখে মেয়েটাকে, স্পষ্টভাবে দেখার এই প্রথম সুযোগ পায় সে। ওছিমনের মুখ আরও পাংশু মনে হয়, ফ্যাকাসে গাল দু'ধারেই বসে গেছে গভীর রেখায়। দেহে তারুণ্যের স্নিগ্ধতা কিসের যেন গ্লানিতে ম্লান হতে চলেছে।

নিঃশব্দে ওদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় রহিম বকশ। চেয়ে থাকে সম্মুখ পানে। ভেসে আসে নরনারীর কোলাহল, শিশুদের কান্না আর বয়স্কাদের বচসা। কাতারে কাতারে অগুণতি মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে দোকানের বন্ধ দরজার সম্মুখে। কাতার যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড়ালে এজন্মেও কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এ-দৃশ্য দেখে ওছিমন অনুসরণ করতে পারছে কি-না, পেছন ফিরে তা দেখতে রহিমের আর ইচ্ছে করে না। দেহের সমস্ত শক্তি জড় করে এগিয়ে নিয়ে চলে অসার পা' দুটিকে ওখান থেকে সামনের দিকে। এগিয়ে চলা ছাড়া আর উপায় বা কি?...

ওছিমনের অনুসরণ করে বিরাট এক বাড়ীর সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় রহিম। "তুমি এখানে বসে একটু বেশ্রাম কইরে ন্যাও।" ওছিমন রহিমকে বলে—"আমি ভেতর বাড়ী একবার চেষ্টা কইরে দেখি, কিছু মেলে কি-না!"

রহিম কি যেন একটা বলার অপচেষ্টা করেছিল, কিন্তু শুষ্ক কণ্ঠনালী রুদ্ধ হয়ে আসায় কোন স্বর বের হয় না শেষ পর্যন্ত। বিরাট বাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকে রহিম—পুরোন পোস্তা, সান চটে যেয়ে স্থানে স্থানে শ্যাওলা ধরেছে।...

ওছিমন লোহার গেট ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে। ভিতরে বাড়ীর দরজার সম্মুখে পাকা সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। পেছনে ফিরে দেখতে পায়, রহিম বকশ এগিয়ে আসছে রাস্তা থেকে একেবারে বাড়ীর আঙ্গিনার দিকে।

"দুয়ারডায় ধাক্কা দ্যাও না ক্যানে ?" রহিম বকশ বলে ওঠে।

ওছিমনের হাত, মুঠো করা হাতের আঙ্গুলগুলি বিষিয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত। ভিতর থেকে কোন প্রকার সাড়া শব্দ আসে না। গোটা বাড়ীটার বুক থেকে সেই আঘাতের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে শুধু। ওছিমন দৃষ্টি ফিরায় রহিমের দিকে, রহিম বকশ মাথা নেড়ে কি যেন ইঙ্গিত করে।

হঠাৎ এক সময় দরজা খুলে যায়, বেরিয়ে আসে একজন যুবকের বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখ। মুখের ওপর এক গোছা ঘন গোঁফ; দক্ষিণ চক্ষুর নীচে থেকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন চিবুক পর্যন্ত নেমে এসে গোটা মুখখানি বীভৎস করে দিয়েছে।

"যাও !"—লোকটা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে ওঠে।

"আমরা তুমার কাছে কিছু খেতে চাইছি, বাবু।"—ওছিমন এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে। "চাড্ডিখানি ভাত যদি দিতা বাবু। কাল রেতে কিছুই পড়েনি পেটে! বাবু, একটু দয়া কর, বাবুগো !" শেষের কথাগুলি ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে না ওছিমন। ব্যবসাদার ভিখারীদের মত বিনিয়ে বিনিয়ে বলার অভ্যাস এখনও আয়ত্ত হয়নি তার।

"পেট মে কুছ নেহী আছে, সো হামি কি করবে ?"—অনভ্যস্ত ভাষায় স্বাভাবিক জড়তার সঙ্গে লোকটা উত্তর করে। "যাও যাও ভাগো! যেতো সব চোর আওর বদমাশ !"

লোকটা দরজা বন্ধ করে আর কি, হঠাৎ কি মনে করে আবার এসে দাঁড়ায় ওছিমনের সম্মুখে। ওছিমন মুচকি হাসে। লোকটা কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ওর দিকে।

"হামি তুহারকো থোরা কুছু দিতে পারে," লোকটা বলে ওঠে অবশেষে। "লেকিন, দোনো মানুষকা লিয়ে হামার কাছে ওতো খাবার নাহি আছে।" বীভৎস মুখ হাসির রেখায় বারকয়েক কুঁচকে যায়।

ওছিমন চট করে ফিরে তাকায় রহিমের দিকে। রহিম বকশ শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে ইসারা করে।

ওছিমনের ঠোঁটের ডগায় বোধ করি অনেক কথা জমাট বাঁধে—শুনতে না পেলেও রহিমের কাছে তাই মনে হয়। ওছিমন আবার মুচকি হাসে।...

রহিম এগিয়ে আসে কয়েক পা।

"চল গো, এঠেন থেকে অন্য কোথাও যাই।"—ওছিমনের অস্পষ্ট স্বর কেঁপে ওঠে।

"না তুমি যাও না ক্যানে।" রহিম সহজভাবে উত্তর দেয়। "এঠেন যা পাও তা খেয়ে ন্যাওগে যাও। আমার এখন খেতে ইচ্ছি করে না; খিদে নেই মুটেই!"

লোকটা মুচকি হেসে দোর আরও খুলে দেয়...ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায় ওছিমন। সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, রহিম নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সামনের ওই গাছটার ওপর। গাছটার পাতায় অদিনেই তামাটে রঙ ধরেছে......শাখা গেছে শুকিয়ে ভঙ্গুর হয়ে।...

ডালে বসে একটা দাঁড়কাক এতক্ষণ নখে করে একখানা মাংস টেনে টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করছিল, নীচে ঘেয়ো কুকুর বসে বসে গায়ের ঘা চেটে সাফ করে।...

...ক্ষুধার্ত রহিমের পেটের নাড়ি মোচড় দিয়ে ওঠে। ওছিমনের কাছে স্রেফ মিথ্যা কথা বলেছে রহিম। ওকে নিজের ক্ষুধার কথা জানালে হয়ত এই সঙ্গে রহিমেরও একটা ব্যবস্থা হতে পারত। অতি বুভুক্ষু রহিমের কাছে হঠাৎ কেন যেন ওছিমনের কথা ভাবতে ভাল লাগে। ক' ঘণ্টাই বা পরিচয়; এরই মধ্যে ওছিমনের সরলতা, ম্লান সৌন্দর্য আর মন্থরগতি, নিস্তেজ জীবনের চিন্তা অসংখ্য দুর্জয় বন্ধনীর মত আচ্ছন্ন করেছে রহিমের অন্তরকে।...

রহিমের শিথিল এলোমেলো চিন্তাস্রোত ক্রমশ: গাঢ় হয়ে ওঠে অনাবিল সম্বন্ধতায়।...

হঠাৎ কুকুরটা বিশ্রী রকমের একটা চীৎকার করে ওঠে। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে যায়, রহিম উঠে দাঁড়ায়; বেলা অনেক হয়েছে...ওছিমন কত খায়! আহা ও বেচারী হয়ত কতদিনের বুভুক্ষু, কতদিনের উপবাস আজকে নিবৃত্ত করার সুযোগ পেয়েছে।

রহিম দরজায় কয়েকবার আঘাত করে আবার এসে বসে পড়ে পাকা পোস্তাটার ওপর।...

...ঘরের মেঝেতে ওছিমনের পাত পড়েছে। বড় প্রকাণ্ড কাঁসার থালা... দিস্তাকয়েক গরম লুচি...বড় বড় আলুর দম...আর একটি বাটি গরম দুধ। ...সুখের ওপর ষোল আনা—ওছিমন ভাবে। জন্মের ভাগ্যি ওর, তাই না এত সুস্বাদু খাবার আজ পেয়েছে।...

ওছিমন যেন দশ হাতে আহার করে চলেছে। যত তাড়াতাড়ি পারছে একটার পর একটা করে আলু আর লুচি তুলে দিচ্ছে মুখে। ওছিমনের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসে ব্যবসায়ী শিউলাল আগরওয়ালা। ঘরের মধ্যে বস্তা বস্তা চাল আর বিবিধ খাদ্যসম্ভার মজুত রয়েছে। ওছিমন মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হাসে, আর ক্ষিপ্রহস্তে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিতৃপ্তি করে চলে।

"ই-সব আনাজ, তুহাদের লিয়ে হামি রাখিয়াছি"—আগরওয়ালা হাসতে হাসতে বলে ওঠে—"যেখোন দরকার হোবে হামার কাছে আনাজ পাইবি, দাল পাইবি, তুহার মাফিক কেতো মেইয়া লোক হামার কাছে আসিয়া মাঙ্গে, হামি সব চিজ মাঙ্গনি দিয়ে দিছি।"

ওছিমন কথার জবাব না দিয়ে শুধু গিলে যায়...বাঁ হাতে করে কয়েক ভাঁজ লুচি বুকের কাছে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ফেলে...পিছন ফিরে চেয়ে দেখে আগরওয়ালাকে...মুচকি হাসে...টপটপ করে আবার তুলে ফেলে কয়েকটা আলুর দম বুকের ভাঁজে।...

আগরওয়ালা কথা কয়—"তুহার ঘর কোথাকে আছে-রে— অ-আচ্ছিমন?"

"বাড়ী আমাদের অনেক দুরেতে গো।"—ওছিমন জবাব দেয়।

"উনেক দুর হৈলে ফিরাত যাইতে তো উনেক রাত হৈবো!" আগর-ওয়ালা কণ্ঠস্বরে একটু দরদ এনে বলে।

"হ্যে।"—পিছন ফিরে ওছিমন শুধু ছোট্ট করে উত্তর দেয়। আগর-ওয়ালা ভাল করে এবার ওছিমনের দিকে চেয়েছিল—তাই হয়ত ওছিমনের হাত আর ক'খানা লুচি সরাবার চেষ্টা করে মাঝপথে থেমে গিয়ে আবার নেমে আসে থালার ওপর।...

"তুহার সাথমে ও মরদঠো কোন আছে-রে?"—আগরওয়ালা জিজ্ঞেস করে।

একটুখানি ভেবে ওছিমন উত্তর দেয়—"ও আমার সোয়ামি।"

"উহু", হামার কিন্তু বিস্ওয়াস হইতেছে না—আগর সোয়ামি হইবে তো তুহারকে এ-রকম ইধার-উধার ছেড়িয়া দিছে কেনো? বাকি, উওভিতো যোয়ান আছে, কৈ নক্‌রি-উক্‌রি লাগাতে ভি পারে!" আগরওয়ালার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

"হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ।" ওছিমন বলে, "ওই লোকটাই আমার সোয়ামি"—তারপর একটু চিন্তা করে ওছিমন আবার বলে—"পাঁচ মাস ও ব্যারামে পইড়েছিল—তাইতে তো কাজ-কম্মে যেতে পারে নাই।" হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে ওছিমন।

..."আচ্ছা, এখুন আমি যাই, বাবু!" ওছিমন উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে একখানা নিরলস হাসি এনে বলে।

"তো, ফির কোবে আসবি রে...আছ্চিমন?" সেরখানেক চাল আর কিছুটা ডাল ওছিমনের কাপড়ের আঁচলে ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করে আগরওয়ালা। আগরওয়ালার চোখে প্রলুব্ধ দৃষ্টি।...ডাল আর চাল বেঁধে নিয়ে ওছিমন মুচকি হাসে!

"আরেকদিন আসবো, বাবু।" ওছিমন কথা শেষ না হতেই ছুটে বেরিয়ে আসে একেবারে দরজার বাইরে।

বাইরে এসে দেখে পোস্তার ওপর বসে বসে কি যেন ভাবছে রহিম বকশ। রহিম ওঠে দাঁড়ায়, অনুসরণ করে ওছিমনকে। আবার কাঁকর ঢালা পথে ওরা উঠে আসে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলে দুজনে। আগরওয়ালার বাড়ী ওদের অনেক পিছনে পড়ে থাকে...ওছিমন নীরবে কাপড়ের ভাঁজ থেকে লুচি আর আলু বের করে ধরে বুভুক্ষু রহিম বকশের দিকে। কোন কথা না কয়ে রহিম তুলে নেয় সেগুলি নিজের হাতে।...গোগ্রাসে লুচি ক'খানা মুখে ফেলে চিবোতে থাকে...ক্ষুধার্ত দৃষ্টি উচ্ছল হয়ে ওঠে। রহিম বকশ নিঃশব্দে চিবোয় আর চেয়ে দেখে ওছিমনের দিকে। মাটির দিখে চোখ রেখে এগিয়ে চলে ওছিমন।...

আধ ঘণ্টাধরে অনবরত এরা দু'জনে এগিয়ে চলে ফিরতি পথ ধরে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

"এ্যাক্কেবারে পাজি লোক উটি।" হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে দেয় ওছিমনের আর্দ্র কণ্ঠস্বর।

রহিম বকশ কোন কথাই কয় না। চলতে চলতে ওরা প্রায় রেল লাইনের কাছে এসে পড়ে। "ন্যাও, পা চালায়ে হাটো দিকিন, সইন্দে হয়ে এল যে!" রহিম বকশ বলে ওঠে!

ওছিমন নিঃসৃত-প্রায় একটা গভীর নিঃশ্বাস জোর করে চেপে রাখে বুকের মধ্যে।...

রহিম একবার দৃষ্টি ফেরায় পশ্চাতে ফেলে আসা পথের দিকে, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকা নেমে আসে মেঠোপথের ওপর। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে পাশাপাশি ওরা দু'জনে। শুধু বর্ণহীন রাত্রির তরল অন্ধকারে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায় দু'টি মানুষের অন্ধকার ছায়ামূর্তি। মানুষের দুটো অপসৃয়মান কালো ছায়া!......

আতশী

শাহেদ আলী

কথা আছে, আজলের লিখা নাকি পালটানো যায় না। কথাটার সত্যতা আবার নূতন করে প্রমাণিত হল মালেকার বেলায়। দ্বিতীয়বারের স্বামীও তাকে একদিন ঘর থেকে বের করে দিল তালাক দিয়ে। আবার সে ভেসে পড়ে বিপুল সংসারের বিপুলতর অনিশ্চয়তার মধ্যে।

এজন্য অবশ্য বিশেষ কোন ভাবনা নেই মালেকার। যার কিছুই নেই, সমস্ত সংসারটাই যে তার, মালেকা এ কথা বিশ্বাস করে বলে অনেকের ধারণা। নেহায়েৎ কচি বয়সে মালেকা তার বাপ-মাকে হারায়। এক ভাই ছিল বেঁচে, সেও বছর চারেক হল, দুনিয়ার দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে জান্নাতবাসী হয়েছে। যে কয়েক কেয়ার জমিজমা ছিল তাও ঋণের বদলে গাঁয়ের মুসলমান মহাজন গিলে ফেলেছে। সুতরাং মালেকার আর কিছুই নেই এ সংসারে। নারীর অনিশ্চিত জীবনে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই থেকেও বঞ্চিত হয়েছে অনেক দিন।

চৌদ্দ বছর বয়েস—যৌবনের পানি দেহের কিনারায় ফুলে ফেঁপে উঠতে চাইছে—ঠিক এমনি সময়ে প্রথম শাদি হল মালেকার। বড় ভাই লতিফ এক কেতাব-পড়া মুন্সীকে ডেকে এনে 'দানে' শাদি দিল মালেকার; হাতে তাগা বেঁধে মুন্সীর সঙ্গে মালেকার জীবনধারাকে যুক্ত করে দেয়া হল এক শুভ মুহূর্তে।

কালো নয়, ফরসাও নয় মালেকা—মাঝামাঝি রকমের রঙ তার গায়। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল দেহ, স্থির-ধীর রাশভারি মেয়ে, কথা বলে একেবারেই কম। রহস্যের স্বাপ্নিকতায় প্রথম প্রথম কিছুদিন ভালই কাটে মুন্সীর—কিন্তু ধীরে ধীরে সহজ সমতলে বিরোধের পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শিশুকালে মুন্সীর মা-বাবার মানৎ ছিল বেঁচে থাকলে কখনো সে লাঙলের মুঠো ধরবে না; এর মানে এ নয় যে, জান কবজ হবার পর সে শুধু লাঙলই

ঠেলবে কেয়ামত তক্। মুন্সী তাই চাষীর ফরজন্দ হয়েও চাষবাস করে না। কিছু আরবী পারসী পড়েছিল, তারই বদৌলতে সে বাড়ী বাড়ী মৌলুদ আর খতম পড়ে বেড়ায়; বিমারির জানের বদলে সদকা-দেয়া বকরিটা মুরগিটা পাকড়াও করে নিয়ে আসে, আর অবসর সময়ে বসে বসে খালি তাবিজ লেখে। সে তাবিজ যে কত রকমের তার হিসেব দিতে গেলে কেতাব বেড়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত গাছকে কলম এবং সবগুলি সমুদ্রের পানিকে কালি করলেও নাকি আল্লার সিফত লিখে শেষ করা যাবে না। মুন্সীর বাংলা ছুলেমানী কেতাবখানির প্রত্যেকটি হরফের ফজিলত বয়ান করেই কি শেষ করা সম্ভব? বিমার আজারি দুর করা, দুশমনকে তাবে করা, আশেক মাশুককে মিলিয়ে দেয়া—এমন কোন কাজ নেই যা এই পুঁথির দৌলতে মুন্সী পারে না। নেক ছায়েত দেখে সে পুঁথিখানি খুলে বসে, সাদা কাগজে নানা রকম নকশা তুলে তাবিজ লিখে, আর জরুরৎ বুঝে শিনি আদায় করে—সোয়া পাঁচ আনা থেকে পাঁচ সিকে।

একদিন সন্ধ্যের সময় মুন্সী বাড়ী ফিরল একটা লাল মোরগ আর কয়েক আনা পয়সা নিয়ে। প্রায় রোজই মোরগটা না হাঁসটা নিয়ে আসে মুন্সী, এ নিয়ে মালেকা কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি কোনদিন। আজ কী মনে করে সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে বসে—কত দিয়া আনছো মোরগটা?

—মোরগ বুঝি আবার কিনা আনতে অয় নাকি?—মুন্সী বিস্ময় বোধ করে,—বড় বাড়ীর একটা মাইয়া বিমারে ভুগছে অনেক দিন, তারি লাইগা ছদ্‌কা দিছে।

—ছদ্‌কা?—মালেকার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, আর মোরগটা হাত থেকে দলা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়,—এ আমি কাটতে পারব না,—মালেকা দা রেখে হঠাৎ উঠে পড়ে।

—রানতে পারবি না? বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি মিশে মুন্সীর গলার আওয়াজটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

—তোমার হাত পাও নাই? কাজ করতা পার না? চলে যেতে যেতে পেছনে না তাকিয়েই ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলে মালেকা—পরের ময়লা খাইয়া ওফা অইবো না কোনদিন।

মুন্সী এবার চটে আগুন হয়ে ওঠে,—আমি কাজ করতে পারি না!

ভাত-কাপড় বুঝি এমনি জুটে, না? মালেকা এ কথার কোন সাড়া না দেয়ায় মুন্সীর আহত বিক্ষুব্ধ পৌরুষ গর্জে ওঠে। প্রথমে সে মালেকার জটপাকান চুলের মুঠায় ধরে এক চোট কিলমোড়া দিয়ে নেয়, তারপর একটা লতান কঞ্চি নিয়ে বেদম তার পিঠে বসাতে থাকে। কিন্তু এত করেও মালেকার স্থির অচঞ্চলতায় ঢেউ তোলা বড় কঠিন ব্যাপার; একটু আর্তনাদ পর্যন্ত সে করল না, ঠায় দাঁড়িয়ে নীরবে হজম করে গেল সব। শুধু দু-একবার ভোতা নিস্পৃহ মুখ তুলে ভীরু দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল— এই পর্যন্ত।

মেজাজ-চড়ে-যাওয়া মুন্সী তাপ বিকীরণ করে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এক সময়। কিন্তু মোরগের স্বাদু গোশত আর পেটে গেল না আজ, আ-কাটা মোরগ যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকল সারা রাত। শুধু ভাত নিজে বেড়ে নিয়ে নাকে-মুখে কিছুটা গুঁজে দেয় মুন্সী, তারপর মুখ ভোতা করে পড়ে থাকে বারান্দায়। মালেকার সঙ্গে তার আড়ি, অন্যায় ব্যবহারের জন্য যতদিন না মালেকা মাফ চেয়েছে, ততদিন আর মুন্সী এক বিছানায় ঘুমোবে না মালেকার সঙ্গে।

মুন্সী তার আড়ি নিয়ে আছে—এদিকে, পরদিন সকাল থেকেই ভাত রাঁধা বন্ধ করে দিল মালেকা। নিজে উপোষ দিতে শুরু করে; কাজের মধ্যে ঘর-দোরটা একটু ঝাঁট দেয়, বাটি-বাসনগুলো ধুয়ে বার বার সাফ করে, তারপর যেখানে সেখানে নিজেকে একেবারে ঢেলে দিয়ে বসে থাকে বট গাছের মত শক্ত হয়ে; অর্থহীন উদাস দৃষ্টির ঘোলাটে ধূসরতায় মৃত্যুর নিরর্থকতা যেন ছায়া ফেলে।

মালেকার মাথা খারাপ নাকি!—মুন্সী একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। দু-একটি কথাও যদি মালেকা বলত, মুন্সী কিছু বুঝতে পারত হয়ত। কিন্তু ও একেবারে নির্বিকার নিস্পন্দ। নিরুপায় হয়ে নিজেই রান্না চড়ায় মুন্সী।

কিন্তু পুরুষ মানুষের রান্না। কত যে হ্যাঙ্গাম আর ফেসাদ তাতে। হাড়ে হাড়ে তেতো-বিরক্ত হয়ে ওঠে মুন্সী। তৃতীয় দিন সকাল বেলা ভাতের মাড় খসাতে গিয়ে মুন্সী তার ডান হাতের আঙুল পুড়ে ফেলল। সেই পোড়া আঙুল নিয়ে সে ছুটে যায় মালেকার কাছে। মালেকা তখন নির্জীবের মত পিঠ বাঁকিয়ে হাতনের বসে অলস তন্দ্রায় ঢুলছে; তার মুখের

কাছে আঙুলটা তুলে ধরে মুন্সী বললে—দেখ্‌তো, হাতটা কী অইছে? মুন্সীর স্বর অসহায় মিনতিতে প্রায় কান্নার মত বেজে ওঠে—আমার না-অয় একটা ভুলই অইছে! তারি লাইগা, সারা জিন্দেগী এইটা মনে রাখবি তুই? এমন কইরাই বুঝি দিন আম্‌রার যাইব?

বন্ধ্যা দৃষ্টিতে ঢিলে দিয়ে মালেকা মুন্সীর হাতের দিকে তাকায়; তারপর, চোখ দুটো ছোট করে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে ওঠে—এই হাতে না তাবিজ লিখ, বাঁচাইতা পারলা না? মালেকা আবার নিজের অন্ধকার নীরবতায় হারিয়ে যায়। তিনদিন পরে শান্ত সমুদ্রে কিছুটা বুদবুদ উঠে আবার মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

মুন্সীর সারা গায়ে জ্বালা ধরে যায়। তিন দিনের মধ্যে মালেকা এই প্রথম কথা বলল, তাও তার সারা জিন্দেগীর পাক-পেশাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে। গোস্বায় সে বাঁ হাতে চুলের মুঠো ধরে, ডান হাতে পিঁজা দিয়ে ধরে মালেকার মুখে—হারামজাদি,—বদমায়েশ,—জাহিল,—আল্লার কালাম মুখে আইয়ে না,—আর তার বেইজ্জত করবার বেলা ফরফরাস্।

চোখ উলটিয়ে মালেকার দৃষ্টি আসমানের দিকে প্রসারিত হয়। আরো কিছু চড় কিল দিয়ে মুন্সী এবার ছেড়ে দিল মালেকাকে। মালেকা থুথু ফেলে আর তারি সঙ্গে বেরিয়ে আসে লাল টকটকে তাজা লোহু: একটুক্ষণে মিলিয়ে-যাওয়া হাসিতে মালেকার ভাবনাহীন নিষ্প্রভ মুখখানি মুহূর্তে আরো করুণ হয়ে ওঠে। আল্লার কালাম যে মুখে আসে না, পিঁজা দিলে সে মুখ থেকেও কিন্তু তাজা লোহু ছুটে আসে দর্‌দর্ করে।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বিকেল বেলা থেকে আবার রান্নাবান্নায় মন দেয় মালেকা। স্বামীর জন্য দুটো ভাত ফুটোয়, বাড়ী নামার বিছড়া থেকে কলমি কুড়িয়ে আনে, মোরগগুলোকে কুড়ো খাওয়ায়, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কেঁচো খেতে দেয় হাঁসের বাচ্চা ক'টাকে। আর শোবার সময়, শুয়ে পড়ে গিয়ে একেবারে মুন্সীর কাছটিতে।

মুন্সী মনে মনে হাসে—ওষুধে ঠিক ধরেছে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। কিন্তু মারতো আরো কতদিন মেরেছে। মালেকা তো কখনো অমন পোষা কুকুরের মত তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েনি। মুন্সীর আক্কেল এবার একেবারেই ঘুলিয়ে যায়; তবু এই নির্জীব মাংসপিণ্ডটার ওপর করুণা

হয় মুন্সীর, একটুখানি মমতাও। মুন্সীই যে মালেকার পরম আশ্রয়, এ কথা মালেকা তার সর্বদেহের নিবিড় এলায়িত সমর্পণে ঘোষণা করছে আজ! মুন্সী তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর তার গায়ের উপর একটা হাত রেখে কোন কথা না পেয়েই যেন বলে—তুই আমারে পিয়ার করস্, না?

—হুঁউ—মালেকা নাকের ভেতর দিয়ে আওয়াজ করে।

—খুব পিয়ার করস্ বুঝি? রীতিমত কৌতুক বোধ করে মুন্সী।

—হুঁম্—পেয়ারার মতোন,—ঘরের ধন্নার দিকে চেয়ে থেকে মালেকা জবাব দেয়, বোবা দৃষ্টিতে তার কী যে বিশেষ অর্থ ফুটে উঠল—মুন্সী তার কিছুই বুঝল না; সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে মালেকার মুখের দিকে।

ধন্না থেকে দৃষ্টি টেনে এনে মালেকা এবার আরো ঘেঁসে আসে মুন্সীর বুকের কাছে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—আমারে তোমার সহ্যি অয়না, না?

প্রশ্নটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে মুন্সীর কাছে। একটু হেসে সে জবাব দেয়—আমি কেনে? দুনিয়ায় অমন কোন মরদ নাই যে তোরে নিয়া ঘর করতে পারে।

—তা অইলে, তুমি কেনে তালাক দেওনা গো আমারে? মুন্সীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মালেকা বলে, আর দু'হাত দিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে চেপে ধরে তার গলায়।

মুন্সী জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নেয় মালেকার হাত থেকে,—বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মালেকার মুখের দিকে তাকায়। বুদ্ধি তার আচ্ছন্ন হয়ে যায় মালেকার ব্যবহারে। মালেকার দু'চোখ বেয়ে আঁসু গড়িয়ে পড়ছে, ঠোঁটে তার একটা অদ্ভুত বিমর্ষ হাসি, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে—আর কেমন যেন একটা গোপন দুরভিসন্ধিতে সে উষ্ণ নিঃশ্বাস পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

এবার মুন্সীর বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে ক্রোধ ঠেলে ওঠে। এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। শাদির পর থেকেই শরীর কেন ভাল যাচ্ছে না, মুন্সী এবার তার হদিস পেয়ে যায়! এবং এবার সে দু'হাতে জোর করে মালেকার গলা টিপে ধরে।

হাত পা ছুঁড়ে গোঁ গোঁ করতে থাকে মালেকা। এক সময়ে তার দূষিত নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মালেকার গলা ছেড়ে দিয়ে মুন্সী থর থর কাঁপতে থাকে। মালেকা বুঝি মরে গেল! বিড় বিড় করে কলেমা কালাম পড়ে মুন্সী ফুঁ দেয় মালেকার চোখে মুখে। হয়ত, কালামের ফজিলতেই এবার চোখ মেলে চায় মালেকা। মুন্সীর ঈমান আরো শক্ত হয়।

পরদিন থেকে মুন্সী আলাদা বিছানা করে। মালেকার দূষিত নিঃশ্বাসের অশুভ সংক্রামক হাওয়া তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। আগের মতই থোম্ ধরে থাকে মালেকা. অতি-প্রয়োজনেও দু'একটার বেশী কথা তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। মুন্সী মাঝে মাঝে ভাবে—মালেকার ওপর জিন-পরীর আছর হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই, সে ছুলেমানী কেতাব খুলে মালেকাকে তাবিজ দেয়, আর মালেকা সেই তাবিজ আগুনে পুড়িয়ে হাসি-কান্নায় করুণ হয়ে ওঠে। তালাকের ভয় দেখাবার সাহসও মুন্সী আজকাল পায় না,—পারলে মালেকা নিজেই মুন্সীকে তালাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া বিয়ে করাটাও তো এত সোজা নয় যে, একটা বউকে ঘর থেকে বার করে দিলেই আরেকটা সোজাসুজি চলে আসবে! নিজে রান্নাবান্না করার কী যে ফেসাদ তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যাবে তার পোড়া হাতটিতে। অথচ প্রতিটি মুহূর্তেই নিরুত্তাপ নীরবতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

একদিন মুন্সী খতম পড়ে বাড়ী ফিরে দেখে—তার ছনের ঘরটিতে আগুন লেগে গেছে। বুন্‌দা পাকিয়ে পাকিয়ে আগুনের শিখা কৃষ্ণাভ লাল নিশানের মত নেচে নেচে আসমানের দিকে ধাওয়া করছে; কাপড়ের খুট ধরে মালেকা দাঁড়িয়ে আছে আগুনের দিকে চেয়ে—নীরব নিথর—বিস্ময়ের যেন অবধি নেই তার। একটা কিছু জিনিষও মালেকা ঘর থেকে বার করেনি; আগুন নেভানোর জন্য পাড়ার লোকদের চীৎকার করে ডাকারও প্রয়োজন বোধ করেনি মালেকা—যারা এসেছে, তারা আগুন দেখে এমনি ছুটে এসেছে, আর মালেকা দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর হয়ে। আগুনের আঁচ এসে লাগছে নাকে-মুখে, চুল উড়ছে; আগুনের এই ঝড়ের মধ্যে কোন্ আতশী স্বপ্নে সে মশগুল হয়ে আছে—কে জানে?

সেই দিনই মালেকার প্রথম বাসা ভাঙলো। পাড়ার লোকের সবারই বিশ্বাস, এবং মুন্সীরও তাই, মালেকাই আগুন দিয়েছে ঘরে। সুতরাং এবার আগুন লাগে মালেকার কপালে। পরিত্যক্ত মালেকা মুন্সীর ঘর থেকে বার হয়ে আসে নির্বান্ধব সংসারে।

বহু দুর-সম্পর্কের এক মামার আশ্রয়ে মাস চারেক থাকার পর সেই মামারই চেষ্টায়, মালেকা দ্বিতীয় বারের মত কনে সেজে আবার ঘর করতে যায় মুনাওয়ারের সঙ্গে।

একার সংসার মুনাওয়ারেরও। পাশের ঘরে থাকে তার এক বড় বোন ও বোনের সোয়ামী; দখ্‌লের হিস্বা তার ভগ্নিপতির বড় ভায়ের। কালো মোষের মত রঙ, চওড়া বুকের পাটা, মুনাওয়ার বলিষ্ঠ যুবক। সামান্য কিছু জমি আছে তা-ই চাষ করে,—কিন্তু তাতে সারা বছর চলে না, কাজেই দিন গুজরানের নতুন নতুন পন্থা তাকে অবলম্বন করতে হয়।

বউ দেখে প্রথম খুশীই হল মুনাওয়ার। রঙটা মন্দ নয়, তা ছাড়া, ঢলঢলে যৌবনের প্রসাদে ঢিলা ঢালা গায়ে তার স্বাস্থ্যের জৌলুষ কম নয়। শরতের আসমানের মত বৈচিত্র্যহীন দৃষ্টি মেলে সে যখন মুনাওয়ারের দিকে চেয়ে থাকে—সত্যি, মমতা হয় মুনাওয়ারের। কিন্তু বহু কষ্ট করেও যখন বউকে হাসাতে পারল না—তাজ্জবও কম হয় না মুনাওয়ার।

পাড়ার বেড়িয়ে-বেড়ানো মেয়েরা ভাব জমাতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। কারো সঙ্গেই মালেকা বড় একটা কথা বলে না; আর বললেও এমন ভাবে বলে যে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই কারো কারো সন্দেহ হয়। কেউ কেউ মনে করে, মেয়েটা বড় দেমাগী—আবার কেউ কেউ তার পয়লা স্বামীর মতই সন্দেহ করে, মালেকার উপর জিন-পরীর আছর হওয়াও অসম্ভব নয়।

আগে মুনাওয়ার জমিটা ভাগে চাষ করতে দিয়ে নিজে চাকুরী করত। কিন্তু এখন আর চাকুরী করে না: কী করে যে তার দিন গুজরান চলে, গাঁর লোকের কাছে তা রীতিমত গবেষণার ব্যাপার। দিনের বেলা সে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, পাটুনী পাড়ায় তাসের আসরে বসে তাস খেলে, নাচগানের মজলিসে বসে হাততালি আর বাহবা দিয়ে সে প্রমাণ করে, তার মত সমঝদার লোক আর নেই। কথনো কখনো সে রোজ-কামলা হিসেবেও

কাজ করে, প্রায় রাতই বিছানা ছেড়ে কোথায় চলে যায় মুনাওয়ার; এটা ওটা নিয়ে সে যখন চুপি চুপি বাড়ী ফিরে তখন গভীর নিশুতি রাত! মালেকা কিছু বলে না, চোখ বুজে পড়ে থাকে বিছানায়, আর গভীর ঘুমে তার শরীরের প্রত্যেকটি গেরো যেন ঢিলে হয়ে খুলে যায়। মুহূর্তের দুঃস্বপ্নের মতই মুছে যায় তার মন থেকে।

আবেগহীন নিরুত্তাপ মালেকার গাম্ভীর্য পাথরের মতই ঠাণ্ডা আর কঠিন। তবু, এ নতুন বউ-এর স্বাভাবিক লজ্জা ছাড়া আর কী? মুনাওয়ার তাকে আদর করবার চেষ্টা করে—হৃদয়ের উত্তাপ পেলে এ বরফ ভেঙে যে ধারা বয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই মুনাওয়ারের।

ধীরে ধীরে বোবা মেয়েটির বোবা চাহনীও কিন্তু অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, গভীর নিশুতি রাতে মুনাওয়ার যখন এটা ওটা নিয়ে বাড়ী ফিরে, মালেকার সন্দেহ-ভরা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তখন জবাবদিহি করতে হয়, "এসব জুয়োর পয়সা দিয়ে কেনা" অথবা "চিঠি-খেলার দানে" পেয়েছে। মালেকা এসব স্পর্শ করে না, মুনাওয়ার যেখানে রাখে সেখানেই পড়ে থাকে। সুতরাং বাধ্য হয়ে মুনাওয়ারকেই এসব সামলাতে হয়।

এ নিয়ে ক্রমেই অসন্তোষের মেঘ জমা হয়ে ওঠে মুনাওয়ারের মনের আসমানে। স্বামীর জীবন বিপন্ন করে আনা জিনিষ শুধু একটু যত্ন করে তুলে রাখবে, তা-ও মালেকাকে দিয়ে হয় না।

একদিন দুপুর বেলা তাসের আড্ডা থেকে ফিরে মুনাওয়ার দেখতে পায়—রাতের বেলা যে পুরানো থালা-বাসন আর কাপড়-চোপড়গুলো এনেছিল, তার সবগুলোই এখনো চুলো-মুখে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে সে জিনিষগুলো রেখে দেয় ধানের বড় ডোল্‌টার মধ্যে। চওড়া বুকের পাটার ভেতর যেন তুফান শুরু হয়ে যায় মুনাওয়ারের—বিয়ে-করা বউ-এর এত দেমাগ আর হিম্মত।

বারান্দায় বসে, বেড়ায় হেলান দিয়ে মালেকা ঝিমুচ্ছে; চুলে টান পড়ায় সন্ত্রস্ত হয়ে সে তাকায় সামনের দিকে—মূর্তিমান আজরাইলের মত মুনাওয়ার দাঁড়িয়ে। রাগে তার নাক আর ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে সে বললে—জব্বর তো দেমাগ অইছে হারামজাদির। জিনিষপাতি সামলাইয়া রাখবি, তা-ও যদি না পারস্, গলায় দড়ি দিয়া মরতে পারস্ না?

মালেকা থোম্ ধরে বোবার মত চেয়ে থাকে মুনাওয়ারের দিকে। চুলটা ছাড়াবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না সে। শুধু অকারণ কৌতুকে চোখ দু'টো তার বড় হয়ে ওঠে।

—এই শয়তানী—কথা ক'স না কেনে? মুনাওয়ার এবার চাপা ক্রোধে গর্জন করে ওঠে: তার ভারী হাতের চড় আর কিল অবিরাম পড়তে থাকে মালেকার পিঠের ওপর। মালেকা কাঁদে না, শুধু একেকবার গোঁ গোঁ করে ওঠে যন্ত্রণায়।

শেষ পর্যন্ত মুনাওয়ারের বোন মাজেদা এসে মালেকাকে উদ্ধার করে। সহানুভূতিতে গলে গিয়ে সে বলে—মা-গো-মা—কেমন পাষাণী, দেখ চা-ই! একবার নি একটু কান্‌ল—একটু উহ্ নি করল। একি মানুষ না আর কিছু?

মালেকা পরণের কাপড়টা সামলে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ে বারান্দায়, এলোমেলো তেল-না-পাওয়া চুল মুখের ওপর ঝুলে পড়ে মালেকার মুখটাকে প্রায় ঢেকে ফেলে; চুলের ফাঁকে ফাঁকে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মালেকা মাথা নীচু করে বসে থাকে—এক হাত বুকে চেপে দ্রুত শ্বাস পতনকে রোধ করবার প্রয়াস পায়—নিঃশ্বাসের চাপে ফুসফুস যেন ফেটে যাচ্ছে তার।

ঘরের এক কোণে কাঁথা বিছিয়ে মালেকা মাটিতে পড়ে থাকে অবশ হয়ে। যন্ত্রণায় সারা দেহ ছটফট করে। বিকেলে আসে প্রবল জ্বর। পানির পিয়াসে ছাতি যেন ফেটে যায় মালেকার—কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে ঠনার কাছে যায়. কলস থেকে ডোগ্‌লায় পানি ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেলে।

মুনাওয়ার মালেকাকে ডেকে এনে ভাত রেঁধে দিতে বলে। মালেকার যে জ্বর হয়েছে এ কথা যেন বিশ্বাসও করতে চায় না মুনাওয়ার। মেয়ে-লোকের অমন ভর-ধরার সাথে খুবই পরিচিত সে। অমন বজ্জাত মেয়ের সঙ্গে আর সে কথাই বলবে না কোনদিন।

দু'দিন গেল—তবু জ্বর ছাড়ে না মালেকার! জ্বর নিয়েই মাঝে মাঝে উঠে কাঁথা-কাপড়গুলো শুকোতে দেয়, ডোগ্‌লা ভরে ভরে পানি খায়, আর হাতনেয় বসে বসে ঝিমোয়।

কিন্তু মাজেদা আর ক'দিনই বা রান্না-বাড়া করে দেবে মুনাওয়ারকে? মুনাওয়ারকে সে বলে দিয়েছে—আমার ঠেকা লাগছে আর কি! বউরে

আরো মারগা গিয়া—ভাত-সালুন এমনি অইব তখন। সুতরাং মুনাওয়ার অসুবিধায় পড়ে এবার। বাধ্য হয়ে তাকে মালেকার কাছে যেতে হয় ; মালেকার গায়ে হাত দিয়ে তার জ্বর পরখ করবার চেষ্টা করে। মালেকা অনাসক্ত দৃষ্টিতে মির্‌মিরিয়ে চায় মুনাওয়ারের দিকে, শিথিল উদাসীন দৃষ্টির মধ্যে কিছুই যেন খুঁজে পায় না মুনাওয়ার। জ্বর নেই মালেকার গায়। মুনাওয়ার বলে : এ্যাই উঠ্ না। দুইটা ভাত রাঁধ গিয়া—আমার ভারী খিদা লাগছে।

মালেকা কিছু না বলেই উঠে পড়ে—তারপর, চুলোর ওপরে হাঁড়ি চড়িয়ে দেয়।

খেতে বসে মুনাওয়ার জিগ্‌গেস করে—তুই থোম্ ধইয়া থাকস্ কেনে, অসুখ-বিসুখ করছে নাকি ?

দড়মের ওপাশে চুপ করে বসে থাকে মালেকা—কোন জবাব দেয় না।

মুনাওয়ার আবার জিগ্‌গাসু হয়—রা করস্ না কেনে ? অসুখ-বিসুখ কর্‌ল নাকি তোর ?

এবারও কোন সাড়া আসে না দড়মের ওপাশ থেকে। ভাত রেখে উঠে পড়ে মুনাওয়ার, হাত না ধুয়েই সে এগিয়ে যায় চুলো মুখের দিকে, সারা শরীর তার রি-রি করে ওঠে রাগে—এত দরদ, এত আন্তরিকতায়ও মুনাওয়ার পাত্তা পেল না মালেকার কাছে। তবু রাগের ভাবটা সে ঢেকে রাখে—মালেকার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করে—কী, গোঙা অইয়া গেলে নাকি। জিগাইছি, অসুখ-টসুখ করল কিনা। অসুখ করলে ওষুধ আনন লাগত না ?

চুলোর প্রায় নিভন্ত আগুনে ঘরের অন্ধকার ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠেছে। প্রায়ান্ধকারের মধ্যে চুলোর আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছে মালেকা, এবার সে চোখ দুটো বড় বড় করে মুনাওয়ারের দিকে তাকায় ; কতকটা জমাট অন্ধকারের মত সে দাঁড়িয়ে আছে মালেকার সামনে। মালেকা ধীরে অথচ গম্ভীরভাবে বললে—তোমার হাত দুইটারে জিগাইতে পার না ? আবার নিঃশব্দের গহন অন্ধকারে মরে যায় মালেকা। অন্ধকারের অতল থেকে শব্দের ক্ষীণ বুদবুদ উঠে আবার অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

মুনাওয়ার ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে—তবু আজ সে চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দেয়। বিমারীর ওপর হাত তোলাটা ঠিক হবে না। হাত ধুয়ে নিজেই তামাক সেজে কয়েকটা টান দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তবু, তাদের সংসার চলে যায় এক রকম। নানা প্রশ্ন করেও মুনাওয়ার যখন কোন জবাব পায় না, ত্যক্ত হয়ে সে মারপিট করে মালেকাকে। মালেকা আবার থোম্ ধরে বসে থাকে—গায়ে জ্বর তোলে, এবং কয়েক দিন পর নতুন করে আবার সংসারের কাজে লেগে যায়। মুনাওয়ার কী করবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না।

শীতকাল—জাল ও ফাঁদ পেতে বুনো হাঁস ধরার মওসুম। দু'একদিন পরপর দুটো-চারটে হাঁস নিয়ে শেষরাতে বাড়ী ফিরে মুনাওয়ার, অনেক ঠেলাঠেলি করে ঘুম ভাঙ্গায় মালেকার, হাঁসগুলোকে জিইয়ে না রেখে তখন তখুনি জবেহ করে ফেলে—কেটে কুটে রাত থাকতে থাকতেই সেগুলো পাকাতে হবে মালেকাকে। অন্ধকার রাত। দোর এঁটে ছেঁড়া কাঁথাগুলো জড়িয়ে বেহুস হয়ে ঘুমিয়ে আছে মালেকা। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার ওপর সে উঠে বসে ; তুষের আগুনে পাটখড়ি গুঁজে আগুন ধরাচ্ছে মুনাওয়ার ; মালেকা আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

—ঘুমাইয়া পড়লি যে,—আগুন ধরিয়ে প্রশ্ন করে মুনাওয়ার। হাঁসটা রাইন্ধা ফেলা জলদি—সকালে আবার বাজারে যাওন আছে। মালেকা কোন সাড়া দেয় না।

—ঘুমাইয়া পড়লি ? মুনাওয়ারের গলার আওয়াজে বিরক্তি যেন ছাপিয়ে ওঠে।

—হু, চোখ বুজে থেকেই মুখ ফুলিয়ে জবাব দেয় মালেকা, রানতে পারব না আমি।

—পারবি না ? মালেকার সাহসে বিস্ময় প্রকাশ করে মুনাওয়ার।

—রোজ রোজ তুমি মানুষের জাল থনি পক্ষি লইয়া আইবা, আমার বুঝি আর ঘুমানি লাগে না ?—মালেকার বলার ভঙ্গীটা আশ্চর্য রকমের জোরাল হয়ে ওঠে।

মুনাওয়ার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে—হারামজাদি ! রাত্রির নীরবতার বুক ফাটিয়ে সে বীভৎস আওয়াজ গর্জন করে ওঠে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে সাপটে ধরে মালেকার ময়লা জটপাকানো চুলের মুঠোয়।

মালেকা উঠে বসে—ধীরে ধীরে আজ যেন শক্তি সঞ্চারিত হয় তার শিরায়।—চুল ছাড়ো,—অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে মালেকা—না অইলে, চিল্লাইয়া আইজ সব জানাইয়া দিবাম মান্‌ষেরে। মালেকা হাঁপিয়ে ওঠে ; জীবনে এই প্রথম তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সে প্রতিবাদ করলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

মুনাওয়ার তখনো তার চুলের মুঠো ধরে আছে—কী জানাইয়া দিবি ? ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গর্জন করে ওঠে মুনাওয়ার—হারামজাদী, বদমায়েশ,—কমজাতের নাড়ি—ক'না দেখি, কী জানাইয়া দিবি ?

চুল ধরে মুনাওয়ার এক রকম শূন্যে ঝুলিয়ে ফেলে মালেকাকে। মালেকা সোজা দাঁড়িয়ে যায়, মুনাওয়ারের মুখোমুখি হয়। তারপর কপাল কুঞ্চিত করে ঘন ঘন দম নিতে নিতে বলে—তুমি চোর—তুমি শয...তা...

মালেকা তার কথা শেষ করতে পারে না—লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে মুনাওয়ার চেপে ধরে তার মুখে, আর হড়হড় করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে তাজা লোহু বেরিয়ে আসতে থাকে। মুনাওয়ার তার মুখ ছেড়ে দিয়ে চুলে ধরে ঠোঁট কামড়াতে থাকে আক্রোশে। মালেকা মাথাটা একটু নীচু করে নাকে মুখে আজলা পেতে ধরে,—রক্তময় থুথু কুলি করার মত ঢেলে দেয় মুনাওয়ারের মুখের ওপর, হঠাৎ ক্ষেপার মত অট্টহাস্য করে আঁজলাভরা লোহু মাখিয়ে দেয় তার গালে আর কপালে।

মুনাওয়ার এবার মালেকাকে ছেড়ে দেয়। ভাগ্যিস জেগে নেই কেউ—মালেকার ওপর আর জুলুম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রেগেমেগে যদি আরো জোরে জোরে চীৎকার শুরু করে দেয়, মুনাওয়ারের কপাল ভাঙবে। গাঁর লোকেরা অনেকদিন তার গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দিহান ; গত ক'মাসের মধ্যে গাঁয়ে যে ক'টা চুরি হয়েছে, মুনাওয়ার তার প্রত্যেকটাতেই জড়িত আছে বলে অনেকের ধারণা। তাদের এই ধারণাই সত্যি হবে, যদি তারা মালেকার কথা শুনতে পায়,—ভালা চাস্, চুপ কইরা থাক কইলাম—না অইলে, কাইটা গাঙে ভাসাইয়া দিবাম,—চাপা গলায় মুনাওয়ার বলে আর জবেহ করা হাঁসটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে এমনি কিলমোড়া মালেকার কপালে জুটেই। দিনে দু'তিনবার করে নিজেই নিজের মাথায় পানি ঢালে, নতুন হাড়ি

পাতিল ভেঙে নিরালায় বসে করমড় করে চারা খায় আর রান্নার সময় পড়ে পড়ে ঘুম দেয়।

একদিন মুনাওয়ার বললে—রাতদিন খালি ঘুমাইলেই চলবো নাকি। রান্ধা বাড়া বুঝি করন্ লাগে না?

দলামুচি হয়ে মালেকা বিছানায় পড়ে থাকে—কোন সাড়াই দেয় না।

মুনাওয়ার এবার সজোরে ধাক্কা দেয় মালেকাকে—এ্যাই, রাতদিন যে খালি ঘুমাস, কী অইছে তোর? কাজকর্ম নাই বুঝি?

সেই অর্থহীন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মালেকা মুনাওয়ারের দিকে তাকায়, মুনাওয়ার কি বলেছে তাই বুঝবার চেষ্টা করে অনেকক্ষণ, তারপর একবার পেটের কাপড়টা একটু সরিয়ে নিয়ে ডান হাতটা পেটের ওপর রেখে ধীরে ধীরে বলে—কী অইছে, জানো না বুঝি?—চোখের তারায় এবার শ্বাপদ-আক্রোশ জ্বলজ্বল করে ওঠে—চোখ নাই? দেখ না কী অইছে?

মুনাওয়ার বোবার মত চেয়ে থাকে। কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ একঝলক আনন্দে তার সমগ্র সত্তা ঝলমলিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আসে সীমাহীন বিস্ময়। সে সন্তানের পিতা হতে চলেছে! মুনাওয়ার কিছু বলতে পারে না, মালেকার ফ্যাকাসে মুখটার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে, এ মুখও আজ তার কাছে সুন্দর লাগছে।

আস্তে আস্তে মালেকা উঠে বসে—আজরাইল! অভিযোগ মুখর হয়ে ওঠে মালেকার কণ্ঠে—বুমাইলেই অখন গা জ্বলে তোমার। কেন তুমি আমার এই সর্বনাশ করলা? আমি আর বাঁচবাম্ বুঝি? মালেকা দস্তুর মত হাঁপিয়ে ওঠে; এতগুলো কথা এক সঙ্গে আর কোনদিন সে বলেছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ মালেকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়, বহুদিন পর বাঁধ ভেঙেছে, প্রবাহ যেন এবার থামবে না।

মালেকাকে মুনাওয়ার কাঁদতে দেখেনি কখনো। সন্তানের মা হবে মালেকা, কান্নার কী আছে মুনাওয়ার ভেবে পায় না। আস্তা পাগল! আস্তা পাগল!! একে নিয়ে কি আর ঘর-সংসার করা যায়?

কয়েকমাস পর এক মেয়ে এল মালেকার শূন্য কোল জুড়ে। মেয়েকে কোলে নিয়ে মালেকা আকুল বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে, আর টপটপ করে পড়ে তার চোখের পানি।

মুনাওয়ার কিন্তু বিরক্ত হয়ে ওঠে মালেকাকে নিয়ে। সারাদিন মেয়েকে নিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়—রান্নাবাড়ার কাজ থেকে অই মেয়ে যেন তাকে মুক্তি দিয়েছে চিরদিনের জন্য। তা ছাড়া, রাতের বেলা মালেকা আজকাল পাহারা দেয় মুনাওয়ারকে; কোথাও সে যেতে পারবে না, গেলে চীৎকার করে পাড়া-পড়শীকে ডেকে সব জানিয়ে দেবে। মালেকা এবার রীতিমত মুখর হয়ে উঠেছে—একরকম তিরস্কারের ভংগীতেই সে বলে—সাত বাঘেও তো খাইয়া ফুরাইতে পারবে না। মানষের বাড়ীও যদি কাজ কর, আম্‌রার দুইটা পেট চল্‌বোই।

মেয়েটা এসে সাত সাগরের ব্যবধান রচনা করে দেয় মালেকা আর মুনাওয়ারের মধ্যে। পরের বাড়ীতে চাকরী করা—সে হবে না মুনাওয়ারকে দিয়ে। ছোটকাল থেকেই সে চাকরী করেছে—সে জানে তার খুন-ঝরানো জ্বালা কোথায়। তাহলে, মালেকাকে নিয়ে তার আর ঘর করা হল না। অমন অলস, নিষ্কর্মা, নোঙরা মেয়েকে যত শিগগীর তাড়ান যায় ততই ভাল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। উঠোনে বসে মুনাওয়ার চাটাই বুন্‌ছে। হঠাৎ তার ছনের ঘরের চুলোর ওপর দিক্‌কার অংশটুকু হতে একটা আগুনের শিখা লক্‌লকিয়ে ওঠে সন্ধ্যার আসমানে। মুনাওয়ার ছুটে যায় ঘরের ভেতর, ঘরের পেছনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে মালেকা, মেয়েটা বুকের উপর, আর মালেকার দৃষ্টি আগুনের শিখাটির দিকে। সেই আগুনেই মুনাওয়ার দেখতে পায়—অবাক বিস্ময়ে মালেকার ঠোঁট দুটো আলগা হয়ে আছে; আর কৃষ্ণাভ লাল শিখার মতই একটা করুণ হাসির অস্পষ্ট আভাস তার মুখে।

মুনাওয়ার তার ঘরটিকে রক্ষে করতে পারলে না, মাজেদা এবং তার ভাসুরদের ঘরও ছাই হয়ে যায় এক সঙ্গে। সবাই বললে, আগুন মালেকাই দিয়েছে।

দ্বিতীয়বারের মত মালেকার কপালে আগুন লাগে। ঘরপোড়া ছাই নাকে মুখে মাখিয়ে, মেয়েটিকে কেড়ে রেখে, তালাকের অধিকার খাটিয়ে মুনাওয়ার তাকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

যার ঘর নেই—পথই ডেকে নেয় তাকে।

অন্ধকার রাত। বাড়ীর নামার গো-পাটটা ধরে মালেকা বেরিয়ে পড়ে। কেমন যেন হালকা বোধ হচ্ছে তার। গাঁর একেবারে দক্ষিণের বাড়ীতে

গিয়ে রাতের মত আশ্রয় নেয় সে। পরদিন সে সেই বাড়ীতেই থেকে যায়; অন্য কোন সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সে ওদের কাজকর্ম করবে, ওদের বাড়ীতেই থাকবে। ওরা ততদিন খোরপোষ জোগাবে মালেকার।

মালেকা যন্ত্রের মত কাজ করে যায়—কখন কোন কাজটা করবে, তা জেনে নেবার জন্য মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে। একটা অতল স্তব্ধতায় তার সারা অস্তিত্ব মৌন-গম্ভীর হয়ে থাকে। দুই স্তন যখন দুধে ভরে যন্ত্রণায় টন্‌টন্‌ করে ওঠে তখনি মেয়েটির জ্বালাময় স্মৃতি তার মনে জাগে, আর দু'হাতে দুধ টিপে বের করে দিয়ে নিষ্কৃতি পায় সে যন্ত্রণার হাত থেকে।

ভবিষ্যতের ভাবনা এলোমেলো ভাবেও মালেকার মনে আসে না। ভবিষ্যতই যেন অচল হয়ে বর্তমানের বুক চেপে বসে আছে।

তবু, পাড়ায় বেরোলেই নানা জনে তাকে নানা প্রশ্ন করে, টিটকারী দেয়, মালেকা এসব গায়ে মাখে না। পারৎপক্ষে কারো জবাব দেবারই প্রয়োজন বোধ করে না মালেকা। যখন কথা বলে, সেও অমন ভাবে বলে যে, অন্যেরা তাকে পাগল ঠাওরায়, আমোদ বোধ করে।

একদিন গোসল করতে গিয়ে ঘাট-ভর্তি মেয়েদের এক রসালো গবেষণার সম্মুখীন হল মালেকা। গবেষণার বিষয়, মালেকার তিন নম্বরটা কখন জুটছে তাই নিয়ে।

মালেকাই একবার বলল—বৈশাখী ফসল লইয়া সবাই বেস্ত। জষ্টি-আষাঢ় লাগাৎ জুটব আর কি?

মেয়েদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় মালেকার কথায়। মালেকা কোন কথা না বলে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে।

এমনি করে মালেকাকে নিয়ে যেখানে সেখানে নানা রকম রস গাঁজিয়ে ওঠে, মালেকা প্রায় সত্যি বলেছিল—আষাঢ়ের শেষ দিকে আবার পয়গাম এল নিকার। পাটা-বুকার রশিদ মোড়লের তিন নম্বরের বিবি হয়ে মালেকা একদিন মুনাওয়ারের গাঁ ছেড়ে চলে যায়।

এবারের পরিবেশটা মালেকার কাছে একেবারেই নতুন।

বেশ বড় সংসার। দু'সতীন এবং দু'সতীনের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। তাছাড়া চাকর-বাকর আছে। দেনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ ও লাভ-লোকসানের

কোলাহলে মুখর হয়ে আছে মোড়লের সংসার। এই নতুন পরিবেশে মালেকা যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে।

বুড়ো মোড়ল সখ করে মালেকাকে নিকে করেনি। ঘরে দু'টো স্ত্রী আছে বটে, কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়েই তারা ব্যস্ত। তা ছাড়া, বড় স্ত্রী আকলিমা মেদ জমিয়ে জমিয়ে মাংসের পাহাড় হয়ে উঠেছে, নড়াচড়া করাই তার পক্ষে দায়, সংসারের কাজকর্ম চলে না। ছোট দিলারা সূতিকায় ভুগে ভুগে একেবারেই সারা, কাজেই সে এখন খরচের কোঠায়। দায়ে পড়েই মোড়ল আবার নিকে করে মালেকাকে।

এত কাজ মালেকার জীবনে কখনো ছিল না। আকলিমা থেকে শুরু করে, একপাল ছেলেমেয়ে, মায চাকর-বাকরদের ফরমায়েশ পর্যন্ত তাকে খাটতে হয়। কাজে কিছু ত্রুটি হলে কিংবা সময় মত কাজটুকু আদায় করতে না পারলে সবার কাছেই সে বকুনি খায়। বকুনি খেয়েও রা করে না মালেকা, কাজের মধ্যে ডুবে থাকে আর আপন মনে কাজ করে যায়। আকলিমা তাকে উদারি বলে ডাকে, অর্থাৎ মালেকার মত বোকা মেয়ে আর নেই। ছেলেমেয়েরা তাকে 'বটি' সম্বোধন করে। শুধু দিলারাই মাঝে মাঝে তাকে ডেকে সান্ত্বনা দেয় দু'একটা হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বলে। কিন্তু সে সান্ত্বনায় উৎসাহের কোন দীপ্তি দেখা যায় না মালেকার মধ্যে; শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে রোগজীর্ণ দিলারার কাতর মুখের দিকে তাকায়, আর কেমন যেন একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করে সে।

মোড়লের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না মালেকার। ধান দিয়ে ভঁাড়ার ভরবে, টাকায় সিন্ধুক ভর্তি করবে—এই দুই পরম ভাবনায় খণ্ডিত টুকরো টুকরো হয়ে মোড়ল তার হাঁকডাকের সংসারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মালেকার দিকে চাইবার তার ফুরসৎ কোথায়? তবু মোড়লের কাছে মাঝে মাঝে মালেকার ডাক পড়ে এটা ওটা করার জন্যে, মালেকা মাথা নীচু করে কাজ করে যায়, আর সুযোগ পেলে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মোড়লের শাদা দাড়ি ও চুলের দিকে তাকায়।

কাজ সেরে মালেকা ঘরের পেছনের বারান্দায় গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কখনো বা গিয়ে বসে শয্যা-নেয়া দিলারার কাছে, আর তার হাজারো রকমের কাহিনী শোনে। আকলিমা মনে মনে জ্বালা বোধ করে।

একরাতে তামাক সেজে দিচ্ছে মালেকা। হুকোটা হাতে নিয়ে মোড়ল বললে—খালি নাকি বইয়ে থাকস্ হামেশা? কাজ-কামে গাফেলতি করলে তো চলবো না।

মালেকা পায়ের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—দ্যাখ, এত বড় সংসার—মোড়ল আবার আরম্ভ করে, কাজ কাম চলে না—তাইতো দুই দুইটা বিবি ঘরে রাইখা ফিরা নিকা করলাম তোরে। না অইলে আমার কি বিয়ার বয়েস আছে?

মালেকার উদাস দৃষ্টি আরো এলোমেলো হয়ে পড়ে, একবার সে বলে বসে—আমার বুঝি বিয়ার বয়েস নাই? বান্দী আনলে কাজ চলত না তোমার সংসারের?

—বাহ, বান্দী কোনদিন আপন অয় নাকি? মোড়ল হেসে ফেলে—নিজের ভাইবা ঘরের কাজ-কাম বউই করে।

মালেকা বেড়ায় হেলান দিয়ে দরজার ফাঁক দিয়া আসমানের দিকে চায়; কপালের উপরিভাগটা তার কিঞ্চিত কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—অনাবশ্যক একটু হাসির আভাস মিলিয়ে যায় তার ঠোঁটের কোণে।

আকলিমার ছোট ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে মালেকা একদিন একটা চিনির বাটি ভেঙে ফেলে। এ নিয়ে আকলিমা তাকে মারধোর করল, টানা-হেঁচড়া করে ছিঁড়ে দিলে তার নাক-কান-চুল। কয়েকদিন পর আকলিমার মেজ ছেলে ঠিক সময়ে পা ধোয়ার পানি না দেয়ার অপরাধে ডান হাতে বাঁ হাতে চড় বসায় মালেকার দু'গালে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে চোখ দু'টো বড় বড় করে মালেকা বোবা আসমানের দিকে তাকায়, তারপর আবার নিজের কাজে মনোযোগ দেয়।

দিলারা পরামর্শ দেয়—বুড়ার কাছে তুই নালিশ কর না ভইন, বুড়া লোক অতো খারাপ না।

কিন্তু নালিশ? সে কি মালেকাকে দিয়ে হয়।

একদিন দিলারাই মালেকার হয়ে মোড়লের কাছে নালিশ জানায়—শুনছো, বড়-বু আর তার ছেলেমেয়েরা মালেকারে যে মারধোর করে দেখো না বুঝি?

—তা বড় বু-ই যখন তোমরার—একটু হেসে মোড়ল জবাব দেয়, শাসন

তো একটু করতেই পারে। আর অবোঝ ছেলে-মাইয়ারা যদি একটা চড়-খামচা দিয়াই ফ্যালায় তারে মারধোর কইবো, তার মধ্যে মানুষাতি আছে নাকি!

—বুঝছি গো, বুঝছি। একটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী করে দিলারা থেমে যায়। বড় বিবি খান্দানী ঘরের মেয়ে, শাদির সময় অনেক জায়গা-জমি লিখে দেওয়া হয়েছিল তার কাবিনে। তাই তার এত তোয়াজ!—আকলিমার সামনে এলেই মোড়ল যেন নেহাৎ ভিজেবেড়াল হয়ে যায়।

উঠতে বসতে সবাই মালেকাকে ফিঙের মত টেল্‌লাতে শুরু করে, তবু মালেকার পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ ওঠে না।

একদিন আকলিমার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মালেকা বললে—খোয়াব দেখছি বু—আমি আর বাঁচতাম না এখানে থাকলে।—তুমি আমারে বাঁচাও বু!

আকলিমা আমোদ বোধ করে, মালেকা তার পায়ে ধরেছে এর আনন্দ তো কম নয়, তবুও সে পা ছাড়িয়ে নেয় আর কোণা কু'চে করে বলে—উদারীও আবার খোয়াব দেখে! তা বাঁচন না থাকলে মরণ তো আছে লো উদারী?

মালেকা এবার হঠাৎ পাগলের মত উচ্চ হাসিতে ভেঙে পড়ে—ঠিক কইছো বু, বাঁচন না থাকলে মরণ তো আছেই। মরণেই নেউক আমারে। হো হো করে হাসতে লাগল মালেকা, আর তার দু'চোখ থেকে নেমে এল ঝরণার অঝোর ধারা। আকলিমার মনে হল কী একটা যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে মালেকার মাথায়।

কিছুদিন পর। মোড়লের কাছে শুয়ে আছে মালেকা। হঠাৎ থুথু ফেলতে ফেলতে, দু'নাক কাপড় দিয়ে বন্ধ করে উঠে পড়ে মালেকা—তারপর বমি করার ভংগীতে গলায় আওয়াজ করতে থাকে এবং সত্যি একবার বমি করে ফেলে।

মোড়লের ঝানু মগজও যেন খেই হারিয়ে ফেলে—বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলে,—কী অইছে তোর?

—সুদ খাইও আরো বেশী কইরা। মুখটারে যেন টাট্টি বানাইয়া রাখছে, ঘেন্না এবং বিতৃষ্ণা দুই যেন এক সঙ্গে ঠেলে ওঠে মালেকার হৃদয়পিণ্ড উল্‌টিয়ে।

মালেকার মুখের দিকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে মোড়ল। সেই

থমথমে গম্ভীর মুখ আর অর্থহীন চাহনীর দিকে চেয়ে মোড়লের সারা শরীরে আগুনের জ্বালা ধরে যায়।—এতো বড় অপমান!—মোড়ল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে—হারামজাদি—বেতমিজির আর জায়গা পাইলে না বুঝি?—তারপর ধুম্ ধুম্ করে কিলাতে শুরু করে, কিলিয়েও যখন হাতের সুখ মিটল না, খড়ম দিয়ে ঠাস্ ঠাস্ মারতে থাকে মালেকার মাথায়—বজ্জাত বদ্‌মায়েশ, আজ তোরি একদিন কি আমারি একদিন।

মালেকা মাটিতে পড়ে গোঙাতে থাকে যন্ত্রণায়—তবু মোড়ল তাকে ছাড়ে না, দু'হাত বাড়িয়ে মালেকা এবার সজোরে আঁকড়ে ধরে মোড়লের পায়, আর করুণায় মোড়লের হৃদয় কাণায় কাণায় ভরে ওঠে।—আহা, উদারা মেয়েটি,—দুঃখ হয় ওকে দেখলে!

কিন্তু করুণা প্রকাশ করবার সুযোগও পেলে না মোড়ল। তার ডান পায়ের গোড়ালি শক্ত করে ধরে সজোরে আকর্ষণ করে মালেকা· মোড়ল ধপ্ করে পড়ে যায় মেঝের ওপর। আর নড়াচড়া নেই মোড়লের—বেহুস, বেকারার।

এবার মালেকার ঠোঁটে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মোড়লের মুখের দিকে তাকায়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আসে তার মনে, হয়ত করুণা—হয়ত বা শক্তির উপলব্ধি। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যারা মালেকার দুর্দশা উপভোগ করছিল, তারা সবাই এবার আত্মপ্রকাশ করে এপাশে। তারপর, একটা ভীষণ রোল পড়ে যায় বাড়ীতে। দিলারা ঘুমিয়েছিল, আকৃলিমার চীৎকারে সেও ছুটে এল তার দুধের বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে।

বুকে, মাজা ও মাথায় অনেকক্ষণ পানি ঢালার পর হুশ ফিরে এল মোড়লের।

তক্ষুণি, নাক-চুল কেটে মালেকাকে বিদেয় দেবার জন্য পরামর্শ দিলে অনেকে। অথচ, সবাইকে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়ে মোড়ল মাফ করে দিলে মালেকাকে, বললে—সে অমনি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, মালেকার কোন দোষ নেই।

এরপর থেকেই মালেকার কদর বেড়ে যায় মোড়লের কাছে। কিন্তু মালেকা তাতে উত্তপ্ত হয় না, কোন উৎসাহও বোধ করে না। আগের মতই ভূত-মেরে থেকে সে যন্ত্রের মত কাজ করে যায়।

একদিন আচমকা আগুন লেগে যায় মোড়লের বাড়ীতে। মালেকা আগুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চারদিক থেকে চীৎকার করে ছুটে আসে মানুষ। হঠাৎ এক অদ্ভুত হাসিতে মালেকার সারা মুখ অসহায় করুণ হয়ে ওঠে। কেউ না দেখে মত সে চুপি চুপি ছুটে যায় ভাঁড়ার ঘরে; কেরোসিন টিন থেকে বোতল ভরে ভরে ঢালতে থাকে সারা গায়। তারপর...

আগুন নেভাতে-ব্যস্ত একজন লোককে চীৎকার করে বলতে শোনা গেল—সর্বনাশ অইয়া গেছে গো, সর্বনাশ অইয়া গেছে—ছোট বিবি পইড়া গেছে আগুনের মাঝে।

মোড়ল ছুটাছুটি করে ঘর থেকে এটা-ওটা বার করছে। লোকটির চীৎকার শুনে একবাড়ী লোকের মধ্যেই মাথা থাবড়িয়ে হায় হায় করে ওঠে মোড়ল—হায় হায়রে—কী সর্বনাশ অইলোরে আমার। দুই-দুইডা পরাণরে নষ্ট করলো পাগলী। মোড়ল যেন সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে আজ। কিন্তু কী-ইবা সে করতে পারে? দাউ দাউ করে আগুন উঠছে আসমানের দিকে; দুটো ঘর ছাড়া আর সবগুলোতেই লেগেছে আগুন, পাড়ার লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেগুলো রক্ষা করবার জন্য।

সর্বনেশে আগুনের দিকে চেয়ে মোড়ল ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

খড়ম

মুনীর চৌধুরী

মস্‌জিদের সামনে একজোড়া খড়ম। রাত্রির অন্ধকারে এশার নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে, সবার শেষে গেছে সবচেয়ে পরহেজগার ফজু ব্যাপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তারই। সারাদিন পায়ে থাকে। অজু করা দেহ মাটির স্পর্শ পায় শুধু এই এশার নামাজের পর। রাত্রির অন্ধকারে একবার মাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু ব্যাপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করবার মত সুযোগ পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানের মণ কিনে সওয়া চার টাকা দরে বিক্রি করেও নেকবখত আলেম ফজু ব্যাপারীর মণপ্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণের কাছে এ রহস্যের সমাধান অসম্ভব। এমন কি গ্রামের মাতব্বররাও কোনদিন এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হয়নি। খোদার যে প্রিয় বান্দা, খোদার রহমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পারে। গ্রামবাসীরাও তাই বিশ্বাস করত। পাক শরীরে, পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে খোদা তার উন্নতি না করেই পারেন না। সমস্ত দিনের মধ্যেই সব সময়ে পাক থাকতেও তারা দেখেছে ঐ একমাত্র ফজু ব্যাপারীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকির ওপর পাল্লা সামনে সারাদিনই তো ফজু ব্যাপারী ওখানে বসে থাকে। অথচ অজু নেই, এমন কথা কোন ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিই বা এক আধবার পায়খানা-পেসাব করবার জন্য তাকে উঠতে হয় তবু আবার দোকানে এসে বসবার আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রংয়ের পরিচ্ছন্ন খালি গায়ে ফর্সা লুংগি পরে, মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপী পরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ধরে দাঁড়িপাল্লা। হাঁ করে ক্রেতার দল দেখে কি করে অবলীলাক্রমে এক হাতের টানে পাল্লাটা উপরে উঠে যাচ্ছে। একদিকে আধমণি বাটখারা, অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান। একটুও হাত কাঁপছে না, নড়ছে না। সাদা দাড়িগুলো কেঁপে

উঠেছে, কাঁধে পিঠের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়, পেছনের সুসজ্জিত চালের বস্তার থয়েরী পাহাড়ের মত। পঞ্চাশ বছরেও অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা, এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক, নেক লোকই এ শক্তির অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই চালের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তির আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও ফজু ব্যাপারীকে সন্দেহ করার মত পাপচিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের পরিমাপ পরীক্ষা করে দেখবার অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগেনি। আর যদিই বা দেখত, যদিই বা সে মাপে কম ধরা পড়ত—তখন ওরা হয়ত নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করত—কিন্তু ফজু ব্যাপারীকে—!

হাটখোলার মধ্যিখানে বিরাট একটা বটগাছ। কচি-সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা, ঠাণ্ডা, আটাল মাটিতে গতদিনের হাটের ভাঙ্গা গুড়ের হাঁড়ির টুকরো, যাত্রীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা—এমনি আরো বহু ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে রয়েছে। সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। মতি ডাক্তারের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। উল্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বসির উল্লা কারী শুধু তার দোকানের সামনের জায়গাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরের ঝাপি তুলে, শুপুরি গাছের তক্তার মাচায় বসে সুর করে কোরান শরীফ পড়ছে। পাকা বটফলের গোটা খেয়ে বটঘুঘুর ঝাঁক তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোয় ওদের নরম পাখা তেতে উঠে। পত্ পত্ করে হলুদ মাখান ছাই রংগা পাখীগুলো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের উপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপার থেকে ফজু ব্যাপারী আসছে। পুলের মধ্যিখানে একবার থেমে নিয়মিত গলায় জিজ্ঞেস করল—

: কৌগা হাইলি আইজ ?

: অনতাই ছোগা।

পুলের নীচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার উপর লুংগি জড়ানো. উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দু'হাত দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিয়ে একটা বাঁশের 'আস্তা' তুলছে। আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা শ্যাওলাপড়া পুষ্ট চিংড়িমাছ ছপ্‌ছপ্ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা

একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও বরাত ফেরে। বাকী 'আস্তা'টা দেখে ঠিক করে কালা লুংগি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আটটা চিংড়ি হয়েছে। কিন্তু শুধু চিংড়িমাছ দিয়ে কি হবে? অসুখে পড়া মেয়েটা কি খাবে? আগুনে পুড়িয়ে মরিচ দিয়ে সে নিজে না হয় এক বেলা চালিয়ে দেবে, কিন্তু মেয়েটা? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃতপ্রায় লম্বা ঠ্যাংয়ের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোশত কেটে বসিয়ে দেয়।

মেয়েটার ক্ষুধার চীৎকার ভোররাতে তার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। বৌকে সে তাই লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়েই মনে হয়েছে, লাথিটা তার নিজের গায়েই মারা উচিত ছিল। বুকে দুধ থাকলে আরফানী মেয়েটাকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু না থাকলে? মায়ের গোশত মেয়ে খেলে, বোধ হয় তাও পারতো। কালা শিউরে উঠে। আরফানীর বিয়ে হয়েছে মাত্র বছরচারেক হবে: কিন্তু ওর বুকের দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই কেঁপে উঠে। কেমন যেন বাদুড়ের মত কুঁকড়ে চেপ্টে আছে!

: বেগগুন কি ইছা নিরে?

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল, রোজকার মত ভয়ে ভয়ে। মতি ডাক্তার কি বলবে তা সে জানত, শুনতে শুনতে তার মুখস্ত হয়ে গেছে। চিংড়িমাছ নাকি পানির পোকা, ওতে রক্ত নেই। চিংড়িমাছ ক্রমাগত বেশী খেলে নাকি রক্ত সাদা হয়ে যায়, রক্তে পোকা হয়—কিন্তু তার ঐ 'আস্তায়' এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আর কিছুই উঠে না। সে কি করবে?

: কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুইনাইন মিক্চার দিলাম হেইডার হৈয়সা কৈরে কালা?

বলতে বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খলুই থেকে গোটা চারেক বাছাই করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ করে সে বলতে থাকে—

: একছার গুড় গুড়া এনা। তা'আ কাইল আরও চাইরগা দিছ, হেইলেই সাইরব।

বলে ডাক্তারখানার মধ্যে পা বাড়ায়। কালা কোন রকমে উচ্চারণ করে—

: ডাগদর সাব, আঁর মাইয়া বাঁইচব ত ?

ডাক্তার মুখ খিঁচিয়ে উঠে—

: বাঁইচত ন' ক্যা ? বাঁইচব। খোদা বাঁচাইলে বাঁইচত ন' ক্যা।

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

: হাক্‌করি চাই রইছত ক্যা ? খাওয়া, খাওয়া। খাওয়াইলেই মানুষ বাঁচে, বুঝ্যত ? তোর মাইয়া বাঁইচব।

কালার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে। সে টলতে টলতে সরে যায়। ডাক্তার তখনও গর গর করছে—

: বাঁইচত ন' ক্যা ? বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুইনাইনের হানি আর ইছা খাই বাঁচে না।

দু'হাত দিয়ে কালা দু'কান চেপে ধরে। শেষেরটুকু সে শুনতে চায় না। নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখে সে কথা সে শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছা হয় এমন কথা বলবার আগে বাকী চিংড়ী ক'টাও ছুঁড়ে মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে—সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ। যা খেলে মানুষ বাঁচে, রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠল। কেরোসিন টিনের দোকানের কালো বেড়ার উপর চুন দিয়ে লেখা— "এখানে মওতের কাপড় বিক্রি হয়।" ছোট কালের বাড়ীর পাঠশালায় শেখা বিদ্যার উপর ও যথেষ্ট নির্ভর করতে পারে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মওতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড়—কবর দেয়ার আগে যে কাপড়—

ভেতর থেকে দেখতে পেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে—

: চাই রইছস্ ক্যা ? লাইগব নাকি কোনডা ?

: না, না।

কালা কোন রকমে চীৎকার করে উঠে।

: তোর মাইয়া ভালা নিয়ে আইজ ?

: আইজ্ঞেগো দোয়া, আইজ্ঞেগো দোয়া—বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেরিয়ে যায়। যাদের স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পরণের কাপড়

পরিষ্কার, যাদের দেহ 'অজুতে' পাক—তাদের কাছ থেকে কালা পালিয়ে বাঁচতে চায়। ফজু ব্যাপারীর মুখে তার মেয়ের অসুখের খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিয়ে আজ সে বাড়ী ফিরবে না—এ সমস্যার সমাধান হল মুন্সী বাড়ীর বৈঠকখানায়। আধকানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোরাকী ছাড়া। কালা রাজী।

সকাল গড়িয়ে দুপুরের রোদ মাথার উপর তেতে উঠে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাঁজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা আগাছা উপড়ে চলেছে। রোদে পুড়ে পিঠের চামড়া চড় চড় করছে। হাতের টানে এক আধ ফোঁটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শির শির করে উঠে। মনে হয় যেন জ্বর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে।

দু'দিনের অভুক্ত পেট। দু'রাত চালের দুঃস্বপ্ন দেখা চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। কচি ধানের সবুজ আর ঘাসের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ঘাস টানতে ধানের গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপে কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মেলে দেখে সামনের সীমা-হীন বাকী জমিটুকু। সবুজ জল-ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন? জুম্মার নামাজ তো সে কখনও বাদ দেয়নি। আজ সে নামাজ পড়বে, আজ তার জীবনে উৎসব। আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে, দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায়। বাড়তি লুংগি তার শেষ হয়েছে যেদিন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা পঁচিশ টাকা আর ভবিষ্যতের অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরনে লুংগিটা পরেছে একাধারে হপ্তাতিনেক ধরে। লুংগি পাক থাকবে কি করে? সেত আর ফেরেস্তা নয়? আর বৌয়ের সঙ্গে সেত ল্যাংটা হয়ে সংসার করতে পারে না যে রোজ ভোরে গোসল সেরে পাক লুংগি

পরে সে ঘর থেকে বেরুবে? হাসতে হাসতে মুখ নীল হয়ে উঠে। আরো কালো হয়ে উঠে যখন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল তার বৌ আরফানী চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পেছন ছুটতে ছুটতে আসছে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের দু'চারজন গণ্যমান্য লোক। আরফানীর কাপড়ের বাঁধনে না আছে ইজ্জত, না আছে আব্রু। কালা মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হা হা করে, কানফাটা আর্তনাদ করে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিন চার ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনিন মিক্‌শ্চারে বেঁচে থেকে এই ভোরবেলা কালার মেয়েটা ছটফট করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালা গুম হয়ে বসে আছে। দু'হাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জোঁক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পেট ফুলে উল্টে পড়ে আছে। সেই একটুখানি ক্ষীণ রক্তস্রোতের চারপাশের চামড়া পচা পানিতে ভিজে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানী থেকে থেকে গোংগায়—

: আঁাই ভাত খাইয়ুম। আঁাই মইত্তামন, আঁাই মইত্তামন, আঁাই ভাত খাইয়ুম।

কালা পা'টা একবার নাড়ে। দেখে নড়ে কিনা, মারবার জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারীই দয়া করে সব করে গেছে। মায় নিজের দোকান থেকে কাফনের কাপড়টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবার সময় শুধু আরফানীকে বলে গেছে—কাফনের কাপড় বাকী রাখা গুনাহ্। ওতে মুর্দার রূহ কষ্ট পায়। কাফনের বাবদ বাকী তিনটাকা তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানী আবার কাতরাচ্ছে।

: আঁাই মইত্তামন, আঁাই মইত্তামন, আঁাই মইল্লে আঁারও কাফনের কাপড়ের দাম বাকী থাইকব। আঁাই—

কালার পা মাথা সব ভারী হয়ে আসছে। কিছুই আর নড়তে চায় না। কানের কাছে আরফানীর অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোন রকমে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়ার অবধি আসে, তারপর সন্ধ্যার আবছা আঁধারে পথ হাতড়ে বাঁশবনের

ভিতর দিয়ে কালা চলতে শুরু করে দেয়। ছ'চোখ আটাল হয়ে বুঁজে আসে একটা অদ্ভুত ক্লান্ত, শ্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাট লেগে যখন চোখ মেললে তখন দেখে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। খালপাড়ের মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা মনে করতে পারল। হাত পা সব ব্যথায় টন টন করছে।

মস্‌জিদের কাছে এসে হঠাৎ কি মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তার আর মাটি সিঁড়ির সামনে। এশার নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে, সকলে চলে গেছে। সামনের সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শক্ত। বড়। ফজু ব্যাপারীর বলিষ্ঠ পায়ের দাগ। মসৃণ কাঠের উপর আরো কালো হয়ে ছাপ পড়েছে। পানি আর চামড়ার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের গর্ত থেকে আঙুলগুলো স্পষ্ট গোণা যায়। গুণতে গুণতে কালা মাঝির চোখ জ্বল জ্বল করে উঠে। বিড় বিড় করে উঠে : আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন।

নিঝুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে কালা মাঝি ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের পিছন দিকের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত! সড়াৎ করে সে হাতটা সরিয়ে নিল। ভেতরে যেন কারা আছে। কারা যেন নড়ছে। কালা কান পেতে টিনের সাথে চেপে ধরে, ধানের রেঁায়া রেঁায়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ু বিবশ করে দিচ্ছে, আর ভেতর থেকে দ্রুত নিঃশ্বাসস্পন্দিত শব্দ।

: আহ। করস্ কি, এমুই সরি আয়। কাফনের উপর হুচ্ছত ক্যা? এমুই কাইত্যাই আয়।

খিল খিল করে একটা মেয়ে হেসে উঠে—

: কাফনের কাপড় হি-হি হি-হি—বাঃ হেমুই যে আবার তঁর চাইলের বস্তা। অ'াই ইয়ানেই হুইত্তম. চাইলের বস্তার লগে ঠেস দিলে আর ডর কইত্ত না, হি-হি হি-হি।

আরফানীর বিকৃত হাসির কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে উঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসার তপ্ত প্রশ্বাস।

পরের দিন ভোরের বেলায় বটঘুঘুর ঝাঁক যখন রোদের আঁচ পাওয়া মাত্র

উড়ে চলে গেছে, যখন সন্থস্নাত শান্ত সৌম্য ফজু ব্যাপারী তার দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কালা মাঝি। কোমর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফজু ব্যাপারী প্রশ্ন করল—

: কাফনের বাকী দিতে আইলা বুঝি বাবা।

: জি।

: আর কি দিউম? কিছু চাইল?

: না, বাকী ট্যায়া দিয়া কাফনের কাপড় দেন।

চমকে উঠল ফজু ব্যাপারী।

: কাফনের কাপড়! কার লাই?

: আরফানীর লাই।

চমকে উঠেছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য,—তারপরই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু করে। সাদা কাপড়, প্রমাণ মাপের স্ত্রীমুর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবার জন্য যতখানি দরকার।

প্রেম একটি লাল গোলাপ

রশীদ করিম

মাঝে মাঝে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাই। বয়স চল্লিশের কম হবে না। চোখে নীল চশমা, একটা ভোকসওয়াগন চালিয়ে যাচ্ছেন। রুপসীদের কথা গল্প-উপন্যাসে মেলা পড়েছি। চোখে খুব বেশী দেখা যায় না। এই ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, এইমাত্র কেতাবের পাতা থেকে ঝরে পড়েছেন।

শামসুর রাহমানের একটি কবিতায় পড়েছি, তাঁর মনের মত মেয়েটি, চৌকাঠের উপর এসে দাঁড়াল, আর অমনি যেন চৌকাঠ কেউ সোনা দিয়ে মুড়ে দিল। কবিতাটি পড়ে হেসেছিলাম। ভেবেছিলাম, শামসুর রাহমান এখনো ছেলেমানুষ আছেন। কারণ, আজকাল ওসব হয়-টয় না। কিন্তু শেষ হাসিটি কবির জন্যেই রাখা ছিল।

সেই ভদ্রমহিলার দুটি হাত, এখন যখন স্টিয়ারিং হুইলটির উপর দেখি, তখন সেই কৃষ্ণকায় গোলাকার বস্তুটিও, আমার চোখে হিরণ্ময় হয়ে ওঠে।

সকালের রোদ এসে স্পর্শ করে তাঁর অলোকগুচ্ছ, গলার নীচে খানিকটা অনাবৃত অংশ, বাহু, এই অন্তরঙ্গতাটুকু আমার চোখে বেশ লাগে।

ফর্সা, খুবই ফর্সা তিনি। দুধে-আলতা রং যাকে বলে তাই। মেয়েদের গায়ের রং দুধে-আলতা হলে, খুব একটা ডাল dull মনে হবে, আমি ভাবতাম। ভাবতাম, অমন পুতুল পতুল রূপ, আর যার লাগে লাগুক, আমার ভালো লাগবে না। কী ভুলই না ছিল সে ধারণা। এই ভদ্রমহিলাকে যে কী আশ্চর্য মানিয়েছে সেই রং।

তাকে দেখলেই একটা টকটকে লাল গোলাপ ফুটে উঠে, আমার চোখের সামনে। না, ঠিক বললাম না। সাদা গোলাপ আর লাল গোলাপের পাপড়িগুলি ছিঁড়ে যদি একটি লাল-সাদা গোলাপ তৈরী করা সম্ভব হত, তাহলেই তুলনা চলত, এই মহিলার সঙ্গে।

তাকে দেখে গোলাপ ফুলের কথা মনে হবে কেন? তিনি তো এক-জন জীবন্ত মেয়েমানুষ। ফুলটুল তো নন।

শুধু গোলাপ ফুলই নয়। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আমার প্রিয়, তাকে একবার দেখলে, সেসব কিছুই আমার চোখের সামনে স্ফুরিত হয়। এবং যেহেতু দেখি, নিমেষের জন্য, তাই, ঠিক ফুলঝুরির মতই ঝরে পড়ে, আমার ভাললাগাটুকু।

ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি না। লিখতে যাচ্ছিলাম, বলা বাহুল্য, ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি না। কিন্তু বলা বাহুল্য কেন? চিনতেও তো পারতাম। তাই শেষ পর্যন্ত লিখলাম, ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি না।

স্বামী তার কি করেন, কোথায় থাকেন, কেমন দেখতে; বাংলাদেশের জনসংখ্যায় তাদের পার্টনারশীপের রান কত—এসব কিছুই আমার জানা নেই।

মাঝে মাঝে কেবল তাকে দেখি। দু'হাত দিয়ে গাড়ীটিকে একটি শান্ত গৃহপালিত ভারবাহী জীবের মত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ীটিকে দেখে মনে হয়, মানে, যেভাবে গাড়ীটি এগিয়ে যায়, তাই মনে হয়, গাড়ীটি তাঁর নিপুণ দুটি হাতের খুব বাধ্য। দানবকে তিনি বশ মানাতে পারেন। সব অস্থিরতা এসে শান্ত হয়, তার স্পর্শে।

কোন তাড়াহুড়ো নেই তাঁর। পথিকের এবং রাস্তার অন্যান্য গাড়ী-ঘোড়ার অধিকার সম্পর্কে তিনি সচেতন। এক পাশ দিয়ে সকলের অধি-কার রক্ষা করে তিনি এগিয়ে যান, সামনে তাঁর দৃষ্টি।

এক পলক মাত্র তাঁকে দেখতে পাই। অমনি চোখের সামনে, আলকাতরার রাস্তা ফুঁড়ে, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, মাথা তুলে ধরে। আমার সব চাইতে প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের, সব চাইতে প্রিয় লাইনটি, একটা তরঙ্গের মত ভেসে আসে। মরা গাছগুলির শাখা নিমেষে ফুলে আর পাতায় ভরে যায়।

এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে একটি গল্প লিখলে কেমন হয়?

মাঝে মাঝে দেখা হবে। না, কোন বৈঠকখানায় নয়। নয় কোন প্ল্যাটফর্মে, কিম্বা রেল-স্টীমারের মায়াবী কক্ষে।

দেখা হবে এইভাবেই, যেভাবে হয়, পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা রাতে নয়, দিনে দুপুরে, দুই বিপরীতগামী মোটর গাড়ীর শার্সির ভেতর দিয়ে,

এক মুহূর্তের একটা ছোট্ট ঝড়ের মত দেখা। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, কোথাও কোন খেদ নেই তাঁর। ভরপুর জীবন। নেই কোথাও এতটুকু শূন্যতা। এত সুখী মানুষ দেখতে আমার ভালো লাগে না। এত সুখ একটা কুৎসিত জিনিস। তাই মনে হয়, থাকত যদি একটুখানি খেদ, এই মনে করুন, আমার মত একটি লোককে ভালবাসতে পারার সুযোগ না পাওয়ার খেদ, তাহলেই সেই মহিলা মানুষ হিসাবে আমার চোখে আরো একটু উপরে উঠে যেতেন।

কিন্তু স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখেই আছেন তিনি। কোন মতে যদি কোন-কালে, স্বর্গেও পৌঁছে যান, সেখানে পর্যন্ত, এর বেশী সুখ, কি থাকতে পারে, ভদ্রমহিলা সেটা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন না।

এর চাইতে বেশী সুখ থাক, আর নাই থাক, এই সুখটুকুকে যাতে নিরাপদে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারেন, সেইজন্য, তিনি এ বিষয়েও সতর্ক, স্বর্গের দিকে যে চওড়া রাস্তাটি চলে গেছে, সেখানে যেন কোন পদস্খলন না হয়।

তাকে যতবার দেখেছি, একাই দেখেছি। হয়তো রোজ সকালবেলা একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে কোথাও যেতে হয়। কোথাও চাকরি করেন কি? কিন্তু তারও কি চাকরির দরকার আছে? অথবা সমাজকল্যাণ? সমাজকল্যাণই হবে। অথবা কোথাও হয়তো সেলাইয়ের স্কুল খুলেছেন। কিম্বা অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়ান।

তিনি ঠিক কি করেন, নায়কের তা জানবার দরকার নেই। পাঠকদের আরো কম। কিন্তু ঠিক ঐ সময়, ঐ পথ দিয়েই, আমাদের নায়ককেও যেতে হবে,—নিতান্তই পেটের ধান্দায়। আর, আশ্চর্য কি জানেন? দু'জনের গাড়ীই, একই সময় এসে খাড়া হয়, একটি বিশেষ ট্রাফিক সিগনালের কাছে। বা একটু আগেপরে। যেন তারা দিনক্ষণ ঠিক করেই, বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। টাইমিংটাও পার্ফেক্ট, যাতে একই সময়, তারা একই জায়গায় পৌঁছে যায়। কিন্তু সত্যিই তো আর তারা আগে থেকে চুক্তি করে বাড়ী থেকে বার হয় না। তাই মাঝে মাঝে দেখা হবে না। ফস্কে যাবে। মাঝে মাঝে আমি দেখব, সামনে দিয়ে গাড়ীটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্যাচটা মিস করলাম। বুঝতেই পারছেন, এককালে ক্রিকেট খেলতাম।

মাঝে দু'একদিন দেখা না হলে, ছেলেটি ভাববে, মেয়েটির অসুখ হল কি? মাসখানেক দেখা না হলে ভাববে, তার স্বামী নিশ্চয় অন্য কোথাও বদলি হয়ে গেছেন। কিম্বা তারা আর এদিকটায় থাকেন না। অন্য কোন পাড়ায় উঠে গেছেন। তাই আর পথেঘাটে দেখা হয় না।

ছেলেটি যখন নায়িকাকে বলতে গেলে ভুলেই গেছে, এদিক ওদিক দেখে না পর্যন্ত, ট্রাফিক-আইল্যাণ্ডটিকে একটি পোড়োবাড়ী মনে হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই আবার—

একদিন তাকে দেখা যাবে। সেই পোড়োবাড়ীটাই হঠাৎ একটা বিয়ে বাড়ী হয়ে গেছে। সেখানে সানাই বাজছে।

ভদ্রমহিলা আমাকে দেখতে পেয়েছিল কিনা, বুঝতে দেবেন না। দেবেন না, গাড়ীটা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। আর আমি, আমার বয়স, সংসারধর্ম, পথের লোকচক্ষু, এইসব বাঁচিয়ে, যত রকমে পারি, বোঝাতে চেষ্টা করছি যে তাঁকে দেখেছি। কিন্তু সে সোজা তাকিয়ে আছে।

ভারী রাগ হয়। ঠিকই দেখেছে। তাছাড়া, কেউ ওভাবে সোজা নাক-বরাবর তাকিয়ে থাকে?

তারপর—পথ খুলে যাবে। গাড়ীতে আবার স্টার্ট দেবে মেয়েটি। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা এগিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে, মেয়েটি চোখের কোণ দিয়ে, হাসির একটা কণা, মুক্তোর মত, ছড়িয়ে দেবে। আর আমি সেটা লুফে নেব।

মেয়েটি সতর্ক। তবু, সে সাবধান হবার আগেই, এক ঝলক খুশি, তার মুখে, ছলাৎ করে উঠবে। যেন আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতাটি তার মনে পড়েছে—

আনন্দ তুমি কোথায় থাক
আরে এই তো তুমি।

আর আমিও কি এতই বুড়ো হয়ে গেছি, যে এত কিছুর পরও, আমার মনটা, বোম্বাই স্টেডিয়ামের ক্রিকেট পীইচের মতই, একটা লাশ হয়ে পড়ে থাকবে? জী না, তা থাকবে না। কারণ আমার হৃদয়ের পীইচে এখনো যথেষ্ট বাউন্স আছে। লাফ দেয় পিঙপঙ বলের মত।

কি আর বলব লজ্জার কথা, আমারও মনে পড়বে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন :

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে
দেখা হবে চন্দনের বনে।

কিন্তু চন্দনের বনটন আর কোথায় পাব। তাই সে সব ফ্যাশনেবল কোয়ার্টারে দেখা হবে না। দেখাই হবে না। কোনখানেই না।

আর, ছেলেটি ছেলেটি করছি বটে, কারণ, প্রেমের গল্পের যে নায়ক, তার বয়স আর কতই হবে? তা মাশ-আল্লাহ, বয়স একটু-আধটু হয়েছে বৈ কি! যে গল্পের নায়িকারই বয়স চল্লিশ, তার নায়কের বয়স, স্কুল-সার্টিফিকেট অনুসারেও, কোন্ না পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে?

দেখাও হবে না, কথাও হবে না, কিন্তু গড়ে উঠুক না, দু'জনের মধ্যে, বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধনের কথা ঠাকুর বলেছেন।

মেয়েটি কি এতদিনে বুঝতে পারেনি, সেই যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়, যার মাথার দু'পাশের চুল সাদা হয়ে আসছে, তাঁর দুটি চোখ, কাকে খুঁজে বেড়ায়? পেরেছে, ঠিকই বুঝতে পেরেছে। ওটা বুঝতে পারা যায়। সেটা বুঝতে বা জানতে পারার জন্য, খুব একটা কিছু জেনারাল নলেজের দরকার পড়ে না। মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টও হতে হয় না। বুঝবার জন্য মেয়ের দুটি চোখ, আর একটি হৃদয় থাকা চাই। সেদিক দিয়ে আমাদের নায়িকাও কোয়ালিফাই করে। আশা করি করে।

আর সে নিজেও কি, ঐ দুটি উৎসুক চোখের দৃষ্টির জন্য, অপেক্ষা করে থাকে না? কিছুদিন দেখা না হলে, ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় না কি!

হয় হয়। ভদ্রমহিলার স্বামী আছেন। ছবির মত সুন্দর আর সুখী সংসার তাঁর। কিন্তু কোন রন্ধ্র বা ফাটল কি নেই জীবনে? সত্যিই কি নেই? পথের মোড়ে মাঝে মাঝে, ঐ যে একটি মুহূর্ত আসে, মন্দ লাগে না তো! বরং বাথরুমে, শারীরিক আর মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাভরণ হয়ে, একাকী আয়নার সামনে, নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালে, স্বীকার করতেই হয়, তাঁর সুন্দর সুখী জীবনে, এই মুহূর্তটাই একটা বাড়তি সার্থকতা এনে দেয়।

আর সেই ভদ্রলোক? তিনি এত খুশি হন, দেখলেই বোঝা যায়।

সেই ভদ্রলোকের ঐ আনন্দও আর এক রকম আনন্দ মাখিয়ে দেয় মহিলাটির জীবনে।

হ্যাঁ, এতটা পর্যন্ত বলা চলে, তিনি প্রায় লোভীর মতই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেন।

সেই যে দুইপক্ষ থেকেই, ঐ একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকা, তাই দিয়েই মনে মনে রচিত হয়ে যায় ফাল্গুনী? হ্যাঁ, যায়। কিন্তু আমি বলছিলাম, অন্য কথা। শুরু হয়ে যায়, এক নীরব কথোপকথনও।

ভদ্রমহিলা ভাবেন, ভদ্রলোকের স্ত্রী নিশ্চয় খুব সুন্দরী, তিনি নিজে যখন অত সুন্দর। আমি তাহলে সুন্দর? হ্যাঁ, তা একটু আধটু আছি বৈ-কি! তা না হলে, ঐ সুন্দর ভদ্রমহিলাকে ভাল লাগতে—ভালবাসতে?—সাহস হত কি?

ভদ্রমহিলা আরো ভাবেন, স্ত্রী তো নাও থাকতে পারে। বাঃ তাও কি হয়? এতটা বয়স হল, আর একটা স্ত্রী থাকবে না! ওঁর মত লোকের! কিন্তু, এমনও তো হতে পারে, স্ত্রী ছিল, এখন নেই, মরে গেছে। মরে গেলেই বা কি। না, কিছুই না। এমনি বললাম আর কি। সম্ভাবনার কথাটা তো একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কোন দোষ হয়েছে? তা ছাড়া, কেন জানি, ভাবতে ভাল লাগে, ভদ্রলোকের স্ত্রী নেই।

একদিন এমন হতে পারে।

এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ছেলেটা জানে, আজ আর দেখা হবে না। তবু, রোজকার অভ্যাস। ট্রাফিক-লাইটের উপর চোখ পড়ল। না, কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই। ট্রাফিক খোলা। সে গাড়ী ছোটালো যত জোরে পারে। কোনদিকে আর ভ্রূক্ষেপ নেই। পৃথিবীতে দেখবার আর কিছু নেই।

আরে আরে এই তো!

সজোরে ব্রেক কষলো ছেলেটি।

একটা ভোকসওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। ভোকসওয়াগন তো কতই আছে ঢাকা শহরে। কিন্তু ছেলেটির মনে হল, এটি আর কারো হতে পারে না। তারই। ছেলেটি গাড়ীর নম্বর দেখে রাখেনি। তবু তার নির্ভুল মনে হল, এ গাড়ী তারই।

বনেট খোলা। নিশ্চয়ই কলকব্জা কিছু বিগড়ে গেছে। নিজের গাড়ীটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে ছেলেটি ছুটে এল। সে কলকব্জা সম্পর্কে কিছু জানে না। তবু মেয়েটির সব মুশকিল সে আসান করে দেবে।

ভদ্রমহিলা একটা গাছের নীচে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ীটা ঘিরে অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। ছেলেটি ঠিক জায়গায় পৌঁছতে বড্ড দেরী করে ফেলেছে। তার করবার কিছুই নেই। ফালতু হয়ে গেছে সে।

গাড়ীর কাজে সে লাগতে পারল না। ঠিক আছে, তার জন্য তার খুব আফসোস নেই। কিন্তু সে ভাবছে ঐ মেয়েটির ব্যবহারের কথা। মোমের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীর বনেটের উপর চোখ স্থির। সেখানে যেন ভ্যানগগের ওরিজিনালগুলি কেউ লটকে দিয়েছে। চোখে ঠিক তেমনি স্বাধ্বী দৃষ্টি। এতটুকু পাপ নেই। আমাকে দেখেও দেখলেন না। পৃথিবীতে আমার মত অপরিচিত যেন আর কেউ নেই।

তবু আমি অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। কিসের অপেক্ষা নিজেই জানি না। কিন্তু এভাবে বেকুবের মত তো আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এক সময় ফিরে আসব নিজের গাড়ীতে। স্টার্ট দেব; অন্যমনস্ক পা য়্যাক্সিলেটরে চাপ দিতেই, গাড়ীটা বন্য জন্তুর মত, লাফ দেবে সামনে। তখন সম্বিত ফিরে পাব।

আমি কি ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা আমার জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে দেবেন? কিম্বা, সত্যিই দিয়েছিলেন, আমি দেখতে পাইনি? ভেবেছিলাম, অন্তত: একটুখানি হাসবেন? পরিচয়ের একটা আভাস দেখা যাবে তাঁর চোখে? সেসব কিছুই ঘটল না কিন্তু!

রাত্রিবেলা। এখন শোবার সময়। শোবার ঘরে ফিকে নীল রংয়ের আলোটা জ্বলছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাগুলো দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ভদ্রমহিলাকে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাগুলি কিভাবে তাঁকে গ্রাস করল, তিনি দেখলেন। একটি কথাই আজ তাঁর চিন্তা দখল করে আছে। সে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলতে গেলে, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এখন শুতে যাবেন তিনি। ফিনফিনে রেশমের স্লিপিং স্যুটটা চেয়ারের হাতার উপর থেকে টেনে নিলেন। কাপড় বদলে নেবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াবার কোন দরকার নেই। কিন্তু এটা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস।

শাড়ীটা গা থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বয়স হয়ে গেছে—গেছে কি? তাই, ঘরে যখন থাকেন, ব্রা রাখেন না গায়ে। গরম লাগে। পাতলা ব্লাউজের বোতামগুলি খুলতেই, দুই দরজার মাঝখানে, দুধ দুটির মুখ দেখা গেল। একটু বয়স্ক স্তন বটে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এখনো স্বাস্থ্য আছে, রূপ আছে। সায়াটার এজারবন খুলে ফেলেছেন তিনি। কোমরটা অল্প একটু ঝাঁকানি দিয়ে, শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলবেন, হঠাৎ এজারবনের শক্ত করে এঁটে থাকা কোমরের অন্তরঙ্গ দাগগুলির উপর চোখ পড়ল, আর অমনি হঠাৎ ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। একটি আঙুল, জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত নাভির উপর স্থির; মুখে সেই সলজ্জ হাসি, যে হাসিটা দেখা গিয়েছিল, যেদিন স্বামী প্রথম তাঁকে বিবস্ত্র করেছিলেন, সেই রাত্রে।

অনেক অনেক বছর পর, গুটিকয়েক ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছেন, তা সত্ত্বেও, সেই ছেলেমেয়েরাই বড় হয়ে গেছে, তাও, আজ আবার সেই কুমারী হাসি এল কোথা থেকে? তিনি কি আজ আবার কারও কাছে প্রথমবারের মত বিবস্ত্র হচ্ছেন? আরও এক অদ্ভুত হাসি ঝুলে আছে। সে হাসির অর্থ তিনি খানিকটা বুঝতে পারছেন, খানিকটা পারছেন না। তাঁর মনে হচ্ছে, এক অনুপস্থিত দর্শক তাঁকে দেখতে পাচ্ছে।

"এস।"

ভদ্রমহিলার সম্মোহন কাটেনি। এই ডাক যে তিনি সত্যিই শুনতে পাবেন, কল্পনাও করতে পারেননি।

"আসছি!"

অনেকটা অভিভূতের মতই তিনি খাটের দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনও তিনি ভাবছেন, অন্য একটি ঠিকানার কথা। কিন্তু উপস্থিত দর্শকটিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ফিরে পেলেন তিনি।

বললেন, "না, আজ নয়, প্লিইজ!"

"কেন? কি হল?"

"এমনি। ইচ্ছে করছে না। মুড নেই।"

স্বামী ভদ্রলোক। সুবিবেচক। আর কিছু বললেন না। এক সময় ভদ্রমহিলার মনে হবে, দূর, এর কোন মানে হয় না।

তিনি বললেন, "রাগ করলে? আচ্ছা এস।"

"কি হল তোমার আজ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"মেয়েমানুষদের এমন মাঝে মাঝে বোঝা যায় না।"

গল্প তো! বানাচ্ছি যখন, আরও একটু সাজিয়ে তোলা যাক। এদিকে আমাদের নায়কেরও মেজাজ গেছে বিগড়ে। রাত্রিবেলা। স্ত্রী শুয়ে আছে পাশে। উসখুস করছে। কিন্তু, মুখ ফুটে কিছু বলতে চায় না। দরকারও হয়নি কোনদিন।

ছেলেটি,—যদিও সে ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়, 'ছেলেটিই' বলব আমরা তাকে, কারণ, এখন সে তাই হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে অন্য কথা ভাবছে সে।

সে ভাবছে, শুনে রাখ গোলাপ ফুল, কৃষ্ণচূড়া, রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি লাইন, আজ তোমাকে আমি শাস্তি দেব। চপলতা যদি ঘটে থাকে কিছু, করিও ক্ষমা! ঘটবে চপলতা বিস্তর। কিন্তু ক্ষমাটমা আমি চাইব না।

শাস্তি দেব, কারণ অন্তত: একটিবার হাসা তোমার উচিত ছিল। হাসো নি তুমি। মেরামতের অছিলায়, গাড়ীতে একবার হাত দিতে দেওয়া, তোমার খুবই উচিত ছিল। লোকেরা মেরামত করছিল? কলকব্জার আমি কিছুই জানি না? তাতে কি! তোমার গাড়ীতে হাত দিতে পারলে, আমার ভাল লাগত। মনে হত, তোমার গায়েই হাত দিয়েছি।

রাত্রি এখন কটা? আমি কি জানি না, তুমি এখন কি করছ? তুমি ভাবছ, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি? পাচ্ছি। সব দেখতে পাচ্ছি। সব!

এই তোমার দুটি দুধের মধ্যে আমি মুখ রাখলাম।

"বল, কি তোমার নাম?"

"পাগল হয়ে গেলে না কি?

"না না। বলতেই হবে। কোথায় থাক তুমি?"

"কি, হচ্ছে কি! মদ খেয়ে এসেছ না কি!"

"না না। আমি দেখতে চাই, তোমার উরু।"

"আঃ, লাগছে, কি করো!"

পরদিন সকালবেলা। স্ত্রী এল। হাতে এক পেয়ালা গরম চা। মুখে নববধূর মত হাসি। চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে বলল, "কাল তোমার হয়েছিল কি বলত?"

"কেন কেন ?"

"কেন ?"

কিছুক্ষণ স্ত্রী আর কিছুই বলতে পারবেন না। বহুদিন পর আবার সেই নববধূ-হাসি খেলা করতে থাকবে তাঁর সারা মুখে।

"আবার জিজ্ঞেস করছ কেন! কি আমার নাম, কোথায় থাকি—এসব কে জিজ্ঞেস করছিল? আর, আমাকে তো প্রায় জখম করেই ফেলেছ। সত্যি, বলত, হঠাৎ তোমার শরীর অমন থৈ থৈ করতে শুরু করেছে কেন?"

"ছেলেমেয়েরা কৈ?"

"স্কুল-কলেজে গেছে। বেলা কি কম হয়েছে। এবার ওঠ।"

অফিস যাবার জন্য গাড়ী বার করছি। হঠাৎ মনে হল, নিজের স্ত্রীকে ওভাবে অপমান করা ঠিক হয়নি।

॥ দুই ॥

তারপর কিছুদিন গড়িয়ে যাবে! দেখাটেখা হবে না।

নায়িকার চোখ দুটিও সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াবে। সেই যে আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে ছিল, আর একটি উন্মাদ মুহূর্তে মনে হয়েছিল, তিনিও আছেন কাছেই, সেদিন থেকে সত্যিই যেন সে বড্ড কাছাকাছি এসে গেছে, সেই ভদ্রলোকের। বড্ড যেন অন্তরঙ্গ মনে হয় তাঁকে। মাঝে মাঝে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

একদিন। ছেলেটি যাচ্ছে দুপুরবেলা নিজেই গাড়ী চালিয়ে। মাথার উপর আকাশটা একটা বিবস্ত্র মেয়েমানুষের মত শুয়ে আছে।

একটি ছোট্ট দোকান চোখে পড়ল। সেই ভদ্রমহিলা কিছু কিনছেন। কি করা যায় এখন?

ফার্স্ট থিংগ ফার্স্ট। আপাততঃ গাড়ীটা তো পার্ক করে রাখি। কাছাকাছি কোন গাছও নেই যে তার নীচে দাঁড়াব।

ন্যাড়া গাছের মত ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দোকান থেকে বেরিয়ে তো এক সময় আসতেই হবে। তখন এক পলক দেখে নেব। সত্যি, একবার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। অনেকদিন দেখিনি তো! দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে।

বেশ বুঝতে পারছি, মাথার চাঁদিতে পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু ঘাম, তারার মত ফুটে বেরুচ্ছে।

"আরে আপনি। এই রোদে দাঁড়িয়ে করছেন কি?"

রফিকুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে অন্ততঃ দশ বছর দেখা হয়নি। আর আজ কি না এইখানেই।

"না, মানে, এই আর কি—দাঁড়িয়ে থাকে না লোকে?"

রফিকুল্লাহ সাহেব জবাবটা শুনলেন। তবু তাঁর চোখ দুটি দেখে মনে হল, তিনি আরও কিছু শুনতে চান।

তাই আবার বলতে হল, "হঠাৎ পেট্রল ফুরিয়ে গেল কি না।"

"কোথায় যাবেন, চলুন না, আপনাকে নাবিয়ে দিয়ে আসি।"

"না ধন্যবাদ। ড্রাইভার গেছে কি না, এক টিন পেট্রল আনতে!"

রফিকুল্লাহ সাহেব চলে গেলেন।

এতক্ষণে সেই ভদ্রমহিলা দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। জীবনে খুব কমই এত বোকা হয়েছি। এ ভদ্রমহিলা আর একজন। দূর থেকে মনে হয়েছিল......

আজকের দিনটা ভাল যাচ্ছে না। কেন জানি মনে হচ্ছে, কপালে আরও দুঃখ আছে। আচ্ছা, আবার যদি রফিকুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? দশ বছরে একবারও হয়নি। কিন্তু দশ মিনিটেই যদি দুবার হয়ে যায়। জীবনে কত হয়েছে এমন। টু হানড্রেড রানস ফর নো উইকেট। দশ মিনিট পর, হানড্রেড এ্যাণ্ড ফাইভ রানস ফর সেভেন উইকেটস! এ রকম তো হরহামেশাই হচ্ছে।

তখন কি করব? ড্রাইভার তো নাই গাড়ীতে। কি বলব? ওঁকে যে রকম দেখলাম, কথাটা তিনি জিজ্ঞেস করবেন নির্ঘাত।

হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখেছি, সেইভাবে চমকে উঠলাম। ভূত অবশ্য নয়; রফিকুল্লাহ সাহেব। তিনি মাথার উপর প্রাণপণে তাঁর দুটি হাত নাড়িয়ে আমাকে থামতে বলছেন।

"আরে ভাই, এবার আমার গাড়ীটাই হঠাৎ অচল হয়ে গেছে। কিছু-তেই যদি স্টার্ট নেয়।"

"আমি কি একটা লিফট দিতে পারি?"

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু কোনমতে কথাটা বলেই ফেললাম।

" হ্যাঁ। যদি কষ্ট না হয়, একটু গুলিস্তানে নামিয়ে দেবেন কি!"

"নিশ্চয়ই। কি যে বলেন, কষ্ট আবার কি।"

দরজা খুলে দিলাম। রফিকুল্লাহ্ সাহেব পাশে বসলেন।

"কৈ? আপনার ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কে? ড্রাইভার? ও, ড্রাইভার। তাকে ছুটি দিয়েছি।"

"আরে, সাহেব, দেখুন দেখুন, সামনে একটা ট্রাক।"

দিন ছয়েক পরের কথা।

আজ কেন জানি মনে হচ্ছে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হবে। এটা ঘটতে দেখেছি বারবার। যে দিন সেটা আশঙ্কা করেছি, কোন পূর্বাভাস ছাড়াই, তাই ঘটে গেছে। আবার খুব করে যা চেয়েছি, তাও মাঝে মাঝে সেদিনই পেয়ে গেছি।

আজ বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে, আর মনও বলছে দেখা হবে। রাস্তায় একটা ভোকসওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তিন তলায় আমার অফিস কামরা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এদিকে মুখ করেই গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। অন্যমনস্ক মহিলার আঁচল একটু সরে গেছে। লো-নেক ব্লাউজের উপর সকালের রোদ এসে পড়েছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি-ই; অমন বাহু আর কার হবে?

একবার মনে হল, নীচে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু যদি তিনি না হন? এই ভাল।

॥ তিন ॥

সন্ধ্যাবেলা।

ক'দিন থেকেই স্ত্রী বলছেন, একটু নিউমার্কেট যাওয়া দরকার, কিছু কেনাকাটা করবার আছে। সুতরাং, আজ আমাকে বেরুতে হয়েছে। সঙ্গে স্ত্রী আছেন; আছে কন্যা, কলেজে পড়ে; এবং পুত্র ম্যাট্রিকের ছাত্র; আজকাল বোধ হয়, স্কুল-ফাইনাল বলে।

সেই ট্রাফিক সিগনাল।

ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, সেই ভোকসওয়াগন। স্টীয়ারিং ধরে আছেন এক ভদ্রলোক...বলে দিতে হবে না, তিনিই স্বামী। সেই স্বামীর সঙ্গে একটা তুলনামূলক বিচারের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভাল করে আর একবার ফিচারগুলি দেখে নেবার সাহস হল না। পাছে আমার স্ত্রী মনে করেন, আমি তাঁর স্ত্রীকেই দেখছি। সেই ভোকসওয়াগনের পেছনে বসে আছে, দুটি তরুণী ও এক তরুণ। নিশ্চয়ই তাঁদের সন্তান। আর কে হবে?

সেই যে বিনি সূতোর একটা বাঁধনের কথা বলেছিলাম, এখন দেখা গেল, শূন্য থেকে সেটাকে কেউ যেন ছুঁড়ে দিল, এবং সাতপাক থেকে সেটা আলগা হতে হতে, কাঁপতে কাঁপতে নেবে এল, আর সেই মহিলা ও আমার মাঝখানে, একটা সেতুর মত, পাশাপাশি, কাত হয়ে স্থির হয়ে গেল।

পথভরা লোক, যান চলাচল, বিচিত্র কলরব, সঙ্গেই আমাদের পরস্পরের ফ্যামিলি, তবু আমার মনে হল, আমরা দু'জনা যেন গাড়ী থেকে নেবে এসেছি, সেই সূতোর মত পুলের উপর দাঁড়িয়েছি, কিছু একটা বোঝাপড়া করছি, কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, আর মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে আমরা দু'জন ছাড়া, আর কেউ থাকে না। আর কারও থাকবার দরকার নেই।

তবু বুঝতে পারলাম না, কি কারণে মনটা আমার ভার হয়ে থাকল। হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে, মেয়েটি আমাকে এতদিন ঠকিয়েছে। কি একটা অপরাধ সে করেছে আমার কাছে।

গ্রীন সিগন্যাল। গাড়ী ছুটতে শুরু করল আবার।

আমি জানি, পরদিনই আবার দেখা হবে। সেই একই জায়গায়। কিন্তু দেখা হল, ঠিক পরদিন নয়; মাঝে একটা দিন বাদ দিয়ে। একজন কিশোরের মত অভিমান আমাকে বিমুখ করে রাখল। মেয়েটিও কি এক লজ্জায় অধোমুখ হয়ে আছে।

পরপর ক'দিনই দেখা হয়ে গেল। আমরা যেন সময় ঠিক করেই বাড়ী থেকে বার হই। তবু মেয়েটির সঙ্গে আমি আর কথা বলি না; অর্থাৎ, মান হয়েও।

একদিন মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে একটুখানি হাসল। যেন, সে সন্ধি করতে চায়।

সেই হাসি যেন আরও বলতে চায় আমাকে, কি ছেলেমানুষি করছো তুমি? আমি কি কখনো বলেছি, আমার স্বামী নেই, পুত্রকন্যা নেই?

তোমারও তো আছে। আমি কি কখনো নালিশ করেছি ?

কিন্তু অভিমান তো, তার কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। তাই আমার মনের মেঘ কেটে যেতে আরও সময় লাগবে।

তারপর আমি বুঝে ফেলব।

মহিলাটিকে খুঁজে বেড়াব আবার। এক পলক দেখা হলে, চোখের সামনে দেখতে পাব, গোলাপফুল, কৃষ্ণচূড়া, কানে আসবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি লাইন।

॥ চার ॥

আপনারা ভাবছেন, আচ্ছা লোক তো, স্ত্রীকে একটুও ভালবাসে না ; কেবল পরস্ত্রীর উপর লোভ। কিন্তু ভুল করলেন। স্ত্রীকে আমি ভালবাসি খুবই। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারি না। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না ? কিন্তু, সত্যি কথাই বলছি। তাহলে ঐ মেয়েটি ?

হাঁ, তাকেও ভাল লাগে ? কি করে সম্ভব ? সেটাই আপনাদের বোঝাতে পারব না যদি না নিজে থেকেই বোঝেন। সত্যিই কি বুঝতে পারছেন না ?

॥ পাঁচ ॥

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা, ভদ্রমহিলার পাশে যে স্বামী ভদ্রলোকটি বসে ছিলেন, তিনি রফিকুল্লাহ সাহেব।

ক্ষুধা

শামসুদ্দিন আবুল কালাম

শহরের লংগরখানা বন্ধ হইবার পর আমেনা আবার গাঁয়ে ফিরিয়া আসিল।

স্বামী-পুত্র দু'জনেই বসন্তে মরিয়াছে। সে যে কেন বাঁচিয়া রহিল, একথা মূক বিধাতাকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর মেলে নাই। শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইয়া জেলাবোর্ডের পথ হাঁটিয়া সে গাঁয়ে পৌঁছিল। ভাবিয়াছিলাম এখন পৌষ মাসের দিন, ধান ভানিয়া বা ক্ষেতের ঝরা ধান কুড়াইয়া কয়েকটা মাসের জন্যও তো নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

কিন্তু যে বাড়ীতে বরাবর ধান ভানিত, সেখানে গিয়া শুনিল যে তাহারা যতটা সম্ভব নিজেরা এবং বাকিটা ঝালকাটীর কলে ভানাইতেছে, সুতরাং এবারে তাহাদের কোন লোকের প্রয়োজন নাই। গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন বাড়ি মাত্র দুইটি—অন্য বাড়িতে গিয়া দেখিল তাহারাও নিজেরা ঢেঁকিতে ধান ভানিতেছে—তাহাদের ওখানেও কাজ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

বড় বউ টানিয়া টানিয়া কহিলেন—আইজ-কাইল কী আর হেদিন আছে? মিয়ার একটা চাউল পড়ইয়া থাকতে দেখলেও খেইপ্যা যায়। কী করম মা, একটা ধানো হে কেউরে ভানতে দিতে মানা করছে।

বাকী রহিল ক্ষেতের ঝরা ধান কুড়ানো। রাশি রাশি সোনালি শীষের ধান মাটির বুকে বিন্দু বিন্দু সোনার মত ছড়াইয়া থাকে। চাষীরা ধান কাটিয়া লইয়া যায়। ছেলেমেয়ে, এমন কী, প্রৌঢ়রা পর্যন্ত তখন ক্ষেতে ধান কুড়াইতে নামে। প্রতি বৎসর পৌষের দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধান কুড়াইবার ব্যতিক্রমহীন প্রতিযোগিতা চলে। মুনশীদের প্রকাণ্ড বিলের জমিতে ধান কুড়াইতে নামিয়া আসিল আমেনা। তাহাদের বড় বাড়িটা কলা, নারিকেল, সুপারী গাছের আড়াল হইতে উঁকি দিতেছে। সেদিক চাহিয়া আমেনা সহসা পুরানো স্মৃতির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল—

—হাশেম ভাই?

—কী ?

—পুবকান্দার হেই জলপাই গাছ দুইডায় অনেক জলপাই আছে, আনতে যাবা ?

—ধ্যাৎ জলপাই খায় না, জ্বর অইবো—আমেনার প্রস্তাবটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল হাশেম। শামুকের খোল দিয়া সে তখন কলাগাছের রস সংগ্রহে ব্যস্ত। বড়রা খেজুরগাছ কাটিয়া রস আহরণ করে, তাহারই অনুকরণে এই খেলা।

—জ্বর অইলে আমার অইবো—তুমি পাড়ইয়া দিতে পারবা কিনা হেইয়া কও।

তাহার হাত হইতে একটা শামুকের 'কলসী' ছিনাইয়া লইল আমেনা। হাশেম ক্রুদ্ধ হইয়া ধমকাইয়া উঠিল—দে, দে শিগগীর, আমি পারমু না পারতে, যা।

আবার সে মনোযোগের সংগে ছোট্ট ছুরিখানা দিয়া কলাগাছের বাকল তুলিতে লাগিল। খানিক পরে কহিল—খাড়া, গাছ কয়ডা কাইড্যা লই—দেহোনী কেমন রস।

কিন্তু আমেনা তখন আর সেখানে নেই। ঠোঁট কুঁচকাইয়া হাশেম একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া গাছের উপর হইতে হাত সরাইয়া আনিল, ডাকিল—আমেনা ?

আমেনা একলাই তখন জলপাই অভিযানে চলিয়াছে। হাশেম দৌড়াইয়া তাহার কাছে পৌঁছিল।

সমস্ত আঁচল জলপাই ভরিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। দু'জনেরই পথে পথে কাদামাখা গা, হাত, পা। সারামুখ রৌদ্রে রক্তিম।

—আমেনা রাগ গেলতো তোর ?

—হুঁ, আমি কী রাগ অইছেলাম নাহি ?

—তয় ?

—তুমি না আইয়া পারো কেমনে হেইয়া দেখলাম আর কী।—খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমেনা ছুটিয়া পলাইল। হাশেম দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ, তারপর সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল—আমি আর যাব না পরবাসে—

বড়দের মুখে শোনা গানের এই একটি কলি মাত্রই সে জানে। এই ছিল তাহাদের কৈশোর। গাছে গাছে ফল পাড়া, খালে বিলে মাছ ধরা, আরো কত বিচিত্র রকমের খেলা ঘিরিয়াছিল তাহাদের সেই দিনগুলি। তারপর

কত দিন কাটিয়া গেল—খালের ও-পাড়ে নাচন মহলে নতুন হাট বসিল, গাঁয়ের বৃদ্ধ করমালি হাটে দোকান তুলিয়া অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিল, তারপর একদিন রাত্রে খুন হইল—কত ঘটনা ঘটিয়া গেল—দু'জনেরই অংগে অংগে দেখা গেল কত বিস্ময়কর পরিবর্তন।

তাহারা বড় হইয়া উঠিল।

—আমেনা!

—কী?

সেই দুপুরে চালিতা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া হাশেমের ডাক শুনিয়া সে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। একখানা লাল গামছা কোমরে বাঁধিয়া হাশেম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঁটু পর্যন্ত পরা ধুতিখানা ধবধবে ফর্শা রঙ। মাংসল দেহ সুমসৃণতায় চকচক করিতেছিল তাহার—আমেনা অজানা লজ্জায় তাহার দিক হইতে চক্ষু নামাইয়া আনিল। বুক কাঁপিয়া উঠিল তাহার। হাশেম ইতস্তত: করিল খানিকক্ষণ—তাহারও কেমন সংকোচ আসিতেছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া কী যে হইয়াছে—তাহারা আগের মত আর সহজভাবে কথা কহিতে পারে না—শৈশবের সে অন্তরংগতার মাঝে একটি অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত ব্যবধান আসিয়াছে। আমেনা তাহাকে দেখিলেই যেন কেমন সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে—হাশেম যে কথা বলিবে ভাবিয়া আসে তাহা সব ওলট-পালট হইয়া যায়—কী একটা গভীর ব্যথা তাহার মনে যেন টনটন করিতে থাকে।

আমেনা পায়ের নখে মাটি আঁচড়ায়। নীরবতা অনেকক্ষণ সহ্য হয় না।

—কী কইবেন হাশেম ভাই?

'তুই' তুকারির সম্বন্ধটাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আমেনার মা হাশেমকে 'তুমি' বলার জন্য একদিন বকিয়াছিল—বড় মানুষের ছেলে, একটু লেহাজ করে কথা বলিস এখন।—বেহায়া বলিয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিল, সেই হইতে আমেনা সংযত হইয়াছে।

—তোমার বিয়ার ব্যবস্থা অইতে লাগছে বোলে?

আমেনার মাথা আরো নুইয়া গেল, মৃদুস্বরে কহিল—হুঁ।

—কোয়ে?

—জানি না।

হাশেমের মুখে অনেকক্ষণ কথা জোগায় না আর। আমেনার মনটা

সঠিক বুঝিতে পারে না। তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিয়া অইয়া গেলে আমাগো ভুলইয়া যাবা তো? কত টাহা-পয়সা, কাপুড়-চুপুর পাবা—নোতুন বাড়িঘর—আমাগো কথা কী আর হেকালে মনে থাকপে?

আমেনা চকিতের জন্য তাহার দিকে একবার চাহিয়া আবার চক্ষু ফিরাইয়া লইল। জোর করিয়া হাসিতেছে হাশেম: যাহা সে বলিতে চাহিয়াছিল বলি বলি করিয়াও তাহা বলিল না।

—এইতো বেশ ভাল বউ অইতে পারবা দেখতাছি। কান, মুখ রাঙা অইয়া ওঠছে। এহোন হাতখানে ঘোমটা টানইয়া দেও। আমেনা আর শুনিতে পারে নাই, অকস্মাৎ রাগ হইয়াছিল হাশেমের উপর—তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া এক রকম ছুটিয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল।

তেমনি জোর করিয়া সশব্দে হাসিতে হাসিতে হাশেম বাড়ির পথ ধরিয়াছিল। দূর হইতে তাহার অস্পষ্ট গানের শব্দ আমেনার কানে আসিল—এ ভবের হাটে সুখ মেলেনা—আ—

হাশেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই, হইবার কথাও নয়। হাশেমের বাবা একে বড় মানুষ, তার উপর অত্যন্ত রাশভারী মেজাজের—তাহার কল্পনা ছিল ভিনগাঁ হইতে বড়ঘরের মেয়ে আনিবার। ছেলের উদাসীনতা দেখিয়া যদিও হাশেমের মা আমেনার কথা তাহাকে বলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, উলটা ধমক খাইয়াছিল—ঐ চেহারার মাইয়াডা ঘরে আনমু? জান ওরা কত ছোট জাত?

হাশেমের মা, প্রতিবাদের ইচ্ছা হইলেও, তাহা দমন করিয়া গিয়াছে। হাশেম নিঃশব্দে উঠানে নামিয়া হাটের দিকে চলিয়া গেল। ধানবেচা কুড়িটা টাকা দিয়া আপনার পছন্দ মত দুইখানা শাড়ী কিনিল সে। কাপড়ের তলে করিয়া বাড়িতে আনিয়া মাচার একটা স্থানে লুকাইয়া রাখিল।

আমেনার বিবাহের দুইদিন আগে সে তাহাকে শাড়ী দুইখানা দিয়া আসিল—মনে আছে, মুনশী বাড়ির ক্ষেতে তুমি-আমি ধান টোহাইতাম?

—হে।

—হেইয়ার পয়সা দিয়া কিনছি—এতদিন ধরইয়া জোমাইছেলাম, এহোন ভাবলাম বোলে জমাইয়া লাভ কী আর—তোমারে দুহান শাড়ী কিনইয়া দেলে তউ মনে করবা।

হাশেমের গলার স্বর ভারি হইয়া আসিয়াছিল। আমেনা দুই হাতে শাড়ী ধরিয়া তাহার মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কী অন্বেষণ করিয়াছিল।

জোর করিয়া হাসিয়া হাশেম বলিয়াছিল—আমাগো ভোলবানাতো আমেনা? ওকী, কথা কও, দুইদিন বাদেতো আর আমুনা, বিরক্ত করমু না।

আমেনা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের শাড়ীতে মুখ ঢাকিয়াছিল। কোন কথা বলে নাই—তারপর দ্রুতপদে ঘরে চলিয়া গেল সেদিনকার মত। হাশেম স্তম্ভিত, ব্যথিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ; তাহার পর ধীরে ধীরে সেও তাহাদের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আসিল, আমেনার মা মোড়া আগাইয়া দিলেন—বও বাবা।

—হয় বই, আইলাম আপনার লগে দেহা করতে—কাইল যামু কিনা!

—কোয়ে?

—শহরে। দেহি কোন চাকরি-বাকরি পাই নি—সংসারের অবস্থা তো ক্রমে খারাপ অইতে লাগছে।

আমেনা তাহার কথা শুনিয়া ঘরের ভিতরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। হাশেম কী গ্রাম ছাড়িয়া সত্যই চলিয়া যাইতেছে? আমেনার চিন্তাস্রোত বাধা পাইয়াছিল হাশেমের গানের শব্দে—সাঁকো পার হইয়া ও-পাড়ে যাইয়া সে সেই পুরানো গানটি ধরিয়াছে—এ ভবের হাটে—

সেই একই ক্ষেত—সেই মাটির ফাটল এখনো আছে, সেই খাজুর গাছ, সেই কাদামাখা ধান, ইঁদুরের গর্ত সবই আছে—সব। সেই রৌদ্রে ঝিলি-মিলি গ্রাম, বলাকার দল, ঘুঘুর কান্না, নাই কেবল সেই দিনগুলি!

এই ক্ষেতেরই ধান, বিন্দু বিন্দু সোনার মত ধান খুটিয়া খুটিয়া হাশেম তাহার আঁচল ভরিয়া দিয়াছিল—তারপর সেই কুড়ানো ধান বেচিয়া তাহাকেই শাড়ী উপহার দিয়াছিল; এই ক্ষেতেরই ধান ক্ষুধা তৈরী করিয়াছিল আমেনার, ক্ষুধা মিটাইতে চায় নাই।

হাত নড়িল না। বোবা দৃষ্টিতে সে তাকাইয়া রহিল সম্মুখে মুনশীদের বাড়িটার দিকে। যেন এলোমেলো দুনিয়াটার দিকে চাহিয়া তাহার মত এক অসহায় মানবীর চোখে বোবা বিস্ময় এবং কাতরতা ছাড়া অন্য কিছু নাই।

আজ, আবার সেই ক্ষেতে নামিয়া একটা ধানও সে কুড়াইতে পারিল না।

জোঁক

আবু ইসহাক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদর পূর্তির নাম চাষী-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কি?

ওসমান হুকা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ'বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে—এই তেল মালিশ করলে কি অয় মা?

—পানিতে কামড়াইতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়! পানির কি দাঁত আছে নি?

—আছে না আবার! ওসমান হাসে।—দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে?

টুনি হয়ত বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুকা রেখে হাঁক দেয়—কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভাল করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে আর হুকা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

তেরোহাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টির। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাটগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন-তেমন খাটুনি। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষোরে—ঢেলা ভাঙ্গোরে—'উড়া' বাছোরে—তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোন। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। 'বাছট' করে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোষ্টাই আর পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরী করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার ঢাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষীদের। এর আগে জমির বিলি-ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্ট পাটগাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত।

ওসমান লুঙ্গিটাকে কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচাপানি কবরেজি পাচনের মত দেখতে। গত দু'বছরের মত বন্যা হয়নি এবার। তবু বুক সমান পানি পাটক্ষেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতকগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মত যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুক্কা, তামাকের ডিব্বা, আগুনের মালশা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে একবার সে বলে, তুই নাও লইয়া যা গা। ইস্কুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইস্কুল তো চাইট্টার সময় ছুট্টি অইব।

—তুই ছুট্টি লইয়া আগে চইলা আইস্।

—ছুট্টি দিতে চায় না যে মাস্টার সাব।

—কামের সময় ছুট্টি দিতে পারব না, কেমুন কথা। ছুট্টি না দিলে জিগাইস্, আমার পাটগুলা জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোর মাস্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। লোহারুর দোকান থেকে সদ্য আল কাটিয়ে আনা ধারাল কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার-পাঁচটার বেশী পাট কাটতে পারে না একডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একের পর এক দশ-বারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা দমটাকে তাজা করবার জন্যে জিরোবার দরকার হয়। কিন্তু এই জিরোবার সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে হাতা বাঁধতে হয় এ সময়। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিরানো দরকার হয়। কিন্তু ডুবের এই হার বেশীক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব এমন কি এক ডুবের পরেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ডুবপ্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনের মেযাদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালই হয়। মাঝে মাঝে তামাক টেনে একটু গরম করে নিতে হয় শরীরটাকে, এই যা। বেলা ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যের ক্ষুধা-রাক্ষস খাম খাম শুরু করে দেয়। ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়ী ভুঁড়ির মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটার সঙ্কল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা তো এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর ঘরে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও তো নয়।

পাশেই কিছুদূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে। পেটে জামিন দেয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্যে নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকীগুলো মালশার আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেয়া, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা দু'টোর বেশী কাটা যায় না এক ডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হয়ে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালার পাটগুলা মোট্টা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান্, চিকন চিকন অইতে দোষ আছিল কি? হে অইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা।

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালশার আগুন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল এক পশলা। পাটগাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর হঠাৎ জমির মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার রাগ। সে বিড়বিড় করে বলে, ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটো বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম।

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোরে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ করে ওসমান, আমি বুইড়্যা খাইট্যা মরি আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসার কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে, এতক্ষণ কি করছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুট্টি লইয়া আগে আইতে? ছুট্টি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস্ নাই?

—আগেই আইছিলাম। মাই কইছিল—আর একটু দেরী কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশান এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এজন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। এ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই-বা আর তার বয়স। চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুণে গুণে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে, কি রান্ছে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমী শাক।

—মাছ পাইল কই?

—বড়শী দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশী হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কাণিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী, বাজান? তোতা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে! জোঁক না জানি কী! আঙুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জোঁকই তো রে। এইডা আবার কোনসুম লাগল? শিগগীর কাচিটা দে।

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জেঁাকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জেঁাক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জেঁাকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জেঁাকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোচ মারে সে। জেঁাকটা দু'টুকরো হয়ে যায়। রক্ত ঝরাতে ঝরাতে খসে পড়ে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—ইস্, কত রক্ত। তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, নে এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাট বোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জেঁাক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইর‍্যা জেঁাকে ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

—না রে বাজান, এগুলা কেমুন কইর‍্যা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে।

—জোঁকটা কত বড়, বাপপুসরে—

—তুও বোকা! এইডা আর এমুন কী জোঁক। এরচে' বড় জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেয়া, কোষ্টা ছাড়ান, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলোও কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাড়ি-পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ীর ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল।

ওসমান ভাবে, তবে কি তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেছে? তার মনে খুশী ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়, কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও।

—আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি ?

—হ ।

—ক্যান ?

—ক্যান আবার ! নতুন আইন অইছে জান না ? তে-ভাগা আইন ।

—তে-ভাগা আইন ! আমি তো হে অইলে দুই ভাগ পাইমু ।

—হ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ । যাও ছোড হুজুরের কাছে ।

—হ এহনই যাইমু ।

—আইচ্ছা যাইও যহন ইচ্ছা । এহন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও ।

—না, দিমু না পাট । জিগাইয়া আহি ।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কি অইব ? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু ।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানায় বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে । তার পেছনে তোতা ।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না । ওসমান বলে ।

—কী ব্যাপার ? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইর‍্যা এক ভাগ দিছে আমারে ।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো দিয়েছে ।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে ।

—বুঝতে পারলে না ? লাঙ্গল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশ' ।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে ।

—আমি টাকা নিছি ? কবে নিলাম হুজুর ?

—হ্যাঁ, এখন তো মনে থাকবেই না । গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে ? গরু-লাঙ্গল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি । তাই আমরা পাব দু'ভাগ, তোমরা পাবে একভাগ । তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মত পাবে ।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশী তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমি দেব না কোন ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রূর হাসি হেসে বলে, তে-ভাগা! তে-ভাগা আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে, আইন! আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে! আমরা সূচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোকনা আইন! কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁহ্ হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তে-ভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারায় ছিল—"জমির মালিক লাঙ্গল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।" এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই আনিয়েছিলেন ভাগ-চাষীদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমুন কইর‍্যা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ্-হা-রে!

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ-বারোজন ভাগ-চাষী এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়, কি মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড় বাড়ী। ওসমান উত্তর দেয়।

—আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে একেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশ'।

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে, ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

—হ ভাই, কেমুন কইর‍্যা যে কলমের খোঁচায় কি লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমুনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, "জমি বর্গা নিবা তার একটা দলিল থাকা তো দরকার।"

—হ, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে, আরে মিয়া, এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির‍্যা চলছো?

—কি করমু তয়?

—কি করবা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, চল আমাগ লগে দেখি, কি করতে পারি।

করিম গাজী তাড়া দেয়, কি মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু?

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই বাড়ী যা গা।

তার ঝিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে—হ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

জতুগৃহ

মিন্নাত আলী

মাঠের উপর দিয়ে শুধু বাক্স-পেটরা, গাঁটরী-বোঁচকা দৌড়চ্ছে।

ক্ষেতের আইলে-আইলে, ক্ষেত-কোণাকুণি।

: মিলিটারী আসছে।

: পালাও—পালাও।

বাঁচার তাগিদে যে যেদিকে পারছে ছুটছে। গাঁটরী-বোঁচকা, ছেলে-মেয়ে বিচিত্র মানুষের বিষণ্ণ মিছিল।

চারিদিকে থমথমে ত্রাস। জমাট ভয়।

রিকসার ওপর থেকে সব দেখা যায়। ডানে-বায়ে সব দিক থেকেই আতঙ্কগ্রস্থ নর-নারীর সন্ত্রাস দৌড়াদৌড়ি।

হঠাৎ মুখ খুলে সাজেদা বেগম: আরও আগেই আমাদের রওনা হওয়া উচিত ছিল। আমার বড় ভয় করছে।

: ভয়? এখন আর কিসের ভয়?—ডক্টর হুদা অবাক না হয়ে পারে না।

: যেভাবে লোক যাচ্ছে। নৌকা যদি না পাই।

: ওহ্ তুমি ভাবছো নদী পার হওয়ার কথা? ডক্টর হুদা সহজ সুরে বলার চেষ্টা পায়—বাসা থেকে যখন বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আর কোন চিন্তা নেই। বাংলাদেশের মানুষ এখনো তার আতিথেয়তা ভুলেনি। তোমাদের বাড়ী পৌঁছুতে না পারলে আর কোন বাড়ীতে না হয় একরাত মুসাফিরি করবো।

সাজেদা বেগমের মুখে কোন কথা নেই। জবাবটা তার মনঃপুত হয়নি বেশ বোঝা যায়।

নিঃশব্দ দুটি ভীত প্যাসেঞ্জার নিয়ে রিকসা চলতে থাকে। এবড়ো-থেবড়ো কাঁচা রাস্তা দিয়ে রিকসা চলে পুরো প্যাডেলে। একটা-দুটো নয়, বহু রিকসা। এবং রিকসাওয়ালাদের মাঝে দারুণ প্রতিযোগিতা।

কে কার আগে সোয়ারী নদীর ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আবার ট্রিপ দিতে পারে। একেক ট্রিপে এখন অসম্ভব টাকা। তিন টাকার জায়গায় কদিন ধরে নিচ্ছে পনের-বিশ টাকা। পঁচিশ-ত্রিশ দিতেও অনেকে রাজী।

সাজেদা বেগমের আশংকাই সত্য হল। শুধু নদী পার হতে কোন নৌকাই রাজী নয়। দূরের কেরায়া নিতে বসে আছে। এক কেরায়াতেই একশো-দেড়শো টাকা পাওয়া যায়। নদী পার করে দিলে আর কত পাওয়া যাবে? বড জোর চল্লিশ কি পঞ্চাশ। অবশ্য এও কম নয়। আগে তো উঠতো মাত্র সাত-আট টাকা।

কি আর করা, অবশেষে নরসিংদীর এক নৌকাতেই উঠতে হল। নৌকা নরনারী শিশুতে ঠাসাঠাসি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই সাজেদা বেগমের— খেয়াল নেই ডক্টর হুদার। গলুইয়ে পাটাতনের উপরই বসে পড়ল দু'জনে।

: মেয়েলোককে ভিতরে বসতে দিন।

: হ্যাঁ হ্যাঁ। ভিতরে জায়গা আছে, ছইয়ের ভিতর চলে আসুন।

কোন কথা, কারো আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মন নেই তখন। পাল্টা জিজ্ঞেস করে সাজেদা বেগম, নরসিংদী পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

: এই জোর তিন-চার ঘণ্টার ব্যাপার, মেমসাব। মাঝি অভয় দিতে চায়, বিকালের মধ্যেই পৌঁছে যাব দেখবেন।

নৌকা ছাড়ল।

চৈত্রের খরা। তীক্ষ্ণ রোদের কণারা শরাঘাত করছে গলুইয়ের যাত্রীদের উপর। সাজেদা বেগম, ডক্টর হুদা হাঁসফাঁস করছে আর নির্মমভাবে ঘামতে শুরু করেছে।

সাজেদা বেগমের অসহায় মুখখানার দিকে তাকিয়ে ডক্টর হুদার হঠাৎ মনে পড়ল তার গাড়ীটার কথা। বিলাত থেকে ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে এসেছে শেভ্রলেট কার—এক মাসও হয়নি। বাসাতে ফেলে চলে আসতে হয়েছে। গাড়ীটা আনতে পারলে মানে গাড়ীটা চালাবার রাস্তা থাকলে, সাজেদা বেগমকে অমন করে রোদে পুড়ে ঘামতে হত না।

: তুমি ভিতরে গিয়ে বসো, সাজু।

: রোদ শুধু আমার উপরই বর্ষণ করছে না। তুমিও চল।

ডক্টর হুদার তখন বলতে ইচ্ছা করছিল, আমি তো এই বাংলাদেশের এই রোদ-বিষ্টির মাঝেরই মানুষ, ও রোদে আমার গা পুড়ে না, এ আমার গা-সওয়া।

কিন্তু বলার ইচ্ছাটা চেপে গেল। ডক্টর হুদা বেশ ভাল করেই জানে এতগুলো বাঙালীর সামনে এ কথা বলা মানে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলা। তাই কোন ওজর-আপত্তি না তুলে বলল : হ্যাঁ, তাই চল, ভিতরে গিয়েই বসি। রোদটা বড় কড়া।

নরসিংদী পৌঁছতেই বিকাল পেরিয়ে গেল। সাজেদা বেগম একা নয়, ডক্টর হুদাও কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ল। যেটুকু বেলা রয়েছে, এতে দশ মাইল রাস্তা পার হওয়া সম্ভব হবে কি ?

হাঁটা দিল দু'জনে। লাগেজ-পত্র কিছুই নেই, দু'জনের হাতে দুটি ব্যাগ। সাজেদা বেগমের কাঁধে ঝুলছে 'গর্ব থলি'ও। পথের সাথী রয়েছে অনেক। আদিয়াবাদ, সাইদাবাদ, রায়পুরার যাত্রীই বেশী। ওরা যাচ্ছে রায়পুরার উত্তরে নয়াচর গ্রামে। রাস্তায় সাজেদা বেগমরা দেখতে পেল নরসিংদী কলেজে সাহায্য শিবির খুলেছে। দূরের যাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বহু লোক ঢাকা থেকে এসে মুসাফিরখানায় উঠেছে। রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা দেবে সীমান্ত আগরতলার উদ্দেশ্যে।

থানাবাড়ী ছাড়াতেই সূর্য পশ্চিমের গাছে হেলে পড়ে। ডক্টর হুদা এবার রীতিমত ঘাবড়ে যায়। এ বিদেশ-বিভুঁয়ে অন্ধকার রাতে স্ত্রী নিয়ে যায় কোথা, নয়াচর তখনো সাত মাইল দূরে। তাছাড়া এদিককার পথ-ঘাট ডক্টর হুদার মোটেই পরিচিত নয়। বিয়ের পর মাত্র একবার শ্বশুর-বাড়ী এসেছিল—তা-ও রেলপথে। শ্রীনিধি স্টেশনে নেমে নৌকায় করে গিয়েছিল। আশ-পাশের গ্রামের নামও জানে না। শ্বশুর ঢাকাতে বাড়ী করেছেন। সেই ঢাকার বাড়ীর সাথেই তার পরিচয়।

এ মুশকিলে আসান করল সাজেদা বেগম।

: আচ্ছা এদিকে নবীপুর নামে একটি গ্রাম আছে না?—সহযাত্রীদের শ্রবণ আকর্ষণ করে সাজেদা বেগম।

: হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সামনের গ্রামটাই তো নবীপুর।

: নবীপুরের মৌলভী বাড়ীটা কোনদিকে বলতে পারেন?

: হ্যাঁ, মৌলভী বাড়ীর সামনে দিয়েই তো আমরা যাব।

: কেন, মৌলভী বাড়ী দিয়ে তুমি কি করবে? ডক্টর হুদা অবাক হয়।

সাজেদা বেগম সাথে সাথে জবাব দেয় না। চুপ থেকে কি যেন মনে মনে ভাবে।

সবাই পা চালিয়ে যাচ্ছে।

: মৌলভী বাড়ীর কথা বলছিলে কেন, বললে না তো? ডক্টর হুদা চাপ দিতে থাকে।—তোমার কোন পরিচিত বাড়ী নাকি?

: মৌলভী বাড়ীটা আমাদের একটু দেখিয়ে দেবেন? ডক্টর হুদার প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে সাজেদা বেগম যাত্রীদের সাথে আলাপ করে—ও বাড়ীতেই আমরা রাত কাটাবো।

: ওটা তোমাদের কোন আত্মীয় বাড়ী নাকি?

যুগপৎ বিস্ময় ও সংশয় ঝরে পড়ে ডক্টর হুদার প্রশ্নে। নবীপুরের দিকে এগুতে এগুতে সাজেদা বেগম বলে—হুঁ।

মৌলভী বাড়ীতে যখন তারা পৌঁছুল তখন সবে মগরেবের নামাজ শেষ হয়েছে। মুসল্লীরা তখনো জুম্মাঘর থেকে বেরুচ্ছে। বাড়ীর সামনে অচেনা দু'জন মেয়ে-পুরুষকে দেখে হাফেজ সাব এগিয়ে আসেন।

: আস্‌সালামু আলায়কুম। আপনারা এখানে কাকে চান?

: আমরা আসছি ঢাকা থেকে। —ডক্টর হুদা প্রতি-সালাম দিয়ে আলাপ শুরু করে।

: যাব নয়াচর।—সাজেদা বেগম মাথা নীচু করে বলে।

: নয়াচর?—চমকে উঠেন হাফেজ সাব। নয়াচর কার বাড়ী যাবেন আপনারা?

: পেশকার বাড়ী।—ডক্টর হুদা জবাব দেয়।

হাফেজ সাব পেশকার বাড়ীর নাম শুনেই স্থান ও পাত্র ভুলে সরাসরি চোখ তুলে সাজেদা বেগমের উপর। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন সাজেদা বেগমের মাঝে। ক'টি অর্থময় নীরব মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সহসা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেন তিনি—সে কি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন—ঘরে এসে আগে বসুন। তারপর কথা হবেখন। বার বাড়ীর ঘরে হাফেজ সাব দু'জনকে নিয়ে উঠেন।

: নিন, এই চেয়ার দু'টায় বসেন আপনারা। দু'খানা পুরনো কাঠের চেয়ার সামনে এনে দিলেন।—ওরে, এই ঘরে একটা হারিকেন দিয়ে যারে।

হাফেজ সাব বরাবর ঢাকাতেই থাকেন। দিনকয়েক আগে বাড়ী এসেছিলেন, গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় আর যাননি। ঢাকায় এক মাদ্রাসায় তালেবুল এলেমদের শিক্ষা দেন। "হাফেজিয়া" পড়াও পড়ান তিনি।

একটি ছেলে এসে ঘরে হারিকেন বাতি দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ঢাকার লোক এসেছে শুনতে পেয়ে ছেলে-বুড়ো সবাই ঘরে এসে ভিড় করেছে। সবার মুখেই ওই এক কথা—ঢাকার খবর কি সাহেব? আমাদের বাঙালীদের নাকি মেরে খতম করে দিচ্ছে?

ডক্টর হুদা যথাসম্ভব তাদের কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছে। বাঙালীদের প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী তারা শুনতে পেয়েছ, শুনে শুনে জল্লাদ বাহিনীর উপর গ্রামবাসীদের বিদ্বেষ জমে উঠেছে বুঝতে পেরে ডক্টর হুদা ভিতরে ভিতরে যেন খুশী হয়—খুশী হয়েই বাঙালীদের উপর নির্মম অত্যাচারের কথা একেক করে বলতে থাকে। গলা খাঁকারী দিয়ে ঘরে ঢুকেন হাফেজ সাব। পাশের লোকজন সরে গিয়ে তার জায়গা করে দিলেন।

: আপনাদের এই রাতের বেলা নয়াচর পাঠাব না। হাফেজ সাব পাশের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলেন। আজ আমাদের বাড়ীতেই বেড়াবেন আপনারা।

সাজেদা বেগম চুপ করে রইল। ডক্টর হুদা একথা শুনে অবাক হয়ে যায়। হাফেজ সাব অমন বেড়ানোর প্রস্তাব করছেন কেন? তারা তো এসেছে এখানে থাকার জন্যই! সাজেদা বেগমের আত্মীয় বাড়ী জেনেই তো এখানে উঠেছে। আত্মীয় হয়ে অমন প্রস্তাব করে নাকি কেউ?

সাজেদা বেগমকে চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে থাকতে দেখে ডক্টর হুদাই জবাব দেয়—হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ীতে মুসাফিরির নিয়তেই তো এসেছি। একথা বলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

: আপনার স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিন।—হাফেজ সাব সাজেদা বেগমের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বলেন, তিনি ভিতর বাড়ীতে মেয়ে-ছেলেদের সাথে থাকুক।

: হ্যাঁ তাইতো—তুমি বরং ভিতরেই চলে যাও।

: না-না।—সাজেদা বেগমের দৃঢ়কণ্ঠ। আমি এখানে বসে আগে রেস্ট নিই। দরকার মত আমিই যাব।

এমন কথার পর আর কারোর আপত্তি থাকতে পারে না। হাফেজ সাব এবার ডক্টর হুদাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন—

: আচ্ছা ঢাকায় তো বেশ ক'দিন থেকে এলেন, আপনার কি মনে হয়? পাকিস্তান টিকবে তো?

ডক্টর হুদা এমনধারা প্রশ্ন শুনে হঠাৎ ভ্যাবাচেকা খেল। সাজেদা বেগম স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হাফেজ সাবের মুখের দিকে চোখ তুলে—বলছে কি লোকটা? ঘরভরা কৌতূহলী বাঙালীরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। তারাও ডক্টর হুদার মুখ থেকে জবাব শোনার জন্য অধীর হয়ে উঠল।

ডক্টর হুদা ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে ধীরে ধীরে বলে, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। পাকিস্তান টিকবে মানে কি? পাকিস্তান তো টিকে আছেই।

: না আমি বলছিলাম, শুনেছি একদল লোক নাকি ই-পি-আর ও পুলিশ বাহিনীকে একসাথে করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার সংগ্রাম করেছে।

: হ্যাঁ, এটা তো সত্য কথাই। ডক্টর হুদা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বাঙালী সৈনিক ও পুলিশরা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানী জল্লাদরা পিলখানা আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কীভাবে বাঙ্গালী বধ করেছে সে অমানুষিক বর্বরতার কাহিনী শুনেছেন?

কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হাফেজ সাব মৃদু আপত্তি করেন:

জানেন তো, শোনা কথার দোনা দোষ। লোকে কত কথাই ছড়ায়, এসব বাজে কথায় আমাদের কান দেওয়া উচিত হবে না।

সাজেদা বেগম নড়েচড়ে বসে আবার হাফেজ সাবের দিকে তাকায়। বাংলাদেশে এখনো এমন লোক আছে?

হাফেজ সাব কিন্তু তখনো বলে যাচ্ছেন তার কথা: আচ্ছা আপনিই বলুন, পাকিস্তানে বাস করে জাতীয় পতাকার অবমাননা, জাতির পিতা কায়েদে আজমের ছবি পুড়ানো এসব কি কোন যুক্তিযুক্ত কাজ হয়েছে? আর এটারই বা কি যুক্তি দেবেন—২৩শে মার্চ তারিখে শেখ সাব নিজ হাতে তাঁর বাড়ীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন কিভাবে? এসব কি রাজদ্রোহী কাজ নয়?

সাজেদা বেগম অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। ঘরভরা বাঙালীদের মাঝেও চাপা গুঞ্জন শুনা যেতে লাগল। সাজেদা বেগমের সমস্ত শরীরটা হঠাৎ রাগে রৈ রৈ করতে লাগল। বাংলাদেশের কুলাঙ্গার এই লোকটার সামনে থেকে চলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। বলা যায় না তারপরে আরও কি সব অশ্রাব্য মন্তব্য তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

সাজেদা বেগম হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

: আমি বাড়ীর ভিতরে যাব।

ডক্টর হুদা একটু অবাক হল। খানিক আগেই বাড়ির ভিতর যাওয়ার প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন নিজের থেকেই চলে যাচ্ছে যে বড়।

হাফেজ সাব একজনকে আদেশ করলেন, এই তুই হারিকেনটা নিয়ে উনাকে বাড়ীর ভিতর দিয়ে আয়। আর মিয়ারা, তোমরা একটু সরো। সরো! মেয়েমানুষ দেখছ না?

হারিকেনের সাথে সাজেদা বেগমও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খেতে বসে ডক্টর হুদা অবাক না হয়ে পারে না। অত অল্প সময়ে অত রান্নাবান্না করল কেমন করে? আলু ভাজি, বয়দা বিরান, মুরগীর গোসত, মশুরীর ডাল, দুধ, কলা—মেহমানদারীর কোন ত্রুটি নাই। ডক্টর হুদার মনে হল, গ্রামীণ বাংলার মেহমানদারীর এ আন্তরিকতা বহুদিন, বহুকালের

একটা চিরন্তন ট্রাডিশন। সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনও গ্রামবাংলার এই ট্রাডিশনের কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি।

খাওয়ার পর পরই সাজেদা বেগম চলে আসে বার বাড়ীর ঘরে।

: আমি কিন্তু ভিতর বাড়ীতে থাকতে পারব না—তোমার সাথে এখানেই থাকব আমি।

ডক্টর হুদা আশ্চর্য হয়ে বলে: এ কেমন করে হয় সাজু? লোকে বলবে কি?

: না, ভিতর বাড়ীতে থাকলে আমি মরে যাব।

: এ্যাঁ। বল কি? ভিতর বাড়ীতে কি হয়েছে?

: সে তুমি বুঝবে না। স্মৃতির জ্বালায় অতোক্ষণ আমি যে কী এক অশান্তির মাঝে কাটিয়েছি। না না, আমি আর ভিতর বাড়ীতে যেতে পারব না।

ডক্টর হুদা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। নির্বাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর মুখে।

গলা খাঁকারী দিয়ে ঘরে ঢুকলেন হাফেজ সাব।

: আপনার শোবার ব্যবস্থা এখানেই করছি। আপনার "ওয়াইফ" ভিতর বাড়ীতে মেয়ে-ছেলেদের সাথে শোবেন।

সাজেদা বেগম জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় স্বামীর দিকে: বল, তুমি বলে দাও, ও আমার সাথে এখানেই থাকবে।

ডক্টর হুদা স্ত্রীর চোখের ভাষা বুঝতে পারে। কিন্তু ও কথাটা অত খোলাখুলি বলতে পারছে না। কেমন জানি বাঁধ বাঁধ ঠেকে। লজ্জায়, সংকোচে। সাজেদা বেগম জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে আছে ডক্টর হুদার চোখে। কৈ বলছো না যে!

: আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ভিতর বাড়ীতে দেখি, উনার শোবার ব্যবস্থা হল কিনা।—এই বলে হাফেজ সাব ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন, পেছন থেকে কথা বলে উঠে সাজেদা বেগম।

: উনাকে বলে দাও, আমি ভিতর বাড়ীতে আর যাব না। এখানেই শুবো।

ঘুরে দাঁড়ালেন হাফেজ সাব। একটুখানি নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর ডক্টর হুদার দিকে চোখ তুলে বললেন: মেয়ে-ছেলে বাড়ীর বাইরের ঘরে রাত কাটাবে, এটা কি খুব শোভনীয় হবে?

ডক্টর হুদাকে মুখ খোলার সময় দিল না। দপ করে জ্বলে উঠল সাজেদা বেগম : নয়াচরের পেশকার বাড়ীর সাজেদা বেগম আজ ভিতর বাড়ীতে রাত কাটিয়ে গেলে বুঝি খুব সুনাম হবে, না ?

ডক্টর হুদা, হাফেজ সাব দুজনেই একেবারে "থ" হয়ে গেল। ডক্টর হুদা স্ত্রীর এ-কথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হল। আর হাফেজ সাব সাজেদা বেগমের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করে একেবারে নিশ্চল মূর্তি হয়ে গেলেন।

সমস্ত ঘরটাতেই হঠাৎ করে কঠোর স্তব্ধতা নেমে আসে। কারো চোখে বা মুখে কোন কথা নাই। সাজেদা বেগম নিজেও কথাটা বলে কেমন যেন শরমিন্দা হয়ে পড়েছে—মাথা নীচু করে রইল। নৈশ রাত্রির নীরবতা ঘরটাতে খাঁ খাঁ করতে লাগল।

এই শ্বাসরুদ্ধকর অশ্বস্তি থেকে বাঁচালেন হাফেজ সাবই।

প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি : ঠিক আছে, আপনারা ঘুমান আমি বিছানাপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। আস্‌সালামু আলায়কুম।

বার ঘরে শুয়েও সাজেদা বেগম ঘুমাতে পারল না।

এশার নামাজের পর থেকে গ্রাম একেবারে নীরব। লোক চলাচল থেমে গেছে অনেকক্ষণ। চালের উপর ঝুঁকে পড়া গাছের ডালে যে পাখীর বাসা সেখানেও পাখা ঝাঁপটা-ঝাঁপটি থেমে গেছে। দূরে-অদূরে মাঝে মধ্যে কুকুরের থেকে থেকে ঘেউ ঘেউ রাত্রির নীরবতাকে একটু সচেতন করে আবার থেমে যাচ্ছে। সাজেদা বেগম দু'চোখের পাতা খুলে সব শুনছে।

ঘুম আসে না !

পাশে স্বামী ডক্টর হুদা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বড় ঘুমকাতুরে। লণ্ডনে প্রথম প্রথম দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পড়ত। এ নিয়ে সাজেদা বেগমকে কম ধকল সইতে হয়নি।

ঘাড় কাত করে তাকালো ডক্টর হুদার দিকে। ঘরের ভিতর হারিকেন ডীম করে রাখা হয়েছে। এই স্বল্প আলোতে দেখল তার ঘুমন্ত স্বামীকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক ডঃ নাজমুল হুদা পি-এইচ. ডি। সদ্য বিলাত ফেরত।

পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে নিদ্রাদেবীকে স্মরণ করে সাজেদা বেগম।

সময় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

হঠাৎ সাজেদা বেগমের মনে হল তার পাশে শুয়ে আছেন কাঁচা দাড়িওলা হাফেজ সাব। তার স্বামী।

চমকে উঠে সাজেদা বেগম চোখ মেলে। না, পাশে ডক্টর হুদাই ঘুমাচ্ছে। তার প্রাণপ্রিয় স্বামী।

নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে সাজেদা বেগম। কিন্তু না, চোখ মুদলেই স্পষ্ট চোখে ভাসে, তার পাশে হাফেজ সাব শুয়ে আছেন।

আবার চোখ মেলে। পাশে ডক্টর হুদা। চোখ বন্ধ করে। পাশে হাফেজ সাব। বিরক্ত হয়ে উঠে সাজেদা বেগম। যে ছবির ভয়ে ভিতর বাড়ীতে গেল না, সে ভয়ই পেয়ে বসল তাকে। যে কথা সে সযতনে ভুলে ছিল, তা-ই দীর্ঘদিন পর অমন করে আষ্টে-পৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরছে কেন? না, এই মৌলভী-বাড়ীতে আসাটাই সাজেদা বেগমের ভুল হয়েছে।

চোখ মেলে সে দেখতে লাগল তার একুশ বছর আগের দিনগুলিকে। আব্বা তখন ঢাকার এস. ডি. ও. অফিসের পেশকার। সাজেদা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রী। আব্বার কেমন করে জানি, মাদ্রাসার ছাত্র কলিমউদ্দিনকে জামাই করার সখ হল। বাড়ীর সবার অমতে তিনি সাজেদা বেগমের বিয়ে দিলেন। সাজেদা বেগম অশ্রুসায়রে ভাসতে ভাসতে এলেন নবীপুর মৌলভী-বাড়ী।

কিন্তু মন মানে না। গ্রামের পরিবেশ, মৌলভী স্বামী কিছুই তার পছন্দ হয় না। আব্বা-আম্মা জানলেন সব। আত্মীয়-স্বজনরাও প্রমাদ গুণল।

ঢাকা গেলে সাজেদা বেগম আর নবীপুর আসতে চায় না। জোর জবরদস্তি করে আব্বা-আম্মা নবীপুর পাঠায়। এভাবেই এক বছর কেটে যায়।

সাজেদা বেগম সেবার আম্মার সাথে বলে, "নবীপুরের নাম বললে আমি বিষ খাব।"

ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় অবশেষে। সাজেদা বেগম আবার পড়াশুনায় মন দেয়। প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাস করে ইডেনে ভর্তি হয়। তারপর বাংলায় অনার্স। শেষে এম. এ. এবং সরকারী কলেজে অধ্যাপিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক নাজমুল হুদার সাথে বিয়ে হল। মন বিনিময়ের পরই। সবই জানাল নাজমুল হুদাকে। নাজমুল হুদা সব জেনে শুনেই সাজেদা বেগমকে বিয়ে করে। সাজেদা বেগমকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে—"আমি সাহিত্যের ছাত্র, মানুষের মনকে বুঝি, শ্রদ্ধা করি। জগতের আর আর সব কিছুর সাথে মানুষের মনের পরিবর্তনেও আমি বিশ্বাসী। তুমি আমার একান্ত, একান্তই আমার হয়ে থাকবে, আমার ভালবাসা পাবে।

আট-ন' বছর অধ্যাপনার পর নাজমুল হুদা সরকারী বৃত্তি পেল। চলে গেল লণ্ডন। কিছুদিন পর নিয়ে গেল সাজেদা বেগমকে। নাজমুল হুদা ফিরল ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে, সাজেদা বেগম আনল এম. এস.।

ফিরেছে মাত্র তিন মাস হল—উনিশ শ' একাত্তরের জানুয়ারীতে। পোষ্টিং নিয়ে কিছু গোলমাল গেল কিছুদিন। সাজেদা বেগমের চাকুরী হয়ে গেল সরকারী কলেজে। ডক্টর হুদা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেও এখানে থাকবার বিশেষ ইচ্ছা নেই তার।

শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা বাংলা ঊর্মি মুখর সাগরের মত জেগে উঠল।

: জয় বাংলা।

: আমাদের সংগ্রাম।

: মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

: সংগ্রাম—

: চলবে চলবে।

: জাগো, জাগো—

: বাঙালী জাগো।

এমন সময় সাজেদা বেগমের কানে এল আজানের সুর-লহরী—আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নাউম।

চমকে উঠে সাজেদা বেগম। সর্বনাশ! সকাল হয়ে গেছে—সে তো একটুও ঘুমায়নি।

পাশে ডক্টর হুদা তেমনি ঘুমাচ্ছে। বাইরে পাখ-পাখালীর কিচির-মিচির। বাড়ীর ভিতরে মানুষ উঠার মৃদু কলরব। জুম্মাঘরে মুসল্লীদের গলা খাঁকারী।

সাজেদা বেগম বিছানায় উঠে বসে। ঠেলা দেয় স্বামীর পিঠে: এই ওঠো, সকাল হয়ে গেছে। স্বামীকে জাগিয়ে সাজেদা বেগম ভিতর বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

উঠানে যেতেই ঘর থেকে ছুটে আসে হাফেজ সাবের স্ত্রী: কি, পায়খানায় যাবেন?

: হ্যাঁ, চলুন আপনাদের কুঁয়োর পাড়ে যাই।

উত্তর ঘরটার পাশ দিয়ে পশ্চিম ভিটের কোণায় বাড়ীর পাতকুঁয়া। সাজেদা বেগম কুঁয়ার দিকে যেতে যেতে উত্তর ঘরটার দিকে তাকাতে থাকে—এ ঘর হ্যাঁ এই ঘরটাতেই সাজেদা বেগম প্রথম উঠেছিল। এ ঘরটাতেই সে থাকতো। তার স্বামীর ঘর।

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে সাজেদা বেগমের বুকে।

কুঁয়ো থেকে পানি তুলে বদনা ভরে হাফেজ সাবের স্ত্রী বলেন: এই নিন পানি—ওই দেখেন পায়খানা।

সাজেদা বেগম বদনা হাতে নিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

: আচ্ছা, এই যে পাকা জায়গাটা, বাথরুমই বুঝি, এটাতে যাওয়া যায় না?

হাফেজ সাবের স্ত্রী অবাক হয়ে যান: তিনি এ খবর জানেন কি করে? এ বাড়ীতে কি আগেও তিনি এসেছেন?

প্রকাশ্যে বললেন—"ওই বাথরুম কেউ ব্যবহার করে না।"

: কেন? ব্যবহার করে না কেন?

হাফেজ সাবের স্ত্রী আমতা আমতা করে বলেন: শুনেছি, এই বাথরুম যার জন্য করা হয়েছিল, সে এ বাড়ী থেকে চলে যাওয়াতে ওটাতে তালা দেওয়া হয়েছে। কাউকে ব্যবহার করতে দেন না।

সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে সাজেদা বেগমের। মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে শুরু করে। মনের আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠে। কিশোরী বধূ সাজেদা বেগমের অনুরোধেই এই বাথরুমটা তৈরী হয়েছিল। শহরের

মেয়ে পাতকুঁয়ার খোলা মেলা জায়গায় গোসল করতে অসুবিধা হয়, এ কথা বলার সাথে সাথেই সে দিনের তরুণ হাফেজ সাব ওস্তাগার ডেকে বাথরুম তৈরী করান। উত্তর ঘরের ভিতর থেকে দরজা কেটে বাথরুমের সাথে সংলগ্ন করা হয়।

মনে পড়ল, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বা গোসলের জন্য সাজেদা বেগমকে আর ঘরের বাইরে আসতে হত না। ওই দরজা খুললেই বাথরুমে যাওয়া যেত।

: কি পায়খানায় যাবেন না?

চমকে উঠে সাজেদা বেগম : ও হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি।

নাস্তা পর্ব শেষ হল। এখন বিদায়ের পালা। সাজেদা বেগম সবই করছে। যান্ত্রিক নিয়মে। মনের ভিতর একটি কথার উথালি-পাথালি: হাফেজ সাব কি এখনো মনে রেখেছে তাকে? সে সকাল থেকে বারে বারে মনে পড়ছে বিভূতি বাবুর একটি কথা। পথের পাঁচালীর বিভূতি বাবু তাঁর "দেবযান" বইতে বলেছিলেন। অনেকদিন আগের পড়া। তবু কথাগুলো মনে আছে সাজেদা বেগমের : "চাপা পড়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। যে কক্ষ যেই অতিথির হাসি-কান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং চিরকাল তারই। আর কেউ সে কক্ষে কোনদিন কোন কালে ঢুকতে পারে না।"

বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে সাজেদা বেগম-ডক্টর হুদা যখন রাস্তায় নেমে পড়েছে তখনো সাথে সাথে হাফেজ সাব চলেছেন।

: আমরা গরীব মানুষ। আপনাদের উপযুক্ত সমাদর করতে পারলাম না ডাক্তার সাব, আমাদের গোস্তাকী মাফ করবেন—

: কি যে বলেন ? হাসতে হাসতে বলে ডক্টর হুদা, "আপনাদেরই তো কষ্ট দিয়ে গেলাম। আমরা তো রইলাম আরামেই।" তিন জনেই ধীরে ধীরে পা চালাতে থাকে।

সাজেদা বেগম যে কথাটা বলার জন্য সকাল থেকে আঁকু-পাকু করছিল অতোক্ষণে যেন সে সুযোগ মিলল। রাস্তার মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সাজেদা বেগম।

: হ্যাঁ, তুমি একটু হাঁটো। আর এই যে, আপনি একটু শুনুন—

হাফেজ সাব মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

ডক্টর হুদা সামনে এগুতে লাগল।

সাজেদা বেগম একটু ইতস্তত: করে শেষে বলেই ফেলে: একটা সত্য কথা বলবেন ?

: কি ?

: আপনি এখনো আমার কথা মনে রেখেছেন ?

হাফেজ সাব সাথে সাথে মাথা হেঁট করলেন। মাটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—

: আপনি একজন পরস্ত্রী। ওসব কথা শুনতে চাওয়া বড় গোনাহ্‌র কাম।

: এ্যাঁ! পরস্ত্রী।

চলার কথা, পথের কথা, সব কিছু ভুলে সাজেদা বেগম নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল হাফেজ সাব, তার প্রথম স্বামীর মুখের দিকে।

চারিদিক দলিত-মথিত করে সাজেদা বেগমের কানে অবিরাম বাজতে থাকল—'আপনি পরস্ত্রী...ওসব কথা শুনতে চাওয়া বড় গোনাহ্‌র কাম...'

গলির ধারের ছেলেটি

আশরাফ সিদ্দিকী

সলিমুল্লা হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই।

গেটের কাছে বের হলেই প্রতিদিন দেখি সেই ছেলেটিকে। দশ এগার বছর বয়স।

পরণে একটা শতচ্ছিন্ন প্যাণ্ট। গায়ে তালির উপর তালি দেওয়া একটা কালো ওভারকোট। খড়িউঠা দেহ। উস্কো খুস্কো চুল। কতদিন তেল পড়েনি কে বলবে?

সেই চিরাচরিত একঘেয়ে নাঁকি কান্না:

একটি পয়সা সাহেব!

সারাদিন না খেয়ে আছি। এক পয়সা দান করলে সত্তর পয়সা পাওয়া যায়।

পকেট হাতড়িয়ে খুচরো পয়সা দেই কোনদিন, কোনদিন বকুনি লাগাই। বকুনি দিলেও বিপদ! পট করে নিচু হয়ে, পায়ে এসে সালাম করে বসবে।—

নাছোড়বান্দা!

কিছুক্ষণ পরেই তাকে দেখব মেডিকেল কলেজ গেটে। দু'পয়সার মুড়ি কাগজের ঠোঙ্গায় নিয়ে চিবোবে। চিরাচরিত নিয়মে পয়সা চাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলেই গেটের কাছে আবার তার শ্রীমুখ! একটি পয়সা সাহেব!

উঃ জ্বালাতন। দুষ্টুমি করে মেয়েদের দেখিয়ে দেই। ছোট্ট টিনের মগটা ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ করে ছুটবে। পয়সা আদায় করে তারপর ছাড়বে। যিনি দেবেন না, চিরাচরিত প্রথায় নিচু হয়ে এক সালাম! একেবারে শক্তিশেল।

বাধ্য হয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দেবেন তিনি। এমনি চলতে থাকবে কিছুদিন। একমাস। তারপর হঠাৎ একদিন উধাও।

সেণ্টার চেঞ্জ।

তাকে দেখব সদরঘাটে, ইসলামপুরের মোড়ে অথবা মিটফোর্ডের সম্মুখে। হয়তো সেখান থেকেও কিছুদিন পর উধাও।

আবার নতুন সেণ্টার।

সাইক্লিক্ অর্ডারে ঘুরে এসে আবার সেই মুসলিম হল। মেডিকেল কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়।

: এই যে! হিয়ার ইউ আর?

: এই, তোর দেশ কোথায়?

: ফরিদপুর।

: ভিক্ষে করিস কেন?

: ক্ষিদে পায় যে।

: থাকিস্ কোথায়?

: চকবাজার।

: কে আছে?

: কেউ নেই।

: কাজ করবি?

: ডান হাত অবশ যে।

: দেখি? তাইতো!

চকবাজার থেকে মার্কেটিং করে ফিরছিলাম সাইকেলে। গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ালাম। তাইতো! সেই ছেলেটি তিনটি ইট বিছিয়ে ছেঁড়া কাগজ, টুক্‌রো খড়ি এবং পাতা এনে সেই ইটের মধ্যে পুরে মাটির পাতিল চাপিয়ে রান্না করছে। ধূমা থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য, চোখ বুঁজে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে বাঁকা হয়ে। টগবগ করে চাল ফুটছে ছোট্ট মাটির পাতিলে।

: এই তোর সংসার নাকি?

: জি হুজুর।

ভাবলাম জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়লাম নাকি? এক্ষুণি হয়তো পয়সা চেয়ে বসবে। কিন্তু তা চাইল না।

: যাস্ না যে ওদিকে ?

: জ্বর সাহেব।

: ক'দিন ?

: পাঁচ দিন।

: খাস্ কি ?

: এতোদিন যা ছিল পকেটে।

: ফুরিয়ে গেলে ?

: মরে থাকবো।

: কি নাম বললি ?

: লাডু মিয়া।

থাক থাক। লাডুতেই চলবে। মিয়ার আর দরকার হবে না।

দেখলাম লাডুর সংসার। জুতোর দোকানের অনেকগুলি ভাঙ্গা কাঠের বাক্স রেখে দিয়েছে ছোট্ট গলির মোড়ে। তারই তিনটে এক করে লাডুর ঘর উঠেছে। দুই বাক্স দিয়ে দুই দিক বন্ধ। মাঝখান দিয়ে যাবার পথ। ভিতরটা অন্ধকার। একটা তেল-চিটচিটে কাঁথা, জুতার বাক্স দিয়ে বালিশ হয়েছে। একটা ঝোল্না। সেই চির-চেনা টিনের মগ। একটা ভাঙ্গা আয়না এবং ভাঙ্গা চিরুনি। সংক্ষেপে লাডুর সংসার !

আপনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান অথবা রিক্সায় কিংবা মোটরে পথ অতিক্রম করেন—তখন আপনার গতি থামিয়ে এমনি গলির মোড়ে যদি সকরুণ এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন আপনার মতই একদল জীব এমনি করে করে দিন কাটায়। এরা পথের কুকুরের কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে খায়—পথে আপনাকে বিরক্ত করে। এরা মানুষ নয়! এরা অভিশপ্ত আদমের সন্তান ! কবে কোন দূর প্রভাতে বিবি হাওয়া আর আদম নিষিদ্ধ গন্দম খেয়েছিলেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলে এরা দিনের পর দিন। কিন্তু বলতে পারেন এই প্রায়শ্চিত্তের শেষ হবে কবে ? যুগ-যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীভূত বেদনার অশ্রু-বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেনি কি আল্লাহতালার বজ্র-ভীষণ অভিশাপের লেলিহান অগ্নি-শাসন।

এরপর লাডুকে অনেকদিন দেখিনি। গলির মোড়ে পড়ে রয়েছে কেরোসিন কাঠের বাক্স দুটি। তার ঝোল্না, টিনের মগ, আয়না চিরুনি—সব।

সাইকেল থেকে নেমে জুতার দোকানীকে জিজ্ঞেস করি।.. লাট-বেলাট, মন্ত্রী-হাকিম, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, হিল্লী-দিল্লীর খবর সকলে রাখে—কিন্তু গরীবের খবর কেউ রাখে না! হয়তো কুকুর-বেড়ালের মত কোথায় মরে পড়েছিল। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মুরদা-ফরাস ফেলে দিয়েছে!

কিন্তু না। লাড়ু মরেনি। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। চার নং ওয়ার্ডে গিয়ে চমকে থমকে দাঁড়ালাম।

: কিরে লাড়ু! তুই এখানে?

: হ স্যার! (লাড়ু স্যার বলতে শিখেছে)

: কবে এলি?

: একমাস।

: কি হয়েছিল?

: জ্বর।

: তারপর?

: অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম পথের ধারে।

: তারপর?

: কে একজন ফেলে রেখে গেছে এখানে।

মনে মনে বললাম: লাড়ুর ভাগ্য ভাল। কারণ সবই তো জানি। দরিদ্রের টাকায় গড়ে উঠে রাষ্ট্র। কিন্তু গরীবের কতটুকু অধিকার। বিরাট ম্যানসন—বিরাট-বিরাট হাসপাতাল গড়ে উঠে—সমুখের দরজা থেকে হতাশ-চোখে ফিরে আসে গরীব—'ভাগো হিয়াসে। সিট নেহি হ্যায়!'...

লাড়ুর ভাগ্য ভাল। তার সিট হয়েছে! দিব্যি আরামে আছে সে! দুধের মত পরিষ্কার সাদা বিছানা। নরম বালিশ। পশমের কম্বল তার উপরে স্প্রিং-এর খাট। লাড়ু কি এর আগে এত আরামে কোনদিন ছিল? লাল টুকটুকে কম্বল গায়ে দিয়েছে। গায়ে হাসপাতালের ষ্ট্রাইফস্-এর সার্ট। পরনে ষ্ট্রাইফস্-এর পায়জামা।

স্প্রিং-এর খাটের উপর বসে মাখন দিয়ে সে রুটি চিবোচ্ছিল। আর খাটের উপর বসে দুলছিল। লাড়ু দিব্যি আছে। সকালে ডিম-রুটি-মাখন-চা-দুধ, দুপুরে ভাত-মাংস-দুধ-কমলালেবু, বিকেলে মাখন-রুটি-দুধ-পুডিং...

বন্ধুকে দেখে লাড়ুর সিটের দিকে যাই। সে তখনো স্প্রিং-এর খাটের উপর জোরে জোরে দুলছে। হি হি করে হাসছে।

: কিরে, কেমন আছিস্?

: খুব ভাল।

: চলে যাবি কবে?

: কোনদিন যাবো না।

: তার মানে? এখানে চিরদিন তোকে থাকতে দেবে নাকি?

: না, আমি যাবো না। লাড়ুর চোখে মুখে দৃঢ় প্রতিবাদের ভাব।

বন্ধুকে দেখতে আসি। লাড়ুর সিটের দিকে তাকাই। শিস দিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। একবার এ বিছানার পাশে, একবার ও বিছানার পাশে। ট্যাঙ্ক থেকে পানি ভরে নিয়ে দেয় কখনও কখনও কোন রোগীকে। আবার নিজের বিছানায় বসে কিছুক্ষণ দুলে নেয়। এক-টুক্‌রো রুটি চিবোয়। চিনি ফুরিয়ে গেছে। পাশের রোগীর কাছ থেকে ধার নেয়। বিকেল বেলাতেই দিয়ে দেবে আবার। মাখন চেয়ে নেয় ডান দিকের বেড থেকে।

নার্স এসে যায়। ওষুধ খাবার পালা। বিছানা থেকে নেবে একছুটে গিয়ে নার্স-এর পায়ে এক আভূমিলম্বিত সালাম।

কিন্তু না, পয়সার জন্য নয় এবারে!

হা হা করে হেসে ওঠে সকলে। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে সকলের।

: কিরে দুষ্টু, কেমন আছিস?—নার্স বলে।

অবশ হাতটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে উত্তর দেয়—ভাল আছি!

নার্সের পেছনে পেছনে সমস্ত ওয়ার্ডময় ঘুরে বেড়াবে। নার্স-এর ওষুধের প্লেট, থার্মোমিটার পিউরীফাইয়ার এবং ইন্‌জেকশনের বাক্স বহন করে চলবে তার পেছনে পেছনে। সমস্ত ওয়ার্ড ঘোরা শেষ হবে। এইবার তার পালা।

: দিদি।

: কি?

বুঝতে পারে সবই নার্স। তেতো ওষুধে তার অরুচি।

: আচ্ছা আজ নাক মুখ বুজে খেয়ে ফেল্। কাল মিষ্টি ওষুধ দেবো।

: দিদি।

: কি ?

আবার করুণ চোখে আবেদন। বুঝতে পেরেছে নার্স।

: চকোলেট ?

: আচ্ছা—নে আমার এই পকেট থেকে। হাত বন্ধ আমার।

চারচারটে চকোলেট পেয়ে লাড়ুর আনন্দের সীমা নেই। দোল্ দোল্ দোল্। দুলতে থাকে স্প্রিং-এর খাটে।

হাসপাতালের নার্স। কথাটি শুনেই আপনাদের কেমন লাগে, না ? যার কোন গতি নেই, সেই নাকি হাসপাতালের নার্স হয়। জাত হারিয়ে নাকি বৈষ্ণব সাজে। নার্স রোকেয়ার জীবনে এমন কোন ইতিহাস আছে কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক দারিদ্র্য তাকে টেনে এনেছে এখানে। ঠিক লাড়ুর মতই দেখতে, তেমনি দুষ্টু একটি ভাই ছিল তার। তেরশ পঞ্চাশ, মন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ব্ল্যাকমার্কেট অনেক কিছু ঘটে গেছে বাংলাদেশে। রোকেয়ার পিতামাতা সব কিছু গেছে। লাড়ুর দিকে তাকিয়ে তার ভাইটির কথা মনে পড়ে। সে যেন তারই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

ছেলেটার প্রতি কেমন মায়া পড়ে গেছে তার। কত রোগী আসে, কত রোগী চলে যায়। কতজন এল, কতজন চলে গেল। সেও হয়তো চলে যাবে একদিন এবং খুব শীগগীরই !

: ইউ বেড নং ফোরটিন ! দেখি টিকেট ?

: লাড়ু।

: ইয়েস। এল এ আর ইউ। লাড়ু।—হাউজ ফিজিসিয়ান নাম লেখেন।

: তোকে চলে যেতে হবে, ভাল হয়ে গেছিস তুই।

বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠে লাড়ুর মুখ। খাট থেকে নেমে চট করে পায়ে

সালাম করে ফেলে সে হাউজ-ফিজিসিয়ানের। পয়সা নয়! যাবে না সে এখান থেকে! না—সে কিছুতেই হবে না!

: আচ্ছা বেশ। কাল না হয় পরশুদিন চলে যাবি।—ডাক্তার বলেন।

নার্স রোকেয়া আসে বিকেলে। ঘড়ির কাটায় কাটায়। পায়ে সালাম করে না লাডু। চকোলেট চায় না। গম্ভীর হয়ে যায় সে। তারপর কেঁদে ফেলে ঝরঝর করে।

: দিদি! আমি যাবো না।

: কি পাগল ছেলে তুই বলতো। তোকে চিরদিন কি এখানে থাকতে দেবে?

: না, আমি কিছুতেই যাবো না।

অশ্রুসজল হয় নার্সের চোখ। হারিয়ে যাওয়া ভাইটির করুণ স্মৃতি মনে পড়ে। কি অসহায়! পিতা নেই, মাতা নেই, আত্মীয়-বান্ধবহীন সংসারে বিপুল জনসমুদ্রে খড়কুটোর মত ভেসে চলে এরা।

দুইদিন পর হাউজ-ফিজিসিয়ান আবার বলেন, তুই আজও যাসনি? কাল সকালে উঠে চলে যাবি।

: রোকেয়া ফিস্ ফিস্ করে ডাক্তারকে বলে—আর ক'টা দিন থাক। শরীরে এখনো নর্মাল ভিগার আসেনি।

: আচ্ছা বেশ বেশ। থাকুক দিন কয়েক।

সুপার আসেন কিছুদিন পরে। এ বেড থেকে ও বেড ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় লাডু। শিস্ দিয়ে সিনেমার গান করে গুন্ গুন্ করে।

: হু ইজ দ্যাট বয়?

: পেসেণ্ট।—নার্স বলে।

: এই ছোক্‌রা, বেড ছেড়ে ওখানে ঘুরছিস কেন?—বেড নং ফোরটিনের কাছে এসে টিকেট দেখে সুপার।

: ভাল হয়ে গেছে তবে রাখা হয়েছে কেন এতদিন?

আমতা আমতা করেন হাউজ-ফিজিসিয়ান আর নার্স।

: ডিসচার্জ করে দেবেন কাল।—সুপারের আদেশ।

: তোকে এতবার বলি—বেড ছেড়ে ঘুরাঘুরি করবি না। দুষ্টুমি করবি না। এইবার হল তো? কালই চলে যেতে হবে তোকে। নইলে চাকুরী যাবে আমার।

ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে থাকে লাডু: না-না আমি যাবো না। আমি কিছুতেই যাবো না!

: কি পাগল। ভাল মানুষকে কি এখানে থাকতে দেয় কখনো?

: ভাল মানুষ মানে? আমার অবশ হাত ভাল করে দাও।

: ওটা তো তোর জন্ম থেকেই। ওকি আর ভাল হয়?

সব ওকালতিই ফেল হয় লাডুর। সারাটা দুপুর গম্ভীর হয়ে শুয়ে থাকে সে! মনে মনে বুদ্ধি আঁটে।

হৈ চৈ পড়ে যায় বিকালে। ডাক্তার ছুটে আসে। নার্সরা আসে আইওডিন ও ব্যাণ্ডেজ নিয়ে। কাঁচে মারাত্মকভাবে পা কেটে গেছে লাডুর। পা কেটে ভেতরের সাদা মাংস দেখা যাচ্ছে। রক্তে ভেসে যায় ওয়ার্ড।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকে লাডু। বিকেলে রোকেয়া আসে।

: কেমন করে কাটলি?

: কাঁচে।

বিছানায় উঠে বসে সে। নার্স রোকেয়া কাছে ডেকে নিয়ে আসে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, ওরা তো বলল থাকতে দেবে না—তুইও বললি ভাল মানুষকে থাকতে দেবে না এখানে। দরজার কাছে সেই ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোটা ছিলনা—সেইটা দিয়ে দিলাম পায়ে এক হ্যাঁচকা টান। ভেবেছিলাম একটু কাটবে—কিন্তু বড্ড বেশী কেটে গেল যে দিদি! যা রক্ত পড়ল। এবারে বেশ নিশ্চিন্তে থাকা যাবে এখানে তাই না দিদি?

অশ্রুসজল হয় রোকেয়ার চোখ।

দীর্ঘ একমাস পরে ঘা সারে তার। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়। আবার তাগিদ। কোন রোগীকেই এতদিন রাখার নিয়ম নেই। সুপারের কড়া হুকুম।—

: তুই এবার চলে যা লাড়ু!—রোকেয়া অশ্রুসজল চোখে বলে।

: না, না, না,—আমি যাবো না! আমি কিছুতেই যাবো না! লাড়ুর পুরাতন জবাব। ওষুধের প্লেট, ইনজেকশন্, ফাইল ইত্যাদি নিয়ে রোকেয়ার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় সমস্ত ওয়ার্ড দিয়ে। তার কাছ থেকে চকোলেট নিয়ে সকলকে দেখিয়ে আরাম করে চুষতে থাকে।

: এটা কি ওষুধ রে দিদি?

: কুইনাইন মিক্শ্চার।

: ওটা কি রে?

: টিন্চার আইওডিন।

: এটা?

: বেলাডোনা।—লাড়ুর প্রশ্নের চোটে বিরক্ত হয়ে উঠে রোকেয়া। বলে,—বড্ড বকিস তুই। থাম তো!

: আচ্ছা দিদি। ফিস্ফিস্ করে কানে কানে বলে সে—এমন কোন ওষুধ নেই যেটা খেলে চিরদিন থাকা যাবে এখানে। শরীরটা বেশী ভালোও হবে না, বেশী খারাপও হবে না।

: উঃ, বড্ড বিরক্ত করিস তুই! কান ঝালাপালা হয়ে গেল!—রোগীদের ওষুধ আনতে আলমারীর দিকে যায় রোকেয়া। রাশিকৃত বোতল। গায়ে লেবেল আঁটা।

: হেই সবুজ ওষুধটা কিসের রে?

: লাড়ুর প্রশ্ন বিরামহীন।

: ওটা দাঁতের।

: ওই লাল টুকটুকেটা?

: ওটা খেলে ক্ষিদে লাগে।

: আর এই ইটের রং-এরটা?—টিন্চার আইওডিনের শিশি দেখিয়ে প্রশ্ন করে লাড়ু। রোকেয়া এবারে ভীষণ বিরক্ত হয়ে যায়।

: এটা? এটা এমন এক ওষুধ যা খেলে কোনদিন তোকে এখান থেকে যেতে হবে না। একেবারে চিরদিনের জন্য থেকে যেতে হবে।—ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে রোগীদের কাছে চলে যায় সে।

লাড়ু একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে বোতলটা। মাঝের তাকে তিনটে বোতলের

পর সবচেয়ে বড় বোতল। মনে মনে মুখস্থ করে রাখে। মাঝের তাকে তিনটে বোতলের পর।

খাটের উপর বসে আবার ঢুলতে থাকে সে। সমস্ত ঘরময় টহল দিয়ে বেড়ায়। গান গায় গুনগুন করে। রাত্রি চারটে বাজে। সমস্ত হাসপাতাল ঘুমুচ্ছে। কেউ জেগে নেই। নার্সরা ডিউটি শেষ করে চলে গেছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়ে লাড়ু। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আলমারীর দিকে। মাঝের তাকে তিনটে বোতলের পর .....

আলমারী খুলে বোতলটা ধীরে ধীরে বের করে নিজের বিছানায় মশারীর নিচে গিয়ে ঢোকে। গলগল করে ঢেলে দেয় মুখে। কিন্তু একি! সমস্ত জীভ মুখ যে পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মত! যেন নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ঢুকছে ওষুধটা। তবে যে দিদি বলেছিল—হাত থেকে খসে পড়ে যায় বোতল।—কপাল ঘেমে ওঠে। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে।

সকাল বেলায় চার নং ওয়ার্ড ভরে গেল ডাক্তার নার্সে। ওয়ার্ডের সমস্ত রোগীরা ঝুঁকে পড়ল চৌদ্দ নাম্বার বেডের সম্মুখে। সেই চঞ্চল ছেলেটা আইওডিন খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সমস্ত শরীর, মুখ নীল হয়ে গেছে।

টস্‌টস্‌ করে পানি গড়িয়ে পড়ে নার্স রোকেয়ার গাল বেয়ে। পাগলের মত চীৎকার করে বলে: না না, সে আত্মহত্যা করেনি! সে এখানে থাকতে চেয়েছিল—চিরদিনের জন্য থাকতে চেয়েছিল। এ পৃথিবীতে তার কেউ ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসি। গলির ধারের সেই ভিক্ষুক ছেলেটি আর বিরক্ত করে না।

এপার ওপার

মযহারুল ইসলাম

উল্লাপাড়া স্টেশন ছেড়ে পুবদিকে কিছুদূর এগুলেই করতোয়া নদী। নদীর পুবপারে একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম রসুলপুর।

এ গাঁয়েরই ছেলে মোমেন। মোমেন যখন ছোট্টটি তখনই ওর বাপ আর মা দু'জনই মারা যায়। ওর বুড়ো দাদী ছাড়া মোমেনকে দেখবার শুনবার কেউই ছিল না। ধরতে গেলে দাদীর কোলেই ও মানুষ। সংসারে মোমেন আর ওর দাদী। আর সবাই চোখ বুজেছে একে একে। মোমেনের দাদী বৃদ্ধা জোমেলা। সংসারে সবাই যখন জোমেলাকে ছেড়ে চলে গেল তখন শূন্য বুকে ওই মোমেনকে কোলে করেই ঝড়ে ভাংগা বটগাছের মত দাঁড়িয়ে থাকল জোমেলা। গাঁয়ের সবাই ওর বেদনাকে জানতো-বুঝতো। সহানুভূতিও জানাতো অনেকেই। আবার অনেকেই সুযোগ বুঝে ওর জমি বাড়ী নিলামের চেষ্টা করেছে বহুবার, কিন্তু পারেনি। পারেনি, কেননা জোমেলার দৃষ্টি ছিল চারিদিকেই বিস্তৃত। খুব সুচতুরা আর বুদ্ধিমতী হিসেবেই গাঁয়ের অনেকে ওকে মান্য করে চলতো।

এত দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়েও কিন্তু মোমেনকে স্কুলে দিয়েছিল জোমেলা। গাঁয়ের লোকেরা অবশ্য বুড়ির এ কাজটাকে সমর্থন করতে পারেনি। ওর যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তারাও বলেছে, 'তোর এ কাজ সাজে না বু, নাতীটারে কোথাও লাগালে ট্যাহা পাবি, আমাগরে ভাগ্যে কি লেহাপড়া আছে।' কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি জোমেলা। মোমেনকে লেখাপড়া শিখানোর অদম্য বাসনা ওর মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুলতো ঝংকার, কোচকানো চামড়ার নিচে হিমেল রক্তে রক্তে আনতো অদ্ভুত শিহরণ। নাতীকে সে দারোগা বানাবে। হাকিম বানাবে। যায় যাবে সাত আট বিঘা জমি—মোমেনের দাদা করেছিল বহু কষ্ট করে। আর না হয় জোমেলা শেষ পর্যন্ত ওর গায়ের মোটা মোটা রূপার গহনাগুলো বিক্রী করে দেবে।

তবু নাতিকে জোমেলা মানুষ করবেই। নাতি ওর লেহা-পড়া শিখলে হয় তো হারানো সম্পত্তি আবার ফিরে পাবে। ওর এই অদম্য বাসনাকে কেউ টলাতে পারেনি কোন উপদেশ দিয়ে।

মোমেনের লেখাপড়া শেখানোর পিছনে ওর দাদীর এই অদম্য বাসনাই ছিল মূল। তাছাড়া মোমেন ছাত্রও ছিল ভাল। প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে শাহজাদপুর স্কুল থেকে যখন সে প্রথম বিভাগে দুটো লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করল তখন স্থানীয় অনেকেই বিস্মিত হয়ে গেছিল। বুড়ি জোমেলাকে স্কুলের হেডমাস্টার পর্যন্ত এসে উপদেশ দিয়েছিল তাকে কলেজে পাঠাতে। জোমেলা জানতো নাতি ওর খুব ভালভাবে পাশ করবে, তাকে আরো পড়াতে হবে। তাই সে প্রায় এক বছর হল হাঁসের ডিম আর মুরগীর ডিম না খেয়ে বেচে বেচে পয়সা জমিয়েছিল। একদিন মোমেনকে বাক্স খুলে একটি নেকড়ার পুটলী দেখিয়ে বলল, "গোনতো বাই পয়সাগুলি, তোর কলেজে যাওয়ার ট্যাহা এতেই হবি, ভাবত্যাছিস ক্যানে বাই, আমি থাকতে তোর ভাবনা নাই।" স্তম্ভিত হয়ে গেল মোমেন। গুণে দেখে অবাক হয় সে। দুশ টাকা জমে গেছে দুই বছরে। আহ্লাদে ওর বুক ফুলে উঠল। তাহলে সত্যিই আর কলেজে যাওয়া বন্ধ হবে না।

এক ভাল কলেজে ভর্তি হল মোমেন। প্রথম শহরে এসে একটি নতুন দুনিয়া দেখে মোমেন একেবারে ভড়কে গেল। অবশ্যি ধীরে ধীরে সে খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে শহরে আবহাওয়ার সাথে। কিন্তু মুস্কিল, ওর দাদীকে ছাড়া মোমেন যেন কিছুতেই থাকতে পারত না। এক মাস বাড়ি ছেড়ে থাকতেই ও হাঁপিয়ে উঠত। ক্লাসে বসে মাঝে মাঝে ওর দাদীর কোঁচকানো মুখটার কথা মনে পড়ে মোচড় দিয়ে উঠত মোমেনের প্রাণের ভেতর। এজন্য ঘন ঘন বাড়ি আসতো মোমেন। ওর দাদী কিন্তু তার একমাত্র নাতির ঘন ঘন বাড়ি আসা ভাল চোখে দেখতে পারত না। একদিন মোমেনকে বলেই ফেলল,—'এত বাড়ি আসিস ক্যানে, পড়া-লেহা করতে হলে বাড়ির মায়া ছাড়তে হয়।' অপরাধীর ন্যায় জবাব দিল মোমেন—'তোমায় ছাড়া থাকতে পারি না যে, কেবল তোমার কথা মনে হয়।'

এত ঘন ঘন বাড়ি গিয়েও মোমেন পরীক্ষায় ভাল করল। আই, এস-সিতে প্রথম বিভাগে পাশ করল পদার্থ বিদ্যায় লেটার নিয়ে। তাছাড়া মাসে কুড়ি টাকা করে বৃত্তিও পেল মোমেন।

মোমেনের যদিও উচ্চশিক্ষার বাসনা ছিল কিন্তু দাদীর দুঃখ দেখে ওর বাসনাকে চাপা দিতে হল। দাদীকে বলল,—'এবার একটা চাকরী নেই, তুমি আর কত কষ্ট করবে। তোমার দুঃখ আমার সহ্য হয় না। তোমায় আমি আর কষ্ট করতে দেব না দাদী।' কিন্তু দাদী ওর দমবার পাত্র নয়। সে মোমেনের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল,—'কস কি! তুই আর পড়বি না! তোকে যে আমি দারোগা বানাবো, হাকিম বানাবো, ব্যারিস্টর বানাবো। বিদ্যার একেবারে শেষ পড়াবো। তোকে পড়তেই হবে। আমার জন্য তোর কুনু চিন্তা নাই। আল্লা আচে রে, আল্লা আচে। তুই পড়তে যা।'

শেষ পর্যন্ত দাদীর চাপে মোমেনকে আবার পড়তে যেতে হল। ঢাকায় ভর্তি হল মোমেন। বি. এস-সিতে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিল সে।

ঢাকায় এক অবসরপ্রাপ্ত দারোগার বাসায় জায়গীর থাকল মোমেন। একটি মাঝারী রকমের দোতলা দালান, ওর নীচের তলায় একটি প্রকোষ্ঠে থাকবার জায়গা হল মোমেনের। বাড়ির অতি আধুনিক চালচলনের সাথে পরিচিত নয় বলে প্রথম প্রথম ওর বেশ একটু অসুবিধা হল। কিন্তু সে শুধু দু'এক মাস। কিছুদিনের মধ্যেই মোমেনের চালচলনে বেশ-ভূষায় দেখা দিতে লাগল আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণ। কোট আর প্যান্ট, দু'চারটে জামা, শেরওয়ানী সবই তার দেহে শোভা পেতে লাগল একে একে। আজ আর শুধু দেহাবরণের জন্যই জামা-কাপড় নয়, দেহাবরণের চেয়ে দেহাকর্ষণ বাড়ানোই বড়। কিসে একটু ভাল দেখা যায় এর অযুত প্রচেষ্টা। মোমেনের হঠাৎ এই পরিবর্তনের অন্য সব কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল প্রধান। সেটা রূপানুরাগ। দারোগা সাহেবের বড় মেয়ে মাজেদাকে ওর খুব ভাল লাগতো। মাজেদার ঐ কালো কালো চোখ দু'টো সরলতা-মাখা মুখখানা আর দোহারা গৌরবর্ণ স্বাস্থ্য প্রথম দৃষ্টিতেই মোমেনের প্রাণে এনেছিল এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে রূপ লাভ করল অশ্রান্ত অনুরাগে। মোমেন কোনদিনও মেয়েদের সংস্পর্শে আসেনি। জীবনে

প্রথম অনুরাগের ঢেউ এল তার যে মেয়েকে দেখে, সে মাজেদা। তাই সে নিজেকে হাজার সংযত করতে গিয়েও পারল না। পদে পদে যেন মাজেদার আকর্ষণ তাকে আঁকড়ে ধরল। মাজেদাকে যতই ভুলতে চায় ততই যেন তাকে আরো আরো বেশী করে মনে পড়তে লাগল মোমেনের। তার সমস্ত পৌরুষ যেন মাজেদার কাছে মাথা নিচু করে পরাজয় স্বীকার করল। মাজেদার তরফ থেকেও সাড়া মিলল প্রচুর। সে আই. এস-সি. ক্লাশের ছাত্রী। সময়ে অসময়ে সে আসতো মোমেনের কাছে পড়া বুঝে নেবার ছল করে। দারোগা সাহেবের এতে বাধা দিবার কিছুই ছিল না। মাজেদার মা অবশ্যি দু'এক মাসের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। দেখলেন মাজেদার চলাফেরায় যে দুর্বার চাঞ্চল্য এসেছে, যে বেপরোয়া গতি এসেছে তা এর আগে কোনদিনও দেখা যায়নি। ব্যাপারটা আঁচ করে তিনি দারোগা সাহেবের কাছে একদিন বলেই ফেললেন। দারোগা সাহেব প্রথমটা মুখ ভারী করে বল্লেন—'হু তাহলে এতদূর! আচ্ছা।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝে দেখলেন মোমেনের হাতে মেয়েকে সমর্পণ করা তেমন খারাপ কিছুই নয়, বরং এমন একটা ছেলে ক'জন পেয়ে থাকে।

শেষে সত্যি একদিন ওদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কথা মোমেন ওর দাদীকে লিখে জানাল। দাদী প্রথমটা কিছু বিস্মিতা, কিছু আহতা হল, কিন্তু বুঝে দেখল মোমেন ভালর ঠিকই করেছে। তবে তার চিন্তা হল মোমেনের লেখাপড়া শেষে নষ্ট না হয়। পাড়ার একটি ছেলেকে ডেকে সে মোমেনের কাছে চিঠি লিখতো প্রায়ই। সে বেশ সুন্দর করে ছোট ছোট কথায় বুড়ির মনের কথাগুলো লিখে দিত মোমেনের কাছে। এবারও লিখল—

'স্নেহের ভাই, বিয়ে করেছো বেশ ভাল কথা। শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমাদের দুজনকেই আমি আশীর্বাদ করি, সুখী হও। কিন্তু ভাই, লেখাপড়ার দিকে নজর রেখ। আর আমার নতুন বোনটিকে পেয়ে এ বুড়ী বোনকে ভুলে যাবেনা তো? সুযোগ পেলে আমার নতুন ছোট বোনটিকে সাথে করে এসে দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো। নিজের হাতে আশীর্বাদ করবো।—তোমার দাদী।'

দাদীর চিঠি পেয়ে মোমেন খুশী হল, প্রেরণাও পেল প্রচুর। প্রাণ-খোলা ভাষায় একটি উত্তরও দিল সে। কিন্তু পড়াশুনার চাপে এক বছরের

মধ্যে ওর পক্ষে আর বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠল না। তার দাদীকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো মোমেন। দাদীও তার জবাব দিত যথাসময়ে।

শেষ পরীক্ষা দিয়ে মোমেন একবার দাদীকে দেখতে গেল বাড়িতে। মাজেদাকে সাথে করে নেবার ইচ্ছে ছিল তার প্রচুর। কিন্তু মাজেদা অসুখের ছুতো দিয়ে যাওয়া অস্বীকার করেছিল। আর সাথে সাথে একথাও জানিয়ে দিয়েছিল যে, কোন এক নোংরা গাঁয়ের কুঁড়েঘরে গিয়ে মারা পড়বার মত ইচ্ছে তার নেই। এমন কি, মোমেনের এই যাওয়াটাকেও ভাল চোখে সমর্থন করতে পারেনি মাজেদা। মোমেন যেন অন্ধকার পল্লী থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসে এ অভিপ্রায়ও মাজেদা জানিয়ে দিয়েছিল মোমেনকে। মোমেন মাজেদার কথাগুলির কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি।

অনেকদিন পর জোমেলা মোমেনকে কাছে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কিন্তু মোমেন আর সে মোমেন নেই। তার মধ্যে শহুরে হাবভাব খুব বেশী ঢুকে গেছে। পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট কুটিরে যে তার মোটেই মন বসছে না। দাদী তা বুঝতে পারল না। ধরে নিল, জোড়া ছাড়া পাখী, তাই অমন ছটফট করছে।

মোমেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য জাগল জোমেলার। একদিন সে জিজ্ঞেস করল মোমেনকে—'তুই তা'লি এহন কি করবি মোমেন, চাকরী-বাকরী দেখত্যাচিস কি।'

—না দাদী, চাকরী দেখছি না, তবে পরীক্ষায় ভাল হলে একটা কাজ করব ইচ্ছে আছে.—শান্তভাবে জবাব দেয় মোমেন।

—কি কাজ ?

—বিলেত যাব।

—বিলেত। ক'স কি! হেখানে গেলি নাকি ম্যাল্লোচ হয়। এত লেহাপড়া শিখ্যা তুই হেখানে যাবি ক্যানে।

—আরে বল কি, যারা জানে না তারাই ওকথা কয়। বিদ্যার গোড়াই তো সেখানে। সেখানে না গেলে কি বড় চাকরী হয় নাকি ?

—কি জানি ভাই, তোরা সেসব জানিস, আমরা কিছু জানিও না। যা ভাল বুঝিস তাই কর। তবে দাদীর কথা মনে কর্যা সৎপথে চলিস। মনে রাখিস তুই গরীবের ছ্যালা।

—সে কথা জানি দাদী। তবে তোমার কষ্ট দেখলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় শুধু তোমাকেই দেখাশুনো করি।

—আমার আর কি কষ্ট। এখন কবে মরি কবে বাঁচি। তবে তুই যে মানুষ হলি এইটাই আমার বড় সুখের. আমি আর কুনু সুখ চাই না।

—না দাদী, মানুষ এখনো হই নাই। মানুষ হতে হলে বিলেত না গেলে এ দেশের লোক তাকে মানুষ বলেই মানে না।

—তা যেতে চাস যা, তবে ট্যাহা কোথায় ?

—টাকা লাগবে না, পরীক্ষায় ভাল ফল হলে বৃত্তি পাব। তাতেই চলবে।

—তাহলে যাওয়াই ভাল। আমি আশীর্বাদ করি, খোদা তোর মনের আশা পুরা করুক। আমার জন্য ভাবিস না। খোদা একভাবে চালাবেই। তবে মর্যা গেলে আস্যা জিয়ারত করিস। তোর আতের এক মুঠ মাটি আমার কবরে দিস। দুনিয়ায় নিজের বলতে তো আর কেউ নাই।

মোমেন লক্ষ্য করেছিল, কথাগুলো বলতে বলতে বুড়ীর চোখ দিয়ে মুক্তার মত দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

বাড়ী থেকে যাবার আগে দাদীকে তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটা ঝি-মেয়েকে রেখে গেল মোমেন। তাছাড়া জমিগুলো একটা বিশ্বস্ত লোকের কাছে বর্গা দিয়ে তাকে বলে গেল যেন নিয়মিত ফসল দেয় এবং বুড়ীকে তত্ত্বাবধান করে। দাদীর যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়ে গেল ঝি-টাকে। তারপর একদিন বিকেলে দাদীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ঢাকার পথে রওনা হল মোমেন। যাবার সময় আশীর্বাদ শেষে দাদী বলে দিল,—'বৌকে একবার দ্যাখাইয়া নিস।' মোমেন 'আচ্ছা' বলে পথ ধরল। মোমেনকে যাবার পথে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিল তার দাদী। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত মোমেনকে দেখা গেল ততক্ষণ পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। মোমেন করতোয়া নদীর খেয়া পার হয়ে ওপারে আড়ালে মিশে গেল, আর দেখা গেল না। বুড়ীর দু'চোখ দিয়ে টস টস করে পানি গড়িয়ে পড়ল। কেন যেন সে অত্যন্ত বিচলিতা হয়ে উঠল। কোন বারই মোমেনের যাবার সময় এমন তীব্র বেদনা তো তার বুকে লাগেনি! সে চেয়ে দেখল এক ঝাঁক পাখী নদীর ওপারে পশ্চিম দিগন্তের পানে চলে গেল, আর ফিরে এল না। তবে কি তার মোমেন,

অনাথ পিতামাতা হারা মোমেনও আর ফিরে আসবে না। চিন্তায় মন তার আরো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সত্যি সত্যি মোমেন বিলেত গেল। সরকার থেকে বৃত্তি দিয়ে পাঠান হল তাকে সাগরপারে। যাবার প্রাক্কালে দাদীকে একটি চিঠিতে মোমেন জানিয়ে গেল সে বিলেত যাচ্ছে। মাত্র দু'বছর থাকবে সেখানে। তারপর এসে দাদীকে দেখাশুনা করবে, দাদীর যত্ন করবে। চিঠি পেয়ে দাদী খোদার কাছে হাজার বার মুনাজাত করল তার মোমেন যেন সুখে থাকে আর নিরাপদে ফিরে আসে ওর বাপের ছোট্ট ঘরে। সত্যি মোমেনকে লেখাপড়া শিখানোর স্বপ্ন জোমেলার সার্থক হয়েছে, এই খুনখুনে বৃদ্ধা বয়সেও এজন্যই সে পরিতৃপ্তা।

দু'বছর চলে গেছে বছর তিনেক আগে। মোমেন ফিরে এসেছে। দেশে ফিরবার পূর্বেই ইসলামাবাদের বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্রে একটি বড় চাকুরীর অফার পায় মোমেন। সুতরাং ইংল্যাণ্ড থেকে ঢাকায় না ফিরে সোজা ইসলামাবাদে পৌঁছে চাকুরীতে যোগদান করে সে। মাজেদা ঢাকা থেকে গিয়ে ইসলামাবাদে তার সাথে মিলিত হয়। গবেষণা ও অফিস সংগঠন ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকে মোমেন। মাসে তার প্রচুর বেতন। তার হুকুমে অনেক চাকর-নফর ওঠে বসে।

খবরটা যে জোমেলা বুড়ীর নিকট পৌঁছেনি, তা নয়। মোমেন বিদেশে থাকাকালে দু'বছর সে এশার নামাজের পর প্রত্যেকদিন মোনাজাত করেছে তার মোমেন যেন ভাল থাকে, তার মোমেন যেন লেখাপড়ায় আরো ভাল করে, তার মোমেন যেন সহি সালামতে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু দুটো বছর কেটে যাবার পর প্রত্যেক দিনই সে গভীর আশায় বুক বেঁধেছে, মোমেন এখন কবে যেন দেশে ফিরবে। তার জমিনগুলো বর্গা চষে যে বছিরদ্দি, তাকে ডেকে পর্যন্ত প্রায়ই ডাকঘরে খোঁজ নেয়, কোন চিঠিপত্র এসেছে কিনা। কিন্তু কোন খবর নেই। দুটো বছরের সীমান্ত পেরিয়ে এরপর আরো দু'বছর গড়িয়ে চলে গেছে। তবু কোন খবর পাযনি জোমেলা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য খবরটি এসেছে। মোমেন বিদেশ থেকে ফিরবার পর তিন বছরের মাথায় গ্রামের একটি ছেলেই বুড়ীকে খবর দেয়, তার কোন

এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় নাকি মোমেনকে ইসলামাবাদে গাড়ী হাঁকিয়ে চলতে দেখেছে— সাথে তার স্ত্রী এবং ছোট্ট বেবী।

এ-খবরে জোমেলা প্রথম প্রথম বেশ মর্মাহতা হয়েছিল। সপ্তাহখানেক সে ভালভাবে ঘুমুতেই পারল না। কিন্তু পরে সে মনকে বুঝ দিল—বুঝ দিল এই বলে যে মোমেন বড় চাকুরী করে। হাতে তার কত কাজ, তার অবসর হচ্ছে না, তাই আসতে পারছে না। তবে সময় ফুরসত পেলেই মোমেন তার বুড়ী দাদীর কাছে আসবে—তার মৃত্যুর সময় শিওরে বসে আয়তল কুরসীর দোয়া পড়বে, মুখে চামচে করে পানি দেবে এবং শেষে বুড়ীর দেহ কাঁধে করে গোরস্তানে নিয়ে যাবে। মোমেনের হাতের মাটি সে কবরে গেলে পাবেই।

মোমেনেরও যে মাঝে মাঝে বুড়ী দাদীর কথা মনে পড়ে না তা নয়—তবে অফিসে কাজের চাপে ডুবে থাকা, ঘরে গৃহিণী ও বাচ্চাকে সাহচর্য দান করা এবং মাঝে মাঝে পার্টি ডিনার ইত্যাদিতে যোগদান করা কিংবা সময় করে কখনো মাজেদা ও বেবীসহ দু'তিন সপ্তাহের জন্য মারী, নাথিয়াগলি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া—এই সবের মধ্যে তার জীবনের চাকা নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। সুতরাং মাঝেমধ্যে কদাচিৎ তার বুড়ী দাদীর কথা মনে পড়লেও এ যেন একেবারেই একটি তুচ্ছ স্মৃতিচারণ—যা কিনা বৃহত্তর ও মহত্তর কর্ম ও চিন্তার চাপে পুড়িয়ে মথিত ও নিঃশেষিত হয়ে যায়। একারণেই মোমেনকে দেখলে মনে হয়, সে যে একদিন বুড়ী জোমেলার ডিম বেচা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছিল, একথা বোধ করি মোমেনের স্মৃতির খাতা থেকে মুছে গেছে। অবচেতন মনের পর্দায় এই স্মৃতির ছিটেফোঁটা কিছু এখনো জীবিত আছে কিনা, সে-কথাও কারো বলবার সাধ্য নেই। যদি থাকেও, বুড়ী জোমেলার তাতে কোন ফায়দা নেই।

বুড়ী জোমেলা আজ আর কোন ফায়দা কামনা করে না। তার একমাত্র কামনা, মোমেন তার একবার এসে তাকে দেখা দিয়ে যাক, মরণের সময় তার কাছে বসুক, তার কবরে এক মুঠো মাটি দিক। এ-যেন তার শুধু কামনাই নয়, এ-তার অমোঘ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করে, যেখানেই থাকুক, যতটাকা বেতনের চাকুরীই করুক, যত লোকই তার কথায় উঠ্‌ক বসুক, যত বড় দফতরের কর্তাই সে হোক, বুড়ী দাদীকে মোমেন কোনদিন

ভুলতে পারবে না—অন্তত নোংরা পল্লীর ছোট্ট কুঁড়েঘরে চামড়া কোঁচ-কানো বুড়ী দাদীর কথা। সে একবার আসবেই। হয়তো এখন সময় পাচ্ছে না—কিন্তু একদিন পাবে, একদিন ঐ নিদারুণ শব্দ করা ট্রেনটি উল্লাপাড়া স্টেশনে এসে থামলে সেই ট্রেন থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে করে মোমেন তার মাটিতে নামবে—তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে এই করতোয়ার খেয়াঘাট পার হবে এবং রসুলপুর গ্রামে পা দিয়েই ডাকবে—"দাদী, ও দাদী! আমি এসেছি।" এই বিশ্বাসে, এই অশান্ত ভরসায় এখনো প্রায় রোজই বিকেলে সেই ছোট্ট খড়ের চালা-ভাংগা কুঁড়েঘর থেকে একটি লাঠি ভর দিয়ে ক্যুজপৃষ্ঠে নদীর পুব পাড়ে রাস্তার ধারে নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসে। ওখানে বসে উদাস দৃষ্টিতে নদীর পশ্চিম পারের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। বুড়ী হয়তো কুল-কুল স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—করতোয়া ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে, তার মোমেন যখন ছোট্ট ছিল, এই নদীর ধার দিয়ে শাহজাদপুর স্কুলে পড়তে যেত, তখনো এমনি করেই নদী বয়ে যেত। এখনো তেমনি বয়ে যায়। নদী আছে, শুধু তার মোমেন নেই। মোমেন নদীর ওপারে চলে গেছে! হয়তো নদীর ওপারে যে যায় সে আর ফিরে না। কিন্তু লোকে তো বলে, মোমেন আছে, সে ইসলামাবাদে অনেক টাকা বেতনে চাকুরী করছে। হয়তো সে ছুটি পাচ্ছে না। ছুটি পেলেই মোমেন তার বুড়ী দাদীকে দেখতে আসবে। বুড়ী জানে মোমেন ওর আসবেই। এই বিশ্বাসে এবং এই ভরসায় রোজ রোজ বিকেলের ট্রেন চলে গেলে বুড়ী খড়ের কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে লাঠি ভর দিয়ে নদীর পারের দিকে আসে। আজকাল লাঠি ছাড়া সে আর চলতে পারে না, চলতে তার খুবই কষ্ট। পিঠ তার বেঁকে গেছে। চলতে গিয়ে মনে হয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

প্রতিদিনই সে নদীর পাড়ে আসে আর সূর্যাস্তের পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে যায়, মোমেন তার আসে না। তবু সন্ধ্যার পূর্বে নদীর পাড়ে তার যাওয়া চাই, কখন কোন ফাঁকে তার মোমেন যদি এসেই পড়ে।

ঘোড়া

শামসুল হক

ধানের শেষ ভারটা সজোরে মাটিতে ফেলে বাঁকখানা খুলে নেয় পচু। বাঁধা আঁটি থেকে দড়ি খুলে নিয়ে বাঁকের মাথায় বাঁধে। বৈঠকখানার বেড়ার গায়ে খাড়া ক'রে রেখে উঠানের আমগাছটার নিচে যায়। জোঁকের মত বেরিয়ে থাকা অসংখ্য শেকড়ের একটার ওপর বসে মাথার গামছা খুলে গায়ে বাতাস করতে থাকে। দর্ দর্ ধারায় গা বেয়ে ঘাম ঝরছে পচুর। এক গ্লাস পানির জন্য কলজেটা ছটফট করে। কিন্তু বাড়ির ভেতর যাওয়া ওদের মানা। বাইরে একটা ইঁদারা আছে বটে, তবে পানি তোলার ব্যবস্থা নেই।

বৈঠকখানা থেকে ধনু ব্যাপারীর কণ্ঠ ভেসে আসছে। নামাজ শেষে তিনি হাম্দ পড়ছেন :

হাজারো কান্দিলে তথা
খোদা না শুনিবে কথা
সে কান্দন কাঁদ হেথা
সোবাহানাল্লা, সোবাহানাল্লা ॥

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়। এখানে বলে কালি-সন্ধ্যা। ধান-কাটা ক্ষেতে শিষ কুড়াচ্ছিল আসগর আর গনি। ক্ষেতের সঙ্গেই একটা বাঁশঝাড়। নীড়ে-ফেরা পাখিদের কিচির-মিচিরের অন্ত নেই। কয়েকটা শেয়াল বন থেকে বেরিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে আবার গিয়ে বনে ঢুকল। কয়েকটা ডাহুক বাঁশ-তলায় আধার খুঁটছে। ধান-কাটা ক্ষেতে আধার খুঁটে-খাওয়া শেষ শালিক দুটো উড়ে গেল। অন্ধকার ওদের দু'জনকে গিলে খাওয়ার জন্য আজদাহার মত দ্রুত এগিয়ে এল। আসগরের গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠল। সে গনিকে উদ্দেশ করে বলল : আঁধারে কিছু দেখা যায় না। চল্ বাড়ি যাই।

আসগর বাড়ির বাইরের উঠানে পা রাখল। ধনু ব্যাপারীর ছোট ছেলে

সে। বড় ছেলে শমশের আলী আলিগড় থেকে আইন পড়ে রংপুর শহরে ওকালতি করেন। পরের দুই ছেলে অল্প-স্বল্প লেখাপড়া শিখে জোতদারি চালায়। আসগর সবে পাঠশালায় যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

ধনু ব্যাপারীর গলা মিষ্টি লাগে। আসগর বাড়ির ভেতর যেতে যেতে দাঁড়ায়। বাবা সুর করে কি বলছে শুনবার চেষ্টা করে। অর্থ ঠিক বোঝে না। সুরটা ভাল লাগে, মুখস্থ করতে চায়। কিন্তু একটু পরেই ধনু ব্যাপারীর খড়ম পরার শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। গনি পচুর দিকে এগোয়।

এখনও বাড়ি যাইস নাই ?

ছেলেকে জিজ্ঞেস করে পচু।

আসগরকে পৌঁছে দিতে—

ছি, নাম ধরতে নাই। ছোট মিয়া কইতে হয়।

ধনু ব্যাপারীকে দেখে ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে শেষের বাক্যটা একটু চড়িয়েই বলে পচু। ব্যাপারী সাহেব যাতে শুনতে পান, সেজন্য ছেলের কথাটা নিজেই বলে : ছোট মিয়াকে পৌঁছে দিতে আইছিলি ?

বলতে বলতে ধনু ব্যাপারীর দিকে এগিয়ে যায় পচু। ব্যাপারী সাহেব ধানের স্তূপীকৃত আঁটিগুলোর দিকে যেতে যেতে গর্জন করে ওঠেন : হারামজাদা হাওয়া খাচ্ছে। ঐ কুত্তার বাচ্চা, আঁটিগুলা পালা করবে কে রে, তোর বাপ ?

কালই তো মলন দিতে—

তোর হুকুমে, হ্যাঁরে শূয়ারের ঝাড় !

আর টু শব্দটি না করে তাড়াতাড়ি আঁটিগুলো পালা করতে লাগল পচু। এ-বাড়ির এমন ব্যবহারের সঙ্গে তার প্রতিদিনের পরিচয়। এই-ই হচ্ছে ওদের ভাষা। গালি ছাড়া ওরা বাক্য শুরু বা শেষ করতে জানে না। ধনু ব্যাপারীর ধমক খেয়ে পচু উপুড় হয়ে একটার পর একটা আঁটি নিতে লাগল, আর স্তূপ সাজিয়ে চলল।

ধনু ব্যাপারীর শ' তিনেক আধিয়ারের মধ্যে পচু একজন। আধিয়ার অর্থাৎ বর্গাদার। জোতদার তার শ' শ' বিঘা জমি চাষ করে এই আধিয়ার দিয়ে। আবাদ করার জন্য আধিয়ারকে দেয় লাঙল, গরু, বীজ। ওরা

দিনরাত গতর খাটিয়ে শস্য ফলায়। জোতদার তার বদলে তাদের দেয় মোট উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক। এই অর্ধেক থেকে আধ। আর অর্ধেক যে পায়, সে আধিয়ার।

জোতদারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গ্রাম, আর তারই করুণায় বেঁচে থাকে গ্রামের লোকগুলো। এদের নিজস্ব জমি নেই। দিনরাত খাটে জোতদারের বাড়ি। বিনিময়ে যা পায়, তাই দিয়ে সংসার চালায়। না পারলে জোতদারের কাছে ধার চায়। খ্যাচাখ্যাচির পর ধার দেয়ও। কেননা, জোতদার জানে, তার নিজের প্রয়োজনেই লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবে নতুন ধান-পাট উঠলে দেড়গুণ হিসেবে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়।

দ'-ক্ষণ কেটে গেছে। স্তূপটা বেশ উঁচু হয়েছে। পচু একবার চোখ তুলে চাইল। ধনু ব্যাপারী চলে গেছেন। একটানা আঁটি টানতে টানতে হাত দুটো ধরে গেছে পচুর। ছেলেকে বলল : গনি, আয় তো বাপ, একটু সাহায্য কর্।

এই কিছুক্ষণ আগে ধনু ব্যাপারী সুললিত কণ্ঠে হামদ পড়ছিলেন। সেই কণ্ঠ থেকে এমন অশ্রাব্য গাল শুনতে হবে, গনি ভাবতে পারেনি। সে বাপের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। বাপের মত তার নিজেরও ব্যাপারীর দিকে চাইবার সাহস ছিল না। বাপ মুখ থুবড়ে কেমন করে আঁটির পর আঁটি দিয়ে স্তূপের পাহাড় বানাচ্ছিল, তাই সে একদৃষ্টে দেখছিল। ছোট্ট মানুষটির ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা ধনু ব্যাপারীর প্রথম ধমকের সময় থেকে ঐ যে দ্রুত চলতে শুরু করেছিল, এখনও তার চলা স্বাভাবিক হয়নি।

ঐ নওয়াবের ব্যাটা, আঁটিগুলা আন্।

ধনু ব্যাপারীর ওপর অক্ষম রাগটা গনির ওপর পড়তে পড়তেও পড়ল না। তাই প্রথম যে মেজাজে তার কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়েছিল, শেষের দিকে সে-মেজাজ সে বজায় রাখতে পারল না। এ-পরিবেশে নিজের ছেলের ওপর রাগ করার অধিকারও যেন নেই বলে মনে হল পচুর।

গনি তাড়াতাড়ি বাপকে আঁটি দিতে লাগল। দ্রুত হাত চলতে লাগল তার। পচু আঁটির পর আঁটি সাজিয়ে টিবি উঁচু করতে লাগল।

আজ কদ্দুর কাটলি?

আবার ধনু ব্যাপারী কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, ওরা টের পায়নি কেউ।

পচু মাথা তুলে বলল: বেশি কাটা হয় নাই, ব্যাপারী সাব। এক-লায় কাটি—

বান্দরটা আজ ছিল কই?

গনির দিকে চেয়ে চেয়ে বলল ধনু ব্যাপারী। ব্যাপারীর দৃষ্টি তার ওপর পড়ায় গনির কলজেটা আবার ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল।

ছোট মিয়ার সাথে স্কুলে গেছল।

স্কুলে। ছেলেকে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বানাবি নাকি?

ছোট মিয়ার সাথে লোক লাগে তো, তাই গেছল।

গনি অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকে স্কুলে যাচ্ছে। কথাটা চেপে গেল পচু।

শেষ আঁটিটা ঢিবির মাথায় রেখে নেমে এল সে। গামছাখানা কোমর থেকে খুলে সশব্দে হাত-পা পিঠ ঝাড়তে লাগল।

কাল তো অনেক কাজ। মলন দিতে হবে, ধান ঝাড়তে হবে, গোলায় তুলতে হবে—সকাল সকাল আসবি।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে পচু বাড়ি-মুখো রওয়ানা দেয়। ব্যাপারী ডাকে: ঐ শোন্ শোন্।

পচু ফিরে দাঁড়ায়। এক পা দু'পা করে ব্যাপারীর কাছে যায়।

গরুগুলা ঠিক আছে? দেখে আয়। সকাল হলে তো তোদেরই কামে লাগে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর দেহটা বিশ্রাম চায়। পচু বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করে। বাড়ি বলতে একখানা খড়ের ঘর। ঝুপড়ি বললে ঠিক বলা হয়। কাঠা দেড়েক জমির ওপর ঐ একটিমাত্র ঘর। ঘর বানাবার জন্য দিয়েছিল ব্যাপারী সাবের দাদা, ছহু মোল্লা। সে কি আজকের কথা। ঐ ঝুপড়ির মধ্যে জীবন কাটিয়েছে তার দাদা, তার বাপ। সেও কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের তিন-পোয়া সময়। এখানেই জীবন কাটাবে গনি, গনির পর তার ছেলে—জীবনের স্রোত এমনি করে বয়ে যাবে একের পর এক।

পচু অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ—একটা সেতু বাঁধবার

চিন্তায় ছিল, এমন সময় ধনু ব্যাপারীর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল : কইরে, গোয়ালে গিয়ে মরলি নাকি ?

ধনু ব্যাপারীর কণ্ঠকে ভয় পায় গনি। আরও কত কি বেফাঁস বলে ফেলবে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি গোয়াল ঘরের দিকে গেল।

একটা গরুর গলায় ফাঁস লাগছিল, ছাড়াতে ছাড়াতে দেরি হল—বলতে বলতে পচু এসে ব্যাপারীর সামনে দাঁড়ায়।

এক ছিলিম তামাক দে।

পচুকে দেখলে ব্যাপারীর কাজের হাত-পা বাড়ে। তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়ে আর দেরি করে না। বাড়ির পথ ধরে।

অন্ধকারে ওরা পথ চলছিল। কুয়াশার ভেতর দিয়ে অন্ধকারকে আরও অন্ধকার মনে হচ্ছিল। পথটা সুমসাম হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কাকের ডাক, শালিক-ফিঙের কিচির-মিচির থেমে গেছে। মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। তবে শীতে তাদের গলাও আড়ষ্ট বলে মনে হয়। ছেলেকে শিশিরের হাত থেকে রক্ষার জন্য পচু ঘাড়ের গামছাখানা ছেলের মাথায় জড়িয়ে দেয়।

বাজান, ধনু ব্যাপারী তোমাকে গাল দিল ক্যান্?

কই ?

হাসতে হাসতে বলে পচু।

কুত্তার বাচ্চা, শূয়ারের বাচ্চা, ইগ্‌লা গাল না?

ও-সব তুই বুঝবি না। আদর করার সখ হইলে ব্যাপারী অমন করি কথা কয়।

ওদের অত জমিজমা, আমাদের একখানও নাই ক্যান্ বাজান ?

ওরা বড়লোক, তাই ওদের অত জমি-জিরাত, গরু-বাছুর, টাকা-পয়সা।

অন্ধকারের ভার হাল্‌কা করার জন্য পচু ছেলের কথার উত্তর দিচ্ছিল।

আমরা বড়লোক হলাম না ক্যান্ বাজান ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পচু। এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সে। তবু বলে : সবাই কি আর বড়লোক হয় রে পাগলা। ছোট লোক আছে বলেই না ওরা বড়লোক।

ওদের বদলে আমরা বড়লোক হলে ভারি মজা হত, তাই না বাজান। খাট-পালং বগলার ফইরের মত বিছনা—

নীরবে পথ চলতে থাকে পচু। ভাবে, একই এলাকার লোক ওরা। একই বাতাসে ওরা নিঃশ্বাস নেয়, একই আকাশের নিচে বাস করে। তবু কী তফাৎ। এসব হয় কেন ? কেউ খেয়ে খেয়ে মরে, আর কেউ মরে না খেয়ে।

বাপের সাড়া না পেয়ে গনি এক সময় বলে : জান বাজান, আসগর আমার কুড়ানো শিষ কেড়ে নিতে চাইছিল। আমি দেই নাই। আমি কুড়াইছি ওকে দেওয়ার জন্যে ?

থাম্ হইছে।

পচু থামিয়ে দেয় ছেলেকে। এতক্ষণ নানান আবোল-তাবোল চিন্তায় মনটা বিষিয়ে উঠেছে। তার ওপর ছেলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয় পচু। ব্যাপারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ ভয়াবহ পরিণতি, ছোট্ট ছেলে গনি তা বোঝে না। বিষ-বৃক্ষের বীজ দেখামাত্রই সমূলে উপড়ে ফেলতে ওরা এতটুকু দ্বিধা করে না, মায়া করে না। এখানে ওদের স্বার্থের প্রশ্ন, মর্যাদার প্রশ্ন। এ-ব্যাপারে ওরা কারও সঙ্গে আপোষ করে না।

বড়দের সাথে পাল্লা দেওয়া ! এমন কথা আর যদি শুনি তবে তোর স্কুলের পড়াই বন্ধ করে দেব। বল্, আর কোনদিন করবি এমন কাম ?

হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে যায় পচু। ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। খপ্ করে গনির গলা টিপে ধরে। বাবার এমন হঠাৎ আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খায় গনি। তাড়াতাড়ি বলে : না বাজান, আর কোনদিন করব না।

হ্যাঁ, মনে যেন্ থাকে।

গলা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর ঢোকে পচু। পেছনে যায় গনি। মায়ের কাছে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

কি হইছে বাজান ?

ফুলবানু তরকারী নাড়ছিল, ছেলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

না, কিছু হয় নাই।

তাইলে কাঁদে ক্যান্ ?

আরে ওরা হইল জোতদার মানুষ। ওদের সাথে পাল্লা দিতে চায় তোমার ছেলে। মনে নাই ? সেবার জালাল বড় মিয়ার সাথে কি একটু করছিল, তারপর ঐ যে জালাল নিখোঁজ হইল, আর কোনদিন পাওয়া গেছে তাকে ?

সামান্য ঘটনা। জালাল একদিন গিয়েছিল ধনু ব্যাপারীর পুকুরে মাছ ধরতে। দেখে ফেলে বড় মিয়া অর্থাৎ শমসের আলী। একটা বড় রুই ধরেছিল জালাল।

এই, মাছ ধরিস কেন ?

কি হইছে ?

ব্যাটা, মুখের ওপর কথা।

গাইল দেবেন না কিন্তুক।

শূয়ারের বাচ্চা কয় কিরে ?

রুই মাছটা বড় মিয়ার গায়ে জোরে ছুঁড়ে দিয়ে জালাল চলে গিয়েছিল।

কি, আমাদের হাঁড়িতে খাবি, আর—

এরপর একদিন জালালকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না তো গেলই না। জালালের বাবার আধিয়ারি চলে গেল। ধনু ব্যাপারীর পায়ে কত মাথা কুটল, আর ফিরে পেল না।

জালালের বাপ না খায়া কেমন তিলে তিলে মরছে, তোর মনে নাই ? আর ঐ যে --

ছি বাজান, ওদের সাথে আমাদের পাল্লা দিতে হয় না। বড়রা বড়ই। আমরা ওদের সাথে পারব ক্যান্ ?

পচুর কথায় বাধা দিয়ে বলল ফুলবানু। ঐ সব অতীত কাহিনী শুনতে তার ভাল লাগে না। ধনু ব্যাপারীর জোতদারিতে এমন কত ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে। প্রত্যেকটা ঘটনাকে সাফল্যের সঙ্গে পদদলিত করে তবেই না টিকে আছে ধনু ব্যাপারী আর তার জোতদারি।

সবে আঁধারের পর্দা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কুয়াশার জাল ছড়িয়ে রয়েছে মাটির উপরিভাগে। পচু কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে চলেছে ধনু ব্যাপারীর বাড়ির দিকে। দু'একটা কাক কা কা করতে করতে উড়ে গেল

মাথার ওপর দিয়ে। ভোরের আজান ভেসে এল কানে। সে একটু দাঁড়াল। কান পেতে শুনল। তারপর আবার এগুতে লাগল। আজান শেষ হলে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়ে দ্রুত এগিয়ে চলল সে। ধনু ব্যাপারীর বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে মোরগের কণ্ঠ। এ-বাড়ির মোরগের কণ্ঠও যেন আর দশটা বাড়ির মোরগের কণ্ঠ থেকে ভিন্ন। না, আরও একটু জোরে পা চালাতে হয়। পচুর পায়ের পাতা ভিজে গেছে শিশিরের পানিতে। সরু আল পথে হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছিল পচু। কিন্তু মাঝে মাঝেই তার পথ রোধ করছিল আলের দু'পাশের পাকা ধানের শিষ। শিশিরের ভারে পথের ওপর এলিয়ে পড়েছে। পচু পা দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে চলল।

ধনু ব্যাপারীর বিশাল বাড়িটা নীরব, নিথর। যেন একখণ্ড জমাট-বাঁধা পাথর। এখনও এ-বাড়ির কেউ ওঠেনি। আয়েশী জীবন এদের। সময়ের হিসেব করে চলে না এরা। ব্যাপারী-বাড়ির ঘড়ি ধনু ব্যাপারীর নিয়ন্ত্রণে চলে। এখানে বাইরের জগতের নিয়ম অচল।

পচু গত সন্ধ্যায় তৈরি ঢিবি থেকে আঁটি নিয়ে নিয়ে 'মাড়া' সাজাল। গোয়াল থেকে গরু বার করল। পাঁচটা গরুর গলায় দড়ি বেঁধে 'মাড়ার' ওপর ঘোরাতে লাগল। গরুর পায়ের চাপে আঁটি থেকে ধানগুলো খসে খসে পড়তে লাগল।

সূর্য ধনু ব্যাপারীর আমগাছটার ওপর উঠলে পচুর বউ এসে হাজির হল। ততক্ষণে পচুর ধান মাড়াই শেষ হয়েছে। বাকি কাজ এবার ফুল-বানুর। পচু কাস্তে হাতে আবার গিয়ে মাঠে নামল। ক্ষেতের বাকি ধানগুলো কেটে আঁটি বাঁধতে লাগল নিপুণ হাতে।

ফুলবানু মাড়া ঝাড়ল। ধানগুলো আলাদা করল। খড়ের আঁটি আর ধানগুলো স্তূপ করল। কুলা দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে ধানগুলো পরিষ্কার করল।

এক ফাঁকে বাড়িতে গিয়ে ফুলবানু দুপুরের পান্তা নিয়ে গেল জমিতে। পচু কাস্তেখানা ধানের আঁটির মধ্যে গুঁজে রেখে খেতে বসল। কাঁচা মরিচে একটা কামড় দিয়ে পচু বউকে জিজ্ঞেস করল : ধান সুমার হইছে ?

হ্যাঁ। খালি ব্যাপারী সাবের মাপার বাকী।

তখন আসরের নামাজের ওয়াক্ত। ধানের ভারা নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে এল পচু। ধনু ব্যাপারী নামাজ শেষে তসবি টিপছিলেন। ফুলবানু

তখনও পালা-করা ধানগুলো পাহারা দিচ্ছিল। পচু ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে বলল: ব্যাপারী সাব, ধান পালা করা হইছে।

যা, আমি আসি।

ধনু ব্যাপারী বাড়ির প্রায় সব কাজ অন্যকে দিয়ে করান। কিন্তু ধান মাপার কাজটি তিনি নিজেই করেন। এ-কাজটিতে আর কারও ওপর ভরসা পান না তিনি। খড়ম পায়ে বসলেন গিয়ে ধানের স্তূপের পাশে। পাল্লা-পাথর নিয়ে আসতে বললেন। ফুলবানুকে আনতে বললেন একখানা পিঁড়ি। পিঁড়ির ওপর বসে তিনি ধান মাপতে শুরু করলেন: রাম, রাম, রাম, দুই দুই, তিন......পালার ধান মাপা হল—পাঁচ মণ তেইশ সের তের ছটাক। শেষের তেইশ সের তের ছটাক পৃথক করে রাখা হল।

হিসেবের খাতাটা নিয়ে আয়তো।

হিসাবের খাতার পাতা উল্টাতে উল্টাতে আধিয়ারদের নাম বলতে লাগলেন: রহিম, করিম, জামাল, করম আলী, সফদার, বেড়াভাঙ্গা—হ্যাঁ, পচু! পাতাটার দিকে নজর দিয়েই বললেন: তুই ধান ধার নিছিস নয় মণ ছাব্বিশ সের চৌদ্দ ছটাক। ছয় মণ সতের সের পনের ছটাকের দেড়া কত হয়? আচ্ছা, বড় পালার ধানগুলা গোলায় তোল্, ছোট পালাটা তোদের। আরও পাওনা থাকল চার মণ তিন সের এক ছটাক।

পচু আর ফুলবানু নির্বিবাদে ধনু ব্যাপারীর গোলায় ধান তুলে দিল। তাদের মাপা ধান একটা ছালার ভেতর ভরল।

ধান পাইলে খুব খুশি, এমন দাতা জোতদার আর আছে কয়জন রংপুর জেলায়?

অর্থাৎ ধনু ব্যাপারী পচু আর ফুলবানুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে চাইলেন, আমার মত ভালমানুষ জোতদার বলেই না এতগুলো ধান তোরা পেলি। আর কোন জোতদার হলে দিত তোদের অতগুলো ধান এই প্রথম দিনেই। যা, এক বদনা পানি আন্।

পচু বা পচুর বউয়ের মুখে হাসি ছিল না। পচুর বউ এক বদনা পানি এনে ধনু ব্যাপারীর সামনে রাখল। তিনি অজু করতে করতে বললেন: না বলে যাবি না।

ধনু ব্যাপারী ধীরে সুস্থে অজু করে মাগরিবের নামাজ পড়তে বসলেন।

পচু আর তার বউ তাদের ভাগে-পাওয়া ধানের বস্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। মুরগীগুলো সন্ধ্যার সময়ও আধার খেতে আসতে লাগল। খেদাবার জন্য ফুলবানুর মুখ দু'একবার নড়ল মাত্র।

ধনু ব্যাপারী নামাজ পড়ে উঠলেন। জায়নামাজখানা তুলে বেড়ার সঙ্গে লটকিয়ে রাখলেন। তারপর বাইরের ঘর থেকে অন্দর মহলে গিয়ে ঢুকলেন। পচু আর তার বউ বস্তাটার পাশে দাঁড়িয়েই রইল। ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। পচুর বউ অন্দর মহলে গেল। ব্যাপারী সাব, থাকতে কইছলেন।

আরে তোরা এখনও আছিস? যা, যা, আমি থাকতে কইছিলাম নাকি?

আসলে মিয়া সাবের এ-সব আনুগত্য যাচাইয়ের পরীক্ষা। মাঝে মাঝেই তিনি তার আধিয়ারদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যারা পাশ করে, তারা সামনের বছরও টিকে থাকে। আর যারা পারে না, পর বছর তাদের কপালে আধিয়ারী জোটে না—তাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে নানা ধরনের অবমাননাকর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তবেই আবার নতুন করে পায় আধিয়ারীর স্বর্ণ-সুযোগ।

এমনি করেই চলছিল মহব্বতপুরের নিস্তরঙ্গ জীবন। কখন কোন ঢেউ উঠলে তা এখানকার জনজীবনে তেমন রেখাপাত করে না। ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে এখানকার লোকেরা উদয়াস্ত এত ব্যস্ত থাকে, ও-সব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মত ফুরসত পায় না। পেলেও প্রয়োজন বোধ করে না। সব কিছুর জন্যে ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করে নিজেরা সন্তুষ্ট থাকে।

দুই

পচুর ছেলে গনি দু'এক ক্লাশ করতে করতে অষ্টম শ্রেণীতে উঠল। পচু ভেবেছিল, দু'একদিন স্কুলে গেলে ছেলের স্কুলে পড়ার সখ মিটে যাবে। কিন্তু যতই ওপরের ক্লাশে উঠছে, ততই যেন লেখাপড়ার দিকে তার আকর্ষণ বাড়ছে। লেখাপড়ায় সে দ্বিতীয় হতে জানে না। কোন পরীক্ষায় খারাপ করলে পরের বার ভাল না করে ছাড়ে না! রাতের বেলা পড়তে পারে না। তাই দিনের বেলা সময় নষ্ট করে না। ক্লাশের ছেলেদের সে অঙ্ক শেখায়। ভাল বুঝতে পারে না, তবু সে পড়ে রবীন্দ্রনাথ,

নজরুল। স্কুল লাইব্রেরির বই সে এরই মধ্যে প্রায়ই পড়ে ফেলেছে। এমন ছবি আঁকে, দেখলে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সে বকের ছবি আঁকে। নীল আকাশের নীচে উড়ে যায় এক বক। বাধাবন্ধনহীন। আঁকতে আঁকতে বলে : আমি এক মুক্ত বিহঙ্গ। আমি উড়ে যাচ্ছি, গাছপালার ওপর দিয়ে, সাগর পেরিয়ে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে। পর মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ আওড়ায় : ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ ক'র না পাখা।

তার আশে-পাশের ছেলেরা ওর কথা বুঝতে পারে না। অনেক সময় গনিকে ওদের অবোধ্য মনে হয়। ওরা পরস্পর বলাবলি করে : কি যে আবোল-তাবোল বকে গনিটা। পাগল হবে নাকি ?

সে আরও কত জিনিসের ছবি আঁকে। তবে ঘোড়ার ছবি সে যেমনটি আঁকে, তেমনটি বোধ করি আর কেউ আঁকতে পারে না। পেন্সিলের মাত্র কয়েকটি টানে এঁকে ফেলে এক অসাধারণ বলিষ্ঠ ঘোড়া—যেন টগবগ করে ছুটে যাবে এক্ষুণি। হ্রেষারব করে সামনের দু'পা শূন্যে তুলে ছুটে যাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে।

ঘোড়ার ছবি এঁকে নেওয়ার জন্য ক্লাশের ছাত্রদের ভিড় জমে যায়। তারা তাদের খাতা এগিয়ে দেয়। এক এক করে সে তাদের ঘোড়া এঁকে দেয়। আসগরকেও সে একটা ঘোড়া এঁকে দিয়েছিল আলাদা করে। সেটা আরও বলিষ্ঠ বলগাহীন এক দুরন্ত অশ্ব। সে সেটা টাঙিয়ে রেখেছিল তার পড়ার টেবিলের ওপর। যে দেখে সে-ই প্রশংসা করে : বাহ্, ভারি তেজি ঘোড়া তো।

গনি সেদিনও ছেলেদের ঘোড়ার ছবি এঁকে দিচ্ছিল। ক্লাশের ঘন্টা কখন পড়ে গেছে, টের পায়নি। হঠাৎ ক্লাশে ঢুকলেন রহমান মাষ্টার। গনির চারপাশে ভিড় দেখে রহমান মাষ্টার সেখানে গেলেন।

কি হচ্ছে এখানে ?

রহমান মাষ্টার গনির কান ধরে দাঁড় করালেন। কিন্তু খাতাটার ওপর চোখ পড়তেই তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। তিনি অবাক হলেন অর্ধ-সমাপ্ত ঘোড়ার ছবিটা দেখে। মনের ভাব গোপন রেখে বললেন : ছবি আঁকা হচ্ছে ? আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবি। বস্।

ছেলেরা ইতিমধ্যে যে-যার সিটে গিয়েছিল, রহমান মাষ্টারের হুকুম শুনে তারা গনির ভবিষ্যৎ নিয়ে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। কালো মিশমিশে চেহারা রহমান মাষ্টারের। বয়স পঞ্চাশ ধরো ধরো। বিয়ে-সাদী করেননি তিনি। কথা কম বলেন। একা একা থাকতে ভালবাসেন। হাসতে তাকে বড় একটা কেউ দেখে না। দেখে মনে হয়, সব সময় তিনি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ছাত্ররা তাঁকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু স্কুলে যত শিক্ষক আছেন, তাঁর মত সুন্দর আর কেউ পড়াতে পারেন না। শিক্ষক হিসেবে তার নাম-ডাক এ-অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষকরা তাঁকে দারুণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র।

স্কুলের ছুটির পর গনি এক পা দু'পা করে রহমান মাষ্টারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বাড়ি মানে একটা টিনের ঘর। ঘরের তিন দিক ঘিরে বাঁশঝাড় আর কলাগাছ। বিকেল বেলাতেই বাড়িটা অন্ধকার অন্ধকার মনে হয়। সূর্যটা পশ্চিমের ঘন বাঁশঝাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। রহমান সাহেব ঘরের ভেতর রান্না চড়িয়েছিলেন। গনি দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, স্যার।

গনি! আয়, ভেতরে আয়। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। বাড়ি যাসনি বুঝি?

না স্যার। স্কুল থেকেই এলাম।

একটু দুধ খা।

না স্যার, এখনই বাড়ি যেতে হবে।

যাবি, বস্‌।

গনি রহমান সাহেবের বিছানার ওপর বসল। বিছানায় পড়ে ছিল একখানি 'সঞ্চয়িতা'; সেটা নিয়ে পড়তে লাগল।

আমাকে একটা ঘোড়ার ছবি এঁকে দিবি তো।

স্যার। গনি অবাক হয়ে রহমান সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। একটু পরে মাথা নেড়ে উত্তর দিল: দেব স্যার।

কালই দিবি।

আচ্ছা স্যার। উত্তর দিয়ে আবার সে সঞ্চয়িতার পাতায় মনোনিবেশ করে।

কি, সঞ্চয়িতা ভাল লাগে? নিয়ে যাবি?

রাতে পড়তে পারি না স্যার। কেরাসিন পাব কোথায় ?

দিনের বেলা পড়বি। নিয়ে যা।

আসি স্যার। কাল ছবি নিয়ে আসব।

হ্যাঁ, আয়।

গনির মত ছাত্র তাঁর এই দীর্ঘ দিনের শিক্ষকতা জীবনে পেয়েছেন বলে মনে করতে পারেন না রহমান মাষ্টার। একটু নজর দিতে পারলে আরও ভাল হত। তার নিঃসঙ্গ জীবনে একটা কাজ পেলেন যেন। ছেলেটাকে কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারলে কাজ হবে। সুযোগটা ছাড়া ঠিক হবে না। মনে মনে ভাবলেন রহমান মাষ্টার।

পরের দিন বিকেলে আবার এল গনি।

স্যার 'মূঢ়' মানে কি ?

মূঢ় মানে মোহগ্রস্ত, অজ্ঞান, জড়। কেন ?

রবীন্দ্রনাথে পেলাম স্যার।

> এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
> এই সব শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

তোমার চারপাশে তুমি কি কিছু দেখতে পাও ? কবি যে ছবি এঁকে-ছেন তার সঙ্গে মিল আছে কিছু ?

গনি কথা বলে না। তার মনের চোখে ভেসে ওঠে তার বাপের মুখ, মায়ের মুখ, তার চারপাশের অগণিত মানুষের মুখ। চুপ করে বসে থাকে গনি।

ঘোড়ার ছবিটা এনেছিস ?

হ্যাঁ স্যার। সঞ্চয়িতার ভেতর থেকে ছবিটা বার করে রহমান মাষ্টারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় গনি।

বাজপাখির ছবি আঁকতে পারিস না ?

বাজপাখি দেখিনি স্যার।

দেখিসনি! একটু চিন্তা করে দেখ তো? একটা ছবি, যেখানে একটা বিরাট বাজপাখি তার ধারালো নখর ঢুকিয়ে দিচ্ছে কতকগুলো সাদা পায়রার পেটের মধ্যে।

রহমান মাষ্টার মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না গনি। কেমন অবাক অবাক লাগে তার।

কাল বলছিলি রাতের বেলা পড়তে পারিস না। এই তেলটুকু নিয়ে যা। কিছু মনে করিস না, তোর শিক্ষক হিসেবে দিলাম।

লাগবে না স্যার।

লাগবে, তোর পড়াশুনা করা দরকার। তোকে দুনিয়ার অনেক কিছু জানতে হবে, জানাশুনো থাকলে চলার পথ বার করতে পারবি। নিয়ে যা।

যাওয়ার সময় আরও খানকয়েক পুস্তক দেন, পুস্তিকা দেন রহমান মাষ্টার। বলে দেন ওগুলো ভাল করে পড়তে।

অনেক দিন পর শমশের আলী গ্রামের বাড়িতে এলেন। শহরে ওকালতি করেন। তার সঙ্গে করেন রাজনীতি। ব্যবসার চাইতে রাজনীতিটাই প্রধান। বাড়ি থেকে ধান-চাল যায়। বাপের কাছ থেকে যায় টাকা। তাই আইন ব্যবসার দিকে যতটা মনোযোগ, তার চাইতে বেশি মনোযোগ রাজনীতির দিকে।

একদিন এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে শমশের আলী অর্থাৎ এ-বাড়ির বড় মিয়া আসগর যে-ঘরে থাকে, সেই ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। তখন আসগর টেবিলে বসে পড়ছিল। বড় মিয়া আসগরের টেবিলের কাছে গেলেন।

কি পড়ছিস ?

বাংলা, ভাইয়া।

আরে ভারি চমৎকার ঘোড়া তো।

ঘোড়াটার বলিষ্ঠতায় শমশের আলী মুগ্ধ হন।

কে এঁকেছে রে ?

পচুর ব্যাটা গনি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন। মুখে শুধু বললেন : তাই নাকি। বাহ্ চমৎকার এঁকেছে তো। কি করে ছেলেটা ?

আমার সঙ্গে পড়ে।

আর শোনার প্রয়োজন বোধ করেননি শমশের আলী। ওকালতি করেন, তার ওপর করেন রাজনীতি; ব্যাপারটার ভবিষ্যৎ ভয়াবহতা বুঝতে তার দেরি হয়নি। আধিয়ারের ছেলে লেখাপড়া শিখলে জোতদারি করা যাবে না। একবার চোখ ফুটলে গিলতে চাইবে সারা তুনিয়াটাই।

শমশের আলী মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না।

ধনু ব্যাপারী সবে জোহরের নামাজ শেষে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সামনে গিয়ে হাজির হলেন শমশের আলী।

বাবা, আপনি আজকাল কি সব লাই দিচ্ছেন?

কি বললি?

ছেলের কথা বলার ঢংটা যেন ভাল লাগল না ধনু ব্যাপারীর। জোত-দারি কি করে টিকিয়ে রেখে আরও বাড়ানো যায়, আধিয়ারদের কেমন করে মুঠোর মধ্যে রেখে কাজ করতে হয়, সে-সব কৌশল তার নখ-দর্পণে। ডাকসাইটে জোতদার তিনি। সারা জীবন নানা কলা-কৌশলের পরীক্ষা নিরীক্ষাই তো করেছেন। কখন লাই দিতে হয়, কখন মুঠোর মধ্যে নিয়ে পিষতে হয়, এর সব কিছু তিনি একা নিজেই করেছেন। সফলও হয়েছেন। ভাল-মন্দের জন্য কোনদিন কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি তাঁকে। ছেলের কথা শুনে চোখ ছুটো তাঁর দপ্ করে জ্বলে উঠল। সে-চোখের ওপর শমশের আলীর চোখ পড়ল।

কি বলছিস?

ছেলেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন ধনু ব্যাপারী।

বলছিলাম কি, শমশের আলীর স্বর নরম হল, বলছিলাম ঐ যে পচুর ছেলে গনি না কি নাম, স্কুলে পড়ে!

আমাদের আসগরের সাথে নাকি স্কুলে যায়।

ক্লাশ এইটে নাকি উঠল। আর পড়তে দেওয়া ঠিক নয়, বাবা।

বেশতো, যা ভাল হয়, কর্ না।

এতক্ষণে ধনু ব্যাপারীর মনটা প্রসন্ন হল। ছেলেরাও তাহলে জোতদারি সম্পর্কে চিন্তা করে। আমি থাকতে থাকতে ওরা গুছিয়ে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এবার হাসতে হাসতে বললেন: আমি বুড়া হইছি, আর কত, বল্?

ঠিকই তো, বাবা বুড়ো হয়েছেন। সারা জীবন তো লাঠিয়ালিই করে গেলেন। তবে আগে যেমনটি ভবিষ্যৎ ভাবতেন, আজকাল যেন তেমন করে ভাবছেন না। হয়তো ভাবতে পারছেন না। শরীরে কুলোবার কথা নয়। এখন নিজের চিন্তা নিজেকেই করতে হয়। ভাবতে ভাবতে শমশের আলী পচু যেখানে কাজ করছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পচু।

কন্, বড় মিয়া।

কথার উত্তর দিয়ে পচু শমশের আলীর দিকে এগিয়ে এল।

তোর ছেলে নাকি স্কুলে পড়ে!

কিসের পড়া, বড় মিয়া। ছোট মিয়ার সঙ্গে খালি যাওয়া-আসা করে।

রাখ্ তোর যাওয়া-আসা। কাল থেকে বন্ধ করে দিবি।

আমি তো দিতে চাই। কিন্তু আমার কথা শোনে না বড় মিয়া। আপনে একটু কয়া দেখেন মিয়া সাব। জমি চাষ করি খেতে হবে আমাদের। আমাদের লেখাপড়া দিয়া কি হয়?

মনে থাকে যেন। নইলে কিন্তু—

আর কোন কথা না বলে শমশের আলী গট্ গট্ করে ফিরে চললেন। এদের 'নইলে কিন্তু' কথাটা বড় মারাত্মক। পচু শমশের আলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাড়াতাড়ি বলল: আর ও কোনদিন স্কুলে যাবে না বড় মিয়া, আমি কথা দিলাম।

বাড়ি ফিরেই শমশের আলী রংপুরে চলে যাবেন বলে জানিয়ে দিলেন। আসগরও তাঁর সঙ্গে যাবে। শহরের স্কুলে ওকে ভর্তি করিয়ে দেবেন তিনি। গ্রামে থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

তাড়াতাড়ি গোছ-গাছ করে নে।

বড় মিয়া হুকুম দিলেন আসগরকে।

পচু ভাবছিল, শমশের আলী থাকতে থাকতে আরও দু'একখানা জমির আধিয়ারীর কথা পাড়বে তাঁর কাছে। ছেলে তার বড় হয়েছে। শরীরটাও বেড়ে উঠেছে নধর লাউয়ের মত। বাপে-পুতে কাজ করলে সংসারের অভাব কিছুটা কমতে পারে। আর ঠিক সেই সময়, বড় মিয়া কী সাংঘাতিক কথাই না বলে গেলেন!

বাকি দিনটা পচুর কিছুতেই ভাল লাগছিল না। জীবনে এর চাইতে কত বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে সে। সে সাহস হারায়নি। এ-সব পরিস্থিতি মোকাবেলা করে টিকে থাকার নামই জীবন, পচু তার দীর্ঘ জীবনে তা ভালভাবে বুঝেছে। আজকের ব্যাপারটা যদি শুধু তাকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত থাকত, তবে সে খুব একটা ভাবত না। এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তারই একমাত্র বংশধর গনি। তাই সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে এবং তার সংসারকে ঘিরে নেচে বেড়াতে লাগল এক অজানা বিভীষিকার আতঙ্ক। কোনমতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরল পচু।

সামনে এসে দাঁড়াল গনি।

শোন্, কাল থাকি তোর স্কুল যাওয়া বন্ধ।

ক্যান্ ?

ক্যান্ আবার কি ? বড় মিয়ায় কয়া দিছে।

বড় মিয়া কইলেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হবে নাকি ?

কয় কি ছাগলটা ? এখানে বড় মিয়ার কথাই আইন, এখনও ট্যার পাইস নাই ?

তোমার বড় মিয়ার আইন আমি মানি না।

নির্বংশ না হওয়া পর্যন্ত মানবি ক্যান্।

হ্যাঁ, তাই হব আমি।

ছেলেটা কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। মুখে মুখে কথা কয়। গলাটা টিপে ধরবে নাকি আর একদিনের মত ? কিন্তু ছেলের চেহারার দিকে চেয়ে নিবৃত্ত হয় পচু। কেমন বেয়াড়া ঘোড়ার মত ট্যাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

কাল থেকে তোর স্কুল যাওয়া বন্ধ, কয়ে দিলাম।

এবার বাপের কথার উত্তর না দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলে গনি। ছেলের কান্না দেখে নিজের মনটাও মোচড় দিয়ে ওঠে পচুর। নিজেকে সংযত রেখে বলে : কেঁদে লাভ নাই বাজান। বাঁচি থাকতে চাইলে হুকুম মানাই ভাল।

ক্যান্, আসগর আমার চাইতে ভাল ? কোনদিন আমার সঙ্গে পারে কোন পড়ায় ? ওদের টাকা আছে, তাই শহরে গেছে। আমি তো কিছু

চাই না। আমি চাই কোনমতে গ্রামের স্কুলে পড়তে। তাও ওরা দেবে না? বড়রা কেন গরীবের ওপর এমন অত্যাচার করে বাজান?

চুপ, চুপ, অমন কথা ভুলেও মুখে আনিস না।

গনি আর কোন কথা না বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। সোজা গিয়ে হাজির হল রহমান মাষ্টারের সামনে।

কিরে, অসময়ে কোত্থেকে?

বাড়ি থেকে স্যার।

কেন?

কাল থেকে আমার পড়া বন্ধ হয়ে গেল স্যার।

কেন?

বড় মিয়া চান না আমি আর লেখাপড়া শিখি।

স্বাভাবিক।

স্যার এখন আমি কি করতে পারি? এর একটা বিহিত করতে হবে স্যার। এমনি এমনি ছেড়ে দেব না আমি।

রহমান মাষ্টার কথা বলেন না। কথা বলা নিরাপদও নয়। এমনিতে ধনু ব্যাপারীদের দৃষ্টি তার ওপর রয়েছে। তিনি সদ্য প্রকাশিত দুর্ভিক্ষের খানকয়েক ছবি গনির সামনে খুলে ধরেন।

ছবি দিয়ে কি হবে স্যার?

তোকে দিলাম। নিয়ে যা। মনোযোগ দিয়ে দেখিস। ছবিও কথা বলে।

রহমান মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করে গনি অনেকটা হালকা হল। এখন ওর বয়স হয়েছে। বাপ-মায়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত তার। বাড়িতে গিয়ে কুপির সামনে খোলে ছবিগুলো। ছবির চেহারাগুলোর সঙ্গে যেন হুবহু মিল খুঁজে পায় তার বাপের, তার মায়ের। ক্রমে সারা গ্রামবাসীর মুখগুলো ছবিগুলোর মধ্যে ভিড় জমায়। এক মুঠো ভাতের জন্য সবাই এক সঙ্গে হাজার হাত বাড়িয়ে দেয়। মানবতার অপমান থেকে পরিত্রাণের জন্য তার কাছে ফরিয়াদ জানায়। এ-অবস্থায় তার কি করা উচিত, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গনি দিনের বেলা বাপের সঙ্গে ক্ষেত-খামারের কাজ করে। রাত্রি-বেলা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। ধনু ব্যাপারীর আধিয়ারদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে। গ্রামবাসীরা তাকে মানেও। আধিয়ারদের মধ্যে গনিই একমাত্র লেখাপড়া শিখেছে। সেজন্য সকলের কাছে তার কদর। গ্রামবাসীদের তত্ত্ব-তালাস করা, রোগীদের সেবা করা, তারপর যেটুকু সময় পায়, সেটুকু সে বইপত্র পড়ে কাটায়। নানা বইপত্র সে নিয়ে আসে রহমান মাষ্টারের কাছ থেকে। সেই সব বইপত্র থেকে বেছে বেছে সে পড়িয়ে শোনায় তার সমবয়সী সাথীদের। তারা আবার সেগুলি কথায় কথায় আলাপ করে অন্যান্য আধিয়ারের সঙ্গে।

রহমান মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে গনি। একটু অবসর পেলেই তার কাছে গিয়ে বসে।

আধিয়াররা আর আধা ভাগে সন্তুষ্ট নয়। তারা গায়ের রক্ত পানি করে ফসল ফলায়। জোতদার বসে বসে অর্ধেক ভাগ পাবে কেন? তাদের চাই তিন ভাগ। জোতদার তার জমির জন্য এক ভাগ পেতে পারে।

ধীরে। আর ক'টা দিন। ধান কাটার মরশুম আসুক।

রহমান গনিকে সাবধান করে দেন।

ধান কাটার সময় এসেও গেল। আধিয়াররা ধান কেটে নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগল নিজেদের বাড়িতে। ধনু ব্যাপারী আধিয়ারদের কাণ্ড দেখে প্রথমে অবাক, তারপর হিংস্র নেকড়ের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কী, আমি বেঁচে থাকতেই এ-সব দেখতে হবে। তিনি হুকুম দেন সব ধান নিয়ে এসে তাঁর বাড়িতে তুলতে। আধিয়াররা তার হুকুমের জবাব পাঠায়: জোতদার তার জমির জন্য পাবে চারভাগের মাত্র এক ভাগ। ধান মাড়াই হলে সে-ভাগ পাঠিয়ে দেওয়া হবে জোতদারের বাড়ি।

তারা আবার গিয়ে জমিতে নামে। ধান কাটতে থাকে।

রংপুরে খবর পেয়ে শমশের আলী তাড়াতাড়ি বাড়ি আসেন। জমির দিকে তাকিয়ে দেখতে পান লাল ধানের ভেতর অসংখ্য কালো মাথা। শমশের আলী এমন একটা আশঙ্কা আগেই করেছিলেন।

ব্যাপারটার চিরতরে নিষ্পত্তি করতে হবে। তিন ভাগ দিতে হবে।

দেওয়াচ্ছি।—বলে শমশের আলী বন্দুক নিয়ে বের হন। সঙ্গে বেরোয় তার অন্য দুই ভাইও।

চলে যা জমি থেকে।

বন্দুক উচিয়ে বলেন শমশের আলী।

মাথা তুলে দাঁড়ায় ধনু ব্যাপারীর আধিয়াররা। টেড়িয়া হয়ে উত্তর দেয় : না, ধান কাটা হলে তবেই আমরা যাব।

কি রে শুয়ারের পাল !

আথালে পাথালে গুলি ছুঁড়তে থাকেন শমশের আলী আর তার ভাই-য়েরা। দু'তিনটে লাশ পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। পচু ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল ক্ষেতের দিকে। তার পায়ে গুলি লেগে পড়ে যায় সেখানেই। এক এক করে পেছনে হটতে থাকে আধিয়াররা।

পুলিশ আসে। আধিয়ারদের অনেককেই ধরে। তার মধ্যে ছিল গনি। গনির মা তার বাপকে ধরে উঠাচ্ছিল। পুলিশ গনিকে ওদের পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফুলবানু তাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল : তোরা একি করলি বাবা ?

গনি চলতে চলতে মায়ের দিকে চেয়ে শুধু বলে : তোমার মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম।

ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রহমান মাষ্টার দেখছিলেন গনির চলে যাওয়া। ওরা চোখের আড়াল হলে রহমান মাষ্টার তার ঘরে ঢুকলেন। দৃষ্টি পড়ল ঘোড়ার ছবিটার দিকে। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেদিকে। মনে হল ঘোড়াটা ফ্রেমে-আঁটা ছবি থেকে মুক্ত হয়ে হ্রেষারব করে ছুটে বেড়াচ্ছে দিগ-দিগন্ত কাঁপিয়ে।

দ্বিতীয় বিধাতা

আবদার রশীদ

মানুষ মানুষ গড়ে না, পুতুল গড়ে। পুতুল হিসাবে সেটা সার্থক হয়, ত্রুটিহীন হয়। কিন্তু বিধাতা মানুষ গড়ে এবং সেখানে সে ভয়ানক রকম ব্যর্থ। তাই দেখা যায় বাইরে যেটাকে দেবদূত বলে মনে হয়, ভেতরে সেটা পিশাচ। সুন্দর, সুঠাম, বলিষ্ঠ যুবক বলে যেটাকে মনে হবে, ভেতরের চেহারায় সেটা হয়তো কদর্য, ক্লেদাক্ত প্রবৃত্তিসম্পন্ন, ঘৃণ্য, নিবীর্য কাপুরুষ।—মানুষের ফাঁকিবাজি নিয়ে মানুষে কত কথা বলে, কিন্তু বিধাতার কাজের সংশোধনের ভার কেউ নিতে চায় না।

অতএব শেষ পর্যন্ত আমাকেই সে সংশোধনের ভার নিতে হয়েছিল। মানুষের ভেতরের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে বাইরের রূপ দিতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু একবারের বেশী সে সুযোগ এরা আমাকে দিল না। একটিবার মাত্র এক্সপেরিমেণ্ট করতে পেরেছিলাম।

এবং এই এক্সপেরিমেণ্টের জন্যই তাই ওকে ধরে এনেছিলাম, যার ভেতরটা ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমার এই ত্রিশ বছরের নিরীহ জীবনে প্রতি পদে যে ব্যক্তি আমার শনি হয়ে আমার সামনে বারংবার এসেছে। আমার শেষতম সুখটুকুকে নিঃশেষে, নির্লজ্জ নিঃসংকোচে বিধ্বস্ত করে দেবার পরও দাঁত বার করে হাসতে পেরেছে।

ওকে ধরে আনতে পেরে তাই ভাবছিলাম, ভাগ্যিস ওর সঙ্গে শত্রুতা করিনি, বরাবর নীরব হয়ে থেকেছি, তা না হলে কি আর ওকে আদর করে ডেকে আনতে পারতাম শহরতলীর নির্জন পরিবেশে আমার এই পৈত্রিক বাড়িটার দোতালায়।

কি করবো। মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম যে শেষে।—পথে দেখা হতেই অন্যান্য বহুবারের মত শয়তানের হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল। ডাকলাম ওকে,—'দেখ ভাই, যা হবার তা তো হয়েছে, এখন আর বন্ধুত্বটুকু

নষ্ট করে লাভ কি? আমার কপালে যা হারাবার ছিল, সে তো হারিয়েছি, থাক না বন্ধুত্বটুকু।'

আমার চিরকালের সরলতা ও জানে। সেই সুযোগ সে বহুবার নিয়েছেও। ও জানতো আমার চরম সর্বনাশ করার পরও ওর বিরুদ্ধে আমি ক্ষেপিনি, ঝগড়া করিনি—করতে পারিও না। আমি দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ।

ভাগ্যিস ও তাই ভাবতো। তাই তো খুশী হল খুব। পিঠে হাত বুলিয়ে হেসে আমার স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের তারিফ করল ও। আবার বললাম, 'তা হলে চল্ আমার বাসায়, এক কাপ কফি খেয়ে আসবি। তাহলে বুঝবো, তুই সব কিছু বেশ হালকাভাবেই নিতে পেরেছিস।' আমার বোকামিতে ও গৌরবের হাসি হাসে।

বাসায় নিয়ে এলাম দোতালায়। আশেপাশে সিকি মাইলের মধ্যে বাড়িঘর বিশেষ নেই। সমস্ত দিক দিয়ে এত সুবিধে আমার।

এত সুবিধে হয়েছিল আমার। আমার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওকে বসালাম। ভেতরের ঘরের দরজাটার দিকে ওকে পেছন ফিরিয়ে। বসবার জন্য ঐ একটি মাত্র চেয়ারই ঐভাবে রাখা ছিল। বললাম— বোস, কফি নিয়ে আসছি।

তারপর ভেতরে ঢুকে, টেবিলের ওপর থেকে মোটা রুলারটা নিয়ে এসে পেছন থেকে মাথায় বাড়ি মেরে ওকে ফেলে দিতে আমার মাত্র মিনিটখানেক লেগেছিল। কৃতকার্যতায় বুকের ভেতরটা আনন্দে উথলে উঠেছিল।

মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করতে হলে কতটা জোরে আঘাত করতে হয় সে আমি বহুদিন ধরে হাতে-কলমে অনুশীলন করে শিখেছি। পাড়ার সব নেড়ি কুকুরদের খেতে দিয়ে ভুলিয়ে বাড়িতে এনে এমনি করে রুলারের বাড়ি মেরে মেরে পরীক্ষা করে নিয়েছি কত জোরে মারলে একটা নেড়ি কুকুর অজ্ঞান হয়। দু'একটা কুকুর প্রাণ দিয়েও আমাকে সে কৌশল শিখিয়েছে। আর ওকে যে নেড়ি কুকুরের আন্দাজ ঘা দিলেই কাজ হবে তাও আমি জানতাম। একটা নেড়ি কুত্তার চেয়ে মনুষ্যত্ব ওর কম যে।

অজ্ঞান অবস্থায় ওর হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলাম দেয়ালের বিভিন্ন উচ্চতায় পরিপাটি সব কপিকল ও হুকের সঙ্গে, যাতে বাজিকরের পুতুল নাচানোর মত ঐ সব দড়ি দড়ার সাহায্যে ওকে আমি ইচ্ছেমত শোয়াতে, বসাতে, দাঁড় করাতে পারি!—মিস্ত্রীদের দিয়ে এই সব হুক আর কপিকল ইত্যাদি লাগিয়ে নেওয়া কম দিকদারীর ব্যাপার হয়নি। তারা হি হি করে হেসেছে। এভাবে উল্টো পাল্টা কপিকল বসিয়ে কি হবে সায়েব?—আরে ব্যাটারা, কি হবে তার তোরা কি বুঝবি! এ হল দ্বিতীয় বিশ্বকর্মার কারখানা।—হেসে ফেললাম মনের আনন্দে। শিস দিলাম।

অস্ত্রোপচারের আগে শেষ বারের মতো আমাকে ভেবে নিতে হবে কি করলে ওর ভেতরের চেহারাটাকে বাইরের রূপ দেয়া যায়। ওর এই যৌবন-পুষ্ট, সুদর্শন, নধর শরীরটা কোন মতেই ওর কুৎসিত মনের সঙ্গে মানায় না যে। ওর এই ছদ্মবেশটা ফেলে দিতে হবে আমাকে। আমার স্বায়ত্ত বিদ্যার জোরে।

ওর এই ছদ্মবেশ দেখেই তো ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম নতুন স্কুলের উঁচু ক্লাশে গিয়ে। আর সেই সঙ্গেই আমার নিজের মৃত্যু কিনেছিলাম, যা দিনে দিনে আমাকে নিঃশেষ করে ফেলেছে।—

স্কুলের স্পোর্টসের আগের দিন। বাজারের কাছে হাঁটছি। একটা ভারী ট্রাক আমাদের পাশেই হঠাৎ স্টার্ট নিল। ও বলে "চাকার তলায় পা দিতে পারবি?"—'পারবো না কেন?' বলতে বলতেই জুতো শুদ্ধ পা'টা মোটরের পেছনের চাকার সামনে বাড়িয়ে দিলাম। চাকাটা আমার পা মাড়িয়ে চলে গেল। হাসলাম—। কি হল। এটা কি এমন শক্ত ব্যাপার। সেও হাসল। আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি জুতো খোলে না। পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। সর্বনাশ। কালকে স্পোর্টস্। আমার চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে নেবার কেউ ছিল না সেবার। হায় হায়, কি হবে?

যা হবার তা দেখলাম পরদিন। ফোলা পা নিয়ে মাঠের এক কোণে বসে বসে দেখলাম। আমার বন্ধুটি চ্যাম্পিয়নশিপের ঢাউস ট্রফিটা বগলে করে আমাকে এসে বলে—ঐ সব তোরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ভাই, আমার বুদ্ধিতেই তুই হেরে গেলি।

স্বীকার করেছিল ওটা ওর পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা। ওর পায়ের ওপর দিয়ে ট্রাক চলে গিয়ে একবার, ঠিক ওমনি পা ফুলেছিল ওর—কি মোক্ষম নির্ভুল ব্যবস্থা !

আর সেই থেকেই আমার ওপর ওর বুদ্ধির খেলা দেখান শুরু হয়ে গেল, একটার পর একটা।

আরো বীভৎস ব্যাপার করেছিল আমরা যখন হস্টেলে থেকে বি.এ. পড়ি। হস্টেল সুপারের মেয়ের ফষ্টিনষ্টির কাহিনী যখন বেশ কেলেংকারী-জনক হয়ে বাড়িতে প্রকাশ হয়ে পড়ল, এবং অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু জানা গেল অপরাধী হস্টেলের কোন বাসিন্দা তখন সুপার সেই ব্যাপারের তদন্ত করতে লাগলেন। তারপর যেদিন তিনি স্বয়ং আমার রুমে এসে আমার টেবিলের ড্রয়ার খুলে তাঁর মেয়ের প্রেমপত্রগুলি বের করলেন—তখন আমি যত উঁচু আকাশ থেকেই পড়িনা কেন, কলেজে পড়া আমার একেবারেই ঘুচে গেল। অনেকদিন পরে সেই কেলেংকারী কাহি-নীর নায়ক, আমার সেই বন্ধুটি, আমাকে ফাঁসিয়ে নিজের অপরাধ চাপা দেয়ার এই অত্যন্ত বুদ্ধিজনক ব্যাপারটি সকৌতুকে বিবৃত করেছিল। তখনও সে বুদ্ধির বড়াই করেছিল। কিন্তু আমি বুঝি না, বুদ্ধি সে কেবল আমার ওপরেই কেন প্রয়োগ করত। আশ্চর্য।

আজ আমার হাসি পেল। বুদ্ধি? আজ তোকে আমার বুদ্ধি দেখাতে হবে।

প্রথম, জ্ঞান ফিরে আসার আগেই, সাঁড়াশী দিয়ে ওর দাঁতগুলো বেশ কয়েকটা উপড়ে ফেললাম! ভারী পরিশ্রম হল। হাঁপিয়ে পড়লাম একে-বারে। তাই বাকি আরো কয়েকটা দাঁত ঠুকে ঠুকেই ভেঙে ফেললাম; তারপর এক গ্লাস বীয়ার খেয়ে নিলাম। তারপর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম—হ্যাঁ, প্রথমে ওকে একটা হিসাবী বুদ্ধিমান বৃদ্ধের রূপ দিতে হবে। এত যার বুদ্ধি ছেলেবেলা থেকে তার কি এখনও যৌবন মানায়?

কিন্তু নাঃ. কোন নির্দিষ্ট রূপ ওকে আমি দিতে পারবো না। শুধু ওর সুন্দর চেহারাটা আমি বিগড়ে দিতে পারি। সুন্দর একটা ছবিকে বা মূর্তিকে অন্য কোন রূপে রূপান্তরিত করা যায় না, তার উপর কালি

লেপে, কিম্বা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে সেটাকে বিকৃত করে দেয়া যায়। ওকেও তাই করব আমি। সেইটেই হবে ওর যথার্থ রূপ।

ওর মাথায় পানি ঢাললাম। পাখা চালালাম। দন্তহীন মুখে পানি দিলাম। এত সেবা যত্ন করছি ওকে। ওর বউও এত করতো না। ওর জ্ঞান ফিরল এক সময়। আর্তনাদ করতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিলাম।

আরো সাবধানতার জন্য রেডিওটা বেশ চড়া ভল্যুমে ছেড়ে দিলাম। আশেপাশে ঘরবাড়ি তেমন নেই যদিও, তবু সাবধানের মার নেই তো!

ওকে বললাম—'তোর বউয়ের কাছে একটা চিঠি লিখে দিস যদি, তবে তোকে ছেড়ে দেব।—সেরকম মারাত্মক কিছু লিখতে হবে না, শুধু লিখবি, তুই এখানে আমার বাসায় আছিস্, চিঠি পেয়েই সে যেন একা একা চলে আসে, খুব জরুরী ব্যাপার।'

ও যে কত বড় জানোয়ার সেটা টের পেলাম যখন খুব বেশী জবর-দস্তী করার আগেই ও রাজী হয়ে গেল। ওর একটা হাত খুলে দিলাম। কাগজ কলমসহ ছোট একটা টেবিল ওর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম। ও কাঁপা কাঁপা হাতে দ্রুত চিঠিটা লিখে ফেলল, যেন চিঠিটা শেষ হলেই ও সত্যিই ছাড়া পাবে!

চিঠিটা সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। ওর খোলা হাতটা আবার বেঁধে দিলাম। এবার ওকে বসিয়ে নিলাম। তারপর ওর মাথায় ভাল ক'রে কাপড় জড়িয়ে, পেট্রোল দিয়ে ভিজিয়ে দিলাম। তারপর দিলাম আগুন ধরিয়ে। ওর মাথায় চিড়বিড়িয়ে আগুন জ্বলতে লাগল,—যেমন জ্বলছিল আমার মাথার ভেতর। একটু পরে দেখা গেল ওর সৌখিন কেশরগুলি এবং মাথার চামড়াও জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে। কান একটা কাপড় চাপা পড়েছিল, সেটাও। কপালটাও পুড়েছে হারামীর। —কেমন থর্ থর্ করে কাঁপছিল ও। আর যন্ত্রণাতেই বোধ হয় ফাঁসীর আসামীর মত মুখ করছিল। কিম্বা হয়ত আমার করুণা আকর্ষণ করার জন্যই বেশী করে গোঙাচ্ছিল। ন্যাকামী যত!

আমি এখন ধীরে সুস্থে যতদিন ধরেই সেবা শুশ্রূষা বা অত্যাচার করি না কেন, আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কেউ আমার কাছে হঠাৎ এসেও

পড়বে না। আমার পরিচিতারাও কেউ আমার কাছে ঘেঁসে না। বন্ধুদের পর্যন্ত আড়াল থেকে বলতে শুনেছি, আজকাল আমার চোখ মুখ দৃষ্টি ইত্যাদি নাকি কেমন কেমন দেখায়,—উদ্‌ভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত! তাই আমাকে ওরা এড়িয়ে চলে। ভালই করে।—আসলে, যখন আমি নানা রকম প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত, তখন ওরা ভাবছে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। উজবুক সব। যাক্ ওদের সে ধারণা বজায় থাকুক। কেউ যেন এখন আমাকে বিরক্ত না করে।

সেদিন ঐ পর্যন্তই রেখে দিলাম। মন-মেজাজ ঠিক রাখার জন্য সারা-রাত ধরে ওর শেষতম পৈশাচিক আচরণের কথাটা ভেবে নিলাম। এবং ওটাই যে শেষতম তাও বলতে পারতাম না, যদি না এমনভাবে ওকে বাগে পেতাম, এমন করে ওর ছদ্মবেশটা, মুখোসটা খুলে দেবার সুযোগ পেতাম।

ফুলের মত মেয়েটা ছিল। কী ভালই যে বেসেছিলাম ওকে। আর ভালবাসা পেয়ে আমিও আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি, সব গ্লানি ভুলে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার সেই বন্ধুটি আমার প্রেমকেও খুন করল।

আমি ওকে নিয়ে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়ে-টার প্রতি ওর ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, ও আমার সঙ্গে যত শত্রুতা করেছে তার জন্য ও বোধ হয় অনুতপ্ত।

ও হবে অনুতপ্ত! আশ্চর্য আমার বিশ্বাস করবার ক্ষমতা! মেয়েটার সঙ্গে গল্প করছিলাম ওদের বাসায় বসে। সেদিন আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছি এবং তার সম্মতি পেয়ে আমি সেদিন রাজা। এমন সময় সে এল। মেয়েটাকে বলল—'আমিও একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। চলুন না, মেয়েটাকে একটু দেখে আসবেন। মেয়েদের চোখ না হলে কি মেয়েদের চেনা যায়?' আমার ভাবী স্ত্রী হেসে বলে—'ওমা তাই নাকি! এতদিন বলেননি যে!' ও আমাকে দেখিয়ে বলে—'বাঃ ওকে দেখে আমার হিংসা হয় না বুঝি? লোভ হয় না?' তারপর একটা শিশুর নিষ্পাপ হাসি হাসে। আমাকে বলে—'তোর ইয়েকে নিয়ে যাচ্ছি। তোর কোন আপত্তি নেই তো?' হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ওরা। আমার মুখে স্পষ্ট স্নেহের হাসি দেখতে পেলাম আমি।

রাত্রে ও এসে আমাকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত, অনুতপ্ত স্বরে বলে—'আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি ভাই। ক্ষমা চাওয়ার সাহসও আমার নেই।' আমার বুকের রক্ত মুহূর্তে শুকিয়ে গেছে। ওর কোন কথা আর ভাল করে আমার কানে যায়নি- শুধু বীভৎস সত্যটা আমার অন্তরে ছুরির মত গেঁথে গেল—সে ওকে রেপ করেছে। নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে,—একলা বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না,—সে এই কাজ করেছে। সেই চরম মুহূর্তে মেয়েটা কি ভাবছিল আমার মধ্যেও ঐ রকম একটা প্রেত লুকিয়ে আছে? কে জানে। কেউ জানবে না। কেউ জানবে না।

কিন্তু ও নিজে আমার কাছে কথাটা স্বীকার করল কি করে? আমার পক্ষে সেদিন এইটেই চরম প্রশ্ন রূপে দেখা দিয়েছিল।—আজকে আমি নিঃসন্দেহে জানি, সেদিন আমার কাছে বিদীর্ণহৃদয় বন্ধুর অভিনয় করে বাসায় গিয়ে প্রাণ খুলে হেসেছে, বুদ্ধির অহংকারে ওর বুক ফুলে উঠেছে, আর পরম পরিতৃপ্তিতে পেটভরে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে।

আর সমস্ত রাত্রি আমি ভেবেছি, সে মেয়েকে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? মেয়েটার কথা তো ভাবিনি, নিজের কথাই ভেবেছি। তাই সারারাত্রির জাগরণক্লান্ত—আমি সকাল বেলা খবর পেলাম সে আত্মহত্যা করেছে।

মেয়েটার বড় ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি আমাকে খবর দিয়ে গেলেন। শুধু বললেন—'ও কাল গলায় দড়ি দিয়েছে।' ব্যস্ ঐটুকু। কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলেন না, কোন কৈফিয়ৎ চাইলেন না, কিছু জানতে চাইলেন না। আর সেই অত্যন্ত নির্লিপ্ত, নির্বিকার মন্তব্যটি আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে অবিরত শোনাতে লাগল—তুমি। তুমি। তুমিই। একবার ইচ্ছা হল পেছন থেকে চীৎকার করে ডেকে বলি...। কিন্তু কি একটা প্রচণ্ড বিকৃত অট্টহাসির ধিক্কার আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে নিস্তেজ করে দিল।

সেই দিন থেকেই—না তখন জানতাম না, আজ বুঝতে পারছি—আমার বুকের ভেতর, মাথার ভেতর কি একটা জন্ম নিচ্ছে। তখন থেকে আমার আর কিছু ভাল লাগে না, শুধু ভাবতে ভাল লাগে। মানুষের মুখ দেখলে আমার বুকের, মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়।

সকাল বেলা বেশ পেট ভরে নাশতা করে নিলাম। ওকেও দিয়েছিলাম, কিন্তু খেতে পারল না। মুখটুখ ফুলে রয়েছে কি না, তাই বোধ হয়। শুধু পানিটুকু মুখের সামনে ধরতে ঢক্‌ঢক্ করে গিলল। গরম কফিটুকু বোধ হয় ওর ভালই লাগল। একটু পরে ওর সার্ট, গেঞ্জি টান মেরে খুলে ফেললাম। ওর মুখে ভাল করে আবার কাপড় গুঁজে দিলাম। তারপর লোহার শিক পুড়িয়ে ওর বুকের ওপর লিখে দিলাম 'জানোয়ার'। তারপর শুধু ওর চোখ দুটো রেখে সারা মুখেও গন্‌গনে লোহার শিক দিয়ে নানান কারুকার্য করে দিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, বুকের ওপর 'জানোয়ার' কথাটা লেখা অর্থহীন, তাই ওটাকে মিলিয়ে দেবার জন্য শিকটাকে আরো কয়েকবার গরম করতে হল হীটারে। তাতেও সুবিধা হচ্ছে না দেখে হীটারশুদ্ধ ওর বুকের ওপর চেপে ধরে বুক জুড়ে একটা ঘা করে দিলাম—ঠিক আমার বুকের ঘা'টার মত।

ওর বুকের, মুখের ঘা'গুলো দগদগ করছিল, তাই পুরু করে 'বার্নল' লেপে দিলাম,—তাতে কিন্তু দেখতে আরো কদর্য হয়ে গেল।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছিলাম না। ওকে এ রকম যন্ত্রণা দিয়ে আমার যে রকম আনন্দ পাওয়া উচিত ছিল, তা' পাচ্ছিনা কেন। বাড়ির মেয়েছেলেরা যেমন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে নির্বিকারভাবে মাছ কোটে, আমার যেন তেমনি হয়েছে। সমস্ত জিনিসটার মধ্যে কোন মজাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

মজা পেতাম, যদি ও আপত্তি করত, কাঁদত, প্রাণভিক্ষা চাইত। কিন্তু তাও সে করে না। কেমন হ্যালা-ক্যাবলা হয়ে গেছে ও। কিংবা ওকে এখন যে নতুন চেহারা দিয়েছি, তাতে ওর মনের ভাবগুলো ঠিকমত ফুটে উঠতে পারছিল না।

রাত্রি দশটার পর সব নিরিবিলি হয়ে গেলে ওর ওপর আবার অস্ত্রোপচারের নেশা জাগল আমার। এবার ওকে যা বানাব, ভাবতেই হাসি পেল। খাসি করব ওকে। এতক্ষণে যেন মজা লাগল বেশ আবার। খাসি করবার কায়দাকানুন আমি সব জানি। ছোটবেলায় আমার নানীর ছাগলটার কত পাঁঠা বাচ্চাকে খাসি করা হত আমাদের বাসায়!—আমাদের পাড়াটার একধারে একঘর মুচি বাস করত। ওরা মরা গরুর চামড়া

ছাড়াত, আর মাঝে মাঝে শুয়োরের গলায় শিক বিঁধিয়ে আগুনে পোড়াত। আর সারারাত সেই শুয়োরের চীৎকার শুনতাম আমরা।

তা পাঁঠাকে খাসি করতে হলে ওদেরকেই খবর দিতাম। একজন এসে আধভোঁতা একটা ছুরি দিয়ে ছাগলছানাটার পুরুষত্বের থলিটা ছ্যাঁক করে কোষদুটো টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, একগাদা হলুদ আর চুন মিশিয়ে সেই শূন্য স্থানে ঢুকিয়ে অত্যন্ত স্থূলভাবে অস্ত্রোপচার সমাপ্ত করত। বাচ্চাটা ঘন্টাখানেক ঝিম মেরে থাকত। আর কি আশ্চর্য! কয়েকদিন পরেই কি রকম তেল চুক্‌চুকে নধরকান্তি ধারণ করত। পাড়া-প্রতিবেশী লোলুপ দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকত।

ওকেও তাই করব, সে কথা ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম। আমার অস্ত্রগুলো ওকে দেখালাম। মুচিদের অস্ত্রের চেয়ে সেগুলি যে বেশী ধারাল তাও বললাম। ওর প্যাণ্টটা টেনে খুলে ফেললাম। জাঙ্গিয়াটাও। তারপর ডেটলের গামলায় ডোবানো রবারের দস্তানা জোড়া হাতে পরে নিলাম। বললাম—'দেখ, কত বৈজ্ঞানিক সাবধানতায় সব কিছু করছি। অস্ত্রগুলোও ডেটলে ডোবানো আছে। খাসির মত তুইও কেমন তেল চিক্‌চিকে হয়ে উঠবি দেখিস্।'

শুনেটুনে ও যা বলল তাতে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। হো হো করে হেসেই ফেললাম। দন্তহীন ফোলামুখে ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বলে কি না—'আস্তে দিস ভাই!'

ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ও আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করল না, কাঁদল না, মাফ চাইল না। শুধু প্রার্থনা,—'আস্তে দিস্ ভাই!' ওকি স্পষ্ট আমার মধ্যে ওর অমোঘ মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল?—যত ভাবি, ততই কেবল হাসি উপচে আসে আমার।

ও একটা জান্তব চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল অস্ত্রোপচারের সময়। ওর গায়ে কম্বল চাপিয়ে মাথার কাছে টেবিল ফ্যান চালিয়ে দিয়ে, আমি হাতমুখ ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে যখন দেখলাম ওর জ্ঞান ফিরেছে এবং কাতরাচ্ছে, তখন মনে বেশ প্রশান্তি নিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আজ দুপুরের দিকেই ওর চিঠিটা পাবে ওর বউ। আর পেয়েই নিশ্চয়ই এসে

পড়বে। তা' সে আজ আসুক আর কাল আসুক,—আমি এখন নিশ্চিন্তে প্রতীক্ষা করে থাকব, দরকার হলে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত।

ওকে দেখে ওর বউটার কেমন চেহারা হয় সেটা না দেখে আমি স্বর্গেও যেতে পারব না। সেই জন্যেই তাকে খবর দেয়া।—এই বউটাই কি আমাকে কম ঘৃণা করত ওর স্বামীর কাছে আমার কথা শুনে। আগেই তো বলেছি, ওর প্রতি কোন বিরূপভাব আমি কখনই প্রকাশ করিনি, (ভাগ্যিস করিনি), কিন্তু সে তার বউয়ের কাছে চমৎকার একটি চাল দিয়ে আমাকে অশুচি করে তুলেছিল।—তখন আমি গল্প লিখি দু'একটা। বাস্তবতার নামে বেশ্যাবাড়ীর এক কাল্পনিক গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্প বউকে পড়তে দিয়ে ও বলেছিল, ওটা নাকি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বউটা বিশ্বাস করেছিল এবং আমার সম্পর্কে একটা কদর্য ধারণা পোষণ করত। কিন্তু ওর স্বামীটা যে কী চিজ, কত বড় পিশাচ তা' কক্ষনো ভাবেইনি হয়তো।

আজ তাই ওর স্বামীর যথার্থ রূপটা আমি ওকে দেখাব। সমস্ত কাহিনী শোনাব—তাই ওকে ডেকে আনা। এবং তার আগেই আরো যা যা করার পরিকল্পনা আছে তারও কোনটাই বাদ যাবে না।

বিকেল বেলা বসে আছি আমার সেই কীর্তির সামনে। কেমন যেন নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ছে ও কেবল। সবল একটা চৈতন্য যেন নেই ওর।

এমন সময় সদর দরজার কড়া বেজে উঠল। ছুটে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ওর বউ এসেছে। মুখটা ভাল করে দেখে নিলাম। একটু পরে এই মুখটা কতখানি বদলে যায় সেটা তুলনা করে দেখতে হবে কি না। ওর মুখে এখন কোন দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েনি, শুধু একটু সংশয়,—একটা কৌতূহল খেলা করছে সেখানে।

সহাস্য মুখে ওকে ডেকে নিয়ে গেলাম ওপরে। সেই ঘরের দরজার পর্দাটার সামনে এনে ওকে দাঁড় করালাম। তারপর বেশ কায়দার সঙ্গে আর্ট একজিবিশনের দ্বার-উন্মোচন অনুষ্ঠানের মত করে পর্দাটা তুলে দিলাম।

দু'পা ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম—'চিনতে পারছেন না বুঝি ? ওই তো আপনার স্বামী।' এই বলেই বউটাকে পেছন থেকে কণ্ঠবেষ্টন

করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম।—ধরেই কিন্তু চমকে উঠলাম। একি মানুষের, বিশেষ করে মেয়েমানুষের দেহ। ওর স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে একটা অবর্ণনীয় দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। যেন ওর নিজের মহাপাপকে এইমাত্র নিজের চোখের সামনে দেখবার জন্য তৈরী হয়েছে।

কিন্তু খেলটা জমলো না একদম। বউটার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার রিরংসা প্রবৃত্তিটাকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপিত করতে পারলাম না। ও যদি কেবল ভয় পেত, কিংবা অজ্ঞানও হয়ে যেত তাহলেও কিছু যেত আসত না। আমি শুধু ওর স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার কাজ মিটিয়ে নিতাম। কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। বউটার ফ্যাকাসে মুখ আর ছাগলের চোখের মত ভাবলেশহীন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মনে হল ও যেন মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছে—অমোঘ, স্পষ্ট।—ঐ হারামজাদা যখন আমার প্রিয়াকে বলাৎকার করে, তখন কি এমনি চেহারা হয়েছিল তার? তবু তো ও বিরত হয়নি। কিন্তু আমি পারছি না কেন?

মুষড়ে পড়লাম। কেমন একটা বিষণ্ণতা আমাকে ছেয়ে ফেলল। ঐ দন্তহীন নপুংসকটা আমার এই ব্যর্থতায় মনে মনে হাসছে কি? নইলে এক মুহূর্ত আগে ওর চোখে যে ভয়াবহ ত্রাসের ছবি দেখেছিলাম, সেটা নেই কেন!

এই সব ভাবতে ভাবতেই বউটা যে কখন কেমন করে বেরিয়ে চলে গেছে, খেয়াল করিনি। মনে মনে হাসলাম। আর কোনদিন ও আসবে না। হয়ত ওর স্বামীর কাছেও না। এ রকম স্বামী দিয়ে ওর কি হবে।

সন্ধ্যের পর যখন একটা হাতুড়ি নিয়ে ধীরেসুস্থে ওর হাতপায়ের আঙুলের ডগাগুলি খেলাচ্ছলে থেঁৎলে দিচ্ছিলাম সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম অনেকগুলি। তক্ষুনি আমার চৈতন্য হল, বউটাকে যেতে দেয়া আমার কোনমতেই উচিত হয়নি, এবং এতক্ষণে সদর দরজাটা বন্ধ করে রাখা উচিত ছিল।

না বউটা ফেরেনি। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একেবারে আমার এই ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়েছে জনকয়েক কন্‌স্টেবল নিয়ে। নীচেও আরো কয়েকজনের কথা শুনতে পেলাম।

দেয়ালে তখনও আমার সেই কীর্তি। ওর চোখমুখ তখন কেমন বিহ্বল। অচৈতন্য হয়ে পড়েছে বোধ হয়।—না কি মরেই গেল?

চিৎকার

লায়লা সামাদ

আলী আহমেদ কাগজ পড়ছিলেন। তার ভোরে উঠা অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে কোন কাজ করেন না। মুখ-হাত ধোন না পর্যন্ত। চোখে চশমাটা এঁটে বসে যান সংবাদপত্র পড়তে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর পড়েন। একবার পড়তে বসলে বিশ্বসংসার ভুলে যান। কাছে এসে তখন কেউ বসলেও বিরক্ত বোধ করেন।

কিন্তু আশেপাশে যা ঘটে তা আর নিরিবিলি বসে পড়ার শান্তিকে যে বিঘ্নিত করে না, তা নয়। তবে সেটাকে উপেক্ষা করতে হয়।

রোজকার মত আজও স্ত্রী জিন্নাতুন নেসার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানে আসে। জিন্নাতুন নেসা শোবার ঘরে খাট থেকে মশারী তুলছিলেন। ছেলেমেয়েরা কেউ কলঘরে, কেউ পড়তে বসেছে। উনানে গরম পানির কেটলি চাপিয়ে তিনি ঘরে এসেছেন। বিছানা ঠিকঠাক করতে করতে আপন মনে বকে চলেছেন। ঘুম থেকে উঠে সেই যে ঘড়ির কাঁটা ধরে তার বকা শুরু হয়, শেষও হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে রাত দশটায়। শুনতে শুনতে আলী আহমেদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তবু মাঝে মাঝে কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলেন, দোহাই আল্লার মুখটাকে একটু ক্ষান্ত দাও।

ব্যাস অমনি শুরু হয়ে যায়—তুমি আর বলবে না কেন। বসে বসে কাগজ পড়া আর আপিস যাওয়া এ দুটোই তো কাজ। সংসারে কে বাঁচল, কে মরল তোমার কি এসে যায়? যদি ঝামেলা সামলাতে হত আমার মত বুঝতে কত ধানে কত চাল।

স্ত্রীর মুখ-ঝামটার কোন উত্তর খুঁজে পান না আলী আহমেদ। বরঞ্চ আরও কিছু মধুর বচন শুনতে শুনতে কতগুলি গভীর রেখা ফুটে ওঠে তার কপালে। তবু নির্বিকার থাকার ভান করেই তলিয়ে থাকেন কাগজের ভেতরে।

দৈনিক পত্রিকাগুলির কার্টুনে দৃষ্টি গিয়ে ঠেকলে আপন মনেই হাসেন। কাপড় সমস্যা, তেলের মূল্য বৃদ্ধি, কলের পানিতে পোকা, বৈদ্যুতিক গোলযোগ ইত্যাদি হাজারো সমস্যা নিয়ে চমৎকার ব্যঙ্গাত্মক ছবি শিল্পীরা আঁকছে। কেমন করে ওদের মাথায় এমন সব পরিকল্পনা আসে কে জানে। এই যে চারদিকে এত সমস্যা এটা নেই, ওটা নেই এসব নিয়ে কি জিন্নাতুন নেসার মত ঘরে ঘরে গৃহিণীরা এমন চ্যাচামেচি করেন? মাঝে মাঝে আলী আহমেদের বড় জানতে ইচ্ছে হয়।

অবশ্য শুধু তার নিজের সংসারেই নয়, গোটা দেশ জুড়েই যে এ অভাব-অনটন আর সমস্যা সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তা তিনি বোঝেন। আর বোঝেন বলেই সেই বাস্তব অবস্থাকে এড়িয়ে চলার জন্য যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মনে মনে সান্ত্বনা খোঁজেন।

বলি কি কানের মাথা খেয়েছ, চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললাম তবু কানে কথা যায় না।

এ্যাঁ, আমায় কিছু বলছিলে নাকি?

শোন কথা, তবে কি ভূতকে বলছি, না দেয়ালকে বলছি?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আলী আহমেদের হঠাৎ কেমন সন্দেহ জাগে মেয়ে জাতটাই কি এমন ঝাঁঝালো আর দাপটে স্বভাবের? না জিন্নাতুন নেসার পরিবারে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ জন্মগত।

কি বলছো বলে ফেল তাড়াতাড়ি। স্ত্রীর উপস্থিতি যেন ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর এই মুহূর্তে।

গত তিনদিন ধরেই তো বলছি আর কত বলব। উঠোনের ড্রেন পরিষ্কার করবার কোন ব্যবস্থা করলে? ধাঙ্গড়, জমাদার কিছুই যে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়ি মাছি ভ্যান ভ্যান শুরু করেছে। একে বর্ষা তার ওপরে চারিদিক থ্যাক থ্যাক, গ্যাদ গ্যাদ। আমি বাপু পারছিনে আর। জিন্নাতুন নেসা এমন মুখব্যাদন করলেন যেন সেই নোংরা আবর্জনায় এইমাত্র তিনি পা রাখলেন।

আলী আহমেদ একবার উঠোনের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনেই স্ত্রীর দিকে তাকালেন। জিন্নাতুন নেসার চেহারা এককালে সুশ্রী ছিল একথা আর

কে বলবে? কপালের আর মুখের ভাঁজে সে রূপ কোথায় তলিয়ে গিয়েছে এখন তার ছিটেফোঁটাও কেউ খুঁজে পাবে না। তবে মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ পান। দুঃখ পান এ ভেবেই যে সুন্দর মানুষ কেমন করে এমন বেখাপ্পা চিৎকার আর কুৎসিত মুখভঙ্গি করতে পারে।

নিজের পরিবারে কখনও এমন উগ্র ব্যবহার দেখেছেন বলে আলী আহমেদের মনে পড়ে না। মা, দাদী নানী সবাই যেন ছিলেন কেমন নরম মেজাজের। উঁচু পর্দার কথা বলাটাই ছিল তাদের কাছে চরম লজ্জার। বিশেষ করে পুরুষ মানুষদের সামনে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলাই ছিল তাদের রেওয়াজ। আলী আহমেদ পুরুষ হয়েও নিজে কখনও চড়া গলায় কথা বলেননি। তখনকার দিনে এটা সম্ভব ছিল অন্য কারণে। বাড়িতে তখন শৃঙ্খলা ছিল, ছিল শান্তি। সমাজে এই মার কাট-কাট অবস্থাটা ছিল না বলেই হয়ত তখনকার দিনের মানুষেরা সহিষ্ণু ছিল। গেরস্ত বাড়ির লোকেরা আর কিছু না পান দুবেলা পেট পুরে খেতে পারত। পুকুরে মাছ, গোয়ালে গাই, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। রেশনের লম্বা লাইন, এক টুকরো কাপড়ের জন্য খুনোখুনি এসব কি কেউ কল্পনা করেছিল?

নিজের মনে সান্ত্বনা দিতে নিজেই ভাবেন এসব। আর তখন জিন্নাতুন নেসার জন্য কেমন একটু মমত্ববোধ জাগে মনে। শান্ত গলায় বলেন, আর দুটো দিন অপেক্ষা কর, পাওয়া যাবে। দেশে এসব কাজের লোকের এখন বড় অভাব। চারদিকে এত কাজ। সবে স্বাধীন হলাম দেশ গড়ে তুলতে হবে তো—

কিন্তু দেশ গড়ে তুলবার জন্য আমার সংসার অচল করে রাখলে তো চলবে না—

আহা তা চলবে না, তবে তোমরা একটু বুঝলেই—

কিন্তু সেত বুঝলাম, আজ বাজার যাবে কে? ফেলু ছোবড়ার রাতে জ্বর এসেছে। বশীরের মা একা কোনদিকে সামলাবে?

তা আমাকে কি করতে বলছো?

কি আর বলব—দয়া করে এসে চা-নাশতা গেলো তারপর বাজারটা এনে দিয়ে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার কর।

একটু ভালভাবে কথাগুলি বলা যায় না। এমন মারমুখী হয়ে থাক কেন সব সময় বলতো?

মাখনের মত মোলায়েম কথা শুনতে চাওতো আর কাউকে ঘরে আন, আমাকে দিয়ে তা হবে না জানইতো। জিন্নাতুন নেসা ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বারান্দা থেকে তার তীব্র চিৎকার কানে এল।

দিলি, দিলিতো কেরোসিনের টিনটা ফেলে। চারদিকে একফোঁটা তেলের জন্য হাহাকার আর ইনি নবাবপুত্র আকাশের দিকে চোখ তুলে হাঁটছেন।

কোনদিকে মন না দিয়ে আলী আহমেদ খাওয়া শেষ করলেন নীরবে। বাজার থেকে ফিরে এসে অফিসের তাড়া আছে। বাজার যেতে তার নিজের যে খুব একটা অনিচ্ছে তা নয়। নিজে গেলে যথার্থ দামে ভাল জিনিসটা দেখে শুনে আনতে পারেন। বাড়িতে ভালমন্দ খাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যাও একটা আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই হল, জিন্নাতুন নেসা চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দেবেন বাড়িতে। এই চ্যাঁচামেচিকেই আলী আহমেদের ভয় বেশী। কেন যে জিন্নাতুন এত চিৎকার করে।

আমি কি করবো, এমন জায়গায় টিন রাখ কেন ?

তোমাদের রাজপ্রাসাদে গুদাম কত। একচিলতি রান্নাঘর, ভাঁড়ার জায়গা নেই। টিন রাখবো মাথায় ? কত বললাম একটা ভাল বাড়ি দেখ। কানেই তুললো না কথা।

বাবারে বাবা, এত বকতেও পার তুমি। পুরোনো কথাগুলি আর কত বলবে, বহুবার তো আব্বাকে বলেছ। হাসতে থাকে ইমু।

যা যা, বেয়াদবি করতে হবে না। কলেজ নেই তোর। সকাল থেকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিস, পড়তে বসবি কখন।

একি তোমার দীপু চিনুর পড়া ? সকালে উঠেই পাখী সব করে রব শুরু করে দেব। রীতিমত অনার্সের সেকেণ্ড ইয়ার, বুঝেছ ?

দেখ ইমু জ্বালাসনে। সবাই মিলে আমার মাথাটা না খেলে হাড় জুড়োয় না।

নিজে চ্যাঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় তুলেছ, আমরা দুটো কথা বললেই দোষ।

যা না হতভাগা, দীলুকে ডাক। দীপু চিনু রিনুকে খেতে দিক। নটা না বাজলে এ বাড়ির চায়ের পাট ওঠে না। এই যে দীলু, যা তো মুড়িগুলি লঙ্কার সম্ভার দিয়ে ভেজে ফেল।

চিনু, চিনু রুটি খেতে চায়, মুড়ি খাবে না বলেছে। ভয়ে ভয়ে বলল দীলু।

বললেই হল, ওদের পাউরুটি দিলে তোর বাবা খাবেন কি? যা দিন-কাল মুড়ি-চিড়েও জুটবে না, পয়সা চিবিয়ে খেতে হবে এরপর।

কই চা দাও। বাজার যেতে হবে বলে আলী আহমেদ এসে বসলেন তার আসনে। তবু জিন্নাতুন নেসার থামবার লক্ষণ নেই। বকেই চলেছেন সমানে।

সবাই আছে নিজের তালে। কেউ বোঝেনা দুদিনে সংসার চলে কিভাবে। চালের দর আগুন; বাজারে মাছ তরকারি কিছু নেই। এরা শুধু সভাসমিতি করেই খালাস। মাইক আর লাউডস্পীকারের কি দৌরাত্মা না বেড়েছে। কিছু লোক গলাবাজিতে মেতেছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে ঘোড়ার ডিম।

সারাদিনই জিন্নাতুন নেসা চ্যাঁচাচ্ছেন। বিশ্বসংসারের পতি তার মন যেন খিচিয়ে থাকে সব সময়ে। কিসে এর প্রতিকার কিছুই ভেবে পাননা আলী আহমেদ। হিন্দুদের মত কোন আশ্রম-টাশ্রম থাকলে তিনি হয়ত সেখানেই যোগ দিতেন গিয়ে। সংসার নামে জিন্নাতুন নেসা আর ছয় ছয়টি সন্তানের এ নরকে বাস করবার ঝামেলা থাকত না তার। আলী আহমেদ বাজারের থলে হাতে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

দীলু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। মা এত ভাল অথচ সবাইকে এত বকাঝকা করেন কেন বুঝতে পারে না সে। কি জানি আজ কেমন মেজাজ থাকে তার। কবীর ভাই এলে আবার যদি চিৎকার শোনে তবে বিশ্রী হবে ব্যাপারটা, দীলুর বড় লজ্জা লাগে। একদিন কবীর অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল এত চিৎকার কিসের? রশীদের মায়ের নামে দোষ চাপিয়ে দীলু সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল কোন মতে।

আজ কবীর ভাই আসতে পারেন সকালে। এমনিতেই দীলুর যথেষ্ট চিন্তা তাকে নিয়ে। ইদানীং কি হয়েছে বুঝতে পারছে না দীলু। মাস-খানেকের বেশী হল কবীর আর তাদের বাসায় আসছে না। ইমুর সাথে দেখা হয়েছে। বলেছে, সময় পাইনে তাই।

কবীর ভাই ব্যবসা করেন সময় না পাবারই কথা। কিন্তু দীলুর সাথে আলাপ হবার পর কাজ ফেলেই তো ছুটে আসতেন আগে। কিন্তু ক্রমেই যেন কেমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন কবীর ভাই। দাদা ভাইটা যে কি, সব সময়

বাড়ির বাইরে। কবীর ভাইকে নিয়ে আগে কেমন গল্প করতো। তার ঝকঝকে টয়োটা করে ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে। দাদা ভাইই তো মাকে বলেছিল—কবীরের ইচ্ছে আছে। দীলুকে ওর খুব পছন্দ। শুধু কবীরের মা-বাবার মত হলেই হল। সেই দাদা ভাই কবীরের নাম পর্যন্ত আনেন না মুখে।

বাবা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন তোর বন্ধু ঐ ছেলেটা কি কাজ করে রে?

চাকরী করে না, ব্যবসা আছে। বেশ অহঙ্কারের সাথে বলেছিল শীরান।

কিসের ব্যবসা? বাবা যেন একটু স্পষ্ট করেই জানতে চান সব। কিন্তু এভাবে খুঁটিয়ে জেরা শীরানের বড় অপছন্দ। তবু বলে, অতশত আমি জানিনে ভাল করে। খেলার মাঠে আলাপ হয়েছিল। দোকানটা সেখানেই, মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম এই মাত্র। মস্ত বড় শাড়ী কাপড়ের দোকান।

দোকান কি আগেই ছিল, না যুদ্ধের পর হয়েছে? কথায় সূক্ষ্ম শ্লেষ শীরান ধরতে পেরে মনে মনে চটে ওঠে। কিছু বলবার আগেই জিন্নাতুন নেসা বিরক্ত হয়েই বলেন, আচ্ছা মানুষ বটে তুমি। উকীলের মত জেরা করতে বসেছ। পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে না হলে টয়োটা হাঁকিয়ে বেড়াতে পারে।

বাপের পয়সা থাকলে ছেলের কি? ছেলে কি কাজ করে জানতে হবে না।

শুনলে তো ব্যবসা করে। আরও তেড়ে ওঠেন জিন্নাতুন নেসা।

শীরান বলে, কাপড়ের দোকানটা আগে বেশ ছোট ছিল। যুদ্ধের পর বড় হয়েছে অনেক। তবে ওরা নতুন রাস্তার ওপর দু'দুখানা ষ্টোর দিয়েছে। মালে বোঝাই সেগুলি।

হুঁ, আলী আহমেদ আর কিছু বললেন না। কিন্তু মুখে না বললেও মনে মনে ভাবনাটা থাকেই। এই দুর্দিনের সময় বড় ষ্টোর দেওয়ার অর্থটা কি হতে পারে তা তার অজানা নয়। লোকের হাতে এত কাঁচা পয়সা আসে কোথা থেকে? কোথা থেকেই বা জোটে এত মাল? দেশে এখন কি ছাই এত তৈরী হচ্ছে যে মাল বোঝাই হয়ে উঠবে দোকানপাট?

জিন্নাতুন নেসা যেন তার মনের ভাবটা তখনই বুঝে ফেলেন তাই বলেন, দেশ শুদ্ধ লোক চুরি করছে, আর চুরির টাকায় ব্যবসা চালাচ্ছে

না? কেবল তুমিই হয়েছ সাধু-সজ্জন! বলি কে কোন অধর্ম করে কি করলো তা না দেখে নিজের চরকায় তেল দিলেই তো হয়। নিজে কিছু করতে পারনি তো তাই অন্যের অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো।

না ঘামিয়ে উপায় কি। ওরই হাতে তো মেয়েকে সঁপে দিতে চাও। চোর না সাধু তা দেখব না, মেয়েকে দেব কি করে।

অতসব দেখার দরকার নেই। ওকে শীরান জানে। তাছাড়া ছেলে নিজেই যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তখন ভাববার কি আছে।

আগ্রহ প্রকাশ আর বিয়ে দু'টো এক জিনিস নয়।

হয়ত নয়, তোমাকে আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমিই দেখবোখন সব। অগত্যা আলী আহমেদ আর উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু তাই বলে দীলুর ভাবনা যে কমলো এমন নয়। রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসে দীলু। বসবার ঘরটায় কদিন মনোযোগ দিতে পারেনি। ইতিমধ্যে কেমন ধুলো জমেছে চারদিকে। কবীর ভাই এলে কি ভাববে কে জানে। একটা ঝাড়ন এনে নিজেই পরিষ্কার করে সব। উঠানের কামিনী গাছ থেকে কিছু ফুলও এনে ফুলদানীতে সাজায়। আর তখন সদর দরজার সামনে কবীরের গাড়ীর হর্ণ শোনা যায়।

ইমু ছুটে আসে— মা, কবীর ভাই এসেছেন এখনি তোমায় ডাকছেন।

নিজের ময়লা শাড়ীর দিকে তাকিয়ে বিব্রত বোধ করেন জিন্নাতুন নেসা। ইমু তুই কথা বল আমি আসছি, দীলু চট করে এক পেয়ালা চা করে নিয়ে আয়তো তোর কবীর ভাই-এর জন্য।

না না, চায়ের প্রয়োজন নেই, আমি বসতে পারব না। আমার বড় তাড়া আছে আজ। কবীর কখন বাড়ির ভেতর চলে এসেছে কেউ টেরও পায়নি।

আমি শুধু আপনাদের দাওয়াত দিতে এসেছি। খামে ভরা একখানা কার্ড কবীর এগিয়ে দেয় জিন্নাতুন নেসার হাতে। যাবেন আপনারা সবাই। শীরান কোথায়, ওর আজকাল দেখাই পাইনে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে এসেও আলী আহমেদ স্ত্রীকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে চিন্তিত হলেন। তোমার কি ব্লাড প্রেসার আবার বেড়েছে নাকি? জিন্নাতুন নেসা হাত দিয়ে দেখালেন মাথা তুলতে পারছেন না বিছানা থেকে।

অসুখটা বাধালে তো শেষে। কথায় কথায় এত উত্তেজিত হওয়া কি ভাল? তখনই বলেছিলাম এত আশা কোর না ঐ ছেলেকে নিয়ে। কথাতো শুনলে না।

আমার কি দোষ, ছেলে নিজে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিল।

সুন্দরী অল্প বয়সের মেয়ে পেলে ছেলেরা অমন দেখিয়েই থাকে। আবার টাকার গন্ধ পেলে অভিভাবকদের দোষ দেয়। কিন্তু নিজেরা ঘুর ঘুর করে তাদের অনুসরণও করে। তখন বরের আসনে গিয়ে বসতেও তাদের আপত্তি হয় না।

হায়রে পোড়া কপাল আমার! দীলুর মত সুন্দরী মেয়ে ফেলে টাকার লোভে ওর কসাই বাপ-মা ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিতে পারল?

বাপ-মা কি, ছেলেই পাষণ্ড। ঐ ছেলে পারল আমার সাথে অমন দুশমনি করতে? বিছানায় শুয়ে শুয়েই বিলাপ করতে থাকলেন জিন্নাতুন নেসা। এখন তাকে দেখে মনে হল কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে যে কোন মুহূর্তে নিজের সর্বনাশ তিনি ডেকে আনবেন।

আলী আহমেদ আর থাকতে পারলেন না। স্ত্রীর নাটকীয় ভঙ্গীর আর হা-হুতাশে বিরক্ত হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আজ তার নিজের মনটা এমনিতেই ভাল নেই। কি এক দুশ্চিন্তা ধুঁয়োর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমেই যেন মাথা-মগজে লেপ্টে যাচ্ছে।

কদিন থেকে তিনি মনে মনে কিছু অশান্ত ছিলেন। ভেবেছিলেন সময় বুঝে বলে ফেলবেন কথাটা কিন্তু স্ত্রীর অবস্থা দেখে সে সাহস হারালেন। কি করেই বা এ সময় আর একটা দুঃসংবাদ তিনি জিন্নাতুন নেসাকে দিতে পারেন। দিলেও তিনি যে কিভাবে গ্রহণ করবেন তা আলী আহমেদ ভাল করেই জানেন। কিন্তু সত্যি কথাটা না বললেও তো নয় আর মাত্র সাত দিন আছে মাস শেষ হবার। মাস শেষ হলেই তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। আর এই অবসর গ্রহণের অর্থ হল বারশত টাকা থেকে হঠাৎ পাঁচ শত টাকায় নেমে আসা। ছোট বাসায় উঠে যাওয়া, একটি কাজের লোককে ছাড়িয়ে দেয়া। ধোপা রিকসা দুধের খরচ সব বন্ধ করে দেয়া। কিন্তু সেই সত্যি কথাটা তিনি জিন্নাতুন নেসাকে বলবেন কি করে?

বলি বলি করেও কমাস বেঁধে রেখেছিলেন কথাটা। কিন্তু ফাঁসির আসামী যদি মরবার আগেও সত্য কথাটা স্বীকার না করে তবে আর করবে কখন। তাছাড়া এক সময়ে না এক সময় জিন্নাতুন নেসাকে তো জানাতেই হবে। মনের সাথে এসব নিয়ে অনেক বোঝাবুঝি করেও পারলেন না আলী আহমেদ। নীরবেই রয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

পরদিন দুপুরে রশীদের মা এসে জিন্নাতুনকে জানাল, ফোনের মিস্ত্রী এসেছে, লাইন নাকি কেটে দেবে। সে কি, ফোন বিলতো সব দেয়া আছে। তবে ?

ও বলছে, সাহেবের নাকি সামনের মাস থেকে পেনসন হবে তাই সরকারী হুকুম হয়েছে ফোন নিয়ে যাবার।

কিসের পেনসন ? ধড়মড় করে অসুস্থ শরীরেই জিন্নাতুন নেসা উঠে বসেন বিছানায়। বিস্ফারিত চোখ দুটিতে রাজ্যের অবিশ্বাসের ভাব ফুটে ওঠে। কই আমি তো জানিনে কিছু ? হায় আল্লাহ, সত্যি কি তবে রিটায়ার করেছেন তিনি ? তবে আমাকে আগে কেন জানালেন না। আঁচলে মুখ ঢেকে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন জিন্নাতুন নেসা।

মায়ের পায়ের কাছে নিঃশব্দে বসেছিল দীলু। গতকালের পর থেকে ও যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছে। বিশ্বসংসারের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। মুখ ফুটে কাউকে কিছু সে বলেনি। মায়ের বিশ্রী আচরণের প্রতিবাদটুকু করেনি পর্যন্ত। নিজের মনে কেঁদে যে বুক হালকা করবে তার সুযোগও তার হয়নি।

কবীর তাকে প্রবঞ্চনা করেছে। বিশ্বাসঘাতকের কাজই করেছে কবীর। অতর্কিতে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে বুকে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে দীলু সে যন্ত্রণা। এ বাড়িতে কে আছে যে তাকে দেবে একটুখানি সান্ত্বনা।

মায়ের অসুখ বাবার অফিস, ভাইদের স্কুল-কলেজ যে যারটা নিয়ে ব্যস্ত। বিব্রত দীলুর কথা কে চিন্তা করবে। কিন্তু দীলুকে চিন্তা করতে হচ্ছে আজ সকলের জন্য। বাবার অফিসের ভাত তৈরী করা, মায়ের পথ্যি। ছোট ভাইদের স্কুলে পাঠানো মুখ বুজে ঘড়ির কাঁটার মত করে যাচ্ছে সব। এ সংসারে এর বেশী কিইবা তার করবার থাকতে পারে। কিন্তু কি জানি কেন মায়ের কান্না দেখে হঠাৎ দু'চোখ উথলে উঠল তার। বিশ্ব

সংসারের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। তার অভিমানেই হয়ত মা মেয়ে এমন আকুল হয়ে কাঁদতে থাকল।

অফিস থেকে ফিরে এসেই কেমন জানি লাগল আলী আহমেদের। বাড়ির ভেতর সেই চ্যাঁচামেচি হট্টগোল জমজমাট ভাবটা আর নেই। জিন্নাতুন নেসার অসুখ। চিৎকার করে বথাই বা আর কে বলবে। তবু আজ যেন আরও নিস্তেজ, প্রাণহীন মনে হচ্ছে বাড়ির পরিবেশটা। কেমন একটা অস্বস্তি নিয়েই প্রবেশ করলেন তিনি ঘরে। জিন্নাতুন নেসার চিৎকার এমন ভাবে কানে এসে বাজল যে বজ্রপাত হলেও বুঝি এতটা বিস্মিত তিনি হতেন না।

স্বামীকে লক্ষ্য করে জিন্নাতুন নেসা যে মধুর কথাগুলি উচ্চারণ করে-ছিলেন তাতে আলী আহমেদের মনে হল অফিস থেকে আজ না ফেরাই বুঝি ভাল ছিল। এতবড় অপমান, লোক এসে ফোনের লাইন কেটে দিয়ে যায় আর আমি কিছু জানতে পারি না। জিন্নাতুন নেসা যেন ফুঁসছিলেন।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিভে কথা উঠছিল না আলী আহমেদের। তবু সাধ্যমত সংযত হয়েই বললেন, এটা কি নতুন কথা কিছু। রিটায়ার তো করতেই হবে। সরকারী চাকুরে আমি, নিয়ম-কানুন তো মানতেই হবে। চিরকালতো চাকরী নিয়ে বসে থাকতে পারিনে।

তাই বলে আমার মাথায় এমনভাবে বজ্রপাত ঘটাতে হবে। একটার পর একটা কত সহ্য আমি? তোমরা ধ্বংস না করে ছাড়বে না। এ সংসারে কতটুকু সুখ দিয়েছ তোমরা আমায়? চারদিকের অভাব, অনটন তার উপরে এই সব। ভেবেছিলাম কবীর দিলুকে বিয়ে করবে, শীরানও আমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ব্যবসায়ে নামবে ওর সাথে। কিন্তু অমন কপাল করে আসিনি আমি। বড়লোক জামাইএর মুখ দেখব। এদিকে বড় মেয়ের জামাইও পাকিস্তানে আটকা। তার ওপরে বোঝার উপরে শাকের আঁটি রিটায়ারের এই খবর, চমৎকার! সব যেন এ পোড়া কপালে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে উঠেছে।

স্বামীকে দেখে জিন্নাতুন নেসার প্রলাপ যেন বেড়ে গেল আরও।

তোমার রক্তের চাপ বেশ বেড়েছে। কালই তো ডাক্তার বলে গেলেন। এমন করে চ্যাঁচালে কি ভাল হবে? সব কিছু মানিয়ে চলা ছাড়া আমাদের

কি গতি আছে। আমাদের জীবনই তো এই। অনেক করেই বোঝাতে চাইলেন আলী আহমেদ, কিন্তু পারলেন না। অগত্যা অফিসের জামা-কাপড় ছাড়তে উদ্যত হলেন আর তখনই বাইরে বহু মানুষের চিৎকার কানে এল।

পর মুহূর্তেই কোথা থেকে ছুটে এল ইমু। আব্বা শিগগীর এস, ভাইয়াকে ওরা মেরে ফেলল।

কখন যে ছুটে পথে বেরুলেন তিনি কখন যে মোড়ের সামনে জনতার ভীড়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন সে ভয়ানক দৃশ্য কিছুই তার মনে পড়ছে না আর। যখন খেয়াল হল তাকিয়ে দেখলেন সামনে শীরান মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অনেক লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ছেলের নাকমুখ রক্তে ভাসা-ভাসি—জামা-কাপড় টুকরো টুকরো ন্যাকড়া হয়ে গায়ে ঝুলছে। সে কি বীভৎস চেহারা।

শীরান, বাবা আমার! জাপটে ধরলেন আলী আহমেদ ছেলেকে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শীরান। বাবা তুমি ওদের বল আমি চোর নই। ডাকাতি আমি করতে যাইনি। পথের মোড়ে ঐ ব্যাঙ্কটার সামনে আমার বন্ধু নিজাম মনিকে দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে। আমি ভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। ওরা গাড়ীতে চুপ করে বসেছিল। আমাকে দেখেই ডাকল। বললে ব্যাঙ্কের ভেতর রবি আর আজাদ গিয়েছে কাজে, তাই ওরা গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি কি করে জানব ওরা ব্যাঙ্ক লুট করতে এসেছিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে নীজান আর মনির সাথে কথা বলছি হঠাৎ চারদিক থেকে চ্যাঁচামেচি আর গুলির শব্দ কানে এল। নিজাম বলল, শীরান পালা শিগগীর, মনে হচ্ছে ব্যাঙ্কে গোলমাল হচ্ছে। আমরা চলে যাচ্ছি। ওরা স্পীডে গাড়ী চালিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে থেকে রবিকে নিয়ে তখনই পালিয়ে গেল। আসাদকে নিতে পারেনি তাই ও আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুড়ছিল। কিন্তু পথের লোকেরা পেছন থেকে ধরে ফেলে ওকে। আমি গুলির শব্দ শুনে পালাতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ওরা ডাকাত বলে আমায় ধরে ফেলেছে। বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল শীরান।

ভীড় থেকে কে একজন এগিয়ে এসে বলল, স্যার ভাগ্যিস পাড়ায় ঘটনাটা ঘটেছে নইলে শীরান ভাইকে বাঁচাতে পারতাম না আজ। আমরা কজনা চিনি ওনাকে তাইতো ভাইজান রক্ষা পেলেন এ যাত্রায়।

রক্ষা? আলী আহমেদ তাকালেন আধমরা ছেলের দিকে তারপর বললেন ওকে আর বাড়িতে এনো না তোমরা। হাসপাতালে দিয়ে এস। শেষের কথাটা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল তার। সবাই ধরাধরি করে শীরানকে রিক্সায় তুলল, ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি। কিন্তু ছেলের সাথে গেলেন না। ইমুকে পাঠিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

দীলু দাঁড়িয়েছিল সদর দরজায়। আলী আহমেদকে দেখেই চিৎকার করে কেঁদে উঠল—বাবা শিগগীর এস, মা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

আলী আহমেদ যেন স্বপ্নে হেঁটে পথ থেকে শোওয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। বিছানায় জিন্নাতুন নেসা চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, চারপাশে ছেলে-মেয়েরা ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। দীলুর চোখে জল।

আলী আহমেদ গ্লাস থেকে পানি নিয়ে স্ত্রীর চোখে জোরে জোরে বেশ কবার ঝাপটা দিলেন। মুখের ভেতর চামচ ঢুকিয়ে হা করাবার চেষ্টাও করলেন। জিন্নাতুন নেসার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কেমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি। আলী আহমেদের বুকের ভেতরটায় একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে চাইলেন তিনি; তারপর অতি সাবধানতায় জিন্নাতুন নেসার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে নাড়ী দেখলেন।

ছোট মেয়ে রীমু বাবার দিকে হা করে চেয়েছিল এতক্ষণ, এবার বলল—মা কথা বলবে না বাবা আর। আলী আহমেদ মাথা নাড়লেন।

সবচেয়ে ছোট ছেলে দীমু বললে—বাবা মা আর লোজ লোজ চিৎকার করবে না—

আলী আহমেদ স্ত্রীর মুখের ওপর চাদর টেনে দিতে দিতে বললেন—না আর কখনও নয়।

দুঃসহ

রাজিয়া মহবুব

ডালিয়াকে দেখতে পারে না কেউ। বাপ-মা সবই আছে ডালিয়ার। তবুও বাপ-মায়ের স্নেহের স্বাদ ও পেল না কোনদিন। জন্মরোগা ডালিয়া। জন্মে-অবধি কেবল ভুগছেই। ভুগে-ভুগেই বাইশ বছরেরটি হল। অবশ্য ষোল পার হওয়ার থেকে সে ভালই আছে। তবু শরীর সারেনি। দেখলে তাকে এখনও রুগ্ন বলেই মনে হয়।

আর তাই, শুধু তাই—এ পর্যন্ত ওর বিয়ের একটি সম্বন্ধও এল না।

আর এমনি ভাগ্য ওর যে বাবার অবস্থাটাও সচ্ছল হল না।

চার পাঁচশো টাকায় চার-পাঁচটি ছেলেপুলে নিয়ে আজকের দিনে কি হয়?

ডালিয়া যদি পড়ালেখায় ভাল হত তা হলেও একটা কথা হত! কাজে কাজেই রূপগুণ সবদিকে নিঃস্ব যে মেয়ে তাকে ভালবাসবে কে? বাবা, মা? তাদের স্নেহ-মমতাও বুঝি চিন্তার তাপে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে শূন্যে। শৈশবে চিন্তা ছিল ওর স্বাস্থ্যের, আর এখন? এখন চিন্তা হয়েছে ওকে ভাল ঘরে বরে পাত্রস্থ করার।

ছেলেবেলায়—ভাল খাবার ওকে দেওয়া হত না অসুস্থ থাকে বলে। ভাল কাপড়-জামা তা-ও পেত না ঐ একই কারণে। বিছানায় পড়ে থাকে যে বারমাস তার ভাল কাপড়ে প্রয়োজন কি? মিছামিছি পয়সা নষ্ট। ওর বড় বোনেরা পেত, ছোটরাও পেত, কেবল ও ছাড়া। তাছাড়া অনেক সময়েই অনেকে ভুলেও যেত এই নেহাৎ নির্জীব, গো-বেচারী মেয়েটির কথা। যেমন এখন ভুলে যায়। যেমন এখনও ওকে কেউ ভাল কিছু দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এমনকি ওর মা-ও নয়। ছেলেবেলায় অসুখ করলেই মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলতেন—এত না জ্বালিয়ে একেবারে মরে গেলেও তো পারিস। আর এখনও ঠিক তাই

বলেন। তবে কারণটা ভিন্ন। এই বাইশ বছর অব্দি কত কিছুই হল কিন্তু তারজন্য একটি সম্বন্ধও জোগাড় করতে পারল না ওর বাপ-মা।

আর—শুধু কি ওর চিন্তা? ওর পর আরো দুটি যে গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। ওকে পার করতে না পারলে ওদেরই বা একটা গতি হয় কি করে?

যদিও ওদের চেহারা ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, যদিও ওদের বিয়ে এতদিনে হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তাহলে ওর বিয়ে হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

এমন দিনে শফীক এল ওদের বাড়িতে।

শফীক ওর বড় বোনের শ্বশুর বাড়ির ছেলে।

এল ওর বড় বোনকে নিয়ে। এর আগে আর কোনদিন সে আসেনি। সুস্থ, সবল, বড় চাকুরে শফীক। এল, ডালিয়াকে দেখল। দেখল এক বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে। আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে। নইলে কেন দেশে এত মেয়ে থাকতে ঐ মেয়েকেই পাবার জন্যে সে পাগল হয়ে উঠল।

সবাই বোঝাল, ঝোঁকের মাথায় বা মোহবশে এ কাজ করা ভাল হবে না। কিন্তু শফীক শুনলে তো?

আর ডালিয়ার বাবা-মাই বা এমন পাত্র হাতছাড়া করেন কি করে?

কাজেই বিয়ে হয়ে গেল ডালিয়ার। বিয়ের পরও শফীককে তেমনি আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত দেখা গেল। কিন্তু ডালিয়ার ভাবান্তর বা পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং সে যেন নিজেকে আরো সঙ্কুচিত করে রাখল। গুটিয়ে নিল একেবারে এককোণে।

প্রথমটায় শফীক ভাবল নববিবাহের সঙ্কোচই বুঝি এর একমাত্র কারণ। এ জড়তা কেটে যাবে মাসখানেক যেতে না যেতে। কিন্তু মাসখানেকের ভেতর একদিনের জন্যেও শফীক দেখতে পেল না ওর মুখের হাসি, ওর চোখের তারায় আনন্দের ঝিলিক। এমন কি মাস দুয়েক পরও সেই একই ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি।

এবার নিজের অবহেলার কথাই ভাবল শফীক। তবে কি সে যথাযোগ্য সমাদর করছে না ডালিয়ার। আর তাই শফীক রাশি রাশি শাড়ী ব্লাউজ ছায়া সেমিজে ঘর ভরে ফেলল। ডালিয়াকে সিনেমা, থিয়েটার, জলসা,

নাটক আমোদ ফুর্তিতে মাতিয়ে রাখতে তৎপর হল। কিন্তু ডালিয়ার কোন রকম ভাবান্তর দেখা গেল না।

এবার শফীক সরাসরি ডালিয়াকে প্রশ্ন করে বসল—আমি কি তোমাকে সুখী করতে পারিনি ? তুমি কি সুখী হওনি ?

—কেন ? সে কথা কেন ? আমি কি, আমি কি এমন কিছু বলেছি ?

—সে কথা মুখ ফুটে বললেও যে এর চেয়ে ভাল হত। তাহলে আর এই প্রশ্নই উঠত না। বল, সত্যি করে বল, তুমি কি সুখী হওনি ?

চুপ করে থাকে ডালিয়া। বলল—বল।—ডালিয়ার হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দেয় শফীক।

তবু ডালিয়া নিরুত্তর। এবার সত্যি রেগে যায় শফীক। ডালিয়ার হাতে আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলে ওঠে—বুঝেছি, আমাকে তুমি চাওনি। তবে কে সে ? তার মাঝে এমন কি পেয়েছিলে যা আমার নেই ?

এবার কথা বলে ডালিয়া। বলে—আমায় মিছে সন্দেহ করে কষ্ট পেওনা। তুমি কি দয়া করে আমায় আর একটু কম ভালবাসতে পার না ?

—তার মানে ? বিস্মিত শফীক, সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ডালিয়ার চোখে চোখ রাখে।

—আমি যে কিছুতে এত সুখ, এত ভালবাসাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার যে বড্ড ভয় করে।

ভয়ে ভয়ে কথাটা বলে ডালিয়া। আর বলতে বলতে সরে আসে শফীকের বুকের কাছে। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে।

এই প্রথম ডালিয়ার সাগ্রহ সমর্পণ। আনন্দোদ্বেল হয়ে ওঠে শফীকের হৃদয়। আবেগ মেশান কণ্ঠে বলে—বল, বল লক্ষ্মীটি কিসের ভয় তোমার ?

ছলোছলো চোখ তুলে ডালিয়া বলে—আমি যে তোমার একেবারে অযোগ্য। তাই তোমার ভালবাসা আমার কাছে দুঃসহ।

নিমেষে ডালিয়ার সমস্ত অতীতটা ভেসে ওঠে শফীকের মনের পর্দায়। সব সে ডালিয়ার বড় বোনের কাছ থেকে শুনেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে শফীকের। হেসে ডালিয়াকে বুকের মাঝে টেনে নিতে নিতে বলে—ছিঃ, নিজেকে অত ছোট ভাবতে নেই। তুমি আমার যোগ্যতমা। উত্তরে ডালিয়া কি যেন বলতে গিয়েও পারে না। অকারণে অজস্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

লালমোতিয়া

আহমদ মীর

আবছা নীল পাহাড়ের সারি। ভাল করে দেখেও মেঘ বলে ভুল হয়। লাইনের দু'পাশে লাল টিবি কেটে সিঁড়ির থাক নেবে এসেছে। ধাপে ধাপে রঙের মেলা। সর্ষের ফুল। অড়হরের ফুল আর গুঁদলির কালচে সবুজ ক্ষেত। যেন যত্নে আঁকা, হিসেব মত ভাগ করে ছক-কাটা টুকরো রঙের সমাবেশ। ট্রেন ছোটে নিজের মনেই। দূরের পাহাড় কাছে আসে না। স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। স্বপ্নের মতই রয়ে যায় দিগন্তের ওদিকে। বদলে যায় শুধু লাইনের পাশে ছক-কাটা রঙের আলপনা।

কোন কাক-ভোরে বরাকর ব্রিজ ছেড়ে এসেছি। ওপারে রেখে এসেছি বাংলার শস্যশ্যামল ভিজে মাটি। এপারে পেয়েছি পশ্চিমের শুকনো লাল মাটির দারিদ্র্য। তবু যেন আশেপাশে, গাছে-মাঠে বাংলার সে মিষ্টি-মধুর জলো হাওয়া এখনো অনুভব করা যায়। কত স্টেশন ধুলো উড়িয়ে পেছনে চলে যায়। দৃশ্যের বদল হয়, মনকে কিন্তু নাড়া দেয় না।

মধুবাগ রোড স্টেশন। হঠাৎ যেন কোথায় এসে গেছি। নতুন মনে হয়। ছোট ছোট স্টেশন। টিমটিমে একখানা কি বড়জোর দু'খানা ঘর। ওপরে মাটি-খোলার ছাউনি। ইটের পাকা সাদা দেয়াল। প্ল্যাটফরমের খোলা জায়গা জুড়ে লাল লাল শালের চারা। বাঁধানো ইঁদারার উঁচু পাড়ে আঁকশি মত দিশি কপিকল। আকাশের দিকে মুখ করে আছে। গুম্ গুম্ করে টানেলের মধ্যে ট্রেনটা এসে যায়। কামরায় নেমে আসে আবছা তারপর ঘুটঘুটে আঁধার। হঠাৎ আঁধার আবার তখুনি আলো। আবার সেই পাহাড়ের দেয়াল। দূরে সেই নীলের স্বপ্ন। ডানদিকে অনেক কাছে সবুজ পাহাড়। চুড়োয় তার ছোট্ট সাদা একটা বাংলো। লাইনের পাশে পাশে এবার ঘন অরণ্যের ছায়া পড়ে। অগুণতি পাহাড়ের চুড়ো মনে হয় মেঘের ধোঁয়ায় হারিয়ে গেছে। হিরোডিহ স্টেশন। লাইনের পাশে

উঁচু জমিনে রোদ চিক্ চিক্ অভ্রের আভা চোখ ঝলসে দেয়। বুঝতে আর বাকী থাকে না গাড়ী ঢুকছে মাইকা ফিল্ডে। সামনেই কোডার্মা। মাইকা টাউন কোডার্মা। অদ্ভুত নিস্তব্ধ। আলোর ঝলকানি। নির্জন প্রান্তরে জীবনের ক্ষীণ নিঃশব্দ কোলাহল। রোদ চিক্ চিক্ বালুর টিবি কেটে পাশাপাশি চারটে রূপো-রঙ পাটি দিগন্তে গিয়ে হারিয়ে গেছে। আপ-ডাউন দুটো গাড়ীই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

স্টেশন প্রাঙ্গণের বাইরে মহুয়া আর পিপুলের ছায়াঘন নিঃশব্দ বাতাসের গান।

ওভার ব্রিজ পার হয়ে, বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে পথে নেমেই অবাক হলুম। ক'জন পোর্টার, বহু চেনা সেই হলদে ঝড়ঝড়ে ডিজেল বাস। সুদীর্ঘ পাহাড়ী পথে ছুটে চলার একমাত্র, একটি মাত্র বিলাস। গিরিডি পর্যন্ত লম্বা পাড়ি দেবে। খাড়াই-উৎরাই সুদীর্ঘ পথ। নিঃশব্দে যেন দম নিচ্ছে। মনটা দমে গেল। বাস ছাড়বে চারটেয়। সোজা যাবে গিরিডি। পথেই লোকাই। আমার ডেরা। বিকেল চারটে। মাইকার ঝুড়ি আর শাল-পাতার ঠোঙায় পাউডার মাইকা বোঝাই দিতে দিতে আসলে বাসের চাকা ঘুরবে সেই সন্ধ্যায়। আর এখন এই খাঁ খাঁ রোদ ঝিম ঝিম দুপুর। পাণ্ডববর্জিত জায়গা। কতক্ষণ বসে থাকা যায়। বাবার অপরিণামদর্শিতায় রাগ হল। দু'দিন আগে টেলি করে দিয়েছি, কিন্তু কই, তবুও তো গাড়ী বা লোক কারু দেখা নেই। মাইকা-জমাট সাদা পাথরের রাস্তা এঁকে বেঁকে মহুয়া বনের ভেতর দিয়ে খানকটে হারিয়ে গিয়ে আবার চড়াই ভেঙেছে ডান দিকে। দেখা যায়। সাদা শাড়ীর মত সবুজের ছায়া-মিঠে আবছা ভেদ করে। একটা এক্কা আসছে, এদিকেই তীরবেগে। কাছে এসে থামতেই কে যেন লাফিয়ে নেমে পড়ল। কথা বলবার সুযোগ আমাকে না দিয়ে বাবাই বলল : যাই বলিস, তোর গাড়ীই আগে এসেছে, আমি কিন্তু লেট নই।

: কিন্তু তুমি নিজে এলে? ধীরজু এল না?

: না, ওর আসা হল না। বাসোয়াকে চিনিস্ তো? ওর ঐ একটি মাত্র ভাই-ঝি, নিজের তো কেউ নেই। মেয়েটার খুব অসুখ। ধীরজু কাল ছুটি নিয়ে গেছে।

: বাসোয়া? কই না, চিনি নাতো।

: আরে বাসোয়া। গত বছর তোর যাবার সময়ে মেয়েটা তো এখানেই ছিল। তখনো বিয়ে হয়নি। দেখিস্‌নি? প্রায়ই আপিসে আসতো ধীরজুর খাবার নিয়ে?

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে নিতে হল। মাইকা ফ্যাক্টরিতে কাজে ব্যস্ত কতজনের ভাইঝি, মেয়ে-ছেলেরা তো তাদের কাকা-বাপুদের খাবার আনে। রোজ। কত দুর-দুরান্তর গ্রাম থেকে তারা আসে। দেখেছি ময়লা কাপড়ে পুঁটলি করা। ভেতরে এ্যালুমিনিয়মের বড় একটা থালা। আর থালায় ভুট্টা বা মকাই সেদ্ধ। বছরে ছ'মাস এরা মকাই সেদ্ধ খেয়েই ওরা থাকে। তিন মাস ভাত আর বাকী তিন মাস মাড়ুয়ার রুটি বা গুঁদ্‌লির ঘ্যাট। মকাই সেদ্ধ এক বাসন। ওপরে একটুখানি অড়হর ডাল আর মকাইয়ের মধ্যে গোঁজা বড় বড় দুটো পোড়ানো মিরচা। দুপুরের এমনি খাবার কতজনে কতজনের জন্যেই তো আনে। কে তার হিসেব রাখে। আমারো রাখবার কথা নয়। বাবা রেখেছিল। তার কারণ বোধ হয়, ধীরজুই এই বিরাট মাইকা ম্যাগনেট, আমার বাবার সবচে' বিশ্বাসী। ওর আসল চাকরিটা যে কি তা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি। এখানে পাঁচ বছর কাটালুম একটানা। তখনি জানতে পারিনি।

ফ্যাক্টরির গেটে দারোয়ানী, বাবার খাস অর্ডারলির ফাইফরমাস থেকে শুরু করে আমাদের মাইকা মাইন খালাকৃতখির জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বাবার জন্যে শরিফা খুঁজে বেড়ানো, খাদের গায়ে পাথরে বোরিং করে ডিনামাইট বসিয়ে পাহাড় ফাটানো, সব কাজেই ওকে দেখি মুরুব্বিয়ানা করতে।

আর কথা না বাড়িয়ে এক্কায় গিয়ে বসলুম। একবার অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: মোটরটা কি খারাপ?

: আর বলিসনে। হতভাগা রামখেলাওন সেদিন বিকেলে উৎরাই-এর মুখে টায়ারে চেন বাঁধেনি। আক্কেল যাহোক। গাড়ী তো যেয়ে একেবারে খাদে পড়ে যায় আর কি। ব্যাটা নিজে তো মরতোই আর গাড়ীটাও যেত। ভাল যে অল্পে ষ্টিয়ারিং-এর ওপর দিয়েই গেছে।

আর কিছু বলবার ইচ্ছে হল না। বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলুম।

লোকাই। মাইকা ফ্যাক্টরি। খালাকৃতখির খাদ থেকে মাইকা তুলে গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে আসে আট মাইল দূর এই গ্রামে। তারপর

চুনাই বাছাই করার কাজ। বড় বড় চাঙ্গড় ভেঙে টুকরো করা হয়। তারপর সে টুকরো আরো ছোট আরো নিখুঁৎ করে কেটে ভদ্রস্থ করাই ফ্যাক্টরির কাজ। বিভিন্ন বিভাগ, নানা রকমের ছোট ছোট কাজ। সবই হাতে চলে। সারি সারি কুলিকামিন বসে যায়। সামনে তাদের ছোট একটা করে খুঁটো পোঁতা। খুঁটোর মাথায় অভ্রের টুকরো চেপে ধরে ডানহাতে ধারালো হেঁসো চালান হয়। চৌকো, ছ'কোণা কিংবা আট কোণ হয়ে টুকরোগুলো চলে যায় অন্য সেক্শনে। ফাকৃনি সেকশন। মুখ সরু দু'পাশে ধার ছোট ছোট ছুরি দিয়ে অভ্রের পরত ছাড়ানোর কাজ চলে ক্ষিপ্রহাতে। কুযাশার মত মিহি হয়ে যায় অভ্রের ভাঁজ। হাল্কা মনে হয় একগাছি চুলের চেয়ে। মিহি পরত মাইকা ডাসটিং সেক্শনে এনে ঢেঁকিতে পেষাই চলে। পাউডার হলে, দেওদার কাঠের পাতলা পেটিতে ভর্তি হয়ে চলে যায় বিদেশে। টুকরো মাইকা চালান হয় বেঁতের ঝুড়ি আর শালপাতার প্যাকেটে। কত রকম কাজ আর কতই বা তার হেরফের। সবচে' ভাল লাগে ছুটির ভেঁা বাজলে। পাহাড়ী বুনো বৃষ্টি যেন হুড়মুড় করে ভেঙে আসে মহুয়ার বনে। কুলিকামিনের উচ্ছ্বসিত কথা-বার্তায় লোকাই-এর স্তব্ধ সাদা রাস্তা ক'টা-মুহূর্ত ভাষা পায়। মহুয়া আর বট, পিপুল আর আমলকির ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে হঠাৎ যেন বিনিয়ে ওঠে নিঃশব্দের গান। দিন-ভোর কাজের অবসরে হাল্কা মনে কুলিকামিনের দল ছুটে চলে যায় ভুট্টা ক্ষেতের আল ধরে। প্রতিটি দিন এই দৃশ্যের ছবি আঁকা, একই গানের মিড় টেনে চলা। সন্ধ্যেবেলা পাহাড়ের জঙ্গলে গাছে গাছে ঘসে আগুন ধরে। বিকেলের ছবিতে লাগে লালের ছোপ। সকালে আবার সেই স্নিগ্ধ সাদা পথ। লোকাই-এর পথে কুলিকামিনের মন্থর গতি।

এমনি এক ছুটির বিকেলে প্রথম দেখেছিলুম জোলা মেয়ে লালমোতিয়াকে। এর আগে কোনদিন তাকে দেখিনি। প্রথম দিনের সে দেখা আজো ভুলিনি। বড় বড় ক'টা মহুয়া গাছেই ফ্যাক্টরির গ্যেটটা প্রায় ঢেকে গেছে। ছায়া ছায়া আঁধার। গ্যেট দেখা যায় না। বারান্দা থেকে বসে দেখি। মনে হয় মহুয়াবনের ভেতর দিয়ে উগ্র মিঠে সৌরভের মত ওরা আচম্বিতে চোখের সামনে এসে গেছে। সবাই চলে গেছে। অনেক অনেক পরে একজন

মন্থরগতিতে বেরিয়ে এসেছে। বাংলোর বারান্দার সামনে দিয়ে সাদা রাস্তাটুকু এঁকে বেঁকে চলে গেছে ফ্যাক্টরির গেট অবধি। দু'ধারে সাজানো শাল আর মহুয়ার গাছ। দূর থেকে মনে হয়েছে কোন সাবধানী শিল্পীর আঁকা ঝাউ কিংবা ইউকালিপটাস-এর সারি। সারির মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথাও দু'একটা বেখাপ্পা আকারের খয়ের গাছ। শিল্পীর অন্যমনস্কতার কথা মনে করিয়ে দেয়। লালমোতিয়াও বোধ হয় এই ব্যতিক্রমের কথাই ভাবছিল। হয়তো ভাবেনি কিছু। তবু কিন্তু আমার চোখে চোখ পড়াতে ও চমকে উঠেছিল। দোষটা বোধ হয় আমারই। আর সে তাকাখনি। চোখ নামিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ ম্লান হয়ে গেছে ওর মুখ। মালিকের ছেলে আমি। আমার দিকে ওদের চোখ তুলে তাকানোটুকুও অপরাধ। অভদ্রতা। লালমোতিয়া চলে যাওয়ার অনেক পরে আমার সম্বিত ফিরে এসেছে। ধীরজু ঠিকই বলেছে, লালমোতিয়াকে দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে হয় না। আর সবার মধ্যেও ওকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। ওর রূপই ওকে চিনিয়ে দেবে, বলে দেবে ওরই নাম লালমোতিয়া। ওর গায়ের রং আর চোখের গভীর কালো ভাষা আর স্বাস্থ্য-নিটোল বর্ষা-বিভোর দেহবল্লরী একটি কথাই বলে, সে কথা লালমোতিয়া।

ধীরজু নিজেই একদিন ওকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। জানিস, তোদের ছোট মালিক। খুব কড়া মানুষ। খুব সাবধানে চলাফেরা করিস। আর দ্যাখ্ অমন করে চুলে চুঁটি বেঁধে থাক্‌বিনে। ওটা নোংরা কাজ। লোকে মন্দ বলে।

ধীরজুর এই অকারণ উপদেশ আমার ভাল লাগেনি। দেখেছিলুম মুহূর্তে ওর মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তারপর ধীর মন্থর পায়ে ও চলে গেছে। ধীরজুকে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলুম তার আগেই ও মুখ খুলল।

: ছোট সাহেব, তুমি জানে না। ও হারামজাদি কেউটের বাচ্চা কেউটে। ফ্যাক্টরিতে কাউকে আমল দেয় না। নিজের রূপের গর্বে নিজেই জমিনদার একেবারে। আরো ওর জোর বেশি বোধ হয়, ওর বাপ কুলিকামিনদের সর্দার বলে। আপনি জানে না বোধ হয়, ছোঁখড়ি কুঞ্জো মিশিরজীর মেয়ে।

ধীরজু অনেক খবর রাখে। কিন্তু এই কিশোরী লালমোতিয়ার ওপর ওর এত রাগ কেন সেদিন বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছি। আর শুনেছি ওরই মুখে। ধীরজুর বিশ্বাস ওই মেয়ের বদৌলতেই কুঞ্জো সব কুলিকামিনের

সর্দার হতে পেরেছে। আর এই সর্দার হয়েই ধীরজুর কোপে পড়েছে। কুঞ্জো সব সময়েই চেষ্টা করে মালিকের ক্ষতি করতে। হঠাৎ কম দামে চাল-ভুট্টা দেবার দাবী, রোজ বাড়িয়ে ছ'আনা থেকে সাত আনা করার আবদার, কুলিকামিনদের দিনে দিনে এইসব যে বেয়াড়াপনা, এসবই নাকি কুঞ্জোর প্ররোচনা। বক্তব্য শেষ করে ধীরজু বড় বড় চোখ করে বলেছিল : আপনি দেখে নেবে ওরা একদিন কোম্পানীর ফ্যাক্টরি আর খাদে তালা ঝুলিয়ে তবে ছাড়বে।

কুঞ্জো মিশিরজীর সর্দারীতে ধীরজু বিদ্বেষী হয়ে পড়েছে। নিজের মাতব্বরী হারাবার আশঙ্কায় সে যে ক্ষেপে উঠেছে, এটুকু বুঝতে কষ্ট হয়নি। বুঝেছিলুম লালমোতিয়ার ওপর ওর রাগ অকারণ মনে হলেও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ধীরজুকে আমি সমর্থন করতে পারিনি। বলেছিলুম : ওর বাপ দোষী হতে পারে, তা'বলে সে অপরাধের শাস্তি মেয়ে পাবে কেন ? ধীরজু আর দ্বিরুক্তি করেনি। উঠে চলে গেছে।

বারান্দায় বসেছি। ঠিক এক বছর পর। আবার বেজেছে ফ্যাক্টরির ভোঁ। বুনো বৃষ্টি ভেঙে এসেছে মহুয়া আর শালের বনে। লোকাই-এর সাদা রাস্তা হঠাৎ যেন জীবন পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। হাতে বোনা মোটা কাপড় বাসন্তী রঙে রাঙিয়ে পরেছে ওরা। পুরুষদের সেই একঘেঁয়ে মালকোঁচা দিয়ে পরা আটহাতি কাপড়। মেয়েরা পরেছে বারো হাতের মোটা লুগা। পাড় নেই। সে অভাব ওরা দূর করেছে কাপড় রাঙিয়ে। রঙের বৈচিত্র্য নেই মোটেই। প্রায়ই বাসন্তি রঙের ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে ব্যতিক্রম কারু গেরুয়া, কারু আবার দু'একজনের টকটকে গাঢ় লাল। মাথায় কাপড় দেয়া। মাথার কাছটা তেল জবজবে কালচে দাগ। হাতে ছোট ছোট চ্যাঁচাড়ীর চুপড়ী, তাতে সরু সরু ফাকনি ফাড়া ছুরি। সবাই চলে যায়। অনেকক্ষণ কেটে গেছে। মনে হয় আজ যেন ব্যতিক্রম ঘটেছে কোথা। মহুয়া বনে, কাক-ভোরে ছড়ানো সে মিঠে গন্ধ হঠাৎ যেন আর আসেনি। শীতের সে মহুয়া মহুয়া কুয়াশা ঘেরা বিকেল, মেঘের বাজো লোকাই পাহাড়ের সেই চূড়ো হারিয়ে যাওয়া, অড়হর গাছের সেই রাঙা কাঠিগুলোর মাথায় হলুদ রঙের সমারোহ, সবই যেন বদলে গেছে। বদলে গেছে চোত-বোশেখের ছোঁয়ায়। দুপুর-পোড়া লু' এসে শুকিয়ে দিয়ে

গেছে সব। খোলার চাল, দরোজা জানালা রুদ্ধ ঘরে মন যেন উন্মুখ হয়ে আসে সন্ধ্যেবেলার পাহাড়, গাছে গাছে ঘসে আগুন লাগার জন্যে। ধীরজু কাছে এসে দাঁড়ায়। ওকে জিজ্ঞেস করি: হ্যারে, আজকাল তো আর লালমোতিয়াকে দেখিনে। ধীরজু একটু হাসে। কেমন সে হাসি লক্ষ্য করিনি। ওর কথা শুনতেই শুধু উদ্‌গ্রীব আমি। ও তখন বলেছে: লাল মোতিয়া? চৌখড়ি এখন খাদেই থাকে। ওর বাপ থাকে এখানে।

ধীরজু আরো একটু সরল, বিস্তারিত হবার চেষ্টা করে: এখানে সর্দারী করে কুঞ্জো আর ওখানে লালমোতিয়া। কুলিকামিনদের আর বাগে রাখা যাবে না।

কথা শেষ করেই ধীরজু তার বহু পুরাতন সাবধান-বাণী উদ্‌গার করতে ভোলে না: এ আপনি দেখে লেবে ছোটা সাহেব, ওরা বাপ-বেটী আপনার কোম্পানীর বহুৎ লোকসান করবে। কোম্পানীর লোকসান! ধীরজু পুনরাবৃত্তি করে অদ্ভুত কণ্ঠে।

পরক্ষণেই স্বর নামিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ধীরজু বলে: জানেন ছোটা সাহেব, আপনাকে চৌখড়ি কি বলে?

: কি বলে রে?

: আমার ভাইঝি বাসোয়াকে তো চিনেন? ওর বিমারীর সময়ে লাল মোতিয়া ওকে দেখতে এয়েছিল। বলেছে তোদের ছোটা সরকার খুব ভাল লোক, আমার অনেক ভাল লাগে।

: তাই নাকি?

হেসে ফেলতে হয়। হঠাৎ চোখ পড়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে ভরে গেছে লালের সমারোহ। বিকেলের আবছা নীল আকাশে দুপুরের সেই বিন্দুর মত একেলা চিলটা আর নেই। দূরে বহু দূরে ঝুম্‌রি তিলাইয়ার হাটে ব্যাচা-কেনা সাঙ্গ করে হাসি-খুশীতে নাচতে নাচতে ক'জন মেয়ে মাথায় খালি টুকরি নিয়ে চলেছে। কে জানে ওদের গন্তব্য। হবে ডোমচাঁচ বা চেঁাড়াখোলা অথবা তিস্‌রির কোন ছোট্ট টাঁড়ে।

ধীরজুকে জিজ্ঞেস করি: আর কি বলেছে রে?

: আবার? আর বলতে সাহস হয় হুজুর? বাসোয়া ভারী তেজী মেয়ে। এমন ধমক দিয়েছে যে, বেটী পালাবার রাস্তা পায়নি।

: তাই নাকি ? বাসোয়া তো খুব তেজী মেয়ে তাহলে।

ধীরজু আত্মপ্রসাদে গদ গদ হয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল ওকে বাধা দিয়ে বললুম : হ্যাঁরে খালাকুতম্বীর ওদিকে পাখি পাওয়া যায় ?

: হ্যাঁ হুজুর, বনমুরগী আর হরিয়াল খুব পাওয়া যায়।

কথা শেষ করেই একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে ধীরজু এবার সংশোধন করে নিজেকে।

: না হুজুর, বনমুরগী আর হরিয়াল তো গিরিডির ওদিকে পাওয়া যায়। খালাকতম্বীতে শিকার পাবে না আপুনি।

: তা না পাই ওদিকটা একদিন যাওয়া দরকার, বুঝলি ? আর খাদে যাইনি অনেকদিন, কাজকর্ম কি রকম চলছে দেখতে ইচ্ছে হয়।

ধীরজু বেজায় গম্ভীর হয়ে চলে যায়।

ঘন অরণ্য। পাথুরে সরু একটুখানি পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। গেছে চড়াই-উৎরাই ভেঙে। কোথাও দেখা যায় আবার কোথাও নজর পড়ে না। শুধু বন। নানান জাতের নানান গাছ। তবু কোনটাকে নির্দিষ্ট করে চেনা যায় না, চিনে রেখে দেয়া যায় না। দু'ধারে ঢালু জমিন গভীর থেকে গভীরে নেমে গেছে। কঁটা দিঘীর মত পরিত্যক্ত অভ্রের খাদ। আশে-পাশে যতদুর দৃষ্টি চলে শুধু মহুয়া, শাল আর বট-পিপুলের বন। বাঁ হাতে আর ডান দিকে সুদীর্ঘ একটা আবছা পাহাড়ের খেই-হারান রেখা। সামনে-পেছনে বন। কোথাও বন ওপরে উঠে গেছে। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় সবুজ পাহাড়ের শুরু। পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না। পাথর দেখা যায় না। আষ্টে-পৃষ্ঠে ছোট-বড় গাছের আস্তরণ। একটু এগিয়েই ধীরজু আমাকে সাবধান করে দিল : এখানে যেন ভুলেও আওয়াজ করবে না হুজুর। ওরা ভাববে ডিনামাইট ফাটান হয়েছে। কাজ গোলমাল হয়ে যাবে। সবাই খাদের ওপরে চলে আসবে, চিল্লাবে, গোলমাল করবে। কোম্পানীর অনেক ক্ষতি হবে।

সমগ্র খালাকুতম্বী নেমে এসেছে ধাপে ধাপে। পাথুরে মাটি কেটে কেটে সিঁড়ি হয়ে নেবে গেছে খাদে। আবছা আঁধার তারপর ধাপে ধাপে সে আঁধার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। সিঁড়ি শেষ হয়েছে এবড়ো-থেবড়ো পাথরের জমিনে। ছোট ছোট ডেভিস ল্যাম্প এদিকে-সেদিকে

দু'চারটে। ভেতরের আঁধার কিছুটা আবছা হলেও পাঁচ ছ' হাত দূরে কাউকে চেনা যায় না। কালো কালো ছায়ামূর্তি ইতস্তত: নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। গাঁইতি আর কোদালের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে পাথরের দেয়ালে। আলো সরিয়ে দেয়ালে ফেললে অভ্রের হঠাৎ ঝলকানি ঠিকরে ওঠে আলোর রেখা ধরে। কালো পাথরের দেয়াল। আগের রাতে ডিনামাইট ফাটিয়ে এক-ধারের দেয়ালে ফাটল ধরেছে। গাঁইতির ঘায়ে, শাবলের খোঁচায় ভাঙা পাথরের চাঙড় সরান হচ্ছে। চাঙড়ের সাথেই অভ্রের চাপড়া নেবে আসছে। বড় বড় হাতুড়ির ঘা মেরে পাথরের গা থেকে অভ্রের ড্যালা ছাড়িয়ে ঝুড়িতে চলছে বোঝাই। সারি সারি বালতির মধ্যে বোঝাই দেয়া তারপর ঢং করে কোথায় যেন কি একটা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বালতিগুলো ওপরে উঠতে থাকে। নীচে থেকে খাদের মুখের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। ছোট ছোট ছায়াকালো কুলিকামিনের মূর্তিগুলো পুতুল নাচের মতই নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে। গাঁইতি পড়ছে তালে তালে, ঘন্টার শব্দ, বালতি বাঁধা চাকা ঘোরার ইশারা তাও যেন ছন্দে বাঁধা। কুলিকামিনের, মেয়েপুরুষের কলগুঞ্জন পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরো গভীর আরো কোলাহল-মুখর হয়ে উঠেছে। যতই দেখি, যতবারই দেখেছি, এ সব যেন পুরনো হবার নয়।

আজ রাতে যে দেয়ালটায় ডিনামাইট বসান হবে, সেখানে সারি সারি বোরিং করা হচ্ছে। রাত ভোরে কুলিকামিনরা ওপরে উঠে আসবে। কেউ ওপরে জিরুবে, যাদের ডেরা কাছে-পিঠে তারা বাড়ি চলে যাবে। ভোর পাঁচটা থেকেই শুরু হবে ডিনামাইট ফাটার শব্দ। সারি সারি বোরিং তালে তালে উদ্‌গার করে যাবে ধোঁয়া আর থর্ থর্ কম্পনে খনি অঞ্চল দুলে দুলে উঠবে। বেলা আটটায় সব শেষ। ওভারসিয়ারবাবু আর কুঞ্জো মিশিরজী নীচে নেবে যাবে অবস্থা দেখতে। তারা ফিরে এলে কুলি-কামিনরা হুড়মুড় করে নীচে নেবে যাবে। কেউ ছুটবে মাটি কাটা ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে, কেউবা ট্রলিতেই বসে যাবে। এখন কুঞ্জো মিশিরজী আর খাদে থাকে না। লালমোতিয়া বাপের কাজ বুঝে নিয়েছে।

ট্রলি লাইনের মধ্যিখান থেকে মোটা তারে বাঁধা বাকেট। ওপরে চাকা ঘুরোলেই নীচে নেমে আসে, মাল-বোঝাইর ইশারা ঘন্টা বাজলেই আবার

চাবা ঘোরে, মাহুত। ঘাব ওপরে উঠে আসে। ট্রলিতে বোঝাই হয় বড় বড় চাঙড়। আমার ডান পাশে ক'টা বাকেট এসে থেমে গেল। ক'টা জোলা মেয়ে মাথায় টুকরি নিয়ে ছুটে এল। পরক্ষণেই আঁধারের আবছা ভেদ করে ডেভিস ল্যাম্পের আলো ওর মুখে গিয়ে পড়ল। ধূসর পাথর-কোঁদা মুখ। পাখির পালকের মত মসৃণ। ঘামে আর পরিশ্রমে অদ্ভুত সে মুখ। শুকনো চূর্ণ-কুন্তল কপালে আর গালের পাশে লুটোপুটি খেয়েছে। গাছ-কোমর করে কালো শাড়ী কোমরে জড়ানো। পরিশ্রমের আবেশে ওর পুরন্ত দেহবল্লরী নিঃশ্বাসের তালে তালে যেন নাচছে।

আমাকে দেখে লালমোতিয়া একটুকু অবাক হয়েছে বলে মনে হল না। নিঃশব্দে মাথার ঝুড়িটা নাবিয়ে দিলে। শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে শ্রান্তির হাঁপ ছাড়ল কি হেসে উঠল বুঝে উঠতে পারলুম না। সামনের চুল ক'টাকে কানের দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে এবার ও সত্যিই হাসল। অভ্রের ঝিলিক ওর মুক্তো-দাঁতে মিশে গেছে। রাঙা ঠোঁট জোড়ায় অদ্ভুত কার্ভ। ভিজে চক্ চক্ করছে। ঘাড়টুকু ঈষৎ তুলিয়ে লালমোতিয়া বলল: ছোট সরকার শিকার খেলতে এয়েছিস?

: হাঁরে। এখানে কি কি পাখি পাওয়া যায় বলতো?

: পাক্ষী? পাক্ষী কুথায়! ইখানে পাবি বাঘ। আর পাক্ষী যদি চাস্ তো হামাকেই গুলী চালিয়ে দেনা!

কথা শেষ করেই লালমোতিয়া খিল খিল করে হেসে চুর চুর হয়ে যায়। হাসির হিল্লোল ওর স্বপ্নের মত আবেশ-মাখা নিটোল দেহে দোলা দিয়ে যায়। আমিও না হেসে পারলুম না। বন্দুকটা ভেঙে দু'টো ব্যারেলে দু'টো লেথল বুলেট পুরে আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিলুম। বললুম: গুলী ভরেছি, চল্ এবার তোকেই তা'হলে শিকার করি।

লালমোতিয়া এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, হাসিতে ভেঙে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। মুখে আঁচল দিয়ে সলজ্জভাবে বলল: ছোট সরকার বহুৎ বড়া শিকারী।

গম্ভীর করে ওর চোখে চোখ রেখে বললুম: তুইও বহুৎ বড়া শিকার; জানিস এতে বাঘমারা বুলেট ভরেছি?

লালমোতিয়া কিশোরীর মত লাল হয়ে উঠে এক মুহূর্তে ছুটে কোথায়

চলে গেল। আমার সম্বিৎ ফেরবার আগেই আবার সামনে এসে হাজির : হিঁ, ছোট সরকার উই পাহাড়ের কাছে অনেক পাখী পাবি, চল্‌না তোকে দেখিয়ে দিই।

: কিন্তু তার আগে বলতো লালমোতিয়া তুই বাংলা ভাষা শিখলি কোথায় ?

: কেনে, বাবুদের সাথে থাকতেই তো শিখে লিয়েছি।

শুধু রূপ নয়, গুণও আছে লালমোতিয়ার। মহুয়া-গন্ধের মত রূপ নিয়ে এতগুলো কুলিকামিনের মধ্যে নির্বিবাদে ওযে আছে সে কি শুধু ওর বাপের দাপটেই ? না, তা নয়, ওর নিজেরও শক্তি, মনের দৃঢ়তা আর তীক্ষ্নবুদ্ধিই আজ ওকে এই থালাকৃতস্বী অভ্র খনির অবিসংবাদিত রানী করেছে। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আর আত্মসম্মান বোধ লালমোতিয়ার। ধীরজু বলেছে, একবার কাজ করতে করতে কোন এক কুলি অসাবধানে ওর গায়ে হাত দিয়ে ফেলে। লালমোতিয়া তাকে ক্ষমা করেনি। হাতের শাবল তুলে তার মাথায় বসিয়ে দিয়েছে। তারপর সে অনেক থানা-পুলিশের ব্যাপার। খাদে লক আাউট হয়ে যায় এমনি অবস্থা। শেষে বাবা অনেক চেষ্টায় পুলিশকে খুশি করে তবে কাজ চালু রাখতে পেরেছে। গত বছরের কথা।

খাদে যখনি নাবি লালমোতিয়া যেখানেই থাকুক আমার যেন গন্ধ পায়। মাথার ঝুড়ি যেখানে-সেখানে ফেলে ছুটে আসে। চোখে চোখ পড়লেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চোখে চোখে হেসে ওঠে। একদিন বলেছিলুম : মুখে অমন করে আঁচল চাপা না দিয়ে হাসতে পারিস না লালমোতিয়া ?

: ও বলেছিল : শরম লাগে, তুই যে বটেক ছোট সরকার।

: তা যাই হই না কেন, তুই মুখে আঁচল দিবিনে।

বলতে বলতে জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে আঁচল ফেলে দিয়েছি। ওর ঠোঁটে হাতের ছোঁয়া লেগেছে। লাল ঠোঁট। ভিজে ভিজে অদ্ভুত উত্তাপ। গভীর কালো চোখ ঘুরিয়ে ও বলেছে : ই ছোট সরকার, তুই ভারী জংলী আছিস্। পাখী মারবার বেলায় তো পারিস না, বন্দুক টিপ করে আবার গুলী খুলে লিস্। আর হামার সাথে ছেড় করবার বেলায় খুব চালাক।

লালমোতিয়ার অভিযোগের কারণ আছে। সেদিন প্রথম ওর সেই পাখির আড্ডা দেখতে গিয়ে যেখানে গিয়েছি সেটা এখান থেকে মাইল-খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে পরিত্যক্ত একটা খাদ। শাল কাঠে ঘেরা

ভাঙা-চোরা একটা হাজরি ঘর। এক পাশের কাঠ ভেঙে হারিয়ে গেছে কোথায়। জংলী আগাছা আর ছোট ছোট শিশু পাহাড়ে জায়গাটা আরো নিরিবিলি, আরো বিচ্ছিন্ন। একটা বনমুরগী দেখিয়ে লালমোতিয়া বলেছে: উই দ্যাখ্ ছোট সরকার, ছেড়ে দে গুলী।

গুলী ছাড়া হয়নি আমার। লালমোতিয়ার চোখে ছেড়েছি আমার চোখের বাণ। নিজেই বুঝিনি। আমার চোখের সে ভাষা আমিই বুঝিনি। লালমোতিয়া বুঝেছিল। পলকে ওর পরিবর্তন দেখে অবাক হয়েছি। মুখ ওর হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কেঁপে উঠেছে। দিঘী গভীর দু'টো চোখে ফুটে উঠেছে রাজ্যের শঙ্কা। আমি হেসে ফেলেছি। আবার বন্দুক তুলে ওর বুক বরাবর ব্যারেল উঁচিয়ে শুধু বলেছি: এবার তোকেই গুলী করি, কি বল্?

লালমোতিয়া এতক্ষণে হেসে উঠেছে আবার, বলেছে: ছোট সরকার, তুই খুব ভাল, তুকে আমার ভাল লাগে।

আবেগ-কম্পিত স্বরে আমি বলেছি: লালমোতিয়া, তোকে আমার আরো ভাল লাগে। তুই দূরে সরে যাস্ কেন, কাছে আয়।

ধীর মন্থর পায়ে ও আমার বুক বরাবর এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে গভীর করে আমার চোখে চোখ রেখেছে। একটু হেসে, আবার চোখ বুঁজে নিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই দু'হাতে ওকে বুকে পিষে ফেলেছি। আমার বাহুবন্ধনে ওর তপ্ত পালক-নরম বুক নিঃশেষে হারিয়ে গেছে আমাতে।

বিকেলি চা-এর সময় তখনো বাকী। লু'য়ের ভয়ে সারাদিন দরজা-জানালা এঁটে বসে থেকে ঘরটা যতটুকু ভেপসে উঠেছে আমার মনটা তারচে' অনেক বেশী হাঁপিয়ে উঠেছে। মকাই ক্ষেত পাশ কাটিয়ে ঝিরঝিরে নদীর ক্যালভাটে গিয়ে বসেছি। ক'টা জোলা ছেলে জলে নেবে মাছ ধরছে। জলের একটু ওপরে ছোট গর্ত খুঁজে বের করে তুমুল উচ্ছ্বাসে হাতের ছোট লাঠি ঢুকিয়ে খানিকটে নাড়া দিয়ে লাঠি বের করে নেয়। পরক্ষণেই সাঁ করে কি একটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে। ওরা সবাই সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতক্ষণের মধ্যে সবাই মাছের হাঁসুলি গেঁথে একেকজনা একেক দিকে চলে যায়। নিঃশব্দে দেখছিলুম। একটু দূরে ক'টা বটগাছে সন্ধ্যা নাবছে ধীর পায়ে। ওপরের ডালে সূর্যাস্তের শেষ আভা

তখনো ছায়া-ছায়া হয়ে ওঠেনি। আবছায়ার মাঝে মাঝে সাদা সাদা রেখার বিনুনি। হঠাৎ দেখি একটা ছায়া-শরীর দাঁড়িয়ে আছে নদীর অপর তীরে। আমার দৃষ্টিপথ ধরেই সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে। হাঁটুপানি ভেঙে ও এগিয়ে আসে। কাছে আসার আগেই ওর চলার ছন্দে চিনতে কষ্ট হয়নি। আমিও এগিয়ে গেছি। অবাক হয়ে বলেছি: তুই এখানে?

: কেনে তাতে কি?

এটুকু বলেই লালমোতিয়া নির্বাক চেয়ে রইল আমার দিকে। দু'জনেই নির্বাক। সাঁঝের বাতাসে তখন ঝিরঝিরে ঠাণ্ডার আবেশ। দূরে পাহাড়ে সবে আগুন লাগতে শুরু হয়েছে। এখনো আকাশ-দিগন্ত জ্বলে ওঠেনি। লালমোতিয়ার হাত ধরে কাছে বসালুম। বললুম: তুই কি করে জানলি আমি এখানে?

: তোর ডেরায় তো গেইলাম।

লালমোতিয়ার সাহস তো বড় কম নয়। কি জানি কেন মনটা একটু রুষ্ট হয়ে উঠল। কথায় উত্তাপ এনে বললুম: শরম নেই তোর। ভয় করল না?

: কেনে, ভয় কিসের?

: কিন্তু কেন গিছলি তাই বল্।

: সে কথা আর বুলবো না। ছোট সরকার হামার উপর রাগ করেছিস্।

ওর কথায় এবার হাসি পেল। হাসলুম ওর অতি কুণ্ঠিত মুখ নীচু করা ভঙ্গী দেখে। কালো শাড়ীর বাইরে ওর মুখ আর হাত দু'টো শুধু দেখা যায়। অদ্ভুত মসৃণ। মাথার চুল শুকনো এলোমেলো হয়ে কপালে, মুখে লুটিয়ে আছে। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বসলুম।

নিজের রূঢ় ব্যবহারে নিজেই লজ্জায় মরে গেলুম। ওকে কাছে টেনে নিয়ে সন্ধ্যের আকাশে আবছায়ার মত শুধু একবার বললুম: লালমোতিয়া!

লালমোতিয়া কোন সাড়া দিল না। শুধু আমার বুকে মুখ ঘষতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ও বললে: জানিস ছোট সরকার, হামরা কাল থাদে কাজ বন্ধ করে দিব। বাপু বি ঠিক করেছে ফ্যাক্টরির কাজ বন্ধ হবে উই সময়ে।

স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: কেন? তোরা হঠাৎ একাজ করতে যাচ্ছিস কেন?

: করবে না? হামরা তো এক মাহিনা আগে বড় সরকারকে রোজ-মজুরী বাঢ়াতে বুলেছি। উ বড় সরকার আজ বলিয়েছে যে, মজুরি বাঢ়বে না।

অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠল। কি বলব ঠিক করতে পারলুম না। লালমোতিয়া আমার মুখের কাছে মুখ এনে শুধু ঘুম ঘুম সুরে বলল: তুই বড়া সরকারকে বুলবি না?

: কি বলব?

: কেনে কুলিকামিনদের রোজ-মজুরি বাঢ়াতে বুলবি?

লালমোতিয়ার জন্যে সহানুভূতি হল। নিজের অসহায়তায় নিজেকে অনেক ছোট মনে হল। চারদিক আঁধার। পায়ের কাছে নদীর সাদা ফিতে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পাহাড়ের ওধারে কোথায় যেন আগুনের আভা। নিঃশব্দে বসে রইলুম। দূরে পাঁড়ে টাঁড়ে টিমটিমে ক'টা আলো। ঝিরঝিরে হাওয়া। শুধু বসে রইলুম আরো কতক্ষণ। লালমোতিয়ার স্পর্শে চমক ভাঙল, সে বলল: ছোট সরকার, হামি এখন যাই।

: আচ্ছা যা, কাল খাদে দেখা হবে আবার।

: দেখা হোবে!

ওর বিষাদঘন কথা কান্নার মত শোনাল। ও উঠে দাঁড়াতেই দূরের টিম-টিমে ক'টা আলো আড়াল হয়ে গেল। তারপর আবার তাদের ছিটান মিহি রেখা চোখে এসে বিঁধতে লাগল। হঠাৎ পাশেই কার পায়ের শব্দ। ছায়া-কালো মূর্তি। সামনে আসতেই চিনলুম ধীরজুকে। অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলল: ছোট সাহেব, আপনাকে সাহেব ডেকেছেন।

: আমি এখানে তুমি কি করে বুঝলে?

: বিনয়ে গলে গিয়ে ধীরজু বললে: হুজুর আপনাকে অনেক ঢুঁড়ে তবে এখানে এসেছি।

কথা শেষ করে ধীরজু একটুক্ষণ থামল। তারপর সামনে দূরত্ব বজায় রেখে বসে পড়ে বলল: লালমোতিয়া, হারামজাদী এখানে এসেছিল কেন হুজুর?

রাগে গা জ্বলে উঠল। কানের পাশে রগছুটো ঝিম ঝিম করে উঠল। বললুম কি গর্জন করে উঠলুম নিজেই জানিনে: তোর তাতে মাথাব্যথা কেন? তোকে কি আমি কৈফিয়ৎ দেব?

ধীরজু এতটা বোধ হয় আশা করেনি। মিইয়ে গিয়ে বলল : না হুজুর, দেখলুম কিনা ওকে তাই। ওই ছোঁয়ড়ি কোম্পানীর ক্ষতি করতে চায়।

: চুপ কর্ বেকুব।

: ঠাস্ করে ওর গালে একটা চড় কসিয়ে দিলুম। সম্বিৎ ফিরে এলে মনে হল এতটা না করলেও চলত। ধীরজু ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে গেল। আমিও উঠলুম। চলতে চলতে পেছনে কিসের যেন একটা শব্দ হল। দাঁতে দাঁত ঘষার মত কড় কড় শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে শুধোলুম : কি ওরকম শব্দ করলি কেন ?

: কই না হুজুর। বোধ হয় শুকনো পাতায় পা দিয়েছি।

রাত আটটা নটায় খবর এল খাদে সবাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা নিজে ছুটল ধীরজুকে সঙ্গে নিয়ে। অনেক রাতে বাবা ফিরে এসেছে ব্যর্থ হয়ে। ধীরজ্ খাদেই রয়ে গেছে ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে কাজে রাজী করাতে।

রাতের আঁধার তখনো কাটেনি ভাল করে। ক্ষিপ্রগতিতে তৈরী হয়ে নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, বাবা সুমুখে এসে দাঁড়াল কোথা থেকে যেন আচমকা। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল : এত রাতে কোথা যাচ্ছিস ?

: খাদে যাব।

: না, গিয়ে কাজ নেই।

: কেন ?

: খাদে গোলমাল হচ্ছে।

বাবার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে ডিনামাইট ফাটার গম্ভীর গর্জন উঠল। সে শব্দ কান খাড়া করে শুনে বাবা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পথ ছেড়ে দিয়ে বললে : যাবি যা, খুব সাবধানে থাকিস্। আমার মনে হয় গোলমাল মিটে গেছে, ধীরজুটা সত্যিই কাজের লোক। আমার এতটুকু ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে ওর খুব নজর।

খালাকৃতম্বী পৌঁছুতে পারিনি। পথেই ধীরজুর সঙ্গে দেখা। বিচলিত স্বরে ও বলল : হুজুর যাবেন না এখন। খাদে আক্সিডেন্ট হয়ে গেছে।

বেলা বাড়তে আপিসে ফিরে এসেছি। আরো অনেক লোক খাদ থেকে এসেছে। কুঞ্জো মিশিরজীও দাঁড়িয়ে আছে মলিন মুখে। চোখ লাল। মুখ

ফোলা ফোলা। সকলেই কথা বলতে চায় একসাথে। ভীষণ গোলমাল। বাবা এসে পৌঁছতেই সব চুপচাপ হয়ে গেল। রামখেলাওন বাবাকে সালাম করে জানাল দুঃসংবাদ। খাদে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। বাবার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠতেই কুঞ্জো মিশিরজী আচমকা বাবার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ভাঙ্গা গলায় ও যা বলল সে কথা আমার কানে অসম্ভব শোনাল। বুকের ভেতরটা কি জানি কেন অকারণেই যেন মুচড়ে উঠল। গলা দিয়ে শব্দ বের করে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারলুম না। শুধু মনে হল এ হতে পারে না। এ হওয়া সম্ভব নয়। ও বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। লালমোতিয়া নেই। ডিনামাইট ফেটে পাথর ধ্বসে চাপা পড়ে মারা গেছে। ভোর রাতে।

আপিসের আশপাশে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে অদ্ভুত থমথমে। বাবা তার রুমে বসে আছে। কারু সাথে কথা বলবারও প্রয়োজন যেন শেষ হয়েছে। সবাই মর্মাহত। শুধু একটি লোক নিজের মনেই বারান্দায় বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খৈনি টিপছে। সে ধীরজু, বাবার বিশ্বাসী সহচর। হঠাৎ আপিসের সবাইকে চমকে দিয়ে রামখেলাওন হন্তদন্ত হয়ে বাবার রুমে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে দুজনাই বাইরে বেরিয়ে এল। বাবার মুখ কাগজের মত সাদা। আগুনের মত চোখ দুটো জ্বলছে। বেরিয়েই বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল : ধীরজু!

: হু-জু-র।

সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি তুলে সে সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

কোডার্মার সবচে' ভাল মানুষ, সবচে' ঠাণ্ডা মেজাজী মাইকা ম্যাগনেট বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল : শয়তান কোথাকার! ওয়ার্নিং না দিয়ে তুই ডিনা-মাইট ফাটাবার ক'মিনিট আগে লালমোতিয়াকে নীচে পাঠিয়েছিলি? কেন, কেন একাজ করলি? রাগে উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

ধীরজু কাঁপতে কাঁপতে কি বলতে গিয়ে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওর অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে শুধু শোনা গেল : কাস্টরি, খাদ কুথাও কাজ বন্ধ করতে দিইনি হুজুর।

স্বর্গ-সিঁড়ির কয়েক ধাপ

আনিস চৌধুরী

ব্যাপারটা অভাবনীয়। সানফ্রান্সিসকোগামী তিনশ দু'নম্বর ফ্লাইটের যে প্লেন বিধ্বস্ত হল, তাতে দু'জন ছাড়া কেউ বাঁচল না। নিউইয়র্ক থেকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন শেষে ফিরছিল পঁয়ত্রিশ জন ডেলিগেট সেই চার্টার প্লেনে। কি হয়েছিল, সেটা প্রত্যক্ষদর্শীরাও বলতে পারে না। শুধু একটা বিস্ফোরণ, বিকট আওয়াজ। তারপর যা ঘটার ঘটে গেল।

দুর্ঘটনা ঘটল সানফ্রান্সিসকোর মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। খবর পেয়ে সাহায্যকারী দল ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে। ষ্ট্রেচারে করে যাদের নামানো হল তাদের একজন প্রখ্যাত লেখক আবু শওকৎ। আরেকজন বছর কয়েকের একটি মেয়ে মেলিনা।

চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। কাছাকাছি হাসপাতালে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। কেবলি যখন প্রথম চোখ খুললেন আবু শওকৎ, বোঝা গেল এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। আরও কিছুকালের জন্য তিনি নিশ্চিন্ত। আশ্চর্য, বয়েসে অনেক কম, অনেক স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে ছিল। তারা কেউ বাঁচল না। তিনি বাঁচলেন। এবং বিচিত্র উপায়ে। প্রায় ধ্বংসাবশেষের মুখ থেকে একজন জীবন তুচ্ছ করে তাঁকে এবং ঐ মেয়েটিকে বাঁচাল। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে খবরও কম রাষ্ট্র হয়নি। পরের দিন নিজেই দেখেছেন সেখানকার কাগজে। প্রাচ্যের একজন সেরা লেখকের অবশ্য মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার খবর। রেডিও টেলিভিশনেও উল্লেখিত হয়েছেন, যদিও তাঁর নামের ঘোষণা কিছুটা উচ্চারণ-দুষ্ট হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। আশাই করতে পারেননি, তাঁকে দেখবার জন্য একটা ছোট-খাট ভিড় জমে যাবে। ছবি উঠবে। সাংবাদিকরা অহরহ ঘিরে রাখবে।

অসুস্থ ছিলেন। ছিলেন খুবই ক্লান্ত। তবু আধো আধো ভাঙ্গা ভাঙ্গা যা বললেন তারা গোগ্রাসে তা লিখে নিল।

তারা চলে গেলে এক সময় হাল্কা নীল আলো জ্বালিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বোধ হয় দেশে তাঁর খবর পৌঁচেছে। হয়ত উদ্বিগ্ন টেলিগ্রাম আসবে। চিঠি আসবে ভুরি ভুরি তাঁর কুশল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে।

আসলে আগাগোড়া ব্যাপারটাই আবু শওকৎ-এর কাছে কেমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে অতগুলো লোককে মেরে ফেলার মধ্যে নিয়তির কি দুজ্ঞে'য় বিধান থাকতে পারে, জানেন না।

নাকি, তাঁকে দিয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করান হবে। সাহিত্যের আরও কিছু কি জয়মাল্য জুটবে তাঁর ভাগ্যে। অনেক তো করেছেন। আর কি নতুন করবেন।

সম্মেলন· সেমিনারের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য-কীর্তির পরোক্ষ স্বীকৃতি না থাকলে, বাস্তব সাহিত্যের জগৎ থেকে তিনি তো অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। ডান হাতখানা টন্ টন্ করছে। দুর্ঘটনায় কেমন করে ব্যথা পেয়েছিলেন মনে নেই। এখনও ব্যাণ্ডেজ করা। না কি, সারা জীবনের জন্য অকর্মণ্য হয়ে গেলেন। যদি তা হয়ও, অন্তত একটা অজুহাত থাকবে। অক্ষমতার দোহাই দেবেন। আক্ষেপ হবে না।

তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ে। লক্ষ্য করেননি কখন এসব এলোমেলো ভাবনায় রাত ভোর করে ফেলেছেন। হাল্কা করে দরজা খুলে নার্স তাঁর বিছানার পাশে একটি তাজা ফুলের তোড়া রেখে গেল। নরম, কাঁচা সোনা রং আলোয় ভরে দিল ঘর, পরদা টেনে দিয়ে। এসেছে কফি। আর অন্য ট্রেতে কিছু চিঠিপত্র। দেশের প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারী তাঁর আরোগ্য কামনা করে তার পাঠিয়েছেন। স্থানীয় লেখক সংঘের তরফ থেকে কে এক মি: জোন্‌স পাঠিয়েছেন শুভেচ্ছা বাণী। হাসপাতালে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চেয়েছেন বিমান কোম্পানীর পারসোন্যাল ম্যানেজার। সধুম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মনে হয়েছে, আর যাই হোক দেশে তাঁর এমন কদর ছিল না। কোনকালে হতও কিনা সন্দেহ। মনে আছে, সম্মেলনে আসার আগে তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য বিমান বন্দরে তেমন কেউ আসেনি। তাদের দেশে যাচ্ছেন বলে বৈদেশিক দুতাবাসের কিছু লোকজন ছাড়া। আজ দেশ থেকে সহস্র যোজন দূরে হাসপাতালের নরম, শুভ্র, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবছেন, কি বলবেন।

নানা লোক তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। একটু চলাফেরার মত অবস্থা হলে তাঁর সম্মানে কিছু রিসেপশন, ভোজসভার ব্যবস্থা হবে, সে রকম আভাসও পেয়েছেন। বুঝতে পারছেন না, এটা কি তাঁর বিখ্যাত হওয়ার স্বীকৃতি, না দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার নিছক গৌরব।

আজকে ভিজিটারদের মধ্যে হোমরা-চোমরা কেউ নেই। ক'জন এসেছে নিছক খবরের কাগজে তাঁর নাম পড়েই। কতক্ষণ হাঁ করে থেকেছে। তারপর চলে গেছে। একযুগ ধরে বসবাস করছে তাঁর স্বদেশীয়, এমন কয়েকজনও এসেছে দেখা করতে। বলা বাহুল্য, তারা তাঁর সাহিত্যের অবদানের কথা জানে না। কোনদিন তাঁর বই পড়েনি। তবু স্ব-ভাষাভাষী বলেই এসেছে। হৃদয়ের তাড়নায়। এদের একজন, চামড়ার ব্যবসায়ী, সুবিবেচকের মত তাঁর দিকে সুদৃশ্য কাগজে মোড়া একখানা প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে, আপনার জন্য একটা পার্স নিয়ে এলাম স্যার।

সন্ধ্যের দিকে, দরজা ঠেলে আসে একটি মেয়ে। বলা বাহুল্য তাঁর স্বদেশীয় মেয়ের দেখা পেয়ে তিনি রীতিমত পুলকিত। তা হলে যা ভেবে-ছিলেন তা নয়। তাঁর সুনাম আর সুখ্যাতি আজ দূর দুরান্তে ছড়িয়ে। নইলে বিদেশ বিভুঁয়ে এ মেয়েটি তাঁকে মনে করে দেখতে আসবে কেন। তবু তিনি কিছুটা ঔদাসীন্য আর কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালেন।

মেয়েটিকে বসতে বললেন না। শুধু বললেন, আমি ভক্তদের জ্বালায় অস্থির।

নিজের কানকে যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারেন না আবু শওকৎ। শুনলেন, মেয়েটি বলছে, আমি আপনার ভক্ত নই।

পরবর্তী যে প্রশ্নটি করা উচিত ছিল, তাই করলেন। বললেন, তাহলে এলেন কেন?

মেয়েটি নড়েচড়ে বসল। আবু শওকৎ একনজর দেখে নিলেন তাকে। তার গল্পে উপন্যাসে যে ধরনের মেয়েদের বর্ণনা দিতে গিয়ে অনেক অযাচিত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তাদের তুলনায় মেয়েটি কিছু ফেলনা নয়। কেমন ঝলমলে চটপটে চেহারা। তবে অমন কটকট করে তাঁর দিকে না তাকিয়ে থেকে, হাসি খুশিতে উচ্ছল হলেই যেন মানাত। তার দৃষ্টিতে কেমন একটা শীতল রূঢ়তা, কেমন নিষ্ঠুর ক্ষমাহীনতা। মেয়েটি বলল, আমি মনস্তত্ত্বে ডক্টরেট করছি এখানে। সাহিত্যের সঙ্গে একটু আধটু

সম্পর্ক নেই তা নয়। ভাবছিলাম এতগুলো অমূল্যপ্রাণ গিয়ে আপনি কেমন করে বেঁচে গেলেন।

আবু শওকৎ কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর অভিমান হল। তিনি অপমানিত বোধ করলেন।

মেয়েটি আবার বলল, আপনাদের দলে ইউজিন পীয়ের ছিলেন না?

আবু শওকৎ এক মুহূর্ত চমকে ওঠেন। যেন এ নামটি কারো মুখে উচ্চারিত হবে আশা করেননি। তবু মাথা হেলিয়ে জবাব দেন, হ্যাঁ ছিলেন।

মেয়েটি বলল, আমি তাঁর বই পড়েছি। তাঁর কথা জানতে এসেছিলাম। আপনার লেখায়, কিছু মনে করবেন না, তাঁর মত গভীরতা নেই।

চোখ ছোট করে দূরবীনে অনেক দূরে দেখার মত কাছে বসা মেয়েটিকে আরেকবার লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন রাগ করবেন। উঠে যেতে বলবেন। অন্তত এটুকুত স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন, তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় এ ধরনের সমালোচনা তিনি শুনতে রাজি নন। ইউজিন পীয়ের বিখ্যাত হতে পারে। কিন্তু তাঁর মত তিনিও একজন আমন্ত্রিত অতিথি। অনেক সম্মানে ভূষিত। এ যাবৎ তাঁর সুখ্যাতি করে বিভিন্ন বক্তা যা যা বলেছেন তাঁর সঙ্গে, দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলো প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েছে। তা না হলে মেয়েটিকে বুঝিয়ে বলা যেত, নিছকই তিনি শয্যাশায়ী তাই তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ মিলছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটির দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল। যেন চোখ তুলে নিতে পারলেন না। তাঁর লেখার সমালোচনার জন্যে নয়। ইউজিনের কথা জিজ্ঞেস করে মেয়েটি যেন তাঁর মনের গভীরতায় একটি দুরু দুরু সন্দেহের পরদা আন্দোলিত করতে চেয়েছে। পঁয়ত্রিশ জনের যে কোন কারও নাম উল্লেখ করতে পারত। সেখানেও আরো সেরা লেখক শিল্পী ছিল। তাহলে, তাহলে সত্যি কি মেয়েটি তাকে সন্দেহ করে।

এক সময় লক্ষ্য করলেন আরও কিছু দর্শনপ্রার্থী তাঁকে ঘিরে। তাদের একজন অটগ্রাফ চাইল। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে তাকে বিদায় দিলেন।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। বলল, আজ আসি। পারলে আরেকদিন আসব।

মেয়েটি আর আসেনি।

হাসপাতালে রোজই অভ্যাগতদের ভিড়। রোজই তার আকুল দৃষ্টি সেই ক্ষুরধার-দৃষ্টি মেয়েটিকে খুঁজে বেড়ায়। একান্তে পেলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতেন, মেয়েটির কি তাঁর প্রতি আক্রোশ ছিল। আবার ভাবেন, তিনি হঠাৎ একটি অযাচিত মন্তব্যে এত বিচলিতই বা হচ্ছেন কেন। গোড়ায় জীবনে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রতিষ্ঠা তাঁর একদিনে আসেনি। দেশের লোকেরা তাঁকে চেনে, জানে। তাঁর লেখার ওপরে আলোচনা হয় ক্লাশে। কিছু নোটও বেরিয়েছে। কিছুদিন আগে দেশে থাকতে নিজেই দেখে এসেছেন বি. এ. ক্লাশে তাঁর বহুল আলোচিত 'একদা রজনী' বই-এর ওপর প্রশ্ন এসেছিল। দিব্য কল্পনা করতে পারেন, তাঁর দু'চারখানা বই তরুণ-তরুণীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। অন্যকে পড়ে শোনায়। আণ্ডার-লাইন করে। গত সাত বছর ধরে তেমন লেখেননি। শুধু সেমিনার আর সম্মেলন করে আসছেন। সুবক্তা, মিষ্টভাষী, পণ্ডিতজন বলে তাঁর সুখ্যাতি। সব আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এইত সেবার তাঁর ডাক পড়েছিল মাদ্রাজে। দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন। এবার এসেছিলেন এক সঙ্গে তিনটে সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে। নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো এবং জেনেভায়। এখনও অনেক আমন্ত্রণ আছে। অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে। ডিসেম্বরে নাইরোবিতে।

তাঁর এই সাফল্যের জন্য অনেকে ঈর্ষা করে। কিন্তু বোঝেনা, এক সময় মাত্র পঁচিশ টাকায় তিনি তার পাণ্ডুলিপি বিক্রি করেছেন। আজ বাজারে তাঁর হাঁকডাক। তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য লোকের ভিড়।

রাত ঘনিয়ে আসছে। অতল গভীরে তলিয়ে যেতে থাকেন আবু শওকৎ। হাসপাতাল নীরব। ধারে কাছে কারও গলার শব্দ শোনা যায় না। একটা ফিকে নীলাভ আলো জ্বলছে কেবিনে। কি যেন মনে করে জানালার পরদাটা একটু সরিয়ে দেন। কাচের স্পর্শ পেলেন। তুহীন শীতল মৃত্যুর মত। তার ভয় লাগল। চেয়ে দেখলেন জানালার বাইরে ইউক্যালিপ্টাস পাইন গাছের সারি। ডালগুলো বরফে ছেয়ে। বাইরে এককণা ঘাস দেখা যায় না। হাড়-কাঁপানো শীতল বরফের প্রলেপ। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পরদাটা টেনে দিলেন আবার। না, ভেতরটাই বেশ। আরামদায়ক গরম। তাঁর ডান হাতটা টন্ টন্ করছে ব্যথায়।

আবার তক্ষুণি তাকে পেয়ে বসে সে একই ভাবনা। ইউজিন, ইউজিন।

হ্যাঁ প্লেনে তাঁরা একসঙ্গেই ছিলেন। একই সারিতে বসেছিলেন। ইউজিন, তাঁর ছোট মেয়ে মেলিনা আর স্বয়ং তিনি। আগেই জেনেছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ইউজিন। নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বই। যদিও কথা বলেন কম, তবু সদালাপী।

অবশ্য ঐ প্লেনে ইউজিন ছাড়াও আরও অনেকেই ছিল। তাদের সবাইকে ভাল করে চেনেন না। একবার দু'বার অভিবাদন বিনিময় হয়েছে মাত্র।

ইউজিনকে চেনবার আরও বিশেষ কারণ তাঁর সঙ্গের সেই ফুটফুটে মেয়েটি, বহুকষ্টে জিজ্ঞেস করেও যার নামটি জানতে পারেননি। সুয়েডিস ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না। তাই ইউজিন মেলিনার নাম বলে দিয়েছিল।

তিনি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন? নাত। একটা পুরো রাত কাবার করেছেন। এখন মোটামুটি ভাল লাগছে। তাঁর চঞ্চল স্নায়ু দু'দিনের পরিচর্যায় যেন অনেকটা তৃপ্ত, শান্ত। চেয়ে দেখেন একদল সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে। চৌত্রিশ জনের বাকিদের কপালে যা জোটেনি। শুধু অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন বলেই কি তাঁর এত কদর। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছে আট ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া চলবে না।

বালিশ দুটো কাঁধের নিচে উঁচু করে দিয়ে গেল নার্স। তিনি প্রশ্নোত্তরের জন্যে তৈরি।

তারা জিজ্ঞেস করল, এই বিপর্যয়ের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর কি মন্তব্য।

মন্তব্য? অতি সাধু। উত্তম। বাঁচতে কেনা চায়! তবু তাঁকে ইনিয়ে বিনিয়ে টেনে টেনে বলতে হয়, নিজের বেঁচে যাওয়াকে আমি মোটেই গুরুত্ব দিইনা। আমার সহযাত্রীদের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে দুঃখভারাক্রান্ত।

বলে একটু থামলেন। খবরের কাগজের লোকেরা খস্‌খস্‌ করে তাঁর বক্তব্য লিখে নিচ্ছে। অভিজ্ঞতায় জানেন এ ধরনের মন্তব্যই জনসাধারণের কাছে হৃদয়গ্রাহী। অগণিত পাঠক-পাঠিকা কাল খবরের কাগজ পড়ে তাঁর উদারচিত্ত মনোভাবের জন্য কৃতজ্ঞতায় ভেঙ্গে পড়বে। মহানুভবতার জন্য সাধুবাদ দেবে। আবার প্রশ্ন: এ্যাকসিডেন্টের সময় আপনি কি কিছু 'ফিল' করেছিলেন?

না। আমি মৃত্যুর জন্য বরাবরই তৈরি।

এবার এল সে প্রশ্নটি, যে প্রশ্নটিকে অন্তর থেকে ভয় করে আসছেন। এড়াতে চাইছেন। তাঁর সহযাত্রী ইউজিনের কথা।

ইউজিনের খ্যাতির কিছুটা নমুনা তিনি নিউইয়র্ক থাকতেও পেয়েছিলেন। একাধিকবার এই লেখকের সম্মানে সভা-সমিতি হয়েছে। হয়েছে ভোজসভা। অবশ্যি সেগুলোতে তিনিও আমন্ত্রিত হয়েছেন।

জানেন না, চেনেন না, কোনদিন আর জানবার সুযোগ হবেনা, তবু এই লোকটিকে মনে মনে ঈর্ষা না করে পারেননি। প্লেনে ভদ্রলোক বহুবার তাঁকে সিগ্রেট দিয়েছে। অথচ তিনি তাঁর মেয়ে মেলিনাকে একটা চকলেটও কিনে দেননি। ইউজিন তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে সুইডেনে। নিজের লেখা একটা বইও দিয়েছে। তাঁর কাছে কলম চেয়ে নিয়ে সই করেছে নিজের নাম। বিনিময়ে আবু শওকৎ একটি ম্লান, নিষ্প্রাণ, 'থ্যাঙ্ক ইউ' ছাড়া আর কিছু বলবার মত খুঁজে পাননি।

দুর্ঘটনার কথা কাগজে পড়েছেন, রেডিওতে শুনেছেন। নিজে কখনও পড়বেন ভাবেননি। প্লেনটা এক সময় ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে যখন দ্রুত নামতে শুরু করেছে, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। একটা ইঞ্জিনে তখন দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। বাঁচার কোন আশা নেই।

তারপর এক সময়ে প্রচণ্ড বীভৎসতায় সমস্ত আকাশটাই ভেঙ্গে পড়ে যেন। চারদিকে ঝলসানো আগুন। আর সে আগুনের উত্তাল সমুদ্রে জীবন-মৃত্যুর একটা ক্ষীণ তটরেখায় থেকে বার বার অসহায়ের মত তাঁর একখানা হাত আন্দোলিত। চারদিকে আর্তনাদ। লেলিহান শিখা বিপুল আক্রোশে গ্রাস করে চলেছে তাঁদের। তখনও চৈতন্য হারাননি। আশ্চর্য, সে সময়ই দেখলেন দরজা ভেঙ্গে কে ঢুকল। অসহায়, হতবাক, ভীত-সন্ত্রস্ত মেলিনাকে কোলে তুলে নিল। তারপরই এল তাঁর দিকে। কি যেন ভারি একটা তাঁর দেহের ওপরটা অসাড় করে রেখেছিল। তবু এত আসুরিক শক্তি কোথায় পেলেন জানেন না। ঠেলে বেরিয়ে এলেন। আগুনে ঝলসে অনেকখানি পুড়েছে, বিশেষ করে তাঁর ডান হাতখানা। অথচ ঐ নিদারুণ অবস্থায় দেখলেন মেলিনা স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে। ইউজিনের দিকে। প্লেনের ওপরের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে পড়ে আছে তার দেহের ওপর।

অসাড়ের মত পড়ে ইউজিন। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যেন মেলিনার দিকে কাতর দৃষ্টি দিয়ে আকুতি জানিয়ে বলছে, মেলিনা সেভ মি। সেভ মি।

মেয়েটি বার বার আবু শওকৎ-এর শার্টের আস্তিন ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছে। বোধহয় ওদিকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। কিন্তু আবু শওকৎ জানেন, সহজে ইউজিনকে টেনে তোলা যাবে না। ততক্ষণ দেরি করলে তাঁর নিজের জীবনই বিপন্ন হবার আশঙ্কা।

উদ্ধারকারী ছেলেটি কেবিনের সামনের দিকে এগুবার চেষ্টা করল। পারল না। ফিরে এল তাঁর কাছে। মেলিনার কাছে।

সময় ছিল। তখনও তিনি বলতে পারতেন ইউজিনের কথা। যদিও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল না, হয়ত প্রাণস্পন্দন ছিল।

উদ্ধারকারী ছেলেটি তাঁদের সঙ্গে করে নেবে আসার আগের মুহূর্তেও আরেকবার জিজ্ঞেস করেছে, এনি মোর সারভাইভারস। আর কেউ বেঁচে নেই ত!

তিনি আরেকবার চেয়ে দেখলেন। ইউজিন কেমন অবচেতনের মত পড়ে। আশ্চর্য, সে অবস্থাতেও সে তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে; কি জানি, নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাড়না; না কোন অজ্ঞাত পৈশাচিক প্রতিহিংসা বোধ, কোনটা জানেন না, মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে জানালেন আবু শওকৎ, নো মোর সারভাইভারস।

কথাটা বলতে গিয়ে চোখ পড়েছিল মেলিনার দিকে। অতটুকু মেয়ে। কোন কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারে না। তবু কেন জানেন না, তবে তাঁর অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠেছিল। মেয়েটির কি তীক্ষ্ণ চাউনি। সে কি তাঁকে অপরাধির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোন গর্হিত অমানুষিক আচরণের জন্য দায়ী করছে। সে কি, চিরদিন তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার জলজ্যান্ত সাক্ষী হয়ে থাকবে। তা থাক। ততদিন তিনি, আবু শওকৎ, থাকবেন না। বেঁচে থাকবেন, অমর হয়ে থাকবেন শুধু তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য। মেলিনার মত নিষ্পাপ শিশু যারা নয়, তারাও ত কত কটাক্ষ করেছে তাঁকে। কি এসে গেছে তাতে। তিনি নিরাপদে বেঁচে আছেন। কিন্তু তবু মেলিনা, তাঁর দিকে অমন ভাবে চেয়ে কেন। তার চোখে কি কোন প্রতিহিংসার ধারাল ছুরি শানিত হচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে নেন তিনি। কিছুটা ঘেমে উঠেছেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হল এক ঘর সাংবাদিক তাঁর দিকে পুলকিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে। তারা তাঁর জবাব প্রত্যাশী।

জানা কথা, তারাও কোন কোন ভাবে সেই অনভিপ্রেত প্রসঙ্গ তুলবে। জানতে চাইবে তাঁর সহযাত্রীদের কথা। বিশেষ করে ইউজিনের কথা, যেটা কিনা তিনি নিজেই এক দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলেছেন একই সঙ্গে বসে ছিলেন তাঁরা।

কি বলবেন। জীবনে কত গল্প লিখেছেন, কত কাহিনী কত ঘটনা। কোন কোনটি অবশ্যি সত্য ঘটনাই ছিল। তবু সত্য বলে কেউ বিশ্বাস করেনি। তারা ভেবেছিল গল্পকার নিশ্চয়ই গল্প বলেন। জানেন তিনিও, জীবনের সত্য কাহিনী গল্পের মত হয় না। কিন্তু যদি কখনও হয়, তবু কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় না। যদিও তাঁর এক একবার প্রগাঢ় বাসনা হয়েছে যে অজস্র লেখার ফাঁকে তাঁর নিজের জীবনের যে নিদারুণ সত্যি কাহিনী ব্যক্ত করেছেন, লোকে তা বিশ্বাস করুক। সবই তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের অলস চিন্তা ছিল না। অন্য আর দশজনের মত অনেক টানা পোড়নের মধ্যে কেটেছে তাঁর জীবন। প্রেমের অলিগলি ঘুরেছেন। তাঁর চরিত্রে অনেক রীণা, মীনা, ডলি, বেবির কাহিনী আছে। সেগুলো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতারই তির্যক রসে দ্রবীভূত। তবু মানুষ সেগুলো নিছকই কাহিনী বলে ভ্রম করে।

অবশ্যি আজ তার মনে হয়, তেমনি জীবনের আবার অনেক সত্যকথা বলার তার সাহস হয়নি। তিনি চিরকাল আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকেছেন। থেকেছেন উত্তাপের গা বাঁচিয়ে। নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন আপন পরিমণ্ডলে। বাইরের জগতে কি ঘটল মাথা ঘামাননি তা নিয়ে। হয়ত দেখেছেন মানবতার চরম অবমাননা। দেখেছেন প্রতিবাদমুখর বিক্ষুব্ধ জনতা। দেখেছেন তারা সংগ্রাম করেছে, লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে। অথচ এতটুকু বিচলিত হননি। দিব্যি লনে দাঁড়িয়ে ক্রিসেনথেমামের টবে পানি ঢেলেছেন। বা কখনও জানালা বন্ধ করে বাইরের কোলাহল মুক্ত হয়ে, চোখ বুজে শুনেছেন আখতারি বাঈ-এর খেয়াল। কখনও কখনও যে তা সত্ত্বেও অস্বস্তি হয়নি, তা নয়। তবু জ্বলন্ত সূর্যের দিকে চোখ মেলার সাহস হয়নি। বরং জোৎস্না-শিহরিত রাতে একা বসে ভেবে দেখেছেন, তাঁর

অনুতপ্ত হবার কিছু নেই। তাঁর জীবনের ধারাটাই অন্যরকম। সাহসের, সত্যের সংগ্রামে কোনদিনই যেতে পারেননি এগিয়ে। জীবনের সঙ্গে আপোষ করে বাঁচতেই তিনি অভ্যস্ত।

তবু ইচ্ছে করলে তিনি হয়ত বাঁচাতে পারতেন মৃত্যুর জঠর থেকে তাঁর সহযাত্রীকে, সে চিন্তা থেকে থেকে কাঁটার মত খচ খচ করে ওঠে। কিন্তু সে মর্মপীড়না সাময়িক। তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-দর্শনের আলোকে তাঁর সাম্প্রতিক আচরণ দোষণীয় হয়নি ভেবে সান্ত্বনা পান। এভাবেই উঠতে হয়। একজনকে ডিঙ্গিয়ে। আর একজনকে টপকে। ভাগ্য আজ নিজেই প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে সাফল্যের সিংহদ্বারে। ইউজিনকে পাঠিয়েছে মৃত্যুর করাল গ্রাসে। তাঁর নিজের কিছু করবার নেই। এটা যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন জেতার মত। হলফ করে বলতে পারেন, আজ ইউজিন বেঁচে থাকলে এই অভ্যাগত আর সাংবাদিকের ভিড় সেই বিদেশী লেখককেই ঘিরে থাকত। তিনি হতেন ভিড়ের একজন। মনের সঙ্গে সামান্য প্রবঞ্চনা দ্বারা আর কিছুই করতে হয়নি তাঁকে এই গৌরব প্রাপ্তির জন্যে। সুতরাং যেমন চলছে চলুক।

হ্যাঁ তারা তাঁকে ঐ প্রশ্নটা করেছে। ইউজিন, ইউজিন সম্বন্ধে বলতে বলেছে।

যেন বেশ দক্ষ অভিনেতার মত গড় গড় করে বলে গেলেন আবু শওকৎ, আমি জীবন বিপন্ন করে বার বার চেষ্টা করেছি তাঁকে বাঁচাতে।

সেই সূত্র ধরেই একজন জিজ্ঞেস করে, নিজের জীবন তুচ্ছ করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন বোধ হয়।

আবু শওকৎ কিছু বললেন না। বিনয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর লক্ষ্য করলেন তাদের প্রতিক্রিয়া। তারপর বললেন, কর্তব্য পালনেই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম।

কে দূর থেকে আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ল, বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আপনি কি আনন্দিত?

কালবিলম্ব না করে জবাব দেন আবু শওকৎ, মোটেও আনন্দিত নই। তারপর গলা নামিয়ে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, ইউজিনের মৃত্যু আমাকে যারপর নেই অভিভূত করেছে।

আপনি কি জেনেভা সম্মেলনে যাবেন ?

রপ্ত করাই ছিল তাঁর জবাব। বলে গেলেন, এরকম মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে চৌত্রিশ জনের যখন কেউ বেঁচে নেই, ইউজিন বেঁচে নেই যাবার প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। কিন্তু কর্তব্যবোধের কাছে মানুষের অনুভূতি গৌণ।

তারপর আবার যেন কথার খেই হারিয়ে নিজেই ইউজিনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বলেন, একবার নয়, দু'দুবার গেলাম এগিয়ে। কিন্তু ইউজিনকে বাঁচাতে পারিনি। যদি আমার জায়গায় ও বেঁচে থাকত, সাহিত্যের সত্যিকার কল্যাণ হত।

ঠিক সে সময় যেন কাকে লক্ষ্য করে অস্বস্তির রেখা গাঢ় হয়ে ওঠে তাঁর চেহারায়। আজ এ-সময়ে কে ডেকেছে মেলিনাকে। অশুভ প্রেতাত্মার মত ইউজিন কি ঐ মেয়েটিকে ভর করে সেই থেকে তাঁর পিছু ধাওয়া করছে। তা নইলে, ঐ চোখ জোড়াকে তাঁর এত ভয় কেন। কেন মেয়েটির ক্ষুরধার দৃষ্টি তাঁর অন্তর ফুটো করে দিতে চায়। তাঁর সুন্দরসুলভ মানবিক কাহিনীর বানোয়াট দুর্গ ভেদ করতে চায় বার বার।

দেখলেন, অপলক দৃষ্টিতে মেলিনা তাঁর দিকে চেয়ে। কি ভাবছে কে জানে। পরমুহূর্তেই নিশ্চিন্ত হন। দৃষ্টির জ্বালায় জ্বালাতে চায় জ্বালাক। ও-ত তাঁর কথার বিন্দু-বিসর্গ বুঝছে না। এমনও হতে পারে, তিনি যা ভাবছেন মোটেও তা নয়। নিছক তার শিশুসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করার কারণেই মেয়েটির এমন লুব্ধ দৃষ্টি।

তা হোক। তবু তিনি মেলিনার চোখে ধরা পড়তে চান না। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন। জায়গায় জায়গায় সিলিং ফুঁড়ে থোক থোক আলো। এক সময় মনে হল এগুলো আলোকমালা নয়। ইউজিন আর মেলিনার অগুণিত চোখ। তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত। চোখ কেমন করে হাসে, কুটিল নিষ্ঠুরতায়, নিদারুণ কটাক্ষে, পরম পরিহাসে সেই দেখলেন প্রথম।

মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে এখনও সেই জ্বলন্ত প্লেনের কেবিনে তিনি। চারদিক দাউ দাউ আগুন। বাঁচবেন কি বাঁচবেন না। তাঁর জীবন-স্পন্দন স্তব্ধ। পরমুহূর্তেই মনে হল, এ সব কি আকাশকুসুম ভাবছেন। আগুনের মুখেই থাকবেন যদি, তবে গরম লাগছে না কেন। উত্তাপ নেই কেন। বরং

কেমন আরামদায়ক ঠাণ্ডাই লাগছে। তখনই বুঝলেন, তিনি স্থান কাল পাত্রের তফাৎটা বুঝতে পারেননি। আছেন, তিনি আছেন। তিনি 'গে লর্ডস' হোটেলের ন'শ বত্রিশ নম্বর স্যুটের লাউঞ্জে। তাঁর কথা শোনার জন্যে কৌতূহলী জনতার ভিড়। যা তার মুখ থেকে ফস্কে যাবে, তাই হবে কালকের কাগজের বলিষ্ঠ শিরোনামার খবর।

তবু মাথা সোজা রাখা যাচ্ছে না। ভীষণ ক্লান্তি, বেদনা ও শূন্যতার একটা জোয়ার ক্রমশ ঠেলে উঠছে তার শিরদাঁড়া বেয়ে। সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছে। যেন তিনি নিজেও! মাথাটা হেলিয়ে দেন পুরু কুশন আঁটা চেয়ারে। আর শুধু অস্ফুট উচ্চারণে ব্যক্ত করেন একটি আকুতি, আমার জন্যে একটা এস্পিরিন।

এরপর মনে নেই। চোখ বুজে থাকা সে ক'টি মুহূর্তের কথা মনে করতে পারবেন। তাঁর জীবন-অধ্যায় থেকে অবলুপ্ত কিছু মুহূর্ত। অন্য দশজন বলেছে, কিছু না। 'শ'কের জন্যে এমন হয়েছিল। হয়েও থাকে।

আর ভাল লাগছে না। তাঁর সাহিত্য-কীর্তির কথা আলোচনা না করে সবাই যেন তাকে কোন এক দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলনা, তার পরবর্তী বই-এর কথা, তাঁর জীবন-দর্শনের কথা।

চলে যাবেন বরং জেনেভাতেই। দেশে ফেরার আগে ক'টা বাড়তি দিন থেকে যাবেন সেখানে। তাঁর বিশ্বাস, তুষারাবৃত আদিগন্ত পাহাড় আর আকাশ-নীল হ্রদের দিকে মন ধাবিত করে পারবেন এই জ্বালাময়ী স্মৃতির ওপর একটা ক্ষীণ প্রলেপ দিতে। তারপর একদিন নিজেও ভুলে যাবেন সব। নতুন করে শুরু হবে জীবনের আরেক অধ্যায়।

তিনি উদ্যোক্তাদের ব্যাকুল হয়ে জানালেন, আমি কালই যেতে চাই।

তারা বিস্মিত এবং বিব্রত। তা হলে যোগ্য শিল্পীর যথাযোগ্য কদর হয়নি।

তারা জানাল, কাল হয় না। কালকের প্রোগ্রাম করা আছে। আপনার সম্বর্ধনা। পরশু বরং কোন ফ্লাইটে ব্যবস্থা করব আপনার ও মেলিনার।

আবার মেলিনা! মুখে কিছু বললেন না। তবু অনুভব করলেন এই ছয় বছরের শিশুটি কি তাকে গ্রে হাউণ্ডের মত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খেদিয়ে নিয়ে বেড়াবে। শান্তি দেবে না একদণ্ড।

উদ্যোক্তাদের একজন কি সে কথা আঁচ করতে পেরেছিল। তা না হলে গায়ে পড়ে বলতে যাবে কেন, জেনেভা থেকে মেলিনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে স্বদেশভূমি সুইডেনে।

মনে পড়ছে প্লেনে বসে ইউজিন বলেছিল, মাত্র দু'মাস আগে তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছিল। সেই থেকে মেয়েটিকে সে চোখের আড়াল করে না। নিজের কাছে আগলে রাখে যখের ধনের মত। মোট কথা, মেলিনা সঙ্গেই যাচ্ছে। তারা কি তার পাশের আসনেই বসতে দেবে তাকে, কি জানি।

সে যাই হোক, আরও একটি দিনের দুঃসহ প্রতীক্ষা।

অবশ্যি যতটা অস্বস্তি হবে ভেবেছিলেন, তা হয়নি। আয়োজন দেখে মনে হল, এমন সম্বর্ধনা আবু শওকৎ-এর জীবনে তেমন জোটেনি। সুযোগও হয়নি। দেশে থাকতে পেয়েছেন বড় জোর একটা মানপত্র। শুনেছেন কিছু চাটুবাক্য। তবু এস. ডি. ও'র চাইতে বড় মান্যজন মনে করেনি কেউ তাকে।

কিন্তু এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আসছেন। আসছেন এ যুগের সাড়া জাগানো 'আওয়ার এ ফ্রি ফ্লাগ' বই-এর লেখক। নোবেল পুলিটজার প্রাইজ প্রাপ্ত সাহিত্যিকরা। নিজে নোবেল প্রাইজ পাননি, হয়ত পাবেনও না। তবু এদের সান্নিধ্যে আসবেন। অবশ্যি তাঁরা আবু শওকৎকে দেখতে আসছেন না। সম্মেলনে আমন্ত্রিত বলেই আসছেন। সে যাই হোক। বাকি চৌত্রিশজন সহযাত্রীর অভাবে এখন তিনিই হবেন মধ্যমণি, কতকটা ভাগ্য জোরেই। একেই বলে নিয়তি।

এ হোটেলে এত বড় হলঘর ছিল, জানতেন না। সেখানেই সম্বর্ধনার ব্যবস্থা। বিশেষ রাজসিক কারণ ছাড়া এ হল ব্যবহার হয় না। দু'ধারে মখমলে মোড়া পুরু গদি আঁটা চেয়ার। দেয়ালে কার্পেট। নিছক বনিয়াদি ঢং-টাকে জিইয়ে রাখার কারণেই যেন ওপরে ঝাড়। তা না হলে এমনিতে আলোর অভাব নেই। ডায়াসে ওঠার সবটুকু পথ লাল কার্পেটে মোড়া।

দৃপ্ত পদভরে, একটা অজানিত উল্লাস আর সাফল্যের তৃপ্তি নিয়ে এসে অলংকৃত করলেন ডায়াসের সেই সুদৃশ্য আসনটি। যেটা কিনা এক মুহূর্ত মনে হল খ্যাতির ময়ূর সিংহাসনের মত। যেন খানিকটা অভিভূত হয়েই

পড়েন। তারপর এক সময় তাঁর দৃষ্টি স্থির হল গুণমুগ্ধ দর্শকদের প্রতি। একদৃষ্টে চেয়ে তারাও।

গোড়ায় নিহত সহযাত্রীদের জন্য দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হল। তারপর সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানসূচী।

গোড়াতেই ছিল পুষ্পতোড়া উপহার। সত্যি কথা বলতে পশ্চিমের এ রীতি তাঁর কাছে ভাল লাগে না। ইচ্ছে করলে তারা কি এ মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা সোনার মেডেল গড়িয়ে দিতে পারত না।

কিন্তু সে ভাবনার আমেজ কাটাতে না কাটাতেই বিস্ফারিত নয়নে যা দেখলেন, তাঁর সভাস্থল ত্যাগ করতে ইচ্ছে হল। আবার দেখলেন, ইউ-জিনের সেই ছোট্ট মেয়ে মেলিনাকে। কালো খাটো ফ্রক, কালো জুতা, পায়ে সাদা মোজা। আর তার সোনালী চুলে সদ্য প্রস্ফুটিত চাঁপার মত ফিকে হলুদ ফিতে। আস্তে আস্তে লঘু চরণে দেয়াল ঘড়ির মত টুকটাক্ শব্দ করে এগিয়ে আসছে। লাল কার্পেটের শেষ প্রান্ত থেকে। মেলিনার নিষ্পলক চোখ যেন তাকে আটকে রেখেছে। তার হাতেই ফুলের তোড়া। সেই তাকে দেবে নিজে থেকে তুলে।

উদ্যোক্তারা কি মেলিনা ছাড়া আর কাউকে পেল না। আজকের স্বত-স্ফূর্ত আনন্দের মুহূর্তটি এক নিমেষে তার কাছে কেমন বিভীষিকাময় মনে হল। ফুলের তোড়া হাতে নয়, যেন জল্লাদের ধারাল একটা ছুরি হাতেই সে এগিয়ে আসছে। যেন ঘাতক তার অব্যর্থ লক্ষ্যবস্তু পেয়েছে। মেলিনার বিষম দৃষ্টি সহ্য করতে পারছেন না আর আবু শওকৎ।

এই শেষ চালে হেরে যাবেন না। কখনই না। মনস্থির করে ফেলেছেন। সজল নয়নে গ্রহণ করবেন পুষ্পস্তবকটি। সস্নেহ আদর বুলিয়ে দেবেন তার গায়ে। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তিনি প্রতীক্ষা করছেন। মেলিনা আসছে। ডায়াসের প্রায় কাছাকাছি। ঘন ঘন ক্যামেরা ক্লিক করে ওঠে।

কিন্তু একি, থেমে পড়ল কেন মেলিনা। কেন তাকে চিরে চিরে দেখছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেটা খানিকক্ষণের জন্যেই।

ডায়াসের কাছাকাছি একটা দরজা, হলঘর থেকে বারান্দায় যাবার। অত-গুলো লোকের নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে একি করল মেলিনা। ছিটকে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে।

নির্বাক বিস্ময়ে দু' একজন চেয়ে দেখল সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দূর থেকে আসা কোন একটি স্তিমিত শব্দকে অনুসরণ করছে। অভ্র সদৃশ বুক চিরে হাল্কা রোদে ঝিলমিল একটি প্লেন দৃষ্টিগোচর হল। আর মেলিনা সেদিক লক্ষ্য করেই তার ছোট্ট হাতের মুঠোয় ছুঁড়ে দিল পুষ্পস্তবকটি। সেই উঁচু হোটেলের লাউঞ্জ থেকে হাওয়ায় ভেসে তার পাপড়ি ছড়িয়ে গেল একগুচ্ছ অভিমানের মত হাওয়ার গায়ে গায়ে। আর ছোট্ট মেলিনা দু'হাতে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। কেউ সিদিক আর তাকাতে পারল না। এমনকি আবু শওকৎও না।

দেয়াল

শহীদ সাবের

জেলখানার দেয়াল ঘেঁষে বসেছে মাতু। ওর কাজ বসে বসে চারদিকে নজর রাখা, যাতে কেউ দেয়াল টপকাতে না পারে। জেলের ভাষায় সে কোণার পাহারা।

জেলের দুটো দেয়াল যেখানে মিশেছে সেখান তার ডিউটি। লম্বা-চওড়া শক্তিমন্ত কৃষাণ সন্তান। নিঃশ্বাস নিতে বুকের ছাতিটা ফুলে ওঠে। মাত্র অল্পদিন আগে সাজা নিয়ে এসেছে।

বৈশাখের এক তপ্ত মধ্যাহ্নে মাতু বসেছিল দেয়ালের ধারে। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। জায়গাটা নির্জন। চুপ করে তাকিয়ে থাকলেও চোখে নীল মারে। জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। মাতু দেখতে পেল খট্ খট্ করে বুকে সাড়া জাগিয়ে এগিয়ে আসছে এক সেপাই। গুদাম ঘরের এলাকা দিয়ে আসবার পথেই মাতু দেখতে পেয়েছিল ওকে। সান্ত্রীটি যখন কাছে এল মাতু ভাল করে লক্ষ্য করলে ওকে। খুশীই হল সে। মুখের চেহারায় যৌবনের দীপ্তি; সান্ত্রীর বয়স অল্প। মাতুর সমবয়েসীই প্রায়। যাক। অন্ততঃ কথা বলার একটা লোক পাওয়া গেল। ছেলেটা কাছে এলে দুয়েকটা কথাবার্তা নিশ্চয়ই হবে। আর তাতে দুপুরের এই অসহ্য নীরবতা ভাঙবে।

সান্ত্রী এল ঠিকই। এসে দাঁড়াল মাতুর কাছেই। কিন্তু একমাত্র শব্দ যা ধ্বনিত হল তা বুটের শব্দ। তার পরেই সান্ত্রী ঘুরে গেল। তার কাজও দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘণ্টা দুই পায়চারী করা।

খট্ খট্ খট্। বুটের শব্দ জাগিয়ে সে পায়চারী করতে লাগল। দেয়ালের এক সীমানা থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া, খট্ করে ঘুরে দাড়ানো, ফিরে আসা, তারপর আবার যাত্রা। খাকী পরা যুবক বলল না একটি কথাও। মাতু অবাক হয়। তাকিয়ে দেখে তার চারিদিকে, কেউ কোথাও নেই।

একই বয়সের দুটি ছেলে। সান্ত্রী যতবার মাতুর কাছে এল ততবারই মাতু আশা করল, এবার নিশ্চয়ই সে কিছু বলবে। কিন্তু আর কথা বেরয় না তার।

খট্ খট্ খট্। ভারী বুটের শব্দ শুধু দুপুরের নিস্তব্ধতা ভাঙল।

সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমাকাশে। বিকেল নামল, প্রশান্ত বিকেল। দেয়ালের ছায়া ঘুরে গেল। ঘন্টা বাজতেই সান্ত্রী ডিউটি শেষ করে চলে গেল একটি কথাও না বলে।

এরপর তাদের দেখা হল হাসপাতালে। মাতু ভর্তি হয়েছিল ছোট-খাট একটা ঘায়ের চিকিৎসার জন্যে। যে মামলায় তার সাজা হয়েছিল, সেই জমির দাঙ্গায় একটুখানি জখম হয়েছিল, কিন্তু ঘা আর শুকোয়নি।

সান্ত্রীটি এল মাতুর দু'দিন পরে। জেল হাসপাতালে ওয়ার্ডার আর কয়েদি সকলেই এক সঙ্গে থাকে--একই ওয়ার্ডে রাখা হল তাদের।

বেসরকারী পোশাক পরণে সান্ত্রীটিকে এবারে মনে হল একেবারে অন্য রকম। গায়ে লাল গেঞ্জী, পরণে নীল লুঙ্গি, পায়ে মোটর টায়ারের রবারে তৈরী স্যাণ্ডেল। হাসপাতাল ঘড়িতে দুটো বাজল।

সারা ওয়ার্ডে জেগে আছে মাত্র পাঁচজন।

'তোমার বাড়ী কোথায়? কক্সবাজার সাইডে নাকি?' সান্ত্রী জিজ্ঞেস করল মাতুকে।

'হ্যাঁ রামু। কক্সবাজার সাব ডিভিশন।'

'দেখে তোমাকে সেই রকমই লাগে।'

'কেন?'

গার্ড এবার মাতুর শরীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 'তোমার শরীরখানা।'

বিনয়ের হাসি হেসে মাতু বলল, 'শরীর?'

'হ্যাঁ। এমন সুন্দর শরীর কমই হয় এদিকে।'

'নিজেরটা নিজের নজরে পড়ে না কিনা।'

'আমার কথা বাদ দাও। এই ব্যারাকে থেকে শরীর রাখা যায়?' দেহসৌষ্ঠবের পারস্পরিক প্রশংসা দিয়ে দুই জোয়ানের আলাপ-পরিচয়ের

শুরু। মাতু জেনে খুশী হয় যে আসলে তারা গাঁয়েরই লোক। তাদের ভাবনা-চিন্তাগুলির গোড়াটা একই রকম। অনেক দিক দিয়েই তাদের মিল।

হাসপাতালে থাকতে থাকতেই তাদের পরিচয় প্রায় বন্ধুত্বে দাঁড়াল। ব্যাপারটা এইভাবে গড়ায়: রাতে খাওয়ার পর গার্ড মাতুকে জিজ্ঞেস করলে, 'তাস জান?'

'কি খেলা?'

'টোয়েন্টি নাইন।'

খেলতে বসে দেখা গেল 'টোয়েন্টি নাইন'-এ মাতু তুখোড় ছেলে। মাতু আর সান্ত্রী যুবক অংশীদার।

'ষোল।'

'সতর'

'উনিশ'

'বিশ'

'রং কর'

'রাখ। সিঙ্গেল্যাণ্ড।'

'বাহ্ বা:। চমৎকার, মারহাবা' গার্ড বললে তার অংশীদারকে। তারপর দান জিতে একে অপরকে হাত বাড়িয়ে দিলে। কায়দা করতে গিয়ে ফিল্মে শেখা হিন্দুস্থানী বুলি বেরুল, 'জিতা রহো বেটা।' খেলতে খেলতে ঠাট্টা-মস্কারাও হল। মাতু একটা পুরান খবরের কাগজের ছবির দিকে চেয়ে আছে দেখে গার্ড ঠাট্টা করে বললে, 'অত নজর দিয়ে কি দেখ? ভাবীর মত লাগে নাকি?'

'আরে না। তাকে দেখনি। দেখলে ভয় পাবে।'

'আরে হ্যাঁ কে কার বউকে কবে সুন্দরী বলেছে বল?

• হাসপাতালে যে কদিন ছিল আলাপ-পরিচয় হৃদ্যতা তাদের কম হল না।

হাসপাতাল থেকে মাতুই আগে ডিসচার্জ হল। খবর শুনে গার্ড মাতুর কাধ দুটো ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললে, 'ঠিক আছে দোস্ত। আবার দেখা হবে।'

চারদিন পর।

মাতু ফিরে এসেছে তার জায়গায়। আগের মতই কোণায় পাহারা।

দুপুর বেলায় ডিউটিতে দেয়াল ঘেঁষে বসে থাকতে থাকতে মাতু ভাবতে লাগল, এমন সময় যদি সেই সান্ত্রীটির ডিউটি পড়ে তা হলে বেশ হয়। সময়টা তাহলে ভালই কাটে। ঠিক সেই সময়ই মাতু দেখতে পেল দেয়ালের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রী ছেলেটা, মাতুর দিকে পিছন ফিরে।

তাকে দেখতে পায়নি হয়ত।

বুকটা যেন লাফিয়ে উঠল মাতুর। জায়গা থেকে উঠে ধীরে ধীরে সে এগোতে লাগল সান্ত্রীর দিকে। খালি পায়ে শব্দ হল না একটুও।

একটু দূরে মাঠে কাজ করছে কয়েদীরা।

জমাদারের রাউণ্ড-এ আসার সময় হয়েছে। গার্ডের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মাতু। ভাবল ওর দুই কাঁধে হাত দিয়ে পেছন থেকে ঝাঁকিয়ে দেবে ওকে। অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি হাসবে।

আস্তে আস্তে সান্ত্রীর গায়ে এসে দাঁড়াল মাতু। কাঁধের ওপর হাত রাখতে যাবে এমন সময় হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল সান্ত্রীর পরিচ্ছদে। পরনে তার সরকারী পোশাক, আগাগোড়া খাকী; ইস্ত্রি করা ভাঁজ।

নীল লুঙ্গি, লাল গেঞ্জি মিইয়ে গেল।

এক পা পেছনে সরে এল সে।

পরক্ষণেই আবার ভাবল, 'এ সংকোচ অর্থহীন।' দুপা এগিয়ে আরো কাছে থেকে তাকে ঝাঁকুনি দিতে যাবে এমন সময় দেখতে পেলে দু'টো নল। বন্দুকের দু'টো ফুটো মুখ। সান্ত্রীর সামনে, ওর হাতের মুঠোয়, দৃঢ়বদ্ধভাবে এঁটে থাকা বন্দুকের নল দুটো আবার বিব্রত করল তাকে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আবার সরে এল সে।

সান্ত্রী ঘুরে দাঁড়ায়।

সে-ও যেন সাদরে একটা কিছু করবে ভাবছে। হাত দুটো ধরবে মাতুর। তা হলে বন্দুকটা রাখা দরকার।

বন্দুকটা রাখতে হবে......। কোথায় রাখবে?—রাখাটা...। এদিক ওদিক তাকাল সে। ইতস্তত: করতে লাগল। ঠিক করতে পারল না। বেশ একটুখানি সময় কেটে গিয়েছে এর মধ্যে। 'উষ্ণ অভ্যর্থনা' এখন বড্ড বেমানান। যা করবার আগেই করা উচিৎ ছিল।

এক পা পেছনে সরে গেল সে।

জিজ্ঞেস করল, 'আজ সুপারিন্টেনডেন্ট এসেছিল ?'

'না।'

'তবে ঘন্টি পড়ল যে ?'

'অন্য কেউ এসেছিল হয়ত।'

'ও হ্যাঁ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা আসে আর খালি আমাদের কাজ বাড়ায়।'

আরও দু'চারিটি এই ধরনের কথা হল তাদের মধ্যে। তারপর মাতু গিয়ে বসে পড়ল নিজের জায়গায়। সান্ত্রী পায়চারী করতে লাগল।

আসলে যে দেয়ালটার ধারে ওদের ডিউটি সেটা ছাড়া আরো একটা দেয়াল যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। কোথায়, তা দু'জনের কেউ জানে না। মাতু তাকিয়ে আছে সান্ত্রীর খাকী পোশাক আর হাতে বন্দুকটির দিকে।

একরাত

সুচরিত চৌধুরী

বায়েজিদ বোস্তামীর পাশের পাহাড়গুলো ঢেউ দিতে দিতে মিশে গেছে আকাশে।

এদিকে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। চারদিকে তারের বেড়া। গেটে সেন্ট্রি। তাঁবুর পর তাঁবু সাজান—যেন অসংখ্য ব্যাঙের ছাতা ফুটে আছে পাহাড়ের থলিতে। জিপ, লরি, ওয়াগন আসছে যাচ্ছে। সোলজাররা মার্চ করে একদল ঢুকছে, একদল বেরিয়ে যাচ্ছে।

গেটের কিছুদূরে ঝাপ মেরে দলা হয়ে বসে আছে লিকলিকে আধা লেংটা কতকগুলো লোক।

কারো হাতে হাঁড়ি, কারো হাতে ভাঙ্গা টিন, কারো হাতে কলাপাতা। ওরা বসে তাকিয়ে আছে তাঁবুগুলোর দিকে—ক্ষুধার্ত কুকুরের মত।

সূর্য আকাশ থেকে মুছে গেলে সামনের ডাষ্টবিনটায় এসে জড় হবে ছেঁড়াফাঁড়া সেঁকা রুটি, হাড়—তাতে কিছুটা মাংস ঝুল্‌ঝুল্ করবে, ঝোলমাখা ভাত, ভাঙ্গা মাছের টিন, ভেজা চায়ের পাতা। ওগুলো ডাষ্টবিনে পড়বার সাথে সাথেই ওরা ঝাপটা ঝাপ্‌টি করে চেঁচাবে, একজন আরেকজনকে খাম্‌চাবে, বক্‌বে, কাঁদবে। ওরা সব আশেপাশের গাঁয়ের লোক।

একদিন নাকি ওদের সব ছিল—ভিটেঘর, গরু, লাঙ্গল, পুকুর, নৌকো, নোলক পরা বউ, ধান। এখন কিছু নেই। আছে শুধু ধুকধুকে প্রাণ। আর সেই প্রাণটাও নাকি ওরা এই ডাষ্টবিনের পাশে দিয়ে যাবে। ওরা বলে—এই ডাষ্টবিনটাই এখন ওদের সব।

পশ্চিম আকাশ লাল।

এখান থেকে দুটো বিল্ পেরোলেই কাঁহার পাড়া।

বিরাট তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে ঝাপটি মেরে বসে থাকা চালাঘরের দাওয়ায় হাঁটু গেড়ে বসে মাটির পুতুল বানাচ্ছে শ্রীনাথ। আর গুনগুন করে গাইছে তার কবিয়াল দোস্ত কালু ফকিরের গীতখানা।

অরে, আখেরে হিসাব লৈবো
পরভু নিরাঞ্জন।
চান্দ মরিবো, সুরুয মরিবো—
আর মরিবো তারাগণ,
আদমী সকল মরিয়া যাইবো—
না থাকিবো তিরভুবন।

গাইছে আর ভাবছে শ্রীনাথ।

না দেখুক মেলা। না কিনুক তার পুতুল। সে তার কাজ চালিয়ে যাবে। আকাল তো আর চিরকাল থাকবে না।

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। যুদ্ধ কি আর ভগবানের তৈরী। মানুষই যুদ্ধ করে, মানুষই মরে, আবার মানুষই যুদ্ধ থামায়।

আহা! যুদ্ধের আগে এই পাড়ায় কত হইচই না ছিল! ওই মাঠটায় ডাঙগুলি খেলতো বাচ্চা ছেলেরা। পুকুর ঘাটে বসে চাল ধুতে ধুতে ঘরের কথা বাইরে ছড়াতো বউ মেয়েরা। দাওয়ায় বসে তাস পিটতো জোয়ান মরদগুলো। গরমের জোছনা রাতে কত হাডুডু খেলা, বর্ষায় মাথায় জুঁই'র চেপে মাছ ধরার চুপাচুপি, শরতে ডুমডুমাডুমডুম্ ঢোলের কাঠি, মাঘ মাসে খেজুর রসের পিঠা আর বসন্তে 'রাত কাটাইয়ম বন্ধু কারে চাই'—গান।

আহা কি দিনই না ছিল।

ভাবতে ভাবতে শ্রীনাথের চোখ দুপুরের পুকুরের মত চক্‌চক্ করে ওঠে। আর এখন! সেই মাঠ আছে—সেই বাচ্চাগুলো নেই। কেউ না খেতে পেয়ে মরে গেছে, কেউ ভুখমিছিলের সাথে চলে গেছে শহরের সড়ক ধরে। পুকুর-ঘাটের বউ মেয়েরা কেউ দিয়েছে গলায় দড়ি, কেউ গিয়েছে মিলিটারী ক্যাম্পে। তাগড়া জোয়ানগুলো এখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হাঁটছে।

গরম আসে, বর্ষা আসে, শরত আসে, আসে শীতবসন্ত—কিন্তু হাডুডু আর কেউ খেলে না, দেখা যায় না মাথায় জুঁইর চাপা কোন মানুষ, আর শোনা যায় না ঢোলের শব্দ বা গান।

আহা কি দিনই না ছিল।

ভাত। কত খাবি খা। মলা মুড়ি খই দৈ—কত খাবি খা। এর দাওয়ায় বসে চিতল পিঠা, ওর দাওয়ায় বসে কলাপিঠা—কত খাবি খা। দিঘিতে

বড় জাল দিয়ে ইয়া বিরাট বিরাট মাছ ধরা হয়েছে—ঘরে ঘরে মাছের গন্ধ। কত খাবি খা। খেতে খেতে গলা পর্যন্ত আটকে যেত। আর এখন!

স্বপ্ন। ভাত মাছ মলা মুড়ি দই খই—সব স্বপ্ন।

সেই ঢেঁকির শব্দ। আহা সেই ঢেঁকির শব্দ আর শোনা যায় না। ভোর রাতে মাঝ রাতে—কখনো সারারাত শব্দ দিয়ে চলেছে, কত মেয়ের পা দুলেছে ঢেঁকিতে।

ধান। কত ধানের ছড়াছড়ি। উঠানে, পথেঘাটে, দাওয়ায় বত ধানের ছড়াছড়ি। কত পায়রা শালিকের ভিড়। ধান, ধান, ধান—ধান থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে গান, জীবন হাসিকান্না।

ভাবতে ভাবতে শ্রীনাথ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে—আমার কাজ আমি করে যাব। দিন যাক বা দিন আসুক।

সন্ধ্যা তখন ঘরে ঘরে কালো হাওয়া ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভেজা ময়নার মত কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে শ্রীনাথের একরত্তি মেয়েটা। কাঁদছে সে, একটানা। সারাদিন পুকুরে ডুব দিতে দিতে শাপলার ভেট আর ডিগ খেয়ে পেট ভরিয়েছে। এখন মনে পড়েছে ভাতের কথা। কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাচ্ছে—অমা ভাত খাইয়ম, ভাত।

ঘরের ভেতর থেকে জবাব আসছে নারীকণ্ঠের—চুপ।

মেয়েটা গড়াগড়ি দেয় উঠোনে।

শ্রীনাথ গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে এসে বসে দাওয়ায়। বলে—এই চা, কি সোন্দর পুতুল।

মেয়েটা তাকায় না পুতুলের দিকে। একটানা কাঁদে আর চেঁচায়—ভাত, ভাত, ভাত।

ঝলমলে শাড়িপরা একটি আধবয়সী বউ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দাওয়ায়।

এক ঝাপটা মেরে মেয়েটাকে শ্রীনাথের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হেঁচড়িয়ে চলতে চলতে বলল—চল্, ভাত খাইবি। আমার রক্ত খাইবি। চল্, চল্ হারামজাদী।

বলতে বলতে বউটা মেয়ের হাত ধরে উঠোন থেকে মুছে গেল পথে, পথ থেকে শুকনো বিলে।

অন্ধকারে চোখ জ্বেলে সেদিকে চেয়ে রইল শ্রীনাথ।

তার সাধের বউটা। কত সাধ করে ওকে ঘরে তুলে এনেছিল তার বাপ-মা। বিয়ের আগে বলেছিল শ্রীনাথ—না, না, ও বোঝা আমি বইতে পারব না। ধমকে উঠেছিল তার বাপ—বোঝা তোকে বইতে হবে না। ভগবানের বোঝা ভগবানই বইয়ে নেবেন। তুই আমি কে!

পাল্‌কি থেকে নেমে পাখির মত পা ফেলে ঘরে এসে বউটা সেদিন ঢুকেছিল।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল শ্রীনাথ। মনে মনে বলে উঠেছিল সত্যিই তো। এমন পুতুল কি আর মানুষের বানান কাজ!

সংসার নিয়ে কোনদিন ভাবেনি শ্রীনাথ। তার বাপ-মা চিতার কাঠে জ্বলে যাবার পরও তার বউটা তাকে আজ পর্যন্ত কিছু ভাবতে দেয়নি।

শ্রীনাথের ভাবনা শুধু মাটির কাজ।

তবু, মাঝে মাঝে শ্রীনাথ ভাবে। ভাবে—বউটা কি করে এই নৌকোটা চালায়! টিনভরা দুধ মাংস রুটি ভাত শাড়ি এসব আসে কোত্থেকে। আর ভাবে—সেজেগুজে বউটা রোজ সন্ধ্যায় যায় কোথায়। ভাবতে ভাবতে মন যখন রোদে পোড়া মাটির মত গরম হয়ে ওঠে তখন গুন্‌গুন্ করে গেয়ে ওঠে—আরে, আখেরে হিসাব লৈবো পরভূ নিরাঞ্জন।

মন, মন তো মাটির মত।

উপড়ে ফেল, গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দাও. কাদায় কাদায় নরম কর, যেদিকে চালাও সেদিকে চলবে। মন যদি বলে—আমি ফসল ফলাব, মন বলবে—ফলাব। মন যদি বলে—আমি ভেঙ্গে দেব, মন বলবে—হ্যাঁ। যেদিকে ঘুরাবে সেই দিকেই ঘুরবে মন—মাটির মত।

শ্রীনাথ বলে—আমি মনের কারিগর।

বউটা যাক্, যেখানে খুশি সেখানেই যাক্। আমি আমার কাজ করতে পারলেই হল। আমার ফসল ফললেই হল। মাটি আমার মন, পুতুলগুলো আমার ফসল।

যুদ্ধ লাগার সাথে সাথেই পাড়ার লোকজন বলেছিল—শ্রীনাথ, এই কাজ ছেড়ে দে। না ছাড়লে ক'দিন পর শুকিয়ে মরে যাবি। চল্—দা কোদাল নিয়ে মাঝিগিরি করিগে। চল্, শহরে চল্।

একতাল মাটি নিয়ে কপচাতে কপচাতে ঠোঁটে ভোরের রোদের মত হাসি ফুটিয়ে শ্রীনাথ শুধু তাদের দিকে তাকিয়েছিল—বলেনি কিছুই।

যখন সমস্ত পাড়া উপোসে খা খা তখন মতি দালাল এসে বলেছিল—শ্রীনাথ চল্ কাজ করবি।

ড্যাবড্যাবে দৃষ্টি মেলে সাজান পুতুলগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল শ্রীনাথ—এগুলো কি কাজ নয়?

হো হো করে হেসে উঠেছিল মতি। বলেছিল—মাটি দিয়ে পুতুল না বানিয়ে মাটি কেটে কুলী-মজুর হয়ে যা শ্রীনাথ। না হলে মরে যাবি হারামজাদা।

কিন্তু মরেনি শ্রীনাথ।

মরতে মরতে বেঁচে আছে। শ্রীনাথ বলে—আমি মরবো না। মরতে পারি না। আমি কারিগর। কারিগর মরে না। ঝড় আসে, তুফান আসে—আবার চলেও যায়। আজ আকাশ যুদ্ধের মেঘে ঢাকা। কিন্তু কাল তা কেটে যাবে। যুদ্ধ চিরকাল থাকবে না। একজনকে হার মানতেই হবে।

শ্রীনাথ বলে—মেলা আবার বসবেই। আবার তার পুতুল কিনবে লোকে।

সেই দিন আবার আসবে। সেই পৌষের দিন। ধানকাটা হয়ে গেলে শালী আর বীজ বালাম ধান জমি থেকে উঠে যাবে ঘরে ঘরে। সব গ্রামগুলোর একহাতে নতুন ধানের মঞ্জরী, অন্য হাতে সূক্ষ্ম বাঁশের তৈরী করা কুলো—ঠোঁটে লাজুকরাঙা হাসি, ধানের চোখের মতই চোখ ধাঁধান। রূপে রূপে রূপবতী, ধানে ধানে ধানবতী। সারা বছর সাজবে, পৌষ এলে অভিসারে বেরোবে। রূপ যেন তার ছলকে পড়বে।

রোদে ঝল্‌সে উঠবে জমি প্রান্তর।

মাটি ফুঁড়ে উঁকি দেবে মুগ কলাইয়ের চিকন চিকন পাতা। লাউ কুমড়োর সর্পিল ডগাগুলো খড়ের চালের ওপর লক্‌লক্ করে বাতাসে দুল্‌বে। সাদা, খয়েরী, কালো পালকের ওপর সরু নীল রঙ আঁকা পায়রাগুলো অকারণে ডাকবে, ডাকবে ঘুঘু। ভাটুই পাখিরা ধানঝরা জমিতে সতর্কে ঘুরে বেড়াবে।

আলের ধারে ধারে খেজুর গাছের সারি—তাতে হাঁড়ি বসান থাকবে। কয়েকটা শালিখ হাঁড়ির মুখে ঠোঁট লাগিয়ে কিচির মিচির শব্দ তুলবে—মায়ের স্তনে ঠোঁট বসিয়ে হঠাৎ খুশিতে কেঁদে ওঠা শিশুর মত।

খালের জলে ভাসবে মরা গরু, দু'তিনটে শকুন তার ওপর বসে মাংস খোটাবে।

দাঁতালো কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ডাক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে শকুনগুলোকে তাড়াবে। খালের ধারে বসা অনেকগুলো শকুন দীর্ঘ গলা বের করে তাকিয়ে থাকবে ভাসমান গরুটার দিকে। কুকুরটা আবার সাঁতার কেটে ফিরে আসবে। কয়েকটা শকুন সাঁই সাঁই করে উড়ে চলে যাবে।

চক্‌চক্‌ করবে দিঘির জল। কিনার ঘেঁষা সূক্ষ্ম সূঁচের মত সবুজ ঘাসের বনে উড়ে বেড়াবে রঙবেরঙের প্রজাপতি। মৌমাছিরা জটলা পাকাবে ঘন লালফুলে মেতে ওঠা মাদার গাছের ডালে ঝোলা মৌচাকে। শাপলা ফুলেরা শাদা শাদা পাঁপড়ি মেলে বিস্তীর্ণ পাতার ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে। ছোট ছোট রূপোলী মাছ সাঁতার কাটবে দিঘির সোনালী জলে। আর সেদিকে দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকবে মাছরাঙ্গার লুব্ধ শিকারী চোখ।

শুকিয়ে যাওয়া অল্পজলে কচুরি পানার তলে তলে শিঙ আর মাগুর মাছের ঝাপট। বেতলতার ফাঁকে ফাঁকে জারুল গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়া চড়ুই পাখির বাসাগুলোকে দূর থেকে দেখাবে মৃদঙ্গের মত।

ঘর থেকে ঘরে, উঠোনে, গোলাঘর থেকে গোয়ালঘর পর্যন্ত গেরুয়া রঙের শুক্‌নো খড় ধানের পালক হয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকবে। ঢেঁকির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, ঢেঁকির লেজ উঠবে নামবে—বউগুলো ঘামে নেয়ে উঠবে, ঘোমটা খসে পড়বে। কালো চুলের অরণ্যে ছেয়ে যাবে গুঁড়ো গুঁড়ো ধানের তুষ। খিলখিলে হাসি আর কলকলে ধানী গানের কথা। শাদা শাদা চালগুলো হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে ধানের কঠিন নির্মোক থেকে, দোল খাবে দু'পা ছড়িয়ে দেওয়া হাতের মুঠোয় চেপে ধরা কিষাণ বউয়ের কুলোর মধ্যে। লাল বা হলুদ আঁশের আবরণে কোনগুলো হয়ত নিজের শুভ্র সত্বাকে একটা লজ্জার মত আড়াল করে রাখবে—যৌবন ঢেকে রাখা কোন লাজুক মেয়ের মত।

ধান, ধান, ধান,

ভেতরে যতই দুঃখ থাকুক না বাইরে গ্রামগুলো তার পোষালি ধানের মতই আনন্দে মেতে উঠবে। যাদের জমি নেই—তারাও হলুদ হলুদ ধান

দেখে মুগ্ধ হবে—এটা ওটার বদলে ধান কিনবে। খই কোটাবে, চিঁড়ে বানাবে, মুড়ি ভাজবে। চাল গুঁড়ো করে হরেক রকমের পিঠা তৈরী করবে। ধুঁই, পাক্কন, নারকেল পিঠা—কত কি। খেজুরের রসে চিবিয়ে-চুবিয়ে খাবে, অন্যকে খাওয়াবে। দূর দেশে—মেয়ের বাড়িতে, বাপের বাড়িতে বা বেহাইয়ের বাড়িতে পাঠাবে।

কোন মেয়ে হয়ত বাপের বাড়ির পিঠার জন্য প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে পুকুর পাড়ের ছায়াঢাকা সারি সারি কলাপাতার নিচে।

ধূ ধূ ধান উঠে যাওয়া শুকনো বিলের ওপার হতে মাথায় একটা বিরাট হাঁড়ি চেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে একটা লোক। লোকটা হয়ত তার বাপ কিম্বা সোদর ভাই।

মুহূর্তে মেয়েটার গলার হাঁসুলী উঠবে দুলে, কাঁখের কলসী থেকে ছলাৎ করে কয়েক আঁজলা জল ছিঁটকে পড়বে—পালাবে, খুশির আবেগে। তারপর বাপের বাড়ির সাধ-করা পিঠা খেতে খেতে মনে মনে ডানা মেলে উড়ে যাবে মা-বাপের সেই ফেলে আসা ভিটে-ঘরখানাতে।

আর, কোন মেয়ে হয়ত চোখের জলে সাজাতে বসবে পিঠার পরে পিঠা দিয়ে একটা কালো রঙের বিরাট হাঁড়ি।

গুনে গুনে সাজাবে—মা খাবে, বাপ খাবে, ভাই খাবে, বোন, পাড়া-পড়শি—সবাই খাবে। সঙ্গে দেবে একটা পানের বিড়া, সুপোরি, একহাঁড়ি মোষের দই, ছোট ছোট ভাইবোনের জন্য কয়েকমুঠো কাঁচাপাকা কুল দিতেও ভুলবে না। দাদীর দাঁত নেই—ছ্যাঁচা সুপোরিও দেবে একটা কলা-পাতায় মুড়ে। সব দেবে মুঠো ভরে—বিনি ধান, কামিনী ধান।

আর সেই সব পেয়ে তার মা মেয়েকে নাইয়র আনতে পাঠিয়ে দেবে কোন আত্মীয়কে।

থলোথলো খুশীতে মেয়েটা আবার চোখের জলে সাজাতে বসবে এক-খিলি পান। স্বামীর মুখে তা পুরে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলবে—আঁয়ারে নাইয়র নিতো আইস্তে।

ঘরে ঘরে হানা দেবে ফিরিওয়ালা।

কাঁধের ভারটায় পুরো একটা মনোহারি দোকান তুলে আনবে। টিপ, সেপটিপিন, কালো নীল হলুদ রঙের চুলের ফিতে, নকল সোনার কানপাশা,

লালরঙে আঁকা 'ভুলনা মোরে' লেখা ডালা বন্ধকরা আয়না, চুলের কাঁটা—কাপড়ও থাকবে হরেক রকমের, গোলাপি বেগুনি আসমানি রঙের মন কেড়ে নেওয়া শাড়ি, ঝল্‌মলে ছিট্ কাপড়, পাতলা পাতলা ওড়নাও থাকবে।

পুকুর পাড়ে এসে ডাক দেবে ফিরিওয়ালা।

সেই ডাকে ছুটে আসবে ন্যাংটা ন্যাংটা ছেলেমেয়েরা, সোমত্ত বউরা খড়ের গাদার পেছনে গা আড়াল করে দাঁড়াবে।

দর-কষাকষি চলবে, ধান দিয়ে এটা ওটা কিনবে।

ফিরিওয়ালার কাছ থেকে আসমানি রঙের শাড়িখানা দু'হাতে সাপটে ধরে একটা ছেলে তার মাকে এনে দেখাবে।

বউটা ফিস্‌ফিস্ করে শুধাবে—কত ?

ফিরিওয়ালা চেঁচাবে—পাঁচ আড়ি ধান।

—হেই ব্যাডা কয় কি। বউটা ছুড়ে দেবে শাড়িখানা। খাবলা মেরে জড়িয়ে ধরবে ছেলেটা।

মেপে মেপে ধান দেবে, দেখে দেখে শাড়ি নেবে—নেবে চিরুনি, খশবু তেল, আতরের শিশি। সোহাগ করে স্বামীকে দেখাবে, সাজবে—ধানে ধানে ধানবতী, রূপে রসে বর্ণে গন্ধে সপ্তকলায় হবে রূপবতী।

আসবে ছবিওয়ালা।

ছবি তোলার বাক্সটিকে দাঁড় করিয়ে তার ওপর কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াবে ছবিওয়ালা।

সামনে কাঠ হয়ে টুলের ওপর বসে থাকা আধবয়সী লোকটার চুল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে সর্ষের তেল। গায়ের লালশালুর কামিজটা আগুনের মত জ্বলতে থাকবে। পরনের লুঙ্গিটাও নানা রঙের কাজ করা, পায়ে একজোড়া ভারী বুটজুতো—কোন মিলিটারির কাছ থেকে সেটা বকশিস্ পাওয়া হয়ত, তাতে কাদাও লেগে থাকবে খানিকটা।

—হাসো, মিয়া সাব হাসো।

লোকটা মুখ বিস্ফারিত করে হাসবে। পেছনে মাদার গাছে টাঙানো একটা সিন্—তাতে আঁকা থাকবে সরু একটা নদী, নদীর ওপর একটা বিরাট জাহাজ, জাহাজের ওপর মাছির মত উড়ন্ত কতকগুলো ছোট ছোট এরোপ্লেন। দূরে নীল রঙের পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা দালান,

দালানের গায়ে বড় বড় ফুল, ফুলগুলো দালানের চেয়েও বড়। আঁকা উড়ন্ত পাখিও থাকবে আকাশের কোণে—তবে সেগুলো চিত্রকরের খেয়ালী তুলির টানে এরোপ্লেনের মতই দেখাবে। কিছু সময়ের মধ্যে জলেভরা গামলা থেকে লোকটার ছবি বেরিয়ে এসে রোদে শুকোতে থাকবে। ছোট বড় মাঝারি—সব রকমের লোকের ভিড় করা চোখগুলোতে তাক লেগে যাবে।

ধানের টুকরীটা রেখে লোকটা ছবি নিয়ে চলে যাবে।

একজনের পর আরেকজন। বুড়ো থেকে জোয়ান, ছোট ছোট ছেলেরাও লুঙ্গির কোঁচায় ধান লুকিয়ে এনে ছবি তুলতে বসে যাবে।

একজন তার কামিজের বুকে একটা মেয়েলোকের ছবি ঝুলিয়ে হুকুম দেবে—চাই, তোল। কিন্তু মাইয়া লোকও থাকন্ চাই, আতরের খশবুও উঠন্ চাই।

ছবি ঠিকই উঠবে—মেয়েলোকটাকে যেন বুকে ধরে রেখেছে। কিন্তু তবু তার পছন্দ হবে না। বলবে সে—ছবি ঠিক আছে, কিন্তু খশবু কোথায়।

ছবিওয়ালা শহরের ঝানু লোক। জোয়ানটাকে কিছুক্ষণ পর ঘুরে আসতে হবে। এই অবসরে ছবিটার গায়ে আতর রাখবে মেখে। কিছুক্ষণ পর জোয়ানটা ফিরে এলে তার হাতে ছবিটা তুলে দিয়ে বলবে—ধরো, শুঁকি চ'ও।

ছবিটা শুঁকে দেখে জোয়ানটা তারিফ করে উঠবে—হ, একদম ঠিক।

বলী খেলা হবে, কবির লড়াই হবে, যাত্রা হবে। শ্রীনাথ বলে—মেলা আবার বসবেই।.........

অন্ধকারে ডুব দেওয়া চালাঘরগুলোর দিকে সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—আহা! ওই বোকা গগন দেখতে পেলনা সব। নদীতে ঝাঁপ দেবার আগে এসেছিল তার কাছে। বলেছিল—ছিরিনাথ, আঁয়ারা আর ন বাঁচ্যম্।

ধমকে উঠছিল শ্রীনাথ—মিথ্যে কথা।

একগাল হেসে পাথরের মত স্থির চোখ দুটি তুলে নদীর পথ ধরে চলে গিয়েছিল গগন।

শ্রীনাথ বলে—গগন বোকা। আর বোকা ওই বউগুলো। বৃন্দাবনের বউ, সনাতনের বউ, পাঁচকড়ির বউ। কথা নেই বার্তা নেই—অমনি গলায়

দড়ি। ব্যাপার কি। ব্যাপার আর কিছু নয়—জীবনে আর খেতে পাওয়া যাবে না। মানুষ আর বাঁচবে না। জগৎটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

বোকা বোকা—সবাই বোকা! এই বোকামীর জন্য ওরা সূর্য-জাগা ফুলফোটা ধানদোলা নদী পথ ঘাট মাঠ প্রান্তর আর মানুষের হাসি কান্না থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল।

একটা মেয়েলি ছায়া কেঁপে উঠল উঠোনে।

—হিবা কন্?

—ফুলরানী।

বলেই ছায়াটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল মোহনবাঁশির ঘরের দিকে।

ফুলরানী মতি দালালের বড় মেয়ে। লম্বা। কালো। দীর্ঘ চুল। মূর্তিমতী কামনার শিখা যেন।

মতি ঘাঘু লোক।

কর্ণফুলির ওপারের এক বুড়ো জোতদারের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে মেয়েকে পালকিতে তুলে দিয়েছিল। দু'মাস ঘুরতে না ঘুরতেই ফুলরানী শাখা ভেঙ্গে শাদা থানে বাপের ঘরে এসে হাজির।

ফুলরানীর আক্রোশ বাপের ওপর নয়, মোহনবাঁশির ওপর।

বিয়ের আগের দিন কত সেধেছিল সে মোহনবাঁশিকে। বলেছিল—বাঁশি, চল্ আমরা পালিয়ে যাই। জবাবে মোহনবাঁশি বলেছিল—না। আমার এখন অনেক কাজ।

সাপের ফণার মত চিবুক উঁচিয়ে বলেছিল ফুলরানী—তুই তাহলে আমায় মন দিস্‌নি?

বলেই ঠাস্ করে এক চড় মেরে সেদিন চলে গিয়েছিল সে। তার পরদিনই সে দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে গিয়ে উঠেছিল বুড়ো জোতদারের পালকিতে।

আজ, এই অন্ধকারে চলেছে সে মোহনবাঁশির ঘরে। একটা বোঝাপড়া হবে।

বলবে—বাঁশি, কেন তুই ছেলেবেলায় আমায় ফুল ভালবাসতে শিখিয়েছিলি?

আমি যখন বার বছরের একটি শাপলাফুল, তখন তুই ঘাটে বসে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বলেছিলি—আইজ যে দেখি ফোটা ফুল, কাইল দেইখাছি কলি—তুই কেমনে এমন হৈলি?

কেন বলেছিলি ! বল্, কেন বলেছিলি ।

শাওন মাসে বিল যখন বানের জলে ডুবুডুবু—তখন তুই নৌকো চেপে এসে দাঁড়িয়েছিলি আমাদের ঢেঁকিঘরের পিছনে ।

দুপুর তখন কান্নার পর হেসে ওঠা বাচ্চা মেয়ের মুখের মত ঝক্‌ঝকে । চুপি চুপি বলেছিলি—চল্, বেড়িয়ে আসি । এক কথায় হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কাদা ছড়াতে ছড়াতে তোর নৌকোয় গিয়ে উঠেছিলাম । লগি ঠেলে ঠেলে তুই আমায় নিয়ে গিয়েছিলি ধূ ধূ বিলের মাঝখানে—যেখানে বানের জল সাগরের মত আকাশ ছোঁয়া ।

ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম—বাঁশি, চল্ ঘরে চলে যাই ।

হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলি—তোর ভয় করছে বুঝি ?

মনকে শক্ত করে জবাব দিয়েছিলাম—না ।

তুই নৌকোটাকে ইচ্ছা করে হেলিয়ে দুলিয়ে বলেছিলি—তুই হলি মতি দালালের মেয়ে । তোর ভয় করতে নেই ।

আকাশে গর্জে উঠেছিল কালো মেঘ ।

চোখের পলকেই বৃষ্টি আর হাওয়ায় দুলে উঠেছিল নৌকো । তুই জোরে লগি মারতে মারতে হাঁফিয়ে উঠেছিলি । আর আমি গুটি গুটি হয়ে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলাম ।

তোর মুখেও কথা নেই আমার মুখেও কথা নেই ।

হঠাৎ চারদিক কালো হয়ে গিয়েছিল । কি হয়েছিল কিছুই বুঝিনি সেদিন ।

চোখ মেলে দেখেছিলাম তার দু'দিন পর । এর ভেতর একদিন এক-রাত চলে গিয়েছিল । চোখ মেলে তোকে দেখতে না পেয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলাম । বাপ মা ভাই বোন সবাই ধম্‌কে উঠেছিল ।

বাঁশি, বল্, কেন তুই সেদিন নৌকোয় করে আমায় নিয়ে গিয়েছিলি জলে ডোবা থইথই বিলে ।

সেই তেঁতুল গাছ এখনো সাক্ষী আছে । আর সাক্ষী আছে তোর কপালের কাটা দাগ ।

ডালে বসে তেঁতুল খেতে খেতে বলেছিলি—ফুলি, তুই আমার বউ হবি ?

এক ধাক্কা মেরে তোকে নীচে ফেলে দিয়েছিলাম । অনেকদিন তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস্‌নি ।

আমার মনে হয়েছিল—যেন অনেক অনেক বছর।

একবার ঝাঁক বেঁধে সবাই গিয়েছিলাম সীতাকুণ্ডের মেলায়।

রেলগাড়ী থেকে নেমে আমার হাতে এক টিপ মেরে বলেছিলি—আয়, আমার পেছন পেছন চলে আয়। বাপ-মার হাত থেকে স্রোতে ভাসা কচুরিপানার মত তোর পেছনে ভেসে গিয়েছিলাম।

তখন বয়স আমার তেরোয় পড়েছে।

কোকিলের ডাক শুনলে আমার কেমন কেমন লাগতো। চাঁদ, তারা, ফুল দেখলে হাততালি দিয়ে উঠতাম। বেশী ভাল লাগতো তোকে দেখলে—আবার ভয়ও লাগতো।

একটা চুড়ির দোকানের সামনে এসে তুই থমকে দাঁড়িয়েছিলি। আমার দিকে মিটিমিটি হেসে একগাছা চুড়ি কিনে নিয়ে আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলি—চল্!

আমি যেন তোর বানানো কলের পুতুল। তুই টিপছিলি, আমি চলছিলাম।

তারপর কপালের টিপ কিন্‌লি, রেশমি রুমাল কিন্‌লি কিন্‌লি সুগন্ধি তেল—কত কি। এক বোঁদা বিড়িও কিন্‌লি আমার জন্যে।

প্রেমতলায় গিয়ে একছিলিম গাঁজা টেনে এসে আমার হাত ধরে বলেছিলি—চল্।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ের গোড়ালিতে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলাম—না। আমি আর হাঁটতে পারব না।

পথের ধারে, একটা চাঁপালিশ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আমি বসে বসে হাঁফাচ্ছিলাম। তুই বিড়ি ফুঁক্‌ছিলি।

ভয়ে, ক্লান্তিতে, অজানা কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছিলাম—বাঁশি, আমরা কি তবে হারিয়ে গিয়েছি?

—আরে দুর! হারাব কেন! তোর মা-বাপের সাথে এক্ষুনি দেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু দেখা হল না।

দিন চলে গেল। এল রাত। আমার বুক ভয়ে দুরু দুরু। তুই ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লি। আমি গুটি গুটি হয়ে বসে রইলাম।

বল্ বাঁশি, কেন তুই ইচ্ছে করে আমায় নিয়ে সেদিন মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলি!

আজ আমি বিধবা। তোর জন্যই বিধবা। তুই-ই তো তুলে দিয়েছিস সেই বুড়োটার ঘাড়ে। তোকে আজ সব কথার জবাব দিতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ফুলরানীর পা-জোড়া এসে থামলো মোহনবাঁশির ঘরের দাওয়ায়।

শ্বাস পড়ার শব্দ হল। নড়ে উঠল দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিটা। গতকাল পুকুরঘাটে দেখা হতেই মোহনবাঁশি তার কাছে লঙ্গরখানার জন্য চাঁদা চেয়েছিল।

—ফুলি, তোর বর কত্তো বড় জোতদার। তোর চাঁদা পাঁচ টাকা।

মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ফুলরানী।

আর মনে মনে বলেছিল—পাঁচ টাকা কেন! তোর জন্যে পাঁচশ' টাকা চাঁদা দিতে রাজি আছি আমি।

দু'হাতে আঁচলের কোণটুকু চেপে ধরে ফুলরানী ভাবে—টাকাটা বাঁশির হাতে দিয়ে বলবে—বাঁশি আর কি চাস্ তুই?

যদি বলে—তোকে।

তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে সে মোহনবাঁশির বুকে।

ভাবতে ভাবতে দাওয়া থেকে ঘরের দিকে পা বাড়ায় ফুলরানী। কোমরের প্যাঁজে বিড়ি আর দেশলাই ছিল। বিড়ি জ্বালিয়ে ঝাপ খুলে ঢুকলো ভেতরে।

কুপির সল্তে জ্বলে উঠতেই দেখা গেল—তার চোখে ভুরুতে নাকের ডগায় চিবুকে ঠোঁটের নীচে নয়া ঘাসের ওপর জমে থাকা ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মত ঘাম।

ঘরের চারদিকে তাকালো সে।

পাটি, ছেঁড়া কাঁথা, তুলো বেরিয়ে যাওয়া তেল চিট্‌চিটে বালিশ, ভাঙ্গা টিনের বাক্স, সুরই, হাঁড়ি—টুক্‌রো টুক্‌রো আধপোড়া বিড়ি, ভাঙ্গা কল্‌কে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

কুপি নিভে যাওয়ার আগে দেখা গেল—সুরই, হাঁড়ি, কলসি সব ঘরের কোণে সাজানো। বাক্সটা একপাশে—তার ওপর যুগল মূর্তিটা দাঁড়ানো। মাঝখানে পাতা। তাতে শুয়ে আছে ফুলরানী।

ঝাপ খোলা।

শুয়ে আছে ফুলরানী।

যত রাত করেই ফিরুক মোহনবাঁশি—সে একটুও নড়বে না, জাগবে না।

দেশলাই জ্বালিয়ে যা দেখবে মোহনবাঁশি, তাতে তার শরীরের আগুন ধপ্ করে জ্বলে উঠবে। যদি দেশলাই না থাকে—ঘরে ঢুকেই তার পায়ের পাতা এসে ঠেকবে ফুলরানীর বিরাট উরুতে।

চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করবে মোহনবাঁশি—হিবা কন্?

কোন জবাব দেবে না ফুলরানী। মরার মত পড়ে থাকবে। মোহনবাঁশি তখন তার শরীর হাতড়াতে হাতড়াতে মানুষ চিনবার চেষ্টা করবে। বুকে চুলে কোমরে হাত দিয়েই মোহনবাঁশি চমকে উঠবে।

তখন?

তখন কি আগুন জ্বলে উঠবে না?

ফিস্‌ফিস্ করে বলবে ফুলরানী—আমি।

মোহনবাঁশি যদি লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মত খট্ করে উঠে দাঁড়ায় তবে অন্য কথা—

কিন্তু যদি ঢেউয়ের মত তার বুকে আঁছড়ে পড়ে, তবে সে তক্ষুণি শক্ত বাহুর আড়ে মোহনবাঁশির গলা চেপে ধরে বলবে—বাঁশি, এই তোর ভালবাসা! জানোয়ার, তুই জানোয়ার।

বলেই কিল চড় মেরে চেঁচাতে চেঁচাতে সমস্ত পাড়া জাগিয়ে তুলবে।

সবার সামনে তাকে বেইজ্জতি করে ছাড়বে।

ফাঁদ পেতে শুয়ে আছে ফুলরানী মোহনবাঁশির ঘরে।

মোহনবাঁশির মুখ তখন আঁতুরা ডিপোর এক চায়ের দোকানে লট্‌কানো হ্যারিকেনের আলোয় ঝল্‌সে উঠছে।

আরো কয়েকটি মুখ আলো আঁধারে কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। লক্ষণ, যামিনী দা, ইয়াকুব, শীতল পাল, মধু কামার, নিতাই শীল। সবাই ভাবছে—কি করে পাড়াগুলোকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচাবে।

যামিনী দা বলছে—চল, আমরা মিছিল করে শহরে গিয়ে হাজির হই।

লক্ষণ বলছে—ও কিচ্ছু হবে না। ডাকাতি করতে হবে।

ইয়াকুব বলছে—আগে রিলিফের ব্যবস্থা কর।

মোহনবাঁশি কিছুই বলে না। সে শুধু ভাবে।

কথায় বলে—খালকুলের গাছকে যত্ন করতে হয় না। সে আপনি বেড়ে ওঠে, আপনিই গন্ধ ছড়ায়।

মোহনবাঁশিও ঠিক তেমনি।

ওকে ওর ঠাকুরদার কোলে রেখে ওর বাপ-মা মারা গিয়েছিল। কি করে দিন দিন বেড়ে উঠেছিল—এ এক আশ্চর্যের কথা। সবাই বলে—ছেলেটার গায়ে ফকিরের ফুঁক আছে।

মোহনবাঁশি—হাঁ, বাঁশির মতই তার গলার সুর। চোখে মোহন টান। কাঁচা, চল্‌চলে। ছিপ নৌকোর মত চলাফেরা, দিলখোলা হাসি। হাতের কাজ অদ্ভুত। চাকি ঘুরিয়ে হাত লাগাতেই এত সুন্দর সব সুরই কলসি বেরিয়ে আসতো—তা দেখে সবাই অবাক হয়ে বলতো—ইবা দেঁওতা, না মানুষ ?

মোহনবাঁশির মা ছিল শঙ্খনদীর ওকূলের কোন এক কায়েত ঘরের বউ।

তার স্বামী ছিলেন বাঁকাবাবু। সকালে চিঁড়ে দই খেয়ে হাটে গিয়ে আড্ডা, দুপুরে ফিরে স্নান সেরে ভাত খেয়ে ঘুম, বিকেলে আবার আড্ডা, তারপর গভীর ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রাত্রে বাড়ি ফিরতেন তিনি।

পান থেকে চুন খসলে বউকে ধরে বেদম মার।

এই মারের জ্বালায় বউটা মাঝে মাঝে পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দিত। কিন্তু মরতে পারত না। ডাঙ্গায় তুলে এনে আবার মার।

বউটা সব সহ্য করত। সবাই মনে করত সে ছিল বাঁজা।

এইসব যন্ত্রণা থেকে ছাড়া পাবার জন্য বউটা একদিন এক কাণ্ড করে বসল।

তখন মেলা বসেছে পতুয়ার বিলে। ঘোমটা পরা বউটা ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেল মানুষের ভিড়ে।

সন্ধ্যায় ঝিমিয়ে পড়া মেলায় জোনাকির মত আলো জ্বলে উঠতেই যে যার ঘরে ফিরে গেল। বউটার সঙ্গিনীরা কেউ উঁচু গলায় শেষবারের মত ডাক দিয়ে চোখ মুছলো—কেউ দূর থেকে পেছন ফিরে বারবার মেলার দিকে তাকালো।

আর এদিকে বউটা হাতি ঘোড়া ময়ূর পাখি—পুতুলের বিরাট স্তূপের পাশে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে কাত হয়ে শোয়া।

—হিবা কন্‌?

বাতাস-কাঁপা তেলের কুপিটা তুলে ধরে এগিয়ে এল মোহনবাঁশির বাবা।

বউটা একটুও নড়লো না। সে তখন ঘুমের ঘোরে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়ছে।

সকালে সব দোকানপাট উঠে গেছে।

এদিকে ওদিকে গুড়ের ভাঙ্গা কলসি—আঁখের ছোবড়া, তরমুজের খোসা, পচা ডিম, ভাঙ্গা উনোন, চিল আর কুকুরের ঝগড়া। চারদিকে শান্ত ঝিল্‌মিলে রোদ।

কাঁধে ঝাঁকা আর মাথায় পোটলা তুলে মোহনবাঁশির বাবা জিজ্ঞেস করলে—তুঁই কণ্ডে যাইবা?

বউটার পেছনের ছায়া নড়ে উঠল। ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইল কলাগাছের মত।

একথা ওকথা জিজ্ঞেস করার পর মোহনবাঁশির বাবা আঁচ করে নিল—বউটার একুলে ওকুলে কেউ নেই। নারায়ণ ভরসা। চল, আমার সঙ্গেই চল।

তার পেছন পেছন চলল মেলা থেকে মেলায়। যেতে যেতে ভুলে বসলো—সে ছিল এক কায়েত ঘরের বউ—তার স্বামী ছিল গ্রামের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি—যিনি দিনরাত বউকে ধরে পিটতেন, আর শালিশে আড্ডায় মুরুব্বিয়ানা করতেন।

একদিন বর্ষার রাতে ধলঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বউটা ধরা দিল মোহনবাঁশির বাবার বুকে।

দু'বছর পরেই মোহনবাঁশির জন্ম।

মোহনবাঁশি কাউকে দেখেনি। না তার বাবাকে, না তার মাকে। তার বুড়ো দাদাকে জিজ্ঞেস করলে বলতো—ওরা মরে গেছে। পাড়ার লোকে জানে—তার বাবা আর মা তাকে তার ঠাকুরদার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে বার্মায়। তার মায়ের বিশ্বাস—ওখানে গেলে শঙ্খকূলের সেই বাঁকা বাবুটা তাদের আর খুঁজে পাবে না। সে আজ অনেকদিন আগের কথা।

একটা লালপেড়ে সাদা শাড়ি যখন মোহনবাঁশির মনের দাওয়ায় দুলে উঠে আবার মুছে যায়—তখনি সে কাজ ফেলে দুম্‌দাম্‌ ঘাস মাড়িয়ে ধূলো

উড়িয়ে কাদা ছড়িয়ে গিয়ে বসে বোয়ালমারির চরে। যেখানে রোদ নরম হলে ঘাস থেকে মুখ তুলে গাইগুলো চলে যায়, ঝিঁঝিঁরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে,—আর, আকাশের লাজুক মেঘ ধীরে ধীরে নীল হয়ে যায়। তখনি ভাবনার হাওয়া বইতে শুরু করে তার মনে। ভাবে তার মায়ের কথা।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখে ফুটে ওঠে ফুলরানীর ফুলের মত মুখখানা।

বিয়ের আগের দিন ফুলরানী যখন পালাতে চেয়েছিল তখন মোহনবাঁশির বুকে ছিল দুর্ভিক্ষের হাহাকার।

পাঁচ বছর আগের মোহনবাঁশিটি তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। সেই নৌকো, সেই বিল, সেই মেলা আর সেই তেঁতুল গাছটাকে যুদ্ধের ধাক্কায় একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

না ভুলে উপায় কি। চোখের সামনে বৃন্দাবনের বউটা না খেতে পেয়ে মরে গেল।

ফুলরানী যেদিন তাকে পালাতে বলেছিল সেদিন সে ফিরছে সনাতনের বউটাকে চিতায় তুলে দিয়ে।

তার বুকে তখন হাহাকার।

বৃন্দাবনের চালাঘরে অন্ধকার, পাঁচকড়ির বাচ্চা মেয়েটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, সনাতন ছটফট করছে ভাতের জন্য—আর ফুলরানী তখন জিজ্ঞেস করছে, বাঁশি, তুই আমায় মন দিস্‌নি?

কি জবাব দেবে মোহনবাঁশি? চড় খেয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ফুলরানীর গর্জে উঠে চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল।

কি হবে ওই ভুল্‌কো তারায়। ওতো আকাশেরও নয়, মাটিরও নয়।

পরদিন ফুলরানী যখন পাল্‌কিতে চড়ে চলে যাচ্ছিল তখন মোহনবাঁশি একদল লিকলিকে বাচ্চাকাচ্চাদের হাঁড়িতে ঢেলে দিচ্ছিল রিলিফের চাল।

আর, পালকির দুয়ার খুলে ফুলরানী তার দিকে চেয়ে দৃষ্টির তীর হানছিল তীব্র আক্রোশে।

মনে মনে বলে উঠেছিল মোহনবাঁশি—মন, তুই সব ভুলে যা।

ফুলি, তুই আর তাকাস্‌নে আমার দিকে। যা, চলে যা। কি হবে ওই ভুল্‌কো তারায়! তুই আকাশেরও নস্‌, মাটিরও নস্‌। তোর চোখে মরণ নদী, চুলে সর্বনাশা ঝড়, রগে রগে সাপের টগবগানি।

ফুলি, আমি আর সেই মোহনবাঁশি নেই।

বদলে গেছি। অনেক বদলে গেছি। ওই চালাঘরটার মত, ওই কালো ছায়ার মত, সনাতন খুড়োর শরীরের মত বদলে গেছি। তোকে এখন আর স্বপ্নে দেখি না। স্বপ্নে দেখি—বিরাট বিরাট চালের পাহাড়, মাছ তরকারি। কখনো দেখি—রাত জেগে বসে আছি হাজার হাজার লাশ নিয়ে পাশে। কখনো দেখি—ঘরবাড়ি গাছ পাতা সব যেন ভাত ভাত ভাত করে কাঁদছে। কখনো দেখি—ভাতের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে বৃন্দাবনের বউ সনাতনের বউ আর গগন জ্যাঠা।

আমার মা নেই।

ছেলেবেলায় বুকটা যখন খাঁ খাঁ করে উঠত তখন ছুটে যেতাম তোর কাছে। বৃষ্টির মত দৃষ্টি হেনে তুই আমার সব যন্ত্রণা ভিজিয়ে দিতিস্। কত আবদার করেছি তোর কাছে। যখন বলেছি, চল্—সঙ্গে সঙ্গে তুই বেরিয়ে এসেছিস্। এখন আর সেই সব জোর খাটাবার মনের জোর নেই। এখন অনেক বদলে গেছি। যখন মনে হয় কেউ আমার নেই এই জগত সংসারে—তখন চুপচাপ বসে থাকি, কাঁদি, শুয়ে থাকি।

ফুলি, তুই আমায় ভুলে যা।

ফুলরানীর মুখখানা মোহনবাঁশির চোখে ফুটে উঠলে আরেকটি মেয়ের ঝাপসা মুখ কেঁপে ওঠে তার চোখের তারায়—যার মুখ দেখেনি—যার গায়ের রঙ কাঁঠালের কোয়ার রঙের মত কি বিকেলের রোদের মত তা কোনদিন দেখেনি। এমন একটি মেয়ের মুখ উঁকি দেয় মাঝে মাঝে।

না দেখলেও তার নামটা জানে মোহনবাঁশি।

পুতুলি।

পুতুলি হরিযুগীর মেয়ে। যুদ্ধের আগুন লাগতেই প্রথমে জ্বলে গেল জানালিহাটের যুগীপাড়াটা। ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে-মরদ বেরিয়ে গেল ভিটে ছেড়ে।

একদিন জানালিহাট ইষ্টিশনের চায়ের দোকানে বসে মোহনবাঁশি বিড়ি ফুঁকছিল—এমন সময় হরিযুগী এসে ভ্যা করে কেঁদে জড়িয়ে ধরল তার দু'টি পা। ঘটনা কি? ঘটনা ভয়ানক। আজ সকালে মতি দালাল তাকে লোভ দেখিয়ে গেছে—পুতুলিকে বেচলে পাঁচশ' টাকা পাওয়া যাবে।

কাঁদতে কাঁদতে হরি বলল—আঁয়ারে বাঁচা অ পুত। আঁয়ার পুতলি সাহেব পাড়ার খান্‌কি হইত্ ন পারিবো।

মুহূর্তে মোহনবাঁশির মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল এক সরুগলি। তার এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো মেয়েলি ছায়া। কারো ঠোঁটে বিড়ি, কারো কারো খোঁপায় চাঁপা বেলা জুঁই। কেউ গুনগুন করে গাইছে—আমার এ সাধের বাগানে একজোড়া ডালম্ ধইরাছে।

শিউরে উঠল মোহনবাঁশি।

হরিকে জড়িয়ে ধরে বলল—কোন চিন্তা নাই। আঁই তোঁয়ার পুতলিরে বিয়া কইর্‌গ্যাম্।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উপোসী রোগা হরিযুগীর মুখাবরণে ফুটে উঠল খুশির কান্না—রুক্ষ রোদেপোড়া জমির ওপর নেমে আসা এক পশলা বৃষ্টির মত।

তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল—তুই আঁয়ার বাপ, তুই আঁয়ার বাপ।

মোহনবাঁশি কথা দিয়েছে—পুতলিকে সে বিয়ে করবে।

পুতলি—অর্থাৎ পুতুল—সেই পুতুলের দেহে মনে বইয়ে দেবে প্রাণের নদী।

দেহপশারিণীর সরু গলিটা মুছে গিয়ে মোহনবাঁশির চোখে ফুটে উঠল একটি সরু পথ—যার দু'ধারে কলাই মরিচ রাই সরিষার খেত।

সেই সরু পথ দিয়ে কাঁখে কলসি নিয়ে এগিয়ে আসছে একটা কলাপাতা রঙের শাড়িপরা বউ। নাকে নাকবোলক্, আধভাঙ্গা চাঁদের মত কপালে জ্বলজ্বলে টিপ—তার নিচে যেন দুটো কোকিল আছে বসে।

একটু স্বপ্ন, একটু মায়া, একটু ভালবাসা আর মাথায় টোপর ও গলায় রঙীন কাগজের মালা পরে—সাথে একজন পাতার সানাই একজন দগর-ওয়ালা নিয়ে মোহনবাঁশি যেদিন হরিযুগীর চালাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল—তখন কেউ তাকে বরণ করতে আসেনি।

অন্ধকারে গুম মেরে বসেছিল চালাঘরখানা।

পাশের আমগাছটা একবার জ্বলছিল, একবার নিভছিল। সানাই শুনে কেউ এগিয়ে এল না। গতকাল দুপুরে বণিকদের বাড়িতে দরিদ্র নারায়ণ সেবার খিচুড়ী খেয়ে সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সকালে মারা গেছে হরিযুগী, হরিযুগীর বউ আর কচুর লতির মত বাচ্চাটা।

পুতলি বিকেল অবধি ছিল গোঙাতে গোঙাতে।

দুর থেকে পাতার সানাইর সুর শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ আগে নীরব হয়ে গেছে।

পাড়াটা নিঝুম।

ভিটে সব ফাঁকা। একটা উজাল জ্বালিয়ে নিয়ে মোহনবাঁশি ঢুকেছিল হরিযুগীর ঘরে।

ঢুকেই সুপোরী গাছের মত স্থির হয়ে রয়েছিল। তার কল্পিত বউ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথায় জটা জটা চুল, মজা মুখ, চুপসে যাওয়া মাই, হাড় বের করা কাঁধ। সে ছবি মনে পড়লে মোহনবাঁশির মুখ আকাশের মেওলার মত হয়ে যায়।

সে আর বিয়ের কথা ভাবে না।

কি হবে আর বিয়ের কথা ভেবে! যেদিকে তাকাও সেদিকেই চিতার ধোঁয়া। সে বলে—বিয়ে তার হয়ে গেছে। সেই রঙীন কাগজের মালাটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে টিনের বাক্সে—যেখানে ভাঁজ করা আছে তার মায়ের লালপেড়ে শাড়িখানা।

মোহনবাঁশির ভাবনা এখন কাহারপাড়াকে নিয়ে। কাহারপাড়া যেন তার বুকের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভাত ভাত করে চেঁচাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে—বাঁচাও, বাঁচাও।

কি করে বাঁচাবে!

যেদিকে যাও সেদিকেই একই কান্না। তেলিপাড়ার একদল লোক ভাত ভাত করে এখানে সেখানে ঘুরে জানোয়ারের মত হয়ে গিয়েছে। চেনাই যায় না। ময়লা লম্বা লম্বা নখ, জটবাঁধা চুল, লেংটা।

মোহনবাঁশি ওদের বলেছিল—মিলিটারী ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে--খুড়া, তোঁয়ারা ঘরৎ য।

ওরা হা করে তাকিয়েছিল মোহনবাঁশির দিকে।

মোহরার ঢুলী পাড়ায় সন্ধ্যা হলে আগে ঢুম্‌ঢুমাঢুম্ বোল শোনা যেত।

এখন শেয়াল ডাকে সেখানে। ভিটের ঘরগুলো কাত হয়ে পড়া। সূর্য ওঠে কি ডোবে—মাটি আছে কি নেই,—তা আর জানে না ঢুলীপাড়ার লোকেরা।

পাঁচলাইশের হাঁড়িপাড়ার চালাঘরগুলো একদিন সাঁৎ করে জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাসি—খেঁদু পাগলার। তার হাতে জ্বলন্ত উজ্বাল। সেই-ই ধরিয়ে দিয়েছে আগুন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—খা, খা। সব খেয়ে যা। মরা মানুষ সব খেয়ে যা।

মোহনবাঁশি তাকে ধরতে গিয়েছিল। ইয়াকুব আর নিতাই পাল তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তুইও পাগল হলি নাকি।

আগুন না লাগালে মরা মানুষের গন্ধে টেকা যেত না।

হু হু করে উঠেছিল মোহনবাঁশির বুক।

মোহনবাঁশির ভাবনা এখন—কি করে বাঁচানো যাবে সবাইকে। যামিনী দা, লক্ষ্মণ, নিতাই শীল, ইয়াকুব, শীতল পাল—সবার দিকে তাকিয়ে সে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—মিছিল টিছিল আর নয়। যারা ধান চাল জমা করে রেখেছে তাদের কাছে যেতে হবে আমাদের। বলতে হবে—বাঁচাও সবাইকে।

বলেই মোহনবাঁশি কারো কাছে কোন জবাবই পেল না। সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে হা করে। হ্যারিকেনটা দুলছে সবার মুখের সামনে।

গভীর রাত তার হাত বাড়াচ্ছে কাহারপাড়ার দিকে। গাছে জোনাকী, আকাশে তারা। ঝিম ধরে বসে আছে ঘরগুলো।

বড় সড়ক থেকে নেমে বিলের আল্ ধরে এগিয়ে আসতে লাগল মতি দালাল। পেছন পেছন দুটো মূর্তি, দুটো গোরা সোলজার। টর্চের আলো কখনো জ্বলছে, কখনো নিভছে।

মতির কাছে এ কাজ নতুন নয়। কত সোলজারকে সে এমনি পেছন পেছন লেলিয়ে নিয়ে এসে কত মেয়েকে ধরিয়ে দিয়েছে তাদের জিবের সামনে।

মতি বলে—এ কাজে পয়সা আছে। কুম্‌ছাড়া কাজ—একটু হুসিয়ার থাকলেই হল।

মতি দালাল।

বাপ পর্যন্ত পালকির বেয়ারা ছিল। বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথেই মতি জানিয়ে দিল—ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি অন্য কাজ করব। এর জিনিস ওকে দেব, ওর জিনিস একে—ব্যস, মাঝখান থেকে আমি পাব টাকা। দুনিয়াটাই তো এই দালালির ওপর চাক্ দিচ্ছে।

মতির প্রথমে হাতেখড়ি হয়েছিল বিন্দু খুড়ীর পায়রা জোড়া দিয়ে।

কচি পায়রাগুলো উঠোনে বসে ধান খাচ্ছিল।

মতি এসে বলল—খুড়ী কইতর বেচিবা?

—না।

—বহুৎ দাম পাইবা। এক টাকা।

এক টাকা শুনে বিন্দু খুড়ীর আমের আঁটির মত চিবুকখানা নড়ে উঠেছিল। রাজী হয়ে গিয়েছিল তখুনি।

বিকেলে আমগাছের ছায়ায় একটি লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে একটি টাকা খুড়ীর হাতে তুলে দিয়ে পায়রাগুলোকে নিয়ে চলে গিয়েছিল মতি।

মতির বয়স তখন দশ কি এগারো বছর।

পায়রা থেকে ছাগল, ছাগল থেকে গরু, গরু থেকে ধান, ধান থেকে জমি—তারপর জমি থেকে মেয়েমানুষ। এই সবের দালালী করতে করতে মতির বয়স এখন পঞ্চাশটা খাল বিল পেরিয়ে গেছে।

মতির বউটা বলে—ওই কাজ ছেড়ে দাও। তোমার মেয়ে আছে, ছেলে আছে, ছেড়ে দাও।

দাঁত দিয়ে জিবের ডগা চেপে ধরে বলে মতি—ছাড়ি দিয়ম্।

মতি অনেকবার চেষ্টাও করেছে। পারেনি।

সোল্‌জারদের টাটকা নোটগুলো দেখলে সে তার সব কিছু ভুলে যায়—ভুলে যায় সে একটি মানুষ, তার সাজানো গোছানো সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আছে টিনের ছানি দেওয়া দোতালা মাটির ঘর, লাঙ্গল জোয়াল গোলাঘর গোয়ালঘর।

টর্চের আলো ছড়িয়ে এগোচ্ছে মতি। পেছন পেছন গোরা সোল্‌জার দুটো। রাত বাড়ছে।

হঠাৎ একটা মেয়েলি চিৎকার শুনে অন্ধকার দাওয়ার ওপর চম্‌কে উঠল শ্রীনাথ।

নকুলের বউয়ের গলা বলেই মনে হল।

নকুল আজ তিনদিন হল উধাও। বউটা সকালে শ্রীনাথের বউয়ের কাছে এসেছিল দু'সরা চালের জন্য। শ্রীনাথের বউ বলেছিল—এখন তো কিছু নেই, রাত্রে আসিস্। চাল কেন—তোকে আমি রুটি মাংসও দেব।

আহা! বউটা খুব লাজুক।

লক্ষ্মীছাড়া নকুলটা এমন সতীলক্ষ্মীকে একলা ফেলে চলে গেল। গাল দিতে দিতে শ্রীনাথ দাওয়া থেকে উঠে ঘরে গেল। সেখান থেকে বাতি জ্বালিয়ে এনে দাওয়ায় এসে বাঁশের ফালি দিয়ে একটা উজাল ধরিয়ে নিল।

উজাল হাতে শ্রীনাথ চলল নকুলের ঘরের দিকে।

নকুলের বউটা সকালে শ্রীনাথের ঘর থেকে এসে সেই যে দাওয়ায় খুঁটি ধরে বসেছিল আর নড়েনি। নড়বেই বা কেমন করে! আজ তিনদিন উপোস। সমস্ত শরীর বেশদ্।

দুপুরে মতি এসে হাজির।

—এই নকুল!

বউটা ঘোমটা টেনে ঘরের ভেতর গিয়ে বলল—নেই! নকুলের কাছ থেকে দুটো টাকা পেত মতি। সেই প্রসঙ্গ না তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল—চাইল্ ডাইল্ আছে তো?

—না।

একটা পাঁচ টাকার নোট দাওয়ায় রেখে বলল মতি—ধরো, লও। রাতিয়া সাজিগুজি থাইক্য। এই কাম কর—নইলে মরি যাইবা।

বলেই মতি দালাল ছায়ায় ছায়ায় সরে গিয়েছিল।

বউটা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল নোটটার দিকে। ওটা দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া যাবে—চাল ডাল কুমড়োর ডগা, শুটকি মাছ,—সব।

বউটা নোটটার দিকে চেয়ে রইল দুপুর থেকে বিকেল অবধি। সন্ধ্যা হতেই সেটা উড়ে গিয়ে উঠোনে পড়ে তার দৃষ্টি থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর কি মনে করে বউটা চারদিকে হাতড়ে বের করল একটা তাল-পাতার ঝাঁপি।

তার থেকে একটা শাড়ি নিল তুলে। শাড়িটা তার বিয়ের। ওটা পরলো। বাঁশের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খিল্‌খিল্ ক'রে হাসলো, কাঁদলো, গুনগুন করে গাইলো—ওরে ও বন কইতরা। এ জনমে তার লগে আর ন হৈব দেখা। তুমি তারে কইও আমার কথা।

গাইতে গাইতে হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল কতকগুলো গোরা সোল্‌-জারের বীভৎস মুখ।

তখুনি সে পরণের শাড়িটা নিজের গা থেকে খুলে নিয়ে দড়ির মত পাকিয়ে ঘরের ভেতরের চালের সঙ্গে বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ চিৎকার দিয়ে চিরকালের জন্য চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর উঠোনে টর্চের আলো।

সোল্‌জার দুটোকে নিয়ে মতি এসে দাঁড়িয়েছে। একজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মতি বলছে—গো আন্‌ সাব।

সোল্‌জারটা ভেতরে ঢুকেই টর্চ মেরে ফাঁসে ঝোলা বউটাকে দেখে শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল।

মতি অবাক।

সে ঢুকল ঘরে। টর্চের আলো জ্বেলেই আবার নিভিয়ে দিল। তারপর তার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। পালিয়ে গেল সে।

আরেকজন গোরা সোল্‌জার, যে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, সে ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ঢুকল ঘরে।

টর্চ জ্বেলে তাকিয়ে রইল সে নকুলের বউয়ের ঝোলান নগ্ন দেহটার দিকে।

একটুকুও নড়ল না, একটুও শিউরে উঠল না ভয়ে বা আপশোষে।

বরং অর্ধদগ্ধ সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জড়িয়ে ধরল মৃত বউটাকে।

আর, তখুনি উজ্জাল হাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল শ্রীনাথ।

গলা খাঁকারি দিল, ডাক দিল নকুলের নাম ধরে—তারপর ঘরে ঢুকেই তার দুই চোখ পাথরের মত স্থির:

শ্রীনাথের দেহে কে একজন আক্রোশে জ্বলে উঠল। মুহূর্তে উজ্জালের জ্বলন্ত আগুন সে ওই গোরা সোল্‌জারের চোখে মুখে লাগিয়ে দিল।

বিকট চিৎকার দিয়ে জানোয়ারের মত লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল সোল্‌জারটা।

শ্রীনাথ থ। কি জানোয়ার। আহা বউটা মরে গেল! বুকে তার শোকের নদী—কাঁদতে কাঁদতে যেন একূল ওকূল ভেঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে শ্রীনাথ পা বাড়িয়ে দিল পথে—যে পথে তার বউ আর মেয়েটা চলে গেছে সন্ধ্যায়।

দু'ধারে ঝাউগাছ রেখে বৃহৎ সড়কটা চলে গেছে রাঙামাটির দিকে।

সেখানে এসে হাঁফাতে লাগল শ্রীনাথ।

সড়কের ওপর সাঁ সাঁ করে একটার পর একটা জিপ লরি চলে যাচ্ছে—তার আলোয় ঝলসে উঠছে শ্রীনাথের ঘর্মাক্ত মুখ। কিছুদূরে একটা বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে ওঠে।

—অমা, মারে, আইও।

তার মেয়ে।

লুকিয়ে ছায়া হয়ে সে ঝোপের ধারে গিয়ে বসল। আর, ঝোপের ওপাশেই সোল্জারটা কাকে যেন বলছে—এই চিকো, হাম্ টুম্‌কো বহুৎ রুটি দেগা।

সঙ্গে সঙ্গে খিল্‌খিলে মেয়েলি হাসি।

হাসির শব্দ শুনে তার শরীর অবশ।

এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে—রোজ সন্ধ্যায় বউটা সেজেগুজে যায় কোথায়! রুটি মাংস টিনভরা দুধ রোজ আসে কোত্থেকে! সব ভেবে তার নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। বউয়ের গা বিক্রির রোজগার সে এতদিন খেয়েছে। আর না। ঝোপের ধারে ওৎ পেতে বসে রইল সে।

সোল্জারটা টর্চের আলো ফেলে চলে গেল। ওদিকে মেয়েটা চেঁচাচ্ছে—অমা, আইও।

বউযের ছায়া ঝোপের ওধার থেকে এধারে আসতেই তাকে লাফিয়ে জড়িয়ে ধরে নিচে ফেলে দিল শ্রীনাথ। ছটফট করতে করতে চেঁচাতে চেষ্টা করল বউটা। পারল না। শ্রীনাথের শক্ত থাবা তখন তার গলা টিপে ধরেছে।

তবু অতি কষ্টে বলেছিল—আমি কি করব বল! তুমি তো রাতদিন পুতুল নিয়েই মশগুল। ভাত আসবে কোত্থেকে। কবে তোমার মেলা বসবে—তা ভেবে তো পেট ভরবে না। তাই আমি এই পথ ধরলাম। আমি—

আর কিছুই বলতে পারল না বউটা।

ওদিকে মেয়েটা চেঁচাচ্ছে—অমা, মারে, আইও।

শ্রীনাথ এসে দাঁড়াল মেয়ের সামনে।

খুশিতে ডগমগ হয়ে বাপকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল মেয়েটা—অমা, বাবা আইস্তে।

একটানে মেয়েকে কাঁধে তুলে নিয়ে শ্রীনাথ চলতে শুরু করে দীর্ঘ সড়ক ধরে।

মেয়ে জিজ্ঞেস করে—মা ন যাইব ?

ঝোপের দিকে চোখ ফেলে আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে চলতে জবাব দেয় শ্রীনাথ—না ।

একদল গোরা সোল্জার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বুটের শব্দ তুলে এসে দাঁড়ায় কাঁহারপাড়ার ঘরগুলোর সামনে ।

এসেই তিনভাগ হয়ে গেল । সবার হাতে রাইফেল ।

ফাঁদ পেতে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে ফুলরানী ।

ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখছে—ভোরের নদী, সূর্য উঠছে পাহাড়ের চূড়ো বেয়ে—মায়ের স্তনে ঠোঁট লাগান শিশুর মত । ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে । ঠাণ্ডা হাওয়া ।

ছইয়ের নিচে বসে আছে সে । সাম্পান বাইছে মোহনবাঁশি । জিজ্ঞেস করছে ফুলরানী—বাঁশি, তুই আমায় কোথায় নিয়ে চলেছিস্ ?

মোহনবাঁশির দাঁড়টানার শব্দই যেন জবাব দিচ্ছে—তোর দেশে ।

বাঁকের পর বাঁক পেরোচ্ছে—খেজুর আম জাম কাঁঠল সুপারি নারিকেল গাছগুলো পেছনে সরে যাচ্ছে—সব সরে যেতে যেতে একটা ঘাটে এসে নৌকা লাগতেই ফুলরানী চেঁচিয়ে উঠল—না, না, আমি যাব না ।

মোহনবাঁশি শব্দহীন হেসে ছইয়ের ভেতর ঝুঁকে তাকিয়ে বলল—ফুলি, তোর দেশ এসে গেছে ।

ফুলরানী মাথা দুলিয়ে বলল—না ।

ঘাটে দাঁড়িয়ে তার বুড়ো জোতদার স্বামী চেঁচাচ্ছে—ওগো এস ।

ডুক্‌রে কেঁদে উঠে মোহনবাঁশিকে জড়িয়ে ধরে বলল ফুলরানী—বাঁশি, আমি ওই বুড়োর ঘর করব না। আমি তোকে ভালবাসি । তুই ছাড়া আমার কেউ নেই বাঁশি, আমি তোকে ভালবাসি ।

মোহনবাঁশি ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দেয়—ফুলি, আমার অনেক কাজ । তোকে নিয়ে ঘর করা আমার সাজে না ।

ফুলরানীর মুখ জলে ডোবা ।

তাকে ঘাটে তুলে দিয়ে মোহনবাঁশি নৌকোর ছপছপ শব্দ তুলে চলে গেল ।

তার বুড়ো স্বামী খক্‌খক্ করে কাশতে কাশতে বলছে—বউ, চল্ ঘরে যাই ।

আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে ফুলরানী—বাঁশি, তুই আমায় নিয়ে যা। বাঁশি, বাঁশি, বাঁশি।.........

স্বপ্নের ঘোরে চেঁচাচ্ছিল ফুলরানী।

এমন সময় একদল সোল্‌জার এসে ঢুকল সেই ঘরে। কয়েকটি টর্চের আলোয় ফুটে উঠল ফুলরানীর দেহের ভরা গাঙ।

একজন গিয়ে চেপে ধরল তার মুখ। আরেকজন গিয়ে শাড়িখানা ছিনিয়ে নিল গা থেকে।

তারপর একজনের পর একজন।

বিধ্বস্ত জমির মত চিৎ হয়ে পড়ে রইল ফুলরানী।

বাইরে রাইফেলের গর্জন।

মতি ভাত খেতে বসেছিল। তড়াক করে এক লাফ দিয়ে সে গুদাম ঘরে চলে গেল।

ডাকাত এসেছে। তার ঘর লুঠ করবে। গুদামঘরে একটা রাইফেল আছে—ওটা সে এক মিলিটারির কাছ থেকে কিনেছিল।

রাইফেলটা নিয়ে সে চুপি চুপি সবাইকে ডেকে একঘরে বেঁধে রেখে দোতলার ওপর উঠে গেল।

সেখান থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে লাগল।

এদিকে একসাথে গর্জে উঠল দশবারোটা রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জিনিস দোতলা থেকে মাটিতে পড়ল। শব্দ হল ঝুপ।

মতির ঘরে গিয়ে ঢুকল সোল্‌জাররা। ব্যাঙকোহাল্ করে উঠল সবাই।

লক্ষ্মণের মা আশি বছরের থুড়থুড়ে বুড়ি। খাওয়া নেই দাওয়া নেই—তবু কোনমতে বেঁচে আছে। রাইফেলের শব্দ শুনে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কি মুস্‌কিল। এত রাইতে বাজী কেয়া পুড়ের্।

বলেই আরেকটা গুড়ুম করে শব্দ হতেই উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

সনাতন আর তার মেয়ে সকালে গিয়েছিল ষোলসহর ইস্টিশানে।

প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষে করে চার পাঁচ সের চাল পেয়েছিল। মেয়েটা উনোনে হাঁড়ি চাপিয়ে বসে আছে। সনাতন ক্লান্তিতে চাটাইয়ে শোয়া।

আর, বাইরে গর্জন—রাইফেলের।

মেয়েটা চিৎকার করে লাফ মেরে জড়িয়ে ধরল বাপকে।

চারজন সোল্‌জার এসে ঢুকল ঘরে।

মেয়েটা মুখ লুকাল সনাতনের বুকে—ভয়ার্ত কুকুরছানার মত।

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুন্।

দাওয়ার ওপর সাজানো পুতুলগুলো ভেঙ্গে গেল শ্রীনাথের। ঘরে কাউকে না পেয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল সোল্‌জাররা। সেই ঘরপোড়া আগুনে দেখা গেল উঠানে দাঁড়িয়ে মতির ছাগলের বাচ্চাটা একটানা চেঁচাচ্ছে।

কসাইপাড়ায় হৈ চৈ।

ভাঙ্গা সাঁকোটা পেরোলেই কসাই পাড়া। সেখানে গিয়ে ঢুকেছে সোরজাররা।

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ।

দূর থেকে গুলীর শব্দ শুনে মোহনবাঁশি একলাফে বেরিয়ে পড়ল আতুরার ডিপোর চায়ের দোকান থেকে।

লক্ষ্মণ, যামিনী দা, ইয়াকুব, নিতাই, মধু কামারও ছুটতে লাগল কাঁহার-পাড়ার দিকে।

ওরা চুপিচুপি এসে থামল লক্ষ্মণের ঘরের পেছনে।

সবাইকে ফিস্‌ফিস্ করে মোহনবাঁশি কি বলল। তা শুনে যামিনী দা, শীতল, নিতাই, মধু কামার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে গেল।

মোহনবাঁশি আর ইয়াকুব বুকে ভর দিয়ে কখনো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় তার ঘরের দিকে।

গোরা সোল্‌জাররা তখন কসাইপাড়ার ঘরে ঘরে।

নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই মোহনবাঁশির পায়ে ঠেকল ফুলরানীর অচেতন দেহ।

রক্তাক্ত, ভেজা।

—কে ?

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল ইয়াকুব। পরমুহূর্তেই তা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

—ফুলি ?

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মোহনবাঁশি গিয়ে বসল ফুলরানীর শিয়রে। ডাকল—ফুলি, ফুলরানী।

জবাব নেই।

মোহনবাঁশি তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে তালপাতার ঝাঁপি থেকে মায়ের লালপেড়ে শাড়িটা বের করে এনে ফুলরানীর শরীরে পরিয়ে দিল। সুরই থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে তা ছিটিয়ে দিল ফুলরানীর চোখে মুখে চুলে। পাখার হাওয়া দিল। ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল কয়েকবার।

রাগে ফুলতে ফুলতে ইয়াকুব তখন ছুটে গেছে বাইরে। যে করে হোক চুপেচাপে একজন সোল্‌জারকে সে আজ রাত্রে ধরবেই।

চারিদিকে হৈ চৈ শব্দ।

এ গ্রাম ও গ্রাম ভেঙ্গে লোকজন আসছে লাঠি নিয়ে, শেল্‌ বল্লম্‌ নিয়ে। হাতে হাতে জ্বলন্ত উজাল। হাজার হাজার জ্বলন্ত চোখ যেন জোনাকির মত ধেয়ে আসছে।

সোল্‌জাররা গুলী ছোঁড়া বন্ধ রেখে কসাইপাড়ার পুকুরের অন্ধকার পাড়ে এসে দাঁড়াল।

উন্মত্ত তরঙ্গের মত চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে। সোল্‌জাররা লাইন করে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ছুড়তে লাগল রাইফেলের গুলী।

ধড়াৎ ধড়াৎ করে পড়ে গেল একঝাঁক লোক।

চিৎকার, কান্না, কোলাহলে কেঁপে উঠল কসাইপাড়ার অন্ধকার। পেছন থেকে সোল্‌জারদের ওপর বর্ষণ শুরু হল লাঠি, ছোরা, আর জলন্ত আগুন।

ওরা আর দাঁড়াতে পারল না। হাজার হাজার লোকের গর্জন শুনে ওরা পালাতে শুরু করল। কেউ পালিয়ে গেল, কেউ ধরা পড়ল।

তারপর জনতরঙ্গের বিরাম নেই।

ষোলসহর, পাঁচালাইশ, ফতেয়াবাদ, নাসিরাবাদের লোকজন পায়ের শব্দ তুলে গমকে গমকে এগিয়ে আসছে।

মোহনবাঁশি মৃত ফুলরানীর শিয়রে বসে তখন ডাকছে এক একজনের নাম ধরে।

—ও মতি খুড়া!

মতি দালাল ব্যাঙের মত উঠানে চিৎ হয়ে শোয়া। জিব বের করা।

—ও নকুল ভইজ।

নকুলের বউ ফাঁসের দড়িতে শুকোতে দেওয়া ধোবার কামিজের মত লটকাচ্ছে।

—ছিরিনাথ জ্যাডা, ও ছিরিনাথ জ্যাডা।

শ্রীনাথ তখন মেয়েকে কাঁধে নিয়ে হেঁটে চলেছে দীর্ঘ সড়ক ধরে। দুধারে ঝাউ, পলাশ, জারুল গাছ। পাখি ডাকছে। পূর্ব আকাশ লাল।

সূর্য আসছে রাতের অন্ধকার ঢেকে দিতে।

ছাতা

আলাউদ্দিন আল আজাদ

শহরতলীর রাস্তাটা যেখানে একটু চওড়া হবার চেষ্টা শুরু করেছে, তার একপাশে সরু গলিটা, সহজে চোখে পড়ে না। যাত্রীবোঝাই বিপুলতর বাস-গুলো যখন গোঙাতে গোঙাতে হেলেদুলে এগুতে থাকে, নাকে রুমাল চেপে পথচারীকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, আর তখনই তা নজরে পড়ার সম্ভাবনা। ডান পাশে বড় বাড়ির প্রাচীরে হাত ঠেকিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকলে, আবছা অন্ধকার দৃষ্টিকে ব্যাহত করবে, তারপর মনে হবে, কোন পাহাড়ের সুড়ঙের ভিতরে প্রবেশ করা হচ্ছে স্বেচ্ছায়। নীচে নর্দমা। যাদের রুমাল থাকবে না, বাঁ হাতে নাকটা চেপে ধরতে হবে সজোরে। এভাবে আরো কিছুদূর এগুলে দেখা যাবে, একটু ফাঁকা, নীল আসমানের এক টুকরো, প্রৌঢ় পেয়ারা গাছটা মরিয়া হয়ে ডালপালা বাড়িয়ে রেখেছে, আর তার নীচেই দু'চালা করগেটের ঘরখানা। বারান্দাটা বড় হলেও নানা রকম জিনিস-পত্রে ঠাসা—ভাঙা চেয়ার, পাঠশলা-লাকড়ি, খড়-বিচালীর স্তূপ। দুয়ারের কাছাকাছি বাঁশের খুটি ঘেঁষে একটা বেতের সোফা, ভেঙে লেপটে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণছে।

বারো তেরো বছর আগে নতুন বৌকে প্রাচুর্যের ইংগিতে হকচকিয়ে দেবার অবচেতন ইচ্ছায় কেনা এই সোফাটায় বসে সকাল-বিকেল দু'বার নিবিষ্টমনে ধূমপান করেন আমিনুদ্দিন, সরকারী দপ্তরখানায় একশো পঁচিশের মালিক। বড় ছেলেটা জ্যামিতির সূত্র মুখস্থ করে মাদুরে বসে, ছোট ছেলেমেয়েগুলো সুর করে চেঁচায় প্রথম পাঠ দ্বিতীয়পাঠ সামনে। সামনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে তাঁর নাক কানের পাশ দিয়ে, নানা দার্শনিক তত্ত্বে তাঁর মগজটা খোপে খোপে ভরে উঠতে থাকে।

রোকেয়াবানুর মেজাজ ভাল নয়, এমন কথা তাঁর বড় শত্রুও বলতে পারবে না। তবে এ জিনিসটা তাঁর দু'চোখের বিষ—এই গোমড়া হয়ে

বসে থাকা, মিছিমিছি ভাবনা-চিন্তায় মন খারাপ করা। আমিনুদ্দিন সব শোনেন, কিছু বলেন না ; সস্তা চশমায় ঢাকা তাঁর ক্লান্ত চোখের তারায় এমন একটা ভাব খেলে, যাকে পত্নী-প্রেম মুগ্ধতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য বিবৃত করতে গেলে, বলতে হয়, এতদিনকার একটানা দাম্পত্য জীবনের পরেও স্ত্রীকে তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। এতে বেশ কিছুটা নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই ; কারণ তাঁর ধারণা ছিল, প্রথম প্রথম উভয়পক্ষ থেকেই আগ্রহের আতিশয্য থাকে, দৈনন্দিন টুকিটাকি ব্যবহারে, কথাবার্তায় ; বৌ মায়ের বাড়ি গেলে, বিরহের কবিতা লিখতে না বসলেও, অন্তত অকারণে দুপুররোদে হেঁটে বেড়াতে, কিংবা বাপ-মায়ের ওপরে কথায় কথায় মেজাজ ফলাতে অনেককেই দেখা গেছে ; আর অতি আগ্রহে মায়ের বাড়ি গেলেও, হাতে মেহেদির ছোপ লাগানো, বিয়ের শাড়িপরা অপর প্রাণীটির ঘুমও যে গভীর রাত্রিতে মাঝে মাঝে ভেঙে যায়—এও সবারই জানা কথা। কিন্তু সাত আটটা নতুন মানুষকে দুনিয়ার আলো দেখাবার পরও দীর্ঘশ্বাস-কাতরতা একটু কমে আসাই স্বাভাবিক।

অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক তার উল্টো।

এ যেন একটা রুটিন হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতেই ছেলেমেয়েদের খাইয়ে গিন্নী একেবারে সাফসোফা। নিজেদের ভাগটুকু আলাদা করে রাখার অভ্যাস তার। একটা মাদুর পেতে ভাত বেড়ে দেন স্বামীকে, ঝাঁপের কোণায় নিজেও থালা নিয়ে বসেন একই সংগে। আমিনুদ্দিন আপত্তি করেন না, কিছু মনেও করেন না ; মেয়েরা আজকাল বাজারে বেরুতে শিখেছে, আর স্বামীর নাম নেওয়া, এক সংগে বসে খাওয়া—এত নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার। যুগের সাথে স্ত্রীর অগ্রগতি দেখে বরং তার আনন্দই লাগে। খাওয়া-দাওয়া সেরে হারিকেনটা সিথানে রাখেন বিছানায়, তামাক সেজে হুকোর নলটা এগিয়ে দেন রোকেয়াবানু। তারপর পানের ডিবাটা এনে উপুড় হয়ে বালিশে ভর দিয়ে গভীর যত্নে খিলি তৈরী করেন গণ্ডাদুয়েক। দু'জনের মাঝখানে রাখেন পানের ডিবাটা। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর সলতেটা কমিয়ে দেন হাত বাড়িয়ে। চৌকির নীচের দিকে মেঝেয় ছেলেপুলেরা শোয়, এমনকি কনিষ্ঠতম জাতকটাও তক্তপোষে শোওয়ার নাগরিক অধিকার পায় না।

এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। তামাকের ধোঁয়া আর পানের গন্ধ বাতাস ভারী করে তুলতে থাকে।

কিছুদূরে রাস্তায় শেষ যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। এ-ছাড়া ঘরময় আদিম নীরবতা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের ঘোরে কঁকিয়ে ওঠে মাঝারি মেয়েটা, বারান্দায় মুর্গির টঙে কদাচিৎ কক্কক্, পাখার নড়াচড়া। পানের ডিবাটা সিথানে রেখে রোকেয়াবানু বলেন, 'ওগো শুনছো।'

'হু!'

নাকে কিংবা মুখে ঠিক বুঝা যায় না, একটা অদ্ভুত শব্দ।

'আমাদের সেই মুর্গিটা দুটি ডিম দিয়েছে।'

'হু!'

'তুমি তো বলছিলে, জবে' করে ফেল। তোমার খালি বাজে গোঁ। জবে' করলে একদিনেই সব খতম হয়ে যেত।'

'হুঁ!'

মুর্গিটার জাত ভাল। আমি তো দেখেই বুঝেছিলাম, দেখো কেমন বাচ্চা দেয়। তা আর বলব কি, দেখলেই তো তোমার জিভ টসটস্ করবে। বলবে এটা জবে' কর, ওটা কর। মুর্গির বাচ্চার কত দাম বাজারে। তোমার কি চোখ আছে? আমাদের গাঁয়ের বেন্দার মা মুর্গি বেচেই টিনের ঘর তুলেছে।'

আমিনুদ্দিন নিশ্চুপ। তাঁর শ্বাস-টানা ক্রমে ভারী হয়ে উঠতে থাকে। রোকেয়াবানু ধাক্কা দিয়ে বলেন, 'কি, ঘুমিয়ে গেলে নাকি?'

'হুঁ।'

নারীকণ্ঠ হঠাৎ ঝাঁকিয়ে ওঠে, 'হুঁ হুঁ, খালি হুঁ। মুখে যেন কাঁথা পুরে রেখেছেন, কথা জানেন না।'

আবার স্তব্ধতা। আবার সেই বস্তির কুকুরের আচমকা ঘেউ ঘেউ, বাড়ির পিছনকার পচা জলায় নানারকম পোকার ঝিন্‌ঝিন্ টিপটিপ ডাক। ঘরের চালের ওপর পেয়ারা গাছের ডালায় একটা নিশাচর পাখি এসে বসে, ঝুপ করে।

সকালে কাক ডাকার আগেই উঠে পড়েন রোকেয়াবানু। গোসল সেরে এসে ফজরের নামাজ পড়েন সাদা শাড়িটা পরে। এরপর রান্নাঘরে চলে যান।

এভাবে শরৎ কাটে, হেমন্ত কাটে। শীতের পর বসন্ত আসে। গ্রীষ্ম যায়, আসমানের একটানা কান্না নিয়ে দেখা দেয় বর্ষা।

আষাঢ় শেষ হতে চলল, তবু বর্ষণের অন্ত নেই। রান্নাঘরের পাশ দিয়েই নর্দমা চলেছে, পাশের দালানের কানিশের ধারা ঝুপঝুপ পড়তে থাকে ঘরের চালে, আর একসংগে সব মিশে জোর একটানা শব্দে নালায় পড়ে। হেঁসেলের ছাউনী ফুটো হয়ে গেছে এমন নয়, তবু ফাঁকে-ফোকরে কিছু কিছু পানি ছিটকে পড়েই। সময় এগিয়ে চলে, সংগে সংগে মেঝেটা ভিজে চপচপ করতে থাকে। কেমন ঘিনঘিনে। সব সময় পয়-পরিষ্কার থাকবার চেষ্টা, এসব সহ্য হয় না রোকেয়াবানুর। কাছে-ভিতে কাউকে না পেয়ে, অপরাধী করতে না পেরে বকবক করতে থাকেন আপন মনেই, 'হায়রে, চোখকানা খোদা, একটু ছ্যাক দিলে কি তোর আরশ ভেঙে পড়ত।'

মাঝারি মেয়েটা বারান্দা থেকে চিঁ চিঁ করে বলে, 'মা! আব্বা বললেন, অফিসের সময় হয়ে এল।'

'অফিসের সময় হয়ে এল!' মেয়ের কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে মা জবাব দিলেন, 'সোফায় বসে বসে তার বলতে কি। সকাল থেকে বাইরে একটু নাক গলিয়ে দেখেছে, কেয়ামত হচ্ছে না শাদিমোবারক? খালি মাতব্বরি, অফিসের সময় হয়েছে, আমি যেন জানি না।'

আমিনুদ্দিন পাজামা পরতে পরতে শুনলেন কথাগুলো। তাঁর ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল, এই সংগে এমন একটা ভংগী হল, যাকে হাসিও বলা যেতে পারে।

বড় ছেলে নান্নু, তারও স্কুলের সময় হয়েছে। পারদ-ওঠা আয়নাটা সামনে নিয়ে সে মাথা আঁচড়াচ্ছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে, চোখ বড় করে চেহারাটা দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাপ আড়চোখে ছেলেটাকে লক্ষ্য করে হাসলেন আবার। যুগটা পাল্টাচ্ছে বটে। তাদের আমলে গোঁফ না উঠলে চুল রাখাই ছিল অশোভন, বখাটে হয়ে যাওয়ার লক্ষণ, আর আজকালকার ছোঁড়াদের হয়েছে কি।

অবশেষে ভাত এল।

ছেলেকেও বসতে দেখে রোকেয়াবানু চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুই আবার বসলি কেন? ওঠ, পেটে যেন দোজখের আগুন, একটু তর সয় না!'

'ইস্কুলে যাব না ?' নান্নু গাল ফুলিয়ে বলে।

'ইস্কুলে ?' মায়ের চোখজোড়া কপালে উঠল, 'এই বৃষ্টিতে ইস্কুলে যাবি ? তোর মাষ্টারদের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই বুঝি।'

ছোট হলেও নান্নু বুদ্ধিমান, মিছিমিছি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করে না। নির্বিকারচিত্তে একটা বাসন টেনে নিয়ে বসে গেল।

ঘাড় গুঁজে গোগ্রাসে সে খেতে লাগল। রোকেয়াবানু একবার মার মার করে উঠছিলেন, স্বামী থামিয়ে দিলেন, 'আহা হা, খেতে দাও না! ইস্কুলে না-হয় না যাবে। হয়তো খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে! পেলেই হল আর কি। ঢ্যাঙা ষাঁড় কোথাকার! ওদিকে ওরা যে খায়নি, তাদের খিদে পায় না?' ছোটদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন রোকেয়াবানু।

বর্ষণ একটু কমলেও, বাইরে বেরুনোর মত অবস্থা এখনো হয়নি। উঠোনে একহাঁটু পানি জমেছে, মাথা খারাপ ছাড়া কেউ জুতো পায়ে বেরুতে চাইবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে হাতে নিয়ে নামতে হবে। পাজামা কুঁকড়িয়ে তুলতে হবে হাঁটুর ওপর। কাঁধে হাতল ঠেকিয়ে ছাতাটা এক হাতে, আর নীচের কাপড় অন্য হাতে ধরে রাস্তার দিকে এগুতে হবে সন্তর্পণে। আমিনুদ্দিনকে প্রায়ই এরকম করতে হয় বলে, বৃষ্টি না থামা সত্ত্বেও, তাঁর যেন কোন ভাবনা নেই। তিনি খাচ্ছেন ধীরেসুস্থে।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে উঠে যায় নান্নু। মুখে এমন ভাব দেখায়, যেন সারা দুনিযা গয়রত হয়ে গেলেও, বারান্দায় পা দেয়ারও ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু মায়ের শ্যেনদৃষ্টির আড়ালে গিয়ে তার চলনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়; টেবিলের কাছে গিয়ে চটপট বইপত্তর সার্টের নীচে, প্যান্টের বন্ধনীতে গুঁজে ফেলে। কালো কাপড়ওলা বস্তুটা টাঙান ছিল বেড়ায়, চেয়ে না চেয়ে কোন রকমে টেনে নিয়ে খরগোসটির মত বেরিয়ে যায়।

উঠোনের পানিতে শব্দ।

'নান্নু!' ডাক নয়, যেন পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে একটা মোক্ষম বর্শা ছুড়ে মারা।

আটকে যায়। এগুতে পারে না, আর একটা পাও ফেলতে পারে না সে। সামনের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো কাঁপতেও থাকে, ঠিক দেখা যায় না।

'আয়। ইদিকে আয়!' চাঁছা-ছোলা স্পষ্ট নির্দেশ।

নান্নু নয়, তার পা দুটো তাকে ধরে নিয়ে আসে। বারান্দার নীচেই দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নীচু করে, উঠে আসার সাহস নেই। এমন অপরাধের শাস্তি কি, সে জানে, এতটুকু জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতার সংগে পরিচয় ঘটেছে অনেকবার। সে জানে, আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এক-টানে ছাতাটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বেড়ায় ঠেসান দিয়ে রেখে, ছেলের চুলের মুঠি ধরে বারান্দায় টেনে তুললেন রোকেয়াবানু। ডান হাতে ঠাশঠাশ দু'তিনটে চড় মেরে বসিয়ে দিলেন একেবারে।

'দস্যি দস্যি। দশমাস দশদিন পেটে আমি দস্যি ধরেছি!' ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকেন, আরে বাপরে বাপ কী কল্জে দেখ না, দিনেদুপুরে ডাকাতি। ছাতিটা নিয়ে চলেছে।'

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করেন আমিনুদ্দিন।

একটু এগিয়ে এসে সহধর্মিণীর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলেন, 'ছেড়ে দিলে কেন? দেও, দেও আরো দেও! এত বয়েস হয়েছে, এখনো একটু কমনসেন্স হল না। হবে আর কবে!'

'আরে বাপরে বাপ!' ছেলেকে টেনে তুলে গালে একটা ঠোনা মেরে রোকেয়াবানু বলেন, 'ছাতিটা যে নিয়ে চলছিলি বড়, চোরের মতন? কথা বলছিস্ না কেন, হে? আমার নবাবপুত্তুর, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব চড়িয়ে!'

নান্নু কাঁদতে সাহস করে না। ঢোক গিলে সে তার আকাশচুম্বী অভি-মানকে দমিয়ে রাখে। কিন্তু কাঁহাতক আর মুখ বুঁজে থাকা যায়? চোখ কচলাতে কচলাতে সে বলে, 'ইস্ মারলেই হল। আমার ইস্কুল নেই যেন।'

সে ভ্যাক্‌ভ্যাক্ করে চোখের পানি ছেড়ে দেয়। ছোট মেয়েটা মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে দিতে আঙুল চোষে সেদিকে চেয়ে।

মাথা নীচু করে কী ভাবেন আমিনুদ্দিন। কাচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা চোয়ালদুটো বড় বিষণ্ণ দেখায়, চশমার আড়ালে ভাবলেশহীন ধূসর ছায়া নামে চোখে। পিরহানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন কিছু লোকজন থাকলে এখনি একটা জোরাল বক্তৃতা শুরু করে দিতেন। এ ভাবটা পত্নীর দৃষ্টি এড়ায় না। ছাতাটা হাতে দিয়ে

বলে ওঠেন, 'কি, এখনো ভালমানুষের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছ যে। তখন যে খুব হৈ চৈ শুরু করেছিলে। আপিসের সময় হয়ে এল! ভাত হল না!'

'ও, হ্যাঁ এই যাচ্ছি!'

নিমেষে কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন আমিনুদ্দিন। বারান্দায় গিয়ে ছেলে-টাকে বলেন, 'চ, আমার সংগে চ'। তোদের ইস্কুলের পথ দিয়েই তো আমার যেতে হবে, দিয়ে যাব তোকে।'

নান্নু অবাক বিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে তাকায়। ইস্কুলের পথ আর আপিসের পথ—দুটো দু'রাজ্য দিয়ে চলে গেছে। অথচ উনি বলছেন কি! এ ভাবটা বেশীক্ষণ থাকে না তার, পিতার অর্থপূর্ণ ইশারা পেয়ে উঠোনে ছাতার নীচে নেমে যায়। দু'জনে একসংগে চলতে থাকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক খিলি পান মুখে ঠেসে, রোকেয়াবানু এমন একটা ভংগী করেন, একমাত্র বাঁদরের ভেংচি কাটার সংগে যার তুলনা চলে।

বৃষ্টি কিছু পাতলা হলেও কাপড় বাঁচাবার মত নয়। পিতাপুত্র যেখানে এসে থামে, তার দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। এখন আর একসংগে যাবায় উপায় নেই, আর গেলেও একজনের ক্ষতি হবেই। চট করে একটা বুদ্ধি খেলে যায় পিতার মস্তিষ্কে, ছাতাটা ছেলের হাতে দিয়ে বলেন, 'এই নে। তুই যা। ইস্কুলের ঘন্টা হয়তো পড়ে গেল।'

'আপনি!' নান্নু উচ্চারণ করে।

আমিনুদ্দিন হাসেন। বলেন, 'আমার জন্যে ভাবিসনে! ঐ বাস এসে গেছে। চট করে উঠে পড়ব, তারপর নেমে সোজা চলে যাব আপিসে। এই নে, তুই যা।'

ওর কানের কাছে ফিসফিস করে আরো কী বলেন, কুচক্রীর আদল ফোটে চেহারায়।

নান্নু ঘাড় নাড়ে, 'আচ্ছা।'

যেন বৃষ্টিকে তুড়ি দিয়ে এড়িয়ে চলেছেন এমনিভাবে মাথাটা নীচু করে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে দৌড়ে যান আমিনুদ্দিন। ছেলেটা নিজের পথ ধরে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

টেবিলের তিন পাশেই ফাইল, ফাইলের স্তূপ। পিঠটা একটু কুঁজো করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসাই তাঁর অভ্যাস, চশমা নেওয়া সত্ত্বেও জৈবিক

চোখদুটো ঢুলিয়ে উঠতে পারে না। কাজ করার সময় বোতাম খুলে দেন পিরহানের, গায়ে ল্যাপটানো গেঞ্জিটা ঘিনঘিন করে ঘামে, হাতাদুটো কনুই ইস্তক কুচকিয়ে খচখচ করে কলম চালিয়ে যান, অটোমেটিক যন্ত্রের মত, একটু চিন্তা করে দেখা, নিম্নতম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চারও কোন প্রয়োজন পড়ে না, মগজ আর মনকে এড়িয়ে কেবল হাতদুটো যেন স্বেচ্ছায় কাজ করে চলে। পাশের টেবিলের সহকর্মী, আতাউল হক খান, একটু বেশী বাক্য-বাগীশ, যখন তখন এটাসেটা নিয়ে রসাল গল্প জমিয়ে তোলার ওস্তাদ। অবশ্য এতে কারো কাজের ব্যাঘাত এতটুকু হয় না। হাত করে হাতের কাজ, মুখ করে মুখের।

জোহরের নামাজের জন্য ছুটি পাওয়া যায় ঘণ্টাখানেকের। আতাউল হক খান আকর্ণবিস্তৃত একটা হাসি দিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। একটা মোহিনী বিড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়, 'নেন খান।'

বিড়িটা হাত বাড়িয়ে নেন আমিনুদ্দিন।

খান বলে, 'ভাবছেন কি অত? ভেবে আর কি হবে বলুন, যা হবার তা হবেই, আপনি আমি ঠেকাতে পারব না! হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে আমি ওমর খৈয়ামের ভক্ত। লোকটার প্রতিভা ছিল বটে। কয়েক শতক আগেও কি বিপ্লবী কথা শুনিয়ে গেছেন, খাও-দাও, নাচো, গাও—কারণ কালই তোমাকে মরতে হবে।'

'হুঁ।' আমিনুদ্দিন শব্দ করেন।

'আরে! আপনার পিরহানটা যে দেখছি ভিজা? ছাতা নেই বুঝি।'

ছিল একটা। আনতে ভুলে গেছি।'

খান সহজভাবে বলেন, 'হ্যাঁ ঠিকই। বৃষ্টির দিনে ছাতা আনতে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাই বলুন, আমরা বড্ড আপনভোলা। নিজের সুখ-সুবিধার দিকেও সব সময় নজর রাখতে পারি না।'

খান যদিও কথাটা আঘাত দেবার জন্য বলেনি, তবু হঠাৎ মনে বড় লাগে। চুপ মেরে থাকেন আমিনুদ্দিন। ভাবেন, ও ভদ্রলোকেরই বা দোষ কি। সত্যিই তো জামাটা বেশ ভিজে গেছে, লেপ্টে আছে পিঠে। এ জন্যেই বোধহয় ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছিল এতক্ষণ।

আপিস ছাড়ে, কিন্তু বৃষ্টি ছাড়ে না। দুপুরবেলাটায়, যখন কোন প্রয়োজন

ছিল না, একটু বিরতি ঘটেছিল, আকাশ পরিষ্কার হতে দেখে আশাও জেগেছিল অনেকের মনে, কিন্তু বেলা গড়িয়ে যেতেই আবার মেঘ জমেছে, কালো কালো। সংগে সংগে নাকিকান্নাও। বৃষ্টি একটু পাতলা হবে আশায় আমিনুদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকেন আপিসের বারান্দায়। কিন্তু পাতলা হবে দূরের কথা, ক্রমে ক্রমে আরো বেড়েই চলে।

আপিসেরই একজন কর্মচারী। ছাতা মাথায় বেরুচ্ছে।

'আপনি বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে যাবেন কি?' বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ছাতার নীচে মাথাটা ঢুকিয়ে দেন আমিনুদ্দিন; ভদ্রলোক নাক সিটকায, কিছু বলতে পারে না।

একটা দোকানের বারান্দা ঘেঁষে ছাতা-হাতে দাঁড়িয়ে আছে নান্নু, পিতার অপেক্ষায়। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল।

'চ' শীগগির। রাত হয়ে গেল।' ছাতাটা নিজের হাতে নিয়ে বলেন আমিনুদ্দিন।

সত্যি অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন মেঘলাদিনে সূর্যের মুখদর্শন অসম্ভব, তবু প্রাকৃতিক আবছায়া আর সন্ধ্যাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। যে-কোন কারণেই হোক, আপিস থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেলে, বাংলা ভাষায় নতুন নতুন বাগ্বিধির সৃষ্টি হয়ে চলবে, কেবল দু'টো ঠোঁটের শক্তিতেই। এ বিষয়ে রোকেয়াবানুকে একদম নির্দয় বলা ছাড়া উপায় নেই, ছেলেপুলে, স্বামী যেই হোক, সন্ধ্যার আগে বাড়ি না ফেরার ব্যাপারটা। ছাতার নীচে জড়াজড়ি করে পিতাপুত্র বাড়িতে ঢোকবার গলিটার মুখে এসে দাঁড়ায়।

পিতা বলেন, 'আমি ছাতা-হাতে বাড়িতে ঢুকি। তুই একটু পরে আসিস। বুঝলি? যাতে সন্দেহ করতে না পারে।'

নান্নু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

পিরহানটা আলনায় রাখতে গিয়ে রোকেয়াবানু সওয়াল করেন, 'জামাটা ভিজল কিভাবে, শুনি!'

'এই ভিজে গেছে!' আমিনুদ্দিন প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

'ভিজে গেছে মানে?'

'বাইরে গিয়ে দেখ না, কেমন বাতাস। আরে বাপস্ বৃষ্টিকে একেবারে তেরছা করে এনে গায়ে ছুঁড়ে দেয়। ছাতার সাধ্যি কি আটকায়।' বলে

হাত-পা ধুতে বেরিয়ে যান আমিনুদ্দিন। ভাবেন, হায়রে স্ত্রীজাতি। তোদের হাত থেকে বাঁচবার কোন পথই বিধাতা সৃষ্টি করেননি।

'নান্নু!'

'জি আম্মা।'

রোকেয়াবানু অভিযোগ করলেন, 'ইস্কুল থেকে কিভাবে এলি? তোর জামা-কাপড় ভিজল না যে।'

'আমার এক ক্লাস-ফ্রেণ্ড তার ছাতায় করে দিয়ে গেছে।'

তিনি এগিয়ে যান স্বামীর দিকে, নান্নু তো ছাতায় করে এসেছে। কই, সে তো ভিজেনি!'

আমিনুদ্দিন জবাব দেন, 'ও ছেলেমানুষ, আবার ভিজবে কি! প্যান্ট পরে, হাফসার্ট পরে, ওদের কথা আলাদা!'

প্রশ্নকর্ত্রী এরকম জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না। শুকোবার জন্যে ছাতাটা ঘরের এক কোণায় মেলে দিয়ে চলে যান নিজের কাজে।

ক্রমে রাত হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর, রোকেয়াবানু একটা পিতলের চামচেয় কিছু সরষের তেল নিয়ে তা গরম করেন চেরাগের শিখায়। দু'তিনটে রশুন ছেঁচে দেন মিশিয়ে। এরপর চৌকিতে উঠে মালিশ করতে বসেন স্বামীর গা। বড় ভাল লাগে আমিনুদ্দিনের। শরীরে মাংস বিশেষ নেই; তবু পায়ের পাতায়, আঙুলের ফাঁকে, হাঁটুর নীচে, উরুর কাছে, বুকের দিকে আর পিঠের ওপর ঈষৎ গরম তেল মাখানো চটচটে হাতটা যখন যত্নের সংগে চাপ দিয়ে দিয়ে চলে, তখন বাতির শিখার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হয়, দুনিয়াতে স্ত্রী যাদের নেই তাদের মত হতভাগাদের গলায় কলসী বেঁধে মরে যাওয়াই ভাল। তাঁর চোখের তারায় গভীর তৃপ্তির ছায়া পড়ে। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে, এই মুহূর্তে অনেক বেশী সুন্দরী মনে হয় তাকে।

এক সময় খুকখুক করে কেশে ওঠেন তিনি।

রোকেয়াবানু বলেন, 'আবার কাশিও হয়েছে দেখছি।'

তৎক্ষণাৎ ছাতাটার কথা তার মনে পড়ে যায়। তার পেছনে একটা কারণ অবশ্য রয়েছে। অনেকদিনের পুরনো একটা ছাতা; গত গ্রীষ্মে দেখা গেল, তার দেহের পরিচ্ছদটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ধরে ধরে অসংখ্য মোটা

সুঁচ ফোটানোর মত, কালো রং উঠে ফ্যাকাশে সাদা রূপ ধারণ করল, শিক-গুলোও এমন দুর্বল হয়ে পড়ল, ছাতাটাকে কোন রকমেই নিজস্ব আকৃতিতে রাখতে পারল না। তবু চলছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, আপনা-আপনিই কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। এই তো হাল। কি করা যায় এখন? আমিনুদ্দিন এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, কোন না কোন উপায়ে দিন চলবেই, অনড় বিশ্বাস তার। কিন্তু সবার দৃষ্টিভংগী তো এক নয়? ছেঁড়া গেঞ্জি পিরহানের নীচে পরে বাইরে বেরুনো যায়, কিন্তু ছেঁড়া ছাতায় অসম্ভব। এ যে একেবারে খোলাসা, সূর্যের নীচে, সূর্যেরই আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যত। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে ছাতা সবারই নজরে পড়ে। নিতান্ত খোলাখুলি।

কিন্তু রোকেয়াবানুর কাছে শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রশ্রয় নেই। তার যুক্তি সম্পূর্ণ অন্য রকম। কাজে-কর্মে বসতে-শুতে তার কেবলি মনে হয়, সংসার-ধর্মে স্বামী একটা ছাতা বিশেষ, যে সুদিনে দুদিনে ছেলেপুলে বৌকে ছায়া প্রদান করে, ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচায়। কোন কারণে এ অকেজো হয়ে পড়লে সামনে কেবল ধূ ধূ মরুভূমি, হাশরের ময়দান। গরমের দিন শেষ না হতেই বনেদী ছাতাটার হাল দেখে তার ভাবনার অন্ত রইল না; স্বামীকে বললেন, খেয়ে না খেয়ে দাঁতে কামড় দিয়ে একটা কিনে নিতে। কিন্তু পীড়াপীড়ি করলেই তো হল না? রক্তমাংসের একটা মানুষ কত আর কুলোতে পারে? জিনিসপত্রের আক্রা দর। এত কাচ্চা-বাচ্চা। অবস্থাটা ধীরেসুস্থে চিন্তা করে দেখলেন রোকেয়াবানু, বাংলাদেশের আর যে গুণই থাকুক, বর্ষাটা এমনি বিশ্রী, মানুষকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ে, বৃষ্টির জন্যে আপিস কামাই করতে হলে, হাঁড়ি চড়বে না। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, নিজে নিজেই। সব সময়ই আনিটা দু'আনিটা সঞ্চয় করা তার অভ্যাস; তাছাড়া প্রতিবেশী অফিসারের বৌয়ের কাছে চুপিচুপি হাঁস-মুর্গি বিক্রি করে জমিয়েছিলেন কিছু। ইচ্ছা ছিল নামাজ পড়ার জন্য একটা ভাল সুতীর শাড়ি কেনা। কিন্তু তিনি স্বার্থত্যাগ করলেন, ওদিকে স্বামী জানতেও পারলেন না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাড়ে এগারোটা টাকা গুণে দিয়ে বললেন, দোকান থেকে ছাতা কিনে বাড়ি ফিরতে। না হলে, রোকেয়াবানু এমন একটা ইংগিত করলেন, যারপর স্বামীর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ছাতা আনা হলে, একটি দিনের পরিশ্রমে নাম লিখলেন, বাড়ির নম্বর, ঠিকানা লিখলেন সুই-সুতো দিয়ে, যাতে হারান গেলেও পাওয়া যায়।

স্বামীর গায়ে তেল মালিশ করতে করতে তার স্বার্থত্যাগের কথা মস্তিষ্কে খেলা করে, শাড়ির জন্যে অনুশোচনা জাগে দুর্বল মুহূর্তে। এভাবে রাতের চাকা গড়িয়ে চলে অসমাপ্ত স্তব্ধতার দিকে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তার।

সকাল হয়। যতই দিন যাচ্ছে, আকাশ যেন কোমর বেঁধে লেগেছে, মানুষের চলাচলকে বন্ধ করে দিতে। কিছুক্ষণ হয়ত নিঝঝুম, চুপচাপ, কিন্তু তা সহ্য হবে কেন? একটু পরই ওঠে গুড়গুড়, গুমগুম গর্জন—একটানা, একঘেয়ে ঝমঝমানি শুরু হয়ে যায়। রান্নাঘরে বেড়ার ফাঁকে ছিটকে পড়ে বৃষ্টির ছিটে। মেঝেটা কাদা-কাদা, চ্যাপচেপে। আসমানের মালিককে লক্ষ্য করে রোকেয়াবানুর সুমধুর বাক্যবর্ষণ চলে বাইরের বর্ষণের সংগে তাল রেখে।

কিন্তু তা বলে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলে না। পুরনো টেবিল ঘড়িটাতে দশটা বাজলে হাতে তুলে নেন ছাতাটা। নান্নু তার সংগে যায়, মায়ের সামনে ভেজা বেড়ালটি হয়ে।

বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসেই পিতা বলেন, 'এই নে, তুই যা। ইস্কুলের ঘন্টা বোধ হয় পড়ে গেল।'

নান্নু উপেক্ষা করতে পারে না পিতার নির্দেশ। ছাতাটা হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের অজান্তেই যেন। দেখে, বাবা ভিজতে ভিজতে ছুটেছেন, রবারের পাম্প সু থেকে কাদার ছিটে পড়ছে পাজামার পেছন দিকে, পিটপিট বৃষ্টি পড়ছে মাথায়, পিরহানের ওপর। তার কিশোর চোখের তারা দুটো কেমন একটা অনুকম্পার আবরণে ম্লান হয়ে যায়। বাসটা চলা শুরু করলে সে পা বাড়ায়।

বিকেলে ইস্কুল ছুটি হলে, আবার সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে নির্দিষ্ট স্থানটিতে। কিছুক্ষণ পর পিতা আসেন। দুজনে মিলে চলে বাড়ির উদ্দেশ্যে। গলিটার মুখে এসে আবার সে দাঁড়ায়। পিতা ভিতরে চলে যান ছাতা-হাতে। এরপর সে ঢোকে।

এমনিভাবে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কাশিটা বেড়েছে আমিনুদ্দিনের। একবার উঠলে শীগগির থামতে চায় না, বুকে বড্ড টান লাগে। ব্যথা বাজে। কপালের দু'পাশের রগদুটো টনটন করে, মাথা ঘোরায়। একটু

ঘরঘর ভাব। বাইরে আগের মতই কাজকর্ম করলেও, ভিতর থেকে যেন শরীরটা ভেঙে পড়েছে। বড্ড ক্লান্তি বোধ করেন আজকাল।

সেদিন বোধহয় শনিবার। কিছু ফাইল জমে আছে। ওপরওলা অফিসারের তাড়ায় কলম চালিয়ে যাচ্ছিলেন বেপরোয়া, হঠাৎ একসময় টেবিলের উপর এলিয়ে পড়ল মাথাটা। পাশের টেবিলে আতাউল হক খান হকচকিয়ে উঠল, 'কি হল আপনার!'

কোন জবাব নেই।

কাছে এসে, শরীর স্পর্শ করে, শিউরে ওঠে খান, ইস্ এ যে ভীষণ জ্বর! হাত পুড়ে যাচ্ছে! এমন শরীর নিয়ে কেউ আপিস করতে আসে নাকি! চুলোয় যাক চাকরি! নিজে বাঁচলে তো বাপের নাম।'

হেড-ক্লার্কের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে, রিকসা করে তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল খান। তখন আড়াইটে বেজেছে।

শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না জানলেও, হঠাৎ এভাবে জ্বর আসবে, ভাবতে পারেননি রোকেয়াবানু। অপ্রস্তুত হয়ে যান, কেমন যেন। এত ঝড়-ঝাপটায় তৈরী-হয়ে ওঠা তার মনোবল ভেঙে পড়তে চায়, টুকরো টুকরো হয়ে। অজানা আশংকা তার সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলে। অসুখ বিসুখে তার বড় ভয়, কি জানি কি থেকে কিসে গড়ায় বলা তো যায় না। ডাক্তার ডাকারও সংগতি নেই। মাথায় পানি ঢালা, তেল গরম করে হাত-পা মালিশ করা—ইত্যাকার যত প্রক্রিয়া তার জানা আছে, সবই বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন রোগীর ওপর।

মালিশ করতে করতে হঠাৎ তার চক্ষু স্থির হয়ে যায়।

'ছাতাটা কই?' জিজ্ঞেস করেন ভয়ার্ত স্বরে।

উসখুস করেন আমিনুদ্দিন। পরে বলেন, 'ও হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম, আপিসে বোধ হয় ফেলে এসেছি।'

রোকেয়াবানু বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'পাওয়া যাবে তো?'

'ও, তার জন্যে ভেব না। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সরকারী আপিসে কোন জিনিস হারান যায় না।'

উনি মনে মনে ঠিক করে রাখেন, নান্নু ইস্কুল ফেরামাত্র তাকে পাঠিয়ে দেবেন ছাতাটার খোঁজে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, ও ফিরছে না দেখে

অবাক হয়ে যান। এত দেরী হবার কথা তো নয়। শত ঝড়বৃষ্টি হলেও সে সময় মত আসবেই বাড়িতে। বিপদ যখন আসে, সব দিক থেকেই আসে। তার মেজাজ বিগড়ে যায়।

ছাতাটা একপাশে লুকিয়ে ঘরের ভিতরে প্রায় ঢুকে পড়ছিল নান্নু, মায়ের নজরে পড়ে গেল। লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন, 'কিরে ছাতি পেলি কোত্থেকে?'

নান্নু মাথা হেঁট করে থাকে।

'কি! জবাব দিচ্ছিস্ না কেন?' মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

ও মুখ নীচু করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার কি দোষ। বাইরে গিয়ে আব্বাই তো দিয়ে যান। বলেন, আমার লাগবে না তুই যা।'

নিমেষে আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল রোকেয়াবানুর কাছে। তার ভুরু যায় কুঁচকে। পান খাওয়া পুরু ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে রাগে, তাহলে এই ব্যাপার!

থপ্থপ্ পা ফেলে স্বামীর বিছানার কাছে হাজির হলেন রণমূর্তিতে। তার শরীরটা ভেতর থেকে ঝাঁকানি দিতে থাকে। কোন কথা আসছে না মুখে, কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে তার। কিন্তু এ ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না, ক্রমে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল—কপালে চোখে মুখে ঠোঁটে বুকে কেমন একটা বিবর্ণ স্তব্ধতা।

'তোমার মনে বুঝি এই ছিল!' কথাটা ঠিকমত উচ্চারিত হল না, গলা কাঁপছে। কেমন একটা জ্বালা, অপরিমেয় ঝাঁঝ। এরপর রোকেয়াবানু ফুঁপিয়ে উঠে বসে পড়লেন দু'হাতে মুখ চেপে, 'ও মাগো, আমি কি করব গো! আমারে মেরে ফেলার ফিকির করছে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে পথে বসাতে চায়। ভিক্ষা করাতে চায়। নিজে মরে, আমাদের সবাইকে মারতে চায়। ও মাগো, আমি কই যাব গো!'

ছোট খুকীর মত তিনি কাঁদতে থাকেন মাটি লেপটিয়ে।

আমিনুদ্দিন কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারেন না, সব এলোমেলো হয়ে গেছে যেন। আলোর দিকে মুখ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন শুধু। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। কোন অনুভূতি কিংবা ভাবের প্রকাশ সেখানে

নেই। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ংগম করে হঠাৎ তিনি রেগে ওঠেন। কটমট করে তাকিয়ে বলেন, 'কেবল বাজে প্যানপ্যানানি। দুনিয়াটা কোন্ তালে ঘুরছে বুঝতে পারছ না।'

কান্না থামিয়ে কথাগুলো শোনবার পর আবার ঝরঝর করে চোখের পানি ছেড়ে দেন রোকেয়াবানু। কেননা, তিনি কিছু বুঝতে পারেন না, এ অপবাদ জীবনে এই প্রথম।

আরো দুটি মৃত্যু

হাসান হাফিজুর রহমান

নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ যাচ্ছে যে রাত্রির ট্রেনটা, এই যে স্টেশনে এসে থামল, মাত্র দু'মিনিট দাঁড়ায় এখানে। অন্ধকার রাত, কিছুই চোখে পড়ছে না। স্টেশন ঘরটার জানালা ও দরজায় যে আলোর আভাস ছিল, চোখের ওপর অকস্মাৎ ঝাপটা দিয়ে চলে গেছে ট্রেন থামতে না থামতেই। কামরা-গুলোর আলোকিত গহ্বরকে চারদিক থেকে মুড়ে দিয়েছে কালো রাত। বাইরে হাতটি মেলে ধরলেও চিহ্নিত করা যাবে না। ভীষণ শীত পড়ছে। যাত্রী কেউ উঠবে, কি উঠবে না কে দেখে। ভেতরে সব গুটিশুটি মেরে বসে আছি নির্লিপ্ত হয়ে।

এমন সময় পাশের কামরা থেকে আওয়াজ শোনা গেল, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আরে দেহ না? কথাগুলো শেষ হতে না হতেই ব্যস্তসমস্ত থপথপ পায়ের আওয়াজ, চুড়িরও শব্দ। মানুষের হাঁপানোর সাথে সাথে কে যেন সে কামরা ছেড়ে সামনে এগুতে লাগল। তারপর আমি যে কামরাতে বসে ছিলাম সেইটের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল যারা, তারা চিৎকার করে উঠল, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আরে দেহ না!

কিন্তু তৎক্ষণে ঘন্টি বাজিয়ে দিল স্টেশনের। গার্ডও চলার ইঙ্গিত জানাল হুইসিল বাজিয়ে। কেউ এবার অধৈর্য হয়েই যেন হাতল খুলে দরজাটা ভেতরের দিকে ঠেলল যত জোরে পারে। নিচে কিশোর কণ্ঠে ভয়ার্ত চিৎকারও শোনা গেল একটা, কাকীমা গো! শব্দটা সেই ভয়াবহ নিথর নিস্তব্ধতাকে মুচড়ে দিল যেন। যে লোকটা উঠতে দেবে না বলে দরজাটা চেপে ছিল এতক্ষণ, সেও এমনি বিমূঢ় হয়ে গেল যে, তার হাত দুটো নিজের থেকেই সরে এল, নিজেও পেছিয়ে গেল দু'পা। এরপর, প্রথমে একটি পুঁটলি ও টিনের সুটকেস ঠেলে দিয়ে ভেতরে উঠলেন প্রৌঢ় একজন হিন্দু ভদ্রলোক। সাধারণ ধুতি কাপড় পরেছে, ঘিয়ে রঙের চাদর গায়ে জড়ান। দাঁড়াবার একটু

জায়গা করে নিয়েই হাত বাড়িয়ে নিচের থেকে কিছু তোলার জন্য এমন সযত্ন ভঙ্গিতে চেষ্টা করতে লাগলেন যেন ঠুনকো কাচের কিছু তুলছেন। কিন্তু যা তুললেন তা একজন মেয়েলোক। মধ্যবয়স্কা, প্রায় ত্রিশ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। উঠে পড়েই মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে বসে হাঁপাতে লাগল। এরপর ছোট একটি মেয়ে উঠল, ন'দশ বছরের, দৌড়তে দৌড়তে। কেননা ট্রেন তৎক্ষণে হুইসিল বাজিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ঝকঝক করে।

আমরা যেটায় বসেছিলাম সেটা একটা 'একুশ জন বসিবেক' কামরা। ঠাসাঠাসি করে বসে, একজন অন্যজনের উপর ঢুলে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙছিলাম আর ঘুমাচ্ছিলাম। দু'জন বেপরোয়া লোক উপরে দেদার জায়গা করে নিয়েছে। আমি নিজে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। কারণ তন্দ্রার ঘোরে পাশের লোকটির শরীরের ওপর পরপর দু'বার ঢুলে পড়ার জন্যে যে বিভীষিকাময় আপত্তি শুনেছি, আমার নিজের বেলাতে অন্য কাউকে যদিও তাই আমি বলতাম, তবু হজম করতে পারিনি।

জেগে থাকতে থাকতে প্রথমে কথা বলার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চার-পাশের লোকগুলোকে এমনি স্থবির মনে হল যেন প্রাণপণ বেগে ঘা দিলেও এদের একজনের ভেতর থেকে শব্দ বেরুবে না। ফাল্গুনের বিদায়ী শীতের ঠাণ্ডা তো আছেই, তাছাড়া ক্লান্তির স্তব্ধতা সারাটা ঠাঁই জুড়ে। যেন কথা বলতে গেলেই যতটুকু উষ্ণতা জমিয়ে নিয়েছে বুকের ভেতর এতক্ষণ ধরে, তাও শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমাদের জমে যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না। সেজন্যেই শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপটুকু এত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল এবং সেটুকুই উপভোগ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। পরস্পরের অজ্ঞাতেই আমরা একে অন্যকে অনুভব করছিলাম শুধু।

এ স্তব্ধতা যে শুধু ক্লান্তির তা নয়,—আতঙ্কেরও। আমি ঢাকা থেকে আসছি, সেজন্য এ অনুভূতিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। পরস্পরের প্রীতির ওপরেই যেমন সামাজিক সুস্থতার নির্ভর, তেমনি পরস্পরের আক্রোশের ভেতরেই সবচেয়ে বড় অশান্তি। এ অশান্তি যে কি, আমি জেনেছি ঢাকার দাঙ্গায়, কোলকাতার পরেই যা শুরু হয়েছিল। এমন ভয়ঙ্কর

যন্ত্রণার অনুভূতিতে কোনদিন ক্লান্ত হইনি। এই চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও জানিনি। ঢাকায় গিয়েছিলুম মেয়েকে দেখতে, জামাই রেলওয়ে কলোনীর বাসিন্দা, সেখানেই ছিলাম। এই এলাকা দাঙ্গাকে রোধ করেছিল। সেই হয়েছে এক মুশকিল আমার জন্যে। খুন-উন্মত্তদের ভেতর থেকে যদি আমারও সারা শরীর তেতে উঠত, যদি চিন্তা বুদ্ধি উবে যেত ধুয়োর মত আগুনের হলকায়, তাহলেও হয়ত এক সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু যে পরিবেশে আমি ছিলাম সেখানে থেকে এই পাশবিকতাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যে সুস্থ প্রতিরোধের ভেতর আমি ছিলাম, সেখানে থেকে এই হিংস্রতার ভয়াবহ পরিণতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি না করে পারিনি। এই ঘৃণা যে একবার অনুভব করেছে তার অস্বস্তি যে কি আমি জানি।

জরুরী কাজ ছিল বটে, বাড়ি ফিরতে পারিনি। মাঘ-শেষের পড়ন্ত শীতের দিন, অথচ এমনি হিম বাতাস ঝাপটা দিচ্ছিল যে, আমার মনে হয়েছিল অন্ততঃ আমার জীবনের এতগুলো বছরের অভিজ্ঞতায় এমনটি আর কখনও দেখিনি। আকাশে প্রান্তরে ছিল শীত, মানুষের মুখে মুখে ছিল স্তব্ধতা আর আতঙ্ক। অন্যদিকে শান্তিকামী কলোনীর সারা ঠাঁই জুড়ে প্রাণপাত প্রতিরোধ। দাঙ্গাকে রুখতে শয়তান ঈশ্বরকে পাশাপাশি দেখেছিলাম যেন। তাই অনেক বড় দেখায় আবার চোখ ভরে আছে। মনুষ্যত্বের এই শেষ রশ্মিটুকু যদি না দেখতাম তবে হয়ত পাগলই হয়ে যেতাম।

এখন ফিরছি বাড়ি। না জানি সেখানে কি হয়েছে। যমুনাপারের দুর্দান্ত মানুষগুলো যে হুজুগে মাতে, আমি তো তা জানি, আপন ভাইকেও মানাতে পারিনে। এখন অবশ্য আবহাওয়া শান্ত হয়েছে অনেকটা। মানুষের স্বভাব, শুভবুদ্ধি ও চেতনার জন্যেই এ অবস্থা অবশেষে স্থায়ী হয় না। গুণ্ডা-বদমায়েশের অত্যাচার একেবারে শেষ হয়নি, তবুও শান্তির আশাবাদ দেখা দিয়েছে। এবং এই সুযোগেই যে এই হিন্দু ভদ্রলোকটা সঙ্গে আর দু'জনকে নিয়ে, অনেকের মত নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছেন তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলুম।

লোকটি উঠেই একটিমাত্র কাজ করল শুধু; জড়িয়ে বাঁধা বিছানাটা, হয়ত ওর ভেতর অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসই আছে, যাতে বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে, মেঝেতে সমান করে রাখল, তার ওপর হাত ধরে বসিয়ে দিল

মেয়েলোকটাকে সযত্নে। যেন পবিত্র কিছু রাখছে, এমনি সম্ভ্রমশীল. স্পর্শকেও যেন পবিত্র করে নিয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি ওঁর শরীর ঘেঁষে বসল বাকী জায়গাটায়। এরপর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কোন দিকে না চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওদের পাশেই। এমন মনে হল যেন কোনদিন কিছু যেন দেখবেন না, কোন কিছু দেখতেও চাইবেন না। আর কিছু দেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

লোকটাকে দেখেই প্রথম অবধি আমার কেমন ঠেকছিল। অনুভূতিটা ঠিক যে কি বুঝতে পারিনি। অথচ একটা স্পষ্ট আকর্ষণ ছিল মনে, চোখই ফিরাতে পারছিলাম না।

ভয় আর আতঙ্কে মুখটা তার চুপসে গেছে, ফ্যাকাশেও হয়েছে, বেশ একটু দূরে বসেও আমার নজরে পড়ল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, আর একটু বড় হলেই মৌলবীদের মুখের মত হয়ে উঠবে। কিন্তু লোকটা পরে এসেছে ধুতি। তিনটি মানুষের ভেতর কারুরই—ওরা যে হিন্দু এই ইঙ্গিতটি লুকিয়ে ঢেকে রাখবার এতটুকুও চেষ্টা নেই। অথচ ট্রেনটা নিরাপদ, এমন মনে করার কোন কারণ আছে বলে ভাবা যায় না। ট্রেনেও খুনখারাবী হচ্ছে। একজন হিন্দুর পক্ষে বিপদটা এখানেও কম নয়। লোকটা একথা জানে বলেই মনে হল। উটপাখি যেমন বালুতে মুখ লুকিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের কারো দিকে একবার পর্যন্ত না তাকিয়ে ভয় আর আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছে মনে হল। সেজন্যেই আমার সহযাত্রীদের মুখের দিকে একবার করে চেয়ে চেয়ে না দেখে পারলাম না। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে আছে, দু'চার জন যারা জেগে, তাদের চেহারাটিই কেমন স্তিমিত। চাইছে যখন, ভেজা আর নিরীহ চোখে কি ম্লান দৃষ্টি! ওদের সবাই এদেরকে লক্ষ্য করছে সহজেই বোঝা যায়। লোকগুলোর দৃষ্টি আর কয়েকটা দীর্ঘ শ্রান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে এই প্রমাণ করছিল যে, এই তিনজনের এমন দুরবস্থার জন্যে ওরা নিজেরাও কম অনুশোচনা ভোগ করছে না। কম অস্বস্তি ওদেরও নয়।

সব মিলিয়ে কেমন একটা ক্লান্ত গুমোট ভাব।

আমি বহু স্থানে যাতায়াত করেছি। রাজধানী ঢাকায় প্রায়ই তো আসতে হয়। কিন্তু এমন দুর্বিসহ মুহূর্তের স্পর্শ কোনদিন পাইনি। আমার মনে হচ্ছে,

এটা দাঙ্গার আতঙ্কেরই ফল। চারদিকের অমানুষিকতাই মানুষের মনগুলো এমন করে থুবড়ে-ছেঁচড়ে দিয়েছে। এ বিষণ্নতা অপরাধবোধের।

লোকটা যমুনার গাঢ় জলের মত ঘোলা, দৃষ্টিহীন চোখ মেলে আছে। আর আমি উৎকণ্ঠিত।

সারাটা কামরার কেউ কি ওঁর সঙ্গে একটি কথাও বলবে না? সংকোচই কাটাতে পারছে না কেউ। না এর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনই সবার মিটে গেছে হঠাৎ? যেন এ এখন এক আলাদা জাতের মানুষ। এর সঙ্গে আবার সহজ হতে ভিন্ন এক অনুভূতির প্রয়োজন। কি যে এক আত্মমন্থন থেকে তা আসবে ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়।

এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, লোকটা অত্যন্ত সরল। জীবনের ভয় আছে, ফাঁকিঝুঁকি নেই। অথচ এমনি প্রাণের তাগিদে বেরিয়ে আসতে হয়েছে যে, এই রাত্রিবেলা ট্রেনকেও নিরাপদ না মেনে পারেনি।

ভাবলাম, একবার ডাক দিই। ভাবলাম একবার কাছে এনে বসাই। পরমুহূর্তেই সমস্ত কামরাটার দিকে চেয়ে গলা দিয়ে আর শব্দই বেরিয়ে আসতে চাইল না। মনে হল এখন যদি একটিমাত্র কথাও বলি, তবে তা ভারী কাচ ভেঙে চুরমার হওয়ার শব্দে খানখান করে বেজে উঠবে। বুঝিবা খুন বেরিয়ে আসবে এই দুঃসহ নিস্তব্ধতার বুক থেকে। সেই আওয়াজ অনন্তকাল ধরে কুরে কুরে বাজতেই থাকবে, কোনদিন থামবে না। সেই রক্ত গড়াতেই থাকবে, কোনদিন বন্ধ হবে না। আর সেই তিনটি মানুষও ভয়াবহ আতঙ্কে ও শঙ্কায় শুধু কাঁপবেই, কাঁপতেই থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবর্ণ নীল হয়ে মরে যায়।

যমুনার সেই উত্তাল ঢেউগুলো যেন খল খল করে উঠল বুকের ভেতর। কেমন একটা ভয়ে চুপ করে গেলাম।

মানুষের বন্য আক্রোশ ওদের তাড়া করে ফিরছে।

মুখটি ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে রইলাম কতক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে। তারপর লাইটের চারদিকে ঘূর্ণায়মান পতঙ্গগুলোর অস্ফুট পাখা ঝাপটানো দেখলাম। আমাদের কামরায় তিনটি সারি। আমি বসেছিলাম জানালার কাছের এক সারিতে। মধ্যের লোকগুলোরই অসুবিধে বেশী। ওদের হেলান দেয়ার সুবিধে আমাদের মত নয়; তাছাড়া হাওয়াও পায় না গরমে। ঠিক যেন

মাঝের জমি, নালার পানি পায় সবচেয়ে কম। একজনের লালা গড়িয়ে পড়ছিল চোয়াল বেয়ে। ঘুমকাতুরে আর একজনের দাড়ির অগ্রভাগটা গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে লাগছিল আর একজনের ঘাড়ে। সে লোকটাও ঘুমে সুড়সুড়ি লাগা জায়গাটা বারবার চুলকিয়ে নিচ্ছিল ঘুমের ঘোরেই।

অন্যসময় হলে হাসতাম হয়ত। কিন্তু এখন কেমন মায়া লাগল তিনজনের ওপরেই। ঘাড়টা ফিরিয়ে আবার চাইলাম সেই হিন্দু লোকটার দিকে। লোকটা এখন আমার উল্টো দিকের থাকে রাখা বেডিংয়ে ঝুলান একটা লোটার উপরে চোখ রেখেছে। তৃষ্ণায় নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কয়েকবার শুকনো ঢোকও গিলল বলে মনে হল। মনের জড়তাকে এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে হাত নেড়ে হঠাৎ ডাকলাম তাকে। লোকটা অপ্রস্তুতের মতই সামনে এসে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। আসবে কি আসবে না এই ইতস্ততাটুকু করবার সাহস পর্যন্ত নেই। ঠোঁট নেড়ে বললও যেন কি! কিছুক্ষণ অসাড় কণ্ঠে সাড়া জাগাতে চাইলাম আমি নিজেও। পরে সহসা পাশে অনেকটা জায়গা করে দিয়ে বলে উঠলাম, বসেন। আমার পাশের লোকটাও সমর্থন করে বলে উঠল. হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসেন। অন্ততঃ শরীরের গরমে আর একটু চাঙ্গা হওয়া যাবে—আমাদের শীতের কাপড় যা আছে তা তো হুঁ......

এদিকে রাতও শেষ হয়ে আসছে। আমরা অনেকগুলো স্টেশন পার হয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। লোকটা বসল। উপায়ান্তর নেই বলেই বোধ হয়। কিন্তু উসখুস করতে থাকল কেমন। বারবার তার সাথের অসুস্থা স্ত্রীলোকটার দিকেই তাকাতে লাগল। উৎকণ্ঠায় একটা শিখার মত দপ্ দপ্ করে উঠছে, আবার নেতিয়ে পড়ছে। ওর পাশ থেকে চলে আসার জন্যেই কি অস্বস্তিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে? ভাবলাম, হয়ত বা আমাদের সান্নিধ্যে এসে সে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

লোকটা গলা উঁচু করে বসেছিল। কণ্ঠনালীর বাঁকা জায়গাটায় আলোর চিক্‌চিকে ছাট এসে পড়েছে। হঠাৎ চোখ পড়ল আমার তার ওপর। ওই সামান্য জায়গাটুকু—জোরে টান দিলেই হয়ত, একটু ছুরির আঁচড় লাগলেই তো শেষ হয়ে যেতে পারে লোকটা। এত ক্ষীণ মানুষ, এত সংক্ষিপ্ত। একেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য কি বিভীষিকাময় পরিকল্পনা, এত হিংসা!

লোকটাকে যেন মুঠির ভেতরে অনুভব করতে পারছি। সম্পূর্ণ আয়ত্তে আমার সে। এত ছোট, ভীরু কপোতের মত একটা মানুষ।

বুকটা শিরশির করে উঠল। লোকটাকে কি আমি মুচড়ে দিতে পারি? এক্ষুণি?

বুকের উত্তাল ঢেউটি জোরে বাঁক নিয়ে নামল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা স্নেহে ঝিমিয়ে এলাম। নিস্তেজ, তৃপ্ত অবসাদে।

ইচ্ছে হল সারাটা রাত গল্প করে কাটিয়ে দেই। নিয়ে যাই একে আমাদের বাড়ি। কোথায় যাবে কষ্ট করে আর নিরাপত্তার খোঁজে, আমি ওকে আগলাবো।

লোকটার দিকে চেয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

মেহনতী মানুষ আমরা, প্রাচুর্য না থাকলেও দুটো তিনটে মানুষকে যে ভার বলে মনে করব, এত ছোট হয়ে যাইনি। কিন্তু গ্রামের কথা ভাবতেই প্রথমেই মনে হল, এদের নিয়ে যাব বাড়িতে, আমরা সব একসাথে বসতি করব, এমন সময় আর নেই। আবার কবে আসবে, তাও জানিনে। গ্রামের কথা মনে হতেই আরো চিন্তা এল বানের পানির মত হুহু করে। কি হয়েছে, কেমন আছে, কেমন চলছে—সংসারের মধ্যে জড়িয়ে গেছি আমরা—চিন্তা একবার শুরু হলে একেবারে অতলে ডুবে যেতে হয়।

কিন্তু সব ফেলে পাশের লোকটার দিকেই যে খেয়াল দেযা প্রয়োজন তাই মনে হল। নড়েচড়ে বসলাম জুতোটা খুলে। ভাইয়ের ছেলের জুতো পরে এসেছিলাম, আঁটসাট হওয়াতে পা গেছে কেটে। টাটাচ্ছিল। পা তুলে নিলাম ওপরে। শরীরটা একটু প্রসারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এতটা সংকুচিত যেন একটি সরল রেখার মত শীর্ণ হয়ে জাযগা দিতে চাইল। লজ্জায় শিউরে উঠলাম।

এখনো কি সে ভয় করছে আমাকে! ভয়?

পা নামিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি করে। ওর পিপাসার কথাটাও মনে হল তখুনি। অনেকক্ষণ থেকেই খচ্‌খচ্‌ করছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলাম, পানি খাবেন?

মাথা নেড়ে বলল, না।

কথাটা শেষ হতে না হতেই সারাটা শরীরও কেঁপে উঠল তার থরথর করে ; ঘাড় ফিরিয়ে স্থির, নিস্পন্দ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সেই মেয়েটির দিকে। এবার অবাক হলাম আমি। মেয়েটাকে ঘিরে ওর অস্বস্তিকে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কাঁপছে কেন এ ? এত ? কিন্তু ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে যা দেখলাম তাতে অবাক হলাম আরো। গাড়ীটা যতবার কেঁপে উঠছিল মেয়েটারও সারা শরীরে ঝাঁকি দিয়ে অদ্ভুত বেদনায় কুঁকড়ে দিচ্ছিল মাংস-পিণ্ডগুলো। প্রত্যেক কাঁপুনির সঙ্গেই এমনি করে শিহরিত হচ্ছিল সে যেন মৃত্যুর দাঁত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে বারবার।

ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি ?

কিন্তু লোকটা নিজেই এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, আর্ত, চাপা, ফিসফিসে স্বরে—প্রসব !

কথাটা প্রথমে বলকে বলকে সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতাকে দুমড়াতে লাগল যেন। তারপর থমথম করে বাজতে লাগল। অবশেষে সমগ্র নিস্তব্ধতাটাই যেন কথাটার ভেতর স্থির হয়ে, পাথরের উপর খোদাই করা অক্ষর যেমন থাকে, তেমনি স্থবির হয়ে গিয়ে, সমস্ত কামরাটা ভরাট করে ফেলল। মেয়েটা যে আসন্ন প্রসবা, আমার প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। গ্রামে একটা সুনাম আছে, সবার টুকিটাকি খোঁজও রাখি বলে। কিন্তু এটা এমনি অসম্ভব যে, আমার ধারণাতেও আসার সুযোগ পায়নি। কেননা একজন প্রসব-উন্মুখ মেয়েকে পথ হাঁটিয়ে আনা, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কথা নয়। এদের সম্পর্কে অন্তত: এতটুকু কল্পনাতেও আসেনি আমার। কিন্তু এখন ভাবতেই সারা দেহ শিরশির করে উঠল। কেমন মানুষ ! লোকটাকে ধিক্কার দেব মনে করলাম, মনে করলাম অভিসম্পাত করব। সেজন্যেই মুখ ফেরালাম। কিন্তু তখুনি মনে হল এ ছাড়া এদের হয়ত আর কোন উপায়ই ছিল না। মৃত্যু এদের সব দিকে ঘিরে আছে। যে মুখটাতে অভিসম্পাতের বিষ ছড়াব ভেবেছিলাম, সেখানে চাইতেই দেখি সেই ম্লান চোখ দুটো ছলছল করছে। কান্নাকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

ছোট মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। আর ও মেয়েটা সমস্ত বেদনাকে সংযমে রাখার জন্য এখন এমনি তীব্র আবেগে শরীর চেপে রাখছে যে, একটি নিঃশব্দ

গর্জনই প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে গুমরে উঠছে। কাঁপছে, কুঁচকাচ্ছে, মাথাটা হাঁটুর ভেতর সেঁধিয়ে দিতে চাচ্ছে। অথচ রা পর্যন্ত করছে না। কি যে দুঃসহ এই অনাস্তিকে লক্ষ্য করা! বিহ্বল করে ফেলে সমগ্র চেতনাকে। নিরূপায় বিহ্বল।

এতক্ষণে ঘেমে উঠেছি আমি।

আরো, আরো কতকাল সে অমনি নিঃশব্দে গুমরাতে থাকবে? মেয়েটা সেখানে থাকতে পারল না আর। বেদনা এখন সারা দেহে সংক্রমিত হয়ে পেশীগুলো উৎক্ষিপ্ত করছে। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পায়খানার ভেতর চলে গেল, নিজেকে প্রাণান্ত চেষ্টায় হেঁচড়ে টানতে টানতে।

এবার লোকটা নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠবে? বুক ফাটিয়ে দেবে চৌচির করে নয়ত দু'হাতে ওকে চেপে ধরবে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলের মত। কিন্তু সে কিছুই করল না। আরো শক্ত হয়ে বসে রইল নিজের জায়গাটাতেই।

এ অবস্থায় কি করা যায় ভেবেই পেলাম না। কি সাহায্য করা যেতে পারে ধারণাতেই আসলো না। লোকটা কি সংজ্ঞালুপ্ত হয়েছে? বজ্রাহত মানুষ যেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু স্পর্শ লেগেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় মাটিতে, এও তেমনি? স্থির হয়ে আছে, একটু স্পর্শ পেলেই ভেঙে পড়বে কি?

ভেবেছিলাম সমবেদনা জানাব,—চুপ করে গেলাম।

ভেবেছিলাম নানারকম গল্প করে মনটা সরিয়ে নেব তার গাঢ় উদ্বিগ্নতা থেকে—কিন্তু গলা দিয়ে কথাই বেরুল না।

মনে হল আমারও পিপাসা, ভীষণ।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আর একটা স্টেশনের পরেই ঘাট। যমুনা-বিধৌত বাহাদুরাবাদ। ঘাটেই নামতে হবে আমাকে। বাড়ি সেখানেই। ইতিমধ্যে এই কামরার অধিকাংশ যাত্রীই নেমে গেছে। গুটিকয়েক যারা ছিলাম, খুব সম্ভব আমি বাদে সকলেই নদী পার হয়ে যাবে। এখন জেগে উঠছে। আয়েশের হাই তুলল কেউ জোরে জোরে। অস্ফুটকণ্ঠে দু'একটা টুনকো কথাও বলল আলগোছে। সেই প্রসব-বেদনা-কাতর দীর্ঘপ্রাণ মহিলাটির গোঙানির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে নাকি? এতক্ষণে জাগছে সব শ্লথ ভাবে। এখন কেমন করছে সে পায়খানা-ঘরটার ভেতর? বিছানাপত্তর

বাঁধতে লাগল অনেকে। বন্ধ জানালাগুলো নামিয়ে দিল। বাইরের আবছা আলোয় লাইটের দগদগে লাল মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। নিষ্প্রভ মুখ। সকালের হাওয়ায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। লোকটাও এবারে কিছু জোর পাবে মনে হয়ত।

অনেক সংকোচ কাটিয়েই দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, একবার দেখা যায় না, তাঁর কি হল……উচিত……

কিন্তু এ কথা শোনামাত্রই অকস্মাৎ লজ্জায় লোকটা এমনই বিমূঢ় হয়ে গেল যে, মনে হল, তার সমস্ত শরীরটাই আগুনের হলকার মত জ্বলে উঠেছে, শিরা-উপশিরা দপ্‌দপ্‌ করছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। বুড়ো মানুষের এমন করে ঠোঁট কাঁপতে আর কখনও দেখিনি আমি। অন্ততঃ এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় যতদূর জানি— এই বয়সের মানুষ সাধারণতঃ ভেতরের দুর্বলতাটা কিছুতেই জানাতে চায় না। কিন্তু লোকটা সংযম হারাচ্ছে।

এত লজ্জা আর সংকোচই বা কিসের বুঝতে পারলাম না।

কিছু জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাব, লোকটা তেমন অবস্থায় আছে তাও মনে হল না।

প্রায় এক ঘণ্টারও ওপরে হয়ে গেল মেয়েটা সেই যে পায়খানার ভেতরে ঢুকেছে, কি যে হল তার! এই লোকটার মতই আমার নিজেরও চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে? ব্যাপারটা আমার আওতার বাইরে বলেই হয়ত, হয়ত এমন নিক্রিয়তা অসহ্য ঠেকছিল সে জন্যেই, এক অদ্ভুত উষ্মায় মনটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছিল বারবার।

যা হচ্ছে, মোটেই কাম্য নয়। এখনি কিছু করতে হবে।

কিন্তু লোকটাকেই তাড়া দেব, না আমি নিজে কিছু করব, ব্যাপারটা আদতে কেন এমন হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করব, না অভিসম্পাত দেব বুড়োকে— কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। দপ্‌দপ্‌ করতে থাকল রগগুলো। অবশেষে আরো স্তব্ধ হয়ে অস্বস্তিকে শান্ত করতে চাইলাম।

কান পেতে রইলাম আকাঙ্ক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে—হয়ত নবজাত শিশুর কোমল কান্নায় এই ভয়াবহ ফসিলের মত স্তব্ধতা গুঁড়িয়ে দেবে। এক আর্ত নারীকণ্ঠের

তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রতিবাদ ছিন্নভিন্ন করে দেবে এই স্থবিরতা। এই প্রাণান্তকর গাম্ভীর্যের অবসান হবে নবজাত সৃষ্টির কলকণ্ঠে। তাই হোক, তাই হোক।

কিন্তু কিছুই হল না।

দাঁতে দাঁতে চেপে ফিরে তাকালাম লোকটার দিকে। এই শীতেও আমার কপালে জমে উঠেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঘৃণায় বিরক্তিতে কাঁপছে ঘাড়ের রগ। কঠিন দৃষ্টিটা ফেরালাম উদ্ধত করে। কিন্তু সে শীর্ণ প্রৌঢ় মুখে তখন গড়িয়ে পড়ছে পানি কোটরাগত চোখ বেয়ে বেয়ে।

অবশেষে এক ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বুকটাকে শূন্য করতে চাইলাম।

ইতিমধ্যে ঘাটে এসে ঢুকল ট্রেন। দু'পাশে সার দেয়া কুলির ভেতরে থামল অবশেষে। যাত্রীরা সব হুড়মুড় করে নামতে লাগল। এতক্ষণের স্তব্ধ মানুষগুলো সহসা নতুন এক বেগ পেয়ে ছটফটিয়ে অসম্ভব ধৈর্যহীনতায় চারদিকে ভাঙতে থাকল। এও এক নতুন বিষণ্ণতার গর্জন যেন। এ স্তব্ধতার আওয়াজ আছে, আরো ভয়ংকর।

আবছা অন্ধকারে মানুষগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। কামরায় রইল না কেউ আর। মনে করলাম লোকটা এবার উঠবে। কিন্তু সে নড়লও না।

আমিও দাঁড়াতে পারছিলাম না কেন, জানিনে।

ঘুমকাতুরে ছোট মেয়েটা যাত্রীদের দাপাদাপিতে জেগে উঠেছিল। চোখ মুছল, হাই তুলল, তারপর আশেপাশে কোথাও কাকীমাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হতে থাকল। অস্ফুটকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, কাকী—কাকীমা গো। বুড়ো লোকটার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে সে চিৎকার করল। কিন্তু সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে পারল না কিছুই। দুর্বোধ্য লোকটা তেমনি রইল—যেমন ছিল স্তব্ধ, নিথর, নিষ্প্রাণ।

সেখান থেকে কোন উত্তর আসবে না জেনে আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম প্রাণপণে। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলাম গলা থেকে আওয়াজই বেরুচ্ছে না এতটুকু, শুধু হাতটা নেড়ে নেড়ে ইশারা করছি মেয়েটাকে। তারপর শব্দ যখন বেরিয়ে আসলো নিজের কাছেই কেমন বেসুরো ঠেকল—ওই পায়খানাটায় দেখ, খুলে দেখ......শীগগির......ওই, ওইখানে......

মেয়েটা হতভম্বের মত দেখল আমাকে। ছুটে গেল সেদিকে। দরজা খুলল। তড়িতাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে বিকট চিৎকার করে—কাকীমা গো। অনবরত সে চিৎকার করতে লাগল—জেঠামশাই গো,......আসনা গো......কি হল গো......কাকী......

ততক্ষণে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। সমস্ত লোম সোজা হয়ে উঠেছে। শির শির করছে।

লোকটার দিকে তাকালাম। সে আরো স্থির হয়ে গেছে। এতক্ষণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল, বুক উঠছিল নামছিল—এখন তাও বন্ধ। তারপর পাগলের মত দু'হাতে ঝাঁকাতে লাগলাম তাকে।

পিতৃস্থানীয় জেঠামশাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর অমন বীভৎস মৃতদেহ দেখবেন না, বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। ছোট মেয়েটা কাঁদতেই থাকবে কুরে কুরে। আমারও যে বলার কিছু নেই—তাও মনে হল। আমরা তিনটি প্রাণীর উৎকণ্ঠা যে কি, কে বুঝবে।

ভাবলাম, একবার দেখি, অবস্থাটা কি! কিন্তু যে আজন্ম সংস্কার আর নিরুপায় বিহ্বলতা সেই প্রৌঢ় লোকটাকে অমন করে ফেলেছে তাই আমাকেও স্থবির করল। অসহ্য নিষ্ক্রিয়তায় চোখ দুটো বন্ধ হযে এল। তীব্রতম আবেগের মুহূর্তেই মানুষ বুঝি এমন করে বন্ধ্যা হয়ে যায়।

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। সামনে নিরন্ধ্র অন্ধকার।

অন্ধকার, যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারীদেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হযে আছে। পেট অত্যন্ত উঁচু। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা। একটি মাতৃত্ব-আকাঙ্ক্ষী নারী, জীবনের জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে। তার ফুলে ওঠা পেটের ভেতর আছে একটি শিশু, একটু আগেও জীবিত ছিল সে। জন্মাতে পারলে অনেক কিছুই হয়ত করতে পারত। সুখী আগামী পৃথিবীর বুকে শ্বাস নিতে পারত অন্ততঃ। এ জন্মকে রুখল কে?

তখুনি কি এক যন্ত্রণায় সারা বুকটা কুঁকড়ে উঠল আমার। আর কি ঘৃণা। ধ্বংসের জন্যে ঘৃণা। অসহ্য!

প্রৌঢ় লোকটার মুখ আমি মনে করতে পারিনে আর। কিন্তু তার নিরুপায় স্তব্ধতাটি এখনও আমার বুকের ভেতর জড়িয়ে আছে।

সময়ের প্রয়োজনে

জহির রায়হান

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প-কমাণ্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। তারপর আপনার সংগে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধান একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে সেখানে।

খাতাটা খুললাম।

মেয়েলি ধরনের গোটা গোটা হাতে লেখা।

মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনও চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রুও হয়ত জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কি জানি, হয়ত অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, তাই। মৃত্যুর খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলাটার ওপরে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু দুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি পেতেছে ওরা। একদিন যারা

আমাদের অংশ ছিল। এক সংগে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিস্‌পিস্‌ করে। পাগলের মত গুলি ছুঁড়ি। মারার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণায় থুথু ছিটোই মৃতদেহের মুখে। সামনে ধানক্ষেত। আলের ওপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল। একটানা ডাকছে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের দিকে। কি যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। সন্দেহে মুহূর্তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প-কমাণ্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার, মনে হচ্ছে ওরা এগুতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসেব কষছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত দু'রাত ঘুমোননি। অবকাশ পাননি বলে। তিনি তাকালেন।

বললেন, কি দেখেছ ?

বললাম, মনে হল একটা মুভমেণ্ট।

ভুল দেখেছ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের দু'এক-দিনের মধ্যে এগুবার কথা নয়। যাও, ভাল করে দেখ।

চলে এলাম নিজের জায়গায়। একটানা তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তন্দ্রা এসে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। হয়ত তাই ভুল দেখি।

কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে-দৃশ্য দেখে-ছিলাম সেটা ভুল হবার নয়। শুনেছিলাম, বহুলোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই।

দেখলাম।

মেঝেতে পুডিং-এর মত জমাট রক্ত।

বুটের দাগ।

অনেকগুলো খালি পায়ের ছাপ।

ছোট পা। বড় পা। কচি পা।

কতগুলো মেয়ের চুল।

দুটো হাতের আঙুল।

একটা আংটি ।
চাপ চাপ রক্ত ।
কালো রক্ত । লাল রক্ত ।
মানুষের হাত । পা । পায়ের গোড়ালি ।
পুডিং-এর মত রক্ত ।
খুলির একটা টুকরো অংশ ।
এক খাবলা মগজ ।
রক্তের ওপরে পিছলে যাওয়া পায়ের ছাপ ।
অনেকগুলো ছোট-বড ধারা । রক্তের ধারা ।
একটা চিঠি ।
মানি ব্যাগ ।
গামছা ।
এক পাটি চটি ।
কয়েকটা বিস্কুট ।
জমে থাকা রক্ত ।
একটা নাকের নোলক ।
একটা চিরুনি ।
বুটের দাগ ।
লাল হয়ে যাওয়া একটা সাদা ফিতে ।
চুলের কাটা ।
দেশলাইয়ের কাঠি ।
একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ ।
রক্তের মাঝখানে এখানে ওখানে অনেকগুলো ছড়ানো ।
পাশের নর্দমাটা বন্ধ ।
রক্তের স্রোত লাভার মত জমে গেছে সেখানে ।
দেখছিলাম ।
দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে ।
আমি একা নই । অসংখ্য মানুষ ।
অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মত ছুটছিল ।

মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের পোঁটরি। হাতে হ্যারিকেন। কোমরে বাচ্চা।

চোখেমুখে কী এক অস্থির আতংক।

কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকোয় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। দু'তিন শ' লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না।

মনে হল পায়ের সংগে যেন কয়েক মণ পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিহ্বল মুহূর্ত। কোনদিকে যাব। পেছনে ফিরে যাবার পথ নেই। মৃতদেহের স্তূপের নীচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছিনে। সেখানেও হয়ত মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনদিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায় সংগে সংগে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কাঁচকি মাছের মত চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার উপরে নেমে এল।

তারপর!

তারপর মনে হল একসংগে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনছি। অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চার কান্না। কতগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার। কান্না। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বা'জান। বা'জান। হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ডাকছে সে। বা'জান। বা'জান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। কিংবা মারা যাচ্ছি।

সামনে ধানক্ষেত। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। ওখানে আমরা থাকি।

মোট সাতাশ জন মানুষ।

প্রথমে উনিশ জন ছিলাম। আট জন মারা গেল মর্টারের গুলিতে। ওদের কবরে নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা এগার জন।

একজন পালিয়ে গেল সে রাতে। গেল, আর এল না। আর একজন মারা গেল হঠাৎ অসুখ করে। কি অসুখ বুঝে উঠবার আগেই হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। আর উঠল না। তার বুকপকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে লেখা। মা। আমার জন্যে তুমি একটুও চিন্তা করো না, মা। আমি ভাল আছি।

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি। থাক। ওখানেই থাক। তখন ছিলাম ন'জন। এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁচেছি।

সাতাশ জন মানুষ।

নানা বয়সের। ধর্মের। মতের।

আগে কারো সংগে আলাপ ছিল না। পরিচয় ছিল না। চেহারাও দেখিনি কোনদিন।

কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিন-মজুর। কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানী। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।

এখন সবাই সৈনিক।

একসংগে থাকি। খাই। ঘুমোই।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোন শত্রুর সন্ধানে বেরোই তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বহুদিন ধরে চিনি। জানি। অতি আপনজনের মত অনুভব করি।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝে মাঝে বিশ্রামের মুহূর্তে গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা।

অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

টুকিটাকি নানা আলোচনা।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। ক'দিন ধরে শুধু ডাল-ভাত চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হত না। সাতাশ জন মানুষ আমরা। মাত্র ন'টা রাইফেল। আরো যদি অস্ত্র পেতাম। সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন ওদের একজন সৈন্যকেও পালিয়ে যেতে দিতাম না।

মোট দু'শ জনের মত এসেছিল ওরা। পঁয়তাল্লিশটা লাশ পেছনে ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশেপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য ছেলে-বুড়ো-মেয়ে গেরস্ত-বাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে।

কারো হাতে ঝাঁটা। দা। কুড়োল খুন্তি।

মৃতদেহগুলোর মুখে ঝাঁটা মারছে ওরা।

কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে ওদের হাত। পা। মাথা। বুকের পাঁজর। দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একটি মৃতদেহকে শত টুকরো করতে করতে জনৈক বৃদ্ধ চিৎকার করে কাঁদছিল। আমার পুলাডারে মারছুস। বউডারে নিয়া গেছুস। মাইয়াডারে পাগল করছুস। আমার সোনার সংসার পুড়ায়া দিছুস।

আল্লার গজব পড়ব। আল্লার গজব পড়ব।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

আমরা বাধা দিলাম। আর প্রায় সংগে সংগে ডুকরে কেঁদে উঠল ওরা। করুণ বিলাপ শুরু করল। বিলাপের অবসরে নিজেদের সহস্র দুঃখ-বেদনার ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগল।

ছেলে নেই। স্বামী নেই। স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। যুবতী মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিন মাস হল। হালের গরু। গোলার ধান। গায়ের অলংকার। কিছু নেই। সব লুট করেছে।

ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।

এত সব বুকে নিয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। একটা বিস্ফোরণে যদি সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত তাহলে হয়ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারত ওরা।

ওরা একা নয়। অনেকগুলো মানুষ। সাড়ে সাত কোটি। এক কোটি লোক ঘর বাড়ি মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। তিন কোটি লোক সারাক্ষণ পালাচ্ছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

ভয়। ত্রাস। আতংক।

জ্ঞান ফিরে এলে আমিও পালিয়েছিলাম। পোড়ামাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে। অনেকগুলো মৃতদেহ ডিঙিয়ে। কালো ধুঁয়োর কুণ্ডলি ভেদ করে।

একটা গহনা-নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ছেলে বুড়ো মেয়ে বাচ্চাতে গিজ গিজ করছিল সেটা। দু'পাশের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলছে।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা প্লেন এসে একটানা বোমাবর্ষণ করেছে সেখানে।

কাছেই একটা মফস্বল শহর। এখনও পুড়ছে। কালো জমাট ধুঁয়ো কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে। একটা মানুষ নেই। কুকুর নেই। জন্তু জানোয়ার নেই। শূন্য বাড়িগুলো প্রেতপুরীর মত দাঁড়িয়ে। সহসা অনেকগুলো মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলাম। দূরে নদীর পারে একসংগে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে কতগুলো মেয়ে চিৎকার করে নৌকাটাকে পারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ডাকছে। ওরা আশ্রয় পেতে চায় নৌকাতে। না না, খবরদার, নৌকা ভেড়াবে না। একজন বৃদ্ধ ওদের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল।

কেন, কী হয়েছে?

কি আর হবে? বাজে মেয়ে। বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে মানে?

মানে আবার কি সাহেব। বেশ্যা। বেশ্যা চেনেন না। ঘৃণায় চোখ মুখ কুঁচকে এল তার।

তার একার নয়। অনেকের।

অনেকেই মুখ বার করে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যাগুলোকে দেখল। না না। নৌকা থামাবার দরকার নেই। আপদগুলো মরুক। মরলেই ভাল।

নৌকা থামাও। সহসা ভীড়ের ভেতর থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তজবার মত লাল চোখ।

শীগগির নৌকাতে তুলে নাও ওদের। কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল সে। উত্তরে বুড়োটা বিরক্তি প্রকাশ করল। না, নৌকা থামাবে না।

সংগে সংগে সামনে লাফিয়ে এসে বুড়োটার গলা চেপে ধরল ছেলেটা। কুত্তার বাচ্চা। তোমাকে এক্ষুণি তুলে ঐ নদীর জলে ফেলে দেব আমি। কোন্ শালা শূয়রের বাচ্চা আছে এখানে বাধা দেয় আমাকে।

নৌকা ভেড়াও মাঝি। ওদের তুলে নাও।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। নৌকা ভিড়ল।

ভয়ে আতংকে অর্ধমৃত বেশ্যাগুলো ভেড়ার পালের মত নৌকায় এসে চড়ল।

ছোট বেশ্যা। মাঝারি বেশ্যা। বড় বেশ্যা।

কিশোরী বেশ্যা। যুবতী বেশ্যা। বৃদ্ধা বেশ্যা।

ঘৃণায় একপাশে সরে গেল নৌকার কুলীন যাত্রীরা। বেশ্যারা কোন কথা বলল না। এককোণে গাদাগাদি করে বসল।

অনেকগুলো মুখ।

একটি মুখ আমার মায়ের মত দেখতে।

মা কখন কী করছে ?

মায়ের কথা মনে পড়তে বুকটা ব্যথা করে উঠল।

ছোট ভাই। বোন। ইতুদি। ওরা কেমন আছে ?

বেঁচে আছে না মরে গেছে ?

জানি না। হয়ত বহুদিন জানব না।

তবু একটা কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি দেয় আমার।

আবার কি ওদের সংগে একসাথে নাস্তার টেবিলে বসতে পারব আমি ?

আবার কি রোজ সকালে মা আমার বন্ধ দুয়ারে এসে কড়া নেড়ে ডাকবে ? কিরে, এখনো ঘুমোচ্ছিস ? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।

ওঠ। চা খাবি না ?

কিংবা।

দল বেঁধে সবাই বাড়ির ছাদের ওপরে কেরাম খেলা। পারব কি আবার ?

অথবা।

মাকে সাক্ষী রেখে, সবাই মিলে বাবার পকেট মারা ? হয়ত। জানি না।

জানতে গেলে ভাবনা হয়। ভাবনাটাই একটা যন্ত্রণা। অথচ ভাবতে আমি এককালে ভীষণ ভালবাসতাম। বিশেষ করে জয়াকে নিয়ে। চিনু ভাবীর জয়া। কতভাবে ভেবেছি ওকে।

কখনো সমুদ্রের উত্তাল পটভূমিতে।

কখনো ঢেউ জাগানো মিছিলের মাঝখানে।

কখনো ছোট্ট একটি ঘরের একান্তে। দিনে। রাতে।

অন্ধকারের নিবিড়তায়।

কিংবা কোন দুপুরে। কোন রেস্তোরাঁর কোণের টেবিলে। নিরিবিলি নির্জনে। দু'কাপ চা সামনে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কোন কথা না বলে বসে থাকার মুহূর্তে। ভাবতে ভাল লাগত।

ইছামতী, করতোয়া, ময়ূরাক্ষী বলে যে-নদীর নাম, তার জলে দু'জনে সাঁতার কেটে ঢেউয়ের সংগে কানামাছি খেলতে।

জয়া কোনদিন সমুদ্র দেখেনি। সমুদ্র দেখার বড় ইচ্ছে ছিল তার। একদিন হাসতে হাসতে বলল, জানো, সমুদ্র দেখে এলাম। কখন! কোথায়? অবাক হয়েছিলাম আমি।

কেন, এই শহরে? কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বলেছিল জয়া। শহরের অলিতে গলিতে এত সমুদ্রের ছড়াছড়ি জীবনে দেখেছ কখনো?

জনতার সমুদ্র।

সমুদ্রের চেয়ে গভীর।

সাগরের চেয়েও উত্তাল।

গতিময়।

মনে হচ্ছিল সামনে যত বাধার পাহাড় আসুক না কেন, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কোটি কোটি মুখ। পাথরে খোদাই করা চেহারা। মুষ্টিবদ্ধ হাত সীমানা ছাড়িয়ে। লক্ষ-কোটি বজ্রের শব্দ কিংবা ঢেউয়ের ধ্বনি সে মিছিলের গর্জনের কাছে অর্থহীন।

আগে তো দেখিনি কোনদিন।

বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে। চুয়ান্নতে। বাষট্টি, ছেষট্টি, কিংবা উনসত্তরে অনেক দেখেছি।

কিন্তু এত প্রাণের জোয়ার কখনো দেখিনি।

এত মৃত্যুও দেখিনি আগে।

সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম।

প্রতিদিন দেখি।

জয়াকেও এত নিবিড় করে দেখিনি কোনদিন। পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। সে দালানের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকেছি আমরা। ওগুলো মৃতের হিসেব।

আমাদের নয়।

ওদের।

যখনি কোন শত্রুকে বধ করেছি, তখনি একটা নতুন রেখা টেনে দিয়েছি দেয়ালে। হিসেব রাখতে সুবিধে হয় তাই। প্রায়ই দেখি। গুণি। তিন শ' বাহাত্তর, তিয়াত্তর, চুয়াত্তর। পুরো দেয়ালটা কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি।

আমাদের যারা মরেছে। মরেছে। তাদের হিসেবও রাখি। কিন্তু সেটা মনে মনে। মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। সেটাও মাঝে মাঝে গুণি।

একদিন।

বেশ কিছুদিন আগে। সেক্টর কমাণ্ডার এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে, দেখতে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে।

তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

কেন যুদ্ধ করছ বলতে পার?

প্রায় এক ধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।

বলেছিলাম, দেশের জন্যে। মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্যে।

বাংলাদেশ।

না। পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি আমরা। উত্তরটা ঠিক হল কি?

দেশ তো হল ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজার বার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তাহলে কিসের জন্যে লড়ছি আমরা?

বন্ধুরা নানাজনে নানারকম উক্তি করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মত মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওই শালারা বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়াবার জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্যে লড়ছি।

কেউ বলেছিল, কেন লড়ছি জান? দেশের মধ্যে যত গুণ্ডা-বদ্‌মাশ, ঠগ, দালাল, ইতর, মহাজন আর ধর্ম-ব্যবসায়ী আছে তাদের সবার পাছায় লাথি মারতে।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

কিসের জন্যে লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি?

হয়ত সুখের জন্যে। শান্তির জন্যে। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্যে।

কিংবা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে।

অথবা, সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে লড়ছি আমরা।

না।

অতশত ভাবতে পারি না। আমার ছোট মাথায় অত ভাবনা এখন

আর ধরে না। ব্যথা করে। যেটা বুঝি সেটা সোজা। আমাদের মাটি থেকে ওদেরকে তাড়াতে হবে। এটাই এখনকার প্রয়োজন।

দেয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে।

মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।

হাতের কব্জিতে এসে একটা গুলি লেগেছিল কাল। সেটা হাতে না লেগে বুকেও লাগতে পারত। মাত্র দু'আঙুলের ব্যবধান।

এখন ক'দিন বিশ্রাম।

মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত। বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল।

ঘর?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড় অদ্ভুত।

ঘর-বাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন চলে গেছে। হয়ত কোন গ্রামে, কোন গঞ্জে। কোন উদ্বাস্তু শিবিরে। কিংবা—

না। ওটা আমি ভাবতে চাই না।

জয়ার কোন খবর নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়ত পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার গ্রামে। তখন হয়ত পরিচিত অনেকগুলো মুখ সেখানে থাকবে না। তাদের আর দেখতে পাব না আমি। যাদের পাব তাদের প্রাণভরে ভালবাসব।

যারা নেই কিন্তু একদিন ছিল, তাদের গল্প আমি শোনাব ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বুকে মাইন বেঁধে যে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিংবা, সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মৃদু হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসেনি। অথবা উদ্বাস্তু শিবিরের পাঁচ লক্ষ মৃত শিশু।

দশ হাজার গ্রামের আনাচে কানাচে এককোটি মৃতদেহ।

না, এক কোটি নয় হযত হিসেবের অংক তখন তিন কোটিতে গিয়ে পৌঁচেছে।

এক হাজার এক রাত কেটে যাবে হয়ত। আমার গল্প তবু ফুরোবে না।

সামনে ধানক্ষেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প-কমাণ্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, কার লেখা, আপনার ?

না। আমাদের সংগের একজন মুক্তিযোদ্ধার।

তার সংগে একটু আলাপ করতে পারি কি ? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্ত কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর ?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পাচ্ছি না। হয়ত মেরে ফেলেছে। বেঁচেও থাকতে পারে হয়ত।

চোখজোড়া অজান্তে আবার খাতাটার ওপরে নেমে এল। অনেকক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। সেখানে আগুন জ্বলছে।

সাদা হাতী

—মুর্তজা বশীর

ও যখন ঘরে এসেছিল, তখন রাত দশটা হবে।

সারা দুপুর জুয়ো খেলেছে। টাকা জেতার ইচ্ছে নিয়ে নয়, কিংবা খেলাটা যে তারপক্ষে নেশা তাও না। কেমন একটা একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রং তুলি নিয়ে বসে এগারোটা-বারোটা নাগাদ। দুপুরে, রয়াল পার্কের ছোট ছোট দোকানে দুটো রুটি আর আধা প্লেট তরকারী দিয়ে কোনমতে পেট চালায়। তারপর, 'মলে'র রাস্তায় ইতস্তত: ঘুরে স্কুল ফেরৎ মেয়েদের দেখে। বিকেল হলে, আর্ট কাউন্সিলে আড্ডা। আর আট্‌টা-নটা পর্যন্ত এই। আর এই একঘেয়েমী থেকে পালিয়ে থাকার জন্য আকিলের ঘরে খেলতে বসেছিল। পকেটে ওর ছিল ত্রিশ টাকা। কিন্তু ত্রিশ থেকে হয়ে উঠেছিল একশ। বাকী টাকাটা ও টেবিল থেকে না নিয়ে উঠে পড়েছিল। আবার অনুভব করছিল সেই অস্বস্তিকর একঘেয়েমী। সবাই অবাক হয়েছিল ওর এমন অদ্ভুত ব্যবহার দেখে। খেলা তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল. কিন্তু বসেছিল মদের পার্টি।

মদ খেয়েও স্বস্তি এতটুকুন পায়নি। বরং নিজেকে মনে হয়েছে বড্ড বেশী নিসঙ্গ। এক সময়, দল বেঁধে টাঙ্গায় করে গিয়েছিল হীরামণ্ডিতে নাচ দেখতে। মেয়েটা কম বয়সীই ছিল। দেখতেও বেশ। নেচেও ছিল মন্দ নয়। তবুও কেন জানি ভাল লাগছিল না বেশীক্ষণ বসতে। গাটা মনে হচ্ছিল পুড়ে যাচ্ছে, কপালে ব্যথা। জ্বর মনে হয়েছিল। বন্ধুদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলো না যে তার জ্বর হয়েছে, আর না হয়ে থাকে হবে।

তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শীত শীত করছে। ঘরে স্টোভ নেই যে কয়লা জ্বালাবে। গ্যাসও নেই যে হিটার রাখবে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, কি আছে ঘরটায়? ভাড়া ত মোটেই সস্তা নয়। "এল" ধরনের ঘর। দেড়তলা। সুবিধা থেকে অসুবিধাই অনেক। আঙ্গুল দিয়ে ও অসুবিধাগুলো এক এক করে গুণলো। ১ ঘরে চুনকাম নেই। তৈরীর সময়

সিমেন্টের প্লাষ্টার লাগিয়েছিল, তেমনিই রয়েছে। ২ বাথরুম নেই। ওটার কি কেউ গোছল সারতে পারে ?

মাথাটা এতক্ষণ লেপের ভেতর ছিল। বের করে বাঁ পাশে তাকাল। হাসল। মেঝে থেকে তিন ফুট উঁচুতে লম্বায় পাঁচ আর পাশে আড়াই ফুটের গর্তটা হলো গোছলখানা। এখন শীত, তাই রক্ষে। গরমে, লাফিয়ে গর্তে ঢুকেছে, বালতির পানিতে গোছল সেরে আবার লাফিয়ে নেমেছে। আশ্চর্য এতদিনে মনে পড়ল ওর এক বছর ধরে সে নীচ থেকে রোজ বালতি করে পানি এনেছে। এবং আনবে, আনতে হবে কাল-পরশু-তরশু। যতদিন থাকবে, ততদিন। ঠাণ্ডা লাগছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে এ বছর। মারীতে জলদি বরফ পড়েছে এবার। বাতাস আসছে ওখান থেকে। লেপটা ফের মুড়ি দিল ও। শুয়ে শুয়ে গালি দিল বাড়ীওয়ালাকে। অকথ্য। বাপ তুলল। মা তুলল। বোন তুলল। আর বলল, শালা চোর। প্রতিজ্ঞা নিল, ভাল হলেই এ ঘর ছেড়ে দেবে। অন্যত্র কোথাও চলে যাবে। হোক না ঘরে ঢোকার পথ সম্পূর্ণ আলাদা। থাকুক না কেন তার চলাফেরা গোপনীয়।

হাঁটুটা মুড়ে কাত হয়ে শুয়ে ছিল, চিৎ হলো।

পেটের উপর হাতটা ছিল, আঙুল দিয়ে সেখানে দাগ কাটতে কাটতে মনে হলো, খিদে পেয়েছে।

শীতের মৌসুম। নটার মধ্যেই সামনাবাদের এলাকা হয়ে যায় নিশুতি। রেষ্টুরেন্টে যে যাবে তার উপায় নেই। এক হয়, যদি চৌবুরজীর দিকে যায়। তা হলে হয়ত রাস্তার ধারের দোকানে দুধ আর বনরুটি পেতে পারে। কিন্তু সে ত বেশ দূর। অবশ্য দূরের জন্য অত ভাবে না। বহুরাত বন্ধুদের সাথে হল্লাগুল্লা করে সেই আনারকলি থেকে হেঁটে এসেছে। সে কথা অবশ্য আলাদা। তখন এমন করে শীত আর খিদে তাকে একজোট হয়ে বাঁধেনি। আজ দুটোই তাকে পেয়েছে।

আচমকা খেয়াল হলো, যখন রিগ্যাল বাস স্টপে বাসের আশায় তীর্থকাকের মত দাঁড়িয়ে ছিল তখন দুটো ডিম কিনেছিল। কোটের দু'পকেটে হাত গুঁজে হাতের মুঠিতে চেপে ধরেছিল ও দুটোকে। সারা শরীর তাতে বেশ উষ্ণ হয়ে

উঠেছিল। লাফিয়ে উঠে বসল এমন করে যে অর্ধেক লেপ গেল মাটিতে ঝুলে। যেমন করে লাফিয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি করে ডিম দুটো নিয়ে এল। পা টান করে সোজা হয়ে বসল বিছানায়। পিঠটা ঠেস দিল পেছনে। দেয়ালে। বুক অবধি লেপটা টেনে ডিমের খোসা সযত্নে ছাড়াতে লাগল। একটুকুনও যেন চলে না যায়। মাথার কাছে দেয়াল তাক। নীচের তাকে দুটো গ্লাস। ব্রাণ্ডির একটা বোতল। অর্ধেকের কম রয়েছে। নাসরীন এসেছিল দু'সপ্তাহ আগে। সেদিন কিনেছিল। অবশ্য গা গরম করার জন্য নয়। মনে সাহস আনার জন্য। মেয়েছেলে চুপি চুপি ঘরে আনতে ভয় হয়েছিল। গ্লাসে আস্তে আস্তে ঢালল। চুমুক দিল।

করাচী থেকে ওর এক বন্ধুর চিঠি এসেছে আজ ভোরে। পেয়েই একবার অবশ্য পড়েছিল। আবার এখন পড়ল। সেই একই কাহিনী। মদ হৈ চৈ আর গাড়ী করে এ রাস্তায় ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। কখনো ক্লিফটনে। আরব সাগরের ওপর তারার মেলা দেখা। ঢেউ গোনা। আবার কখনো এয়ারপোর্টে। লাউঞ্জে, বিয়ারের বোতল সুমুখে রেখে প্লেনের ওঠানামা দেখা। একদিন না। দুদিন না। রোজ। এমনি। ভাবল, একঘেয়ে লাগে না। বমি আসে না।

ও যখন করাচীতে ছিল গরমে, তখন এমনি সেও করেছে। রোজ। তারপর হুট করে চলে গিয়েছিল ঢাকায়। কাউকেও না বলে। একটুখানি শান্ত পরিবেশের জন্য মনটা হাঁফিয়ে উঠেছিল।

আজকেও অনেক দিন পর আবার ঢাকার কথা ওর মনে পড়ল। মনে হলো সবারই কথা। বাবা-মা-বোন-ভাই-ভাবী। কারো খবর সে জানে না। জানতে চায়নি। রাখতে চায়নি। খবর দেয়নি, নেয়নিও। কিন্তু, এখন কেন জানি জানতে ইচ্ছে করল বড্ড বেশী। জানাতে ইচ্ছে করল, খুব হয়েছে।

তাছাড়া, আর কারুর কথা মনে এলো, না। বন্ধুদের কথা ত নয়ই। ঢাকার বন্ধুদের ও ঘৃণা করে। এখানে, লাহোরের বন্ধুদেরও ঘৃণা করে। সবাইকে ঘৃণা করে। নিজেকে করে সবচেয়ে বেশী।

ব্রাণ্ডিটা মন্দ লাগছে না। যেন আগের মত নয়। বেশ গরম হয়ে উঠেছে গাল। কান। পায়ের একটা পাতা দিয়ে অপরটা মৃদুভাবে ঘষতে লাগল ও। বন্ধুটি গল্প লেখে। নতুন এক গল্প লিখেছে। সেটার থেকে কিছু তুলে দিয়েছে।

চিঠিটা পড়ে কাগজ টেনে নিল।

প্রথমে লিখল, প্রিয়বরেষু। লিখে কিছুক্ষণ ভাবল। না, ঠিক হলো না। কেটে দিল কথাটা। লিখল, সুহৃদবরেষু। আবার কাটল। ঠিক কথাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

মাথাটা ভার লাগছে। চোখজোড়া জ্বলছে। আবার শীত লাগছে ওর। সারা শরীরে ধানের শীষের মত কেঁপে কেঁপে ঠাণ্ডা এল।

কলমটা খুলে লেপের উপর রেখেছিল। নিবের জায়গায় গোল হয়ে দাগ ধরে গেছে। কলমটা তুলে নিল। আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করল ভেজা দাগের মসৃণতা। আঙ্গুলের ডগায় কালির ছোপের দিকে অকম্পভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনো হলো রক্তের দাগ কালো হয়ে গেছে।

হঠাৎ কাগজটা টেনে লিখল। সোজাসুজি। জান সাইদ, কেন জানি আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। এই যে অগুনতি মানুষ, তার কোলাহল চারিদিকে, তবু কই আমার নিসঙ্গ জীবনের শেষ? নিজেকে মনে হয় একা। পৃথিবীতে নির্বাসিত।......

চোখ জোড়া বেশ জ্বালা করছে। কি যে লিখেছে এবং লিখবে বুঝতেই পারছে না।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানার এপাশ ওপাশ করল। কিন্তু ঘুম এল না অত তাড়াতাড়ি।

রাস্তায় হঠাৎ করে একটা বাসের শব্দ। কখনও ধীরে চলা কোন টাঙ্গাগাড়ীর ঘোড়ার খুরের একটানা আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে চিরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল :

আকাশ আর পাখী। অসংখ্য পাখী। লাল। হলুদ। কালো। সাদা। সারা আকাশময় উড়ছে আর উড়ছে। ছোট ছোট পাতলা ডানা বাতাসকে কেটে চিরে ঘুরছে। কখন একসঙ্গে। কখন এলোমেলো। ডাইনে। বাঁয়ে। এদিক-ওদিক। হঠাৎ একটা রূপালী পালক বাতাসে দোল খেয়ে কেঁপে কেঁপে নীচে নেবে এল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা মানুষ। উলঙ্গ। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল পালকটা। অর্ঘ দেবার মত করে দু'হাতের অঞ্জলিতে রাখল। তারপর

পায়ে পায়ে হেঁটে এল। ওর সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সেটাকে। এই প্রথম ও দেখল লোকটার চেহারা। ও নিজে। নিজের চেহারা।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেলা অনেক।

মাথায় তখনও ব্যথা রয়েছে। চোখ মেললেই সুচ বেঁধে। বিছানা ছেড়ে মোটেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। তবুও তাকে উঠতে হলো।

জানালার পাটে, পেরেকে গোল আয়নাটা ঝুলান। ওখানে চেহারা দেখল। একটু ক্যাকাশে হয়ে গেছে চোখ মুখ। জানালাটা খুলে তাকিয়ে রইল বাইরে। কেমন মেঘলা আকাশ রোদ যেখানে পড়েছে মনে হচ্ছে সোনাতে মোড়া। মনে পড়ল টারনারের ছবির কথা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল।

রোজকার মত নীচ থেকে পানি তুলল এক বালতি। মুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরুল। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাস্তায় নেমে এলো। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁজো হয়ে চলতে লাগল বাজারের দিকে। নিমকি বিস্কুট কিনল এক প্যাকেট। আটটা কমলা। গোটা ছয়েক এ্যাসপ্রো।

ঘরে ফেরার মুখে দেখল একদল মেয়েদের। ইস্কুলে যাচ্ছে। মনে মনে বলল, বেশ সুন্দর মেয়েগুলো ত' এদিকে।

সত্যি, আশ্চর্য। কোন দিন এদের সে দেখেনি। এ পাড়ার কোন মেয়েকেই চোখে পড়েনি। ঘুম থেকে ও যখন উঠত তখন তারা ইস্কুলে পৌঁছে যায়।

ঘরে এসে সোজাসুজি বিছানায় বসল ও। গোটা পাঁচ-ছয়েক বিস্কিট খেল। একটা কমলা। তার কিছুক্ষণ বাদ দুটো এ্যাসপ্রোর গুলি। তারপর লম্বালম্বি ভাবে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

শুয়ে শুয়ে মাথা চারধারে ঘুরিয়ে দেখল, খুঁজল ধূসর কোন জীব। কিন্তু নিরাশ হলো। পেল না। থাকলে বেশ হতো, ভাবল ও। অন্তত একটা কিছু জীবন্ত। তাকে চলতে। নড়তে।

এই প্রথম ও অনুভব করল রেডিওর প্রয়োজন। রেডিও রাখাকে ও ভাবত বিলাস। যার না আছে কোন চালচুলো। ঠিক ঠিকানা। আজ এ শহর, কাল ও শহর। ওর মোটেই ভাল লাগে না। এমনি করে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু উপায় কই? ছবি এঁকে চলে, একজিবিশন করে। টাকার টান ধরলেই আবার একজিবিশন। প্রতিবার ঠিক করে এই শেষ। আর না। এইবার এক জাগায়

থাকবে। চাকরী নেবে। আর অবসরে ছবি আঁকবে। চাকরী পেয়েছে ও। তখনই ভয় পেয়েছে ও। ভয় লেগেছে। তাহলে আর ছবি আঁকতে পারবে না। তখন পিছিয়ে গেছে। নেয়নি।

আর নেয়নি বলেই রেডিও নেই আজ।

বার বার কামনা করল কোন শব্দ। একটা স্বর। অন্য কারুর। আর সেই আওয়াজ এই গুমোটটাকে ভেঙ্গে দিত। বেশ হতো। একটুখানি গান। বা কোন সুরের গুনগুনানি।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেল ও।

কানটা সজাগ করল। ভয় পেল নিশ্বাস ফেলতে। যদি অমুচ্চ শব্দটা হারিয়ে যায়। তারপর ধীরে খুব মোলায়েমভাবে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল শব্দের দিকে। অতি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল টাইমপিসটা তাক থেকে। বাঁ হাতের উষ্ণ তালুতে ওটাকে রেখে সন্তর্পণে চাবি দিতে লাগল অ্যালার্মে। সুচের মতন চিক্কন কাঁটাটা রয়েছে পাঁচের ঘরে। সকাল সকাল তাড়াতাড়ি যাতে নাসরীন চলে যেতে পারে সেজন্য সেদিন কাঁটাটা ওখানে রেখেছিল। এরপর আর সরাবার সুযোগ আসেনি। আজও সরাল না। বরং সময়ের কাঁটা ঘুরিয়ে আনল পাঁচের ঘরে।

ছোট্ট ছেলেমানুষ যেমন করে শোনে বার বার তেমনি করে ও শুনতে লাগলো। বেশ আওয়াজটা। কাঁপানো। পাতলা। মিষ্টি।

কখন কানে চেপে, কখন সুমুখে ধরে শুনল। শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল: বিরাট এক দরজা। তার সুমুখে ও দাঁড়িয়ে। কড়া নাড়বে কিন্তু দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। লোকটা ও নিজে। দু'মাসের আগের চেহারা। দাড়ি নিয়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। বলল, কাপুরুষ কোথাকার।

শুনে চমকে গেল। বলল, না, না, আমি না।

দাড়ি কেন কেটেছ?

লোকে আমাকে মৌলানা বলে। তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা বার কয়েক চুলকালো।

সলজ্জ বলল, মেয়েদের দিকে তাকালে ওরা হাসে।

ধমক দিল লোকটা, মিথ্যে কথা। আসলে সব কিছু মেনে নিয়েছো। নতি স্বীকার করেছ। তোমার অহংকার নেই। যার অহংকার নেই সে কি মানুষ? আত্মার মৃত্যু হয়েছে তোমার।

আত্মার মৃত্যু। না। কি করে? অসম্ভব।

হাসল লোকটা। এত স্বচ্ছ সে হাসি যে নিজেকে তার সুমুখে দাঁড় করিয়ে রাখতে কেমন সংকোচ হলো। নিজের সমস্ত সত্তা যেন গড়িয়ে গেল মাটিতে। নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। তার মুখের দিকে।

লোকটা বলল, বুঝবে কি করে। বুদ্ধি কি আছে তোমার? মাথার পেরেক ঠুকলে হয়তো বেরুতে পারে।

শুনে শিউরে উঠল ও। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল পেরেক কেন?

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখে লোকটা জবাব দিল। বুদ্ধির গোড়াতে ছুঁতে হবে।

না। না। আবার ও কেঁপে উঠল। জলদি করে বলল, ফুল দিয়ে আঘাত কর। যদি বুদ্ধি আমার ঘুমিয়ে থাকে তবে ফুলের পাপড়ির আঘাতে ওর ঘুম যাবে ভেঙ্গে। তারপর চোখ মেলে চাইবে। দেখবে। আমি বুঝবো।

তুমি বিয়ে করতে চলেছ? না রাজা?

লোকটার বিদ্রুপে ও মোটেই দমল না। একটু ভেবে বলল, বেশ, তবে কাঁটা দিয়ে আমার মাথাটাকে মোরাব্বার মত কাঁচো। লাল হয়ে আমার সারা মুখ ভিজে যাবে। লোমকূপের গোড়া দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যাবে রক্তের ধারা। বিস্মৃত বুদ্ধি জেগে উঠবে। ভেসে উঠবে।

তুমি কি বিশু?

লোকটার প্রশ্ন শুনে তার দিকে তাকাল। কোন রকম দয়া নেই। মায়া নেই।

তা ঠিক, আমি রাজা নই। বিয়ে করতেও যাচ্ছি না। বিশু নই।

কাপুরুষ।

না।

হ্যাঁ।

না, না। তোমার কসম ওটা বল না।

কেন? সত্যি কথা শুনতে ভয় পাও?

না।

তবে, কে তুমি?

হাসান রেজা।

নাম ওটা।

ছবি আঁকি।

ওটা পেশা।

আমার ছবি সবাই চেনে। আমার নাম সই রয়েছে সেখানে।

ওগুলো অক্ষরের সৃষ্টি।

লোকটার কথা শুনে চমকে উঠল ও। তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে রইল মুখোশ আঁটা মুখের দিকে।

জানি না। বুঝি না। উহ্। দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। এক সময় মুখ তুলল। অকরুণ একটা লোক। তাকে দেখছে। চোখ-জোড়া সরু করে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল ওর মুখের দিকে। ক্রমেই বড় হতে লাগল আঙ্গুলগুলো। পাঁচটা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল উন্মুক্ত আকাশ, কিন্তু আর পেল না। অনুভব করল ওর মুখে আঙ্গুলের ছোঁয়া। একটা হিমশীতল সাপ তার সারা শরীরকে জড়িয়ে উঠতে লাগল। যেখানে দিয়ে সাপ বেয়ে বেয়ে উঠেছে ও জায়গাগুলো যেন পচে গেল। কোন রকম অনুভূতি নেই। অবসাদ।

শুনল, চিনতে পারো তোমাকে এখন?

না। চোখজোড়া চামড়ার সঙ্গে চলে গেছে।

শুনল, এবার হাসছে লোকটা। হাসি যখন থামল কানে এল এবার তার স্বর।

আসলে চেনার মত চোখ নেই। বুঝলে? বললাম না? বুদ্ধিতে ঠুকতে হবে।

মরিয়া হয়ে উঠল ও।

বলল, বেশ। মাথার কাছে তাকে বড় পেরেক রয়েছে একটা। নাও। মারো। আমার মাথায় মারো।

উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

লোকটা পেরেকটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বলল, কালো রং তোমার না। এই যে তোমার ছবিগুলো কালো লাল আর হলুদে আঁকা, এগুলিতে তুমি নেই। তোমার রং নয় এগুলো। নিজেকে শুধু প্রবোধ দিচ্ছ। ঠকাচ্ছ। তোমার রং হলো নীল।

ঘরের কোণে রংয়ের কৌটাগুলো ছিল, সেখানে গিয়ে নীল রংগে পেরেকটাকে চুবিয়ে নিল। বলল, নাও ধর এবার।

দু'হাত দিয়ে কপালের মাঝখানে পেরেকটা ধরল ও।

লোকটা পেরেকটাকে ঠুকতে লাগল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কান পেতে শুয়ে শুয়ে শুনল

শব্দটা আসছে দরজা থেকে। কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

কোন?

আমি। নাসরীন।

এস। দরোজা খোলাই। জোরে ঠেলে দাও।

ঘরে ঢুকে, দরজাটা ভেজিয়ে নাসরীন জিগ্‌গেস করল, কি হয়েছে আপনার? শুয়ে যে।

জ্বর! বোখার।

কালো রংয়ের বোরখাটা খুলে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ক্যানভাসগুলোর কোণায় ঝুলিয়ে রাখল। বিছানার সুমুখে এসে জিজ্ঞেস করল, এতোয়ারের রোজ এলেন না যে? আমি কাসিনোর সামনে অপেক্ষা করেছিলাম। ঠিক চারটেয়; তাইত আপনি বলেছিলেন। তাই না?

এসেছিলাম। একটু ইতস্তত করে বলল, তবে দেরী হয়ে গিয়েছিল বিশ মিনিট।

বিশ মিনিট? কেন?

নাসরীনের কেনর জবাব দিতে গিয়ে ও হুট করে দিতে পারল না। কি কথা বলবে ওকে? সত্যি কথাটাই বলবে, না মিছে কিছু বলবে।

ওকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখল নাসরীন। তাই বলল. জানেন ত অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন মুস্কিল। লোকজন তেমন কেয়ার করি না। তবে, পুলিশকে যা ডর। এই যা।

এবার ও মুখ খুলল, দেখো নাসরীন, আমি আসছিলাম ঠিকই। কিন্তু...
একটু থেমে, নাসরীনের বড় বড় চোখের খয়েরী মণিতে নিজকে দেখল। মাথা নাবিয়ে নখ দিয়ে নখে আঁচর কাটতে কাটতে বলল, কিন্তু এক দোস্ত বলল, তোর সরম করে না টেক্সীর সঙ্গে প্রেম করিস। তাই, তাই আমি ভাবছিলাম...
কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই জ্বালা ভরা সুরে নাসরীন বলল, তাই দেরী হলো। বহুৎ শুকরিয়া। তবে যে জন্ত এসেছিলাম হ্যাঁ, সেদিন আমার বডিসটা ফেলে গেছি। জলদিতে যেভাবে ভাগতে হয়েছিল। তাই নিতে এলাম। নতুন দেখেই একটু মায়া। তা না হলে...
কথাটা শেষ করল না। ঠোঁটটা বেঁকিয়ে মাথাটা শুধু ঝাঁকি দিল।
নাসরীনের কাঁপানো বেণীর শেষের দিকে বাঁধা গোলাবী ফিতে দেখতে দেখতে ও বলল, বডিসটা মাথার কাছে তাকে রেখেছিলাম। দেখো পাবে।
কিন্তু খুঁজে পেল না নাসরীন। ভুরিং করা কাগজ, খাতা, বই, চিঠিপত্তর সব নেড়েচেড়েও পেল না। ওকে বলার জন্ত মুখ ঘুরিয়েই, চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কি ? আপনার হাতে।

পেরেক।

পেরেক ?

হ্যাঁ। পেরেক।

ওর হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে থাকা নীল বডিসটাকে ছিনিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে নিজেকে বলার মত করে বলল নাসরীন, পেরেক। তারপর শব্দ করে হেসে উঠল।
দু'হাত দিয়ে ষ্ট্রেপটা ধরে ওর চোখের ওপর দোলাতে দোলাতে বলল, পেরেক ? কের হাসির দমকে, ভেঙ্গে নুইয়ে পড়ল। হাসতে হাসতেই বলল, আরে সাব খোয়াব দেখছেন আপনি।
নাসরীনের হাসি দেখে শীত পেল ওর। গায়ে কাঁটা দিয়ে এল।
লেপটা ওভাবে গায়ে জড়াতে দেখে প্রশ্ন করল নাসরীন, কি হয়েছে ?
শীত করেছে খুব।
চিৎ হয়ে শুয়েছিল। এবার পা ভেঙ্গে দ হয়ে শুলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নাসরীন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ওকে। কেমন অসহায়। একটা ছোট্ট ছেলে মনে হলো। মাসুম।

চুলের বিনুনীটা খুলে ফিতেটা সেখেয় ফেলল। কামিজ খুলে, সালোয়ার ছেড়ে স্তূপ করে রাখল তার ওপর। ও শুয়ে শুয়ে দেখল। কোন কিছু ভাববার অবকাশ না দিয়ে ওর লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল নাসরীন। দু'হাতে ওকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে মোলায়েম সুরে ফিস ফিস করে শুধাল, কেমন লাগছে এখন?
ভাল।
আরো কাছে টেনে নিল ওকে। বড় বড় চুলে ঢেকে গেল সারা চোখ মুখ। কেমন মিষ্টি গন্ধ। হাল্কা।
হঠাৎ এক সময় ও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল নাসরীনকে।
দু'হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে চুলের গোছাগুলো তাড়াতাড়ি সরাতে সরাতে বলল, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছাড়ো। ছেড়ে দাও।

আচমকা চোখ মেলল ও।
ঘরটা অন্ধকার। ঘামে ভিজে গেছে গলা বুক। দু'হাতের মুঠিতে বডিসটা ধরে রয়েছে। ওটা দিয়ে মুখ গলা মুছে বালিশের পাশে রাখল। সযত্নে। ঘামে ভেজা পাউডার আর সেন্টের গন্ধে মাথাটা ভরে গেল। আবার ওটাকে নিয়ে শুঁকল। বুকভরা শ্বাস নিয়ে রাখল অনেকক্ষণ। ঝট্ করে ছাড়তে ইচ্ছে করল না। প্রথম যেদিন সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়েছিল অমনি করে ছাড়ল। যাতে তার রক্তের মধ্যে গন্ধটা মিশে যায়। থাকে।
ঘড়িটা কাত হয়ে পড়েছিল পাশে। ওটা নিল। সময় দেখল
পাঁচটা।
চোখ বুজল। আবার খুলল। ফের দেখল ঘড়িটা। সেই পাঁচটা। নাসরীনের জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল, পাঁচটায়। মনে পড়ল। পাঁচ?
অবাক হয়ে নিজেই প্রশ্ন করল। কানের ওপর চেপে ধরল তারপর।
বন্ধ হয়ে গেছে, নিজে নিজে বলল।
ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এ সময়টা কি? সকাল না সন্ধ্যে? মনে হলো কতদিন পর ঘুম থেকে রূপার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠল। সময়টা জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল ও। সারা দেহমনে সেই অস্থিরতা।
বিছানা থেকে নেবে জানালার পাশে দাঁড়াল। ঘন কুয়াশা। কিছু তত স্পষ্ট দেখা যায় না। পয়লা গোল চক্করের কাছে, গাছগুলোর নিচে কয়েকটা টাঙ্গাগাড়ী। ঘণ্টা খানেক ঠায় প্রতীক্ষায় থাকার পর আবিষ্কার করল, সকাল। এখন সকাল। কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখল উত্তাপ মোটেই নেই।

মুখ ধুলো নিচে। কলপাড়ে। তারপর বেরুল বাইরে। চা খেল। ব্যাংকে গেল। টাকা তুলল। ডাক্তারের কাছে গেল।

ডাক্তার সাহেবকে বলল সব। কেমন করে জ্বর এসেছিল। কি খেয়েছে। কি করেছে : সব বলল স্কুলের ছোট ছাত্রের মত। গড় গড় করে।

ডাক্তার সাহেব হাতের কব্জির নাড়ি টিপলেন। চোখ দেখলেন। জিভ দেখে বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। ভয়ের কারণ এখন নেই। তবে বিশ্রাম নিতে হবে আরো দু'দিন। ওষুধ দিলেন মিকশ্চার।

ওটা পকেটে পুরে, রাস্তা দিয়ে ছায়ায় চলতে শুরু করল ও। গাছ গুনল। আজকেও। এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সাত আট ৯ দশ এগারো ১৫ ১৮ বিশ ২২ পঁচিশ ৩০।

ফের গুনল। ফের হলো ওরকম। বরং বেশী।

অবাক হলো। ও জানে রিগ্যাল থেকে চ্যারিংক্রশ পর্যন্ত পনরোটা গাছ।

কপালের দু'পাশের রগ নাচছে। মাথাটা মনে হচ্ছে একেবারে হাল্‌কা। রাস্তায় লোকগুলোকে মনে হচ্ছে কাচের তৈরী।

একটা টাঙ্গাকে ডাকল হাত তুলে।

বলল, সামনাবাদ। পহেলী গোল চক্‌কর।

বসে পা দুটো তুলে দিল সিটে। ঠেস দিল লোহার শিকে। ওপাশের হুডের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ আর গাছের মাথাগুলো।

চোখ বুজল।

ঘোড়াটা জোরে ছুটছে। টাঙ্গাটা দুলছে অনেক।

এক সময় চোখ খুলল আবার। দেখল, গাছের মাথাগুলো আর আকাশ।

ফের চোখ বুজল।

স্বপ্ন দেখল :

আকাশ আর গাছের মাথাগুলো। ও শুয়ে রয়েছে নৌকার পাটাতনে। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখছে বাইরে। দু'ধারে খাড়া পাহাড়। কর্ণফুলিতে অনেক জোয়ার। পাহাড় থেকে ঢল নেবেছে। ও যাচ্ছে বরকল। তারপর একটা খেয়া পেরুবে। সুমুখে পড়বে রিজার্ভের বন। ওটার ভেতর দিয়ে সরু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে নাববে গিয়ে ঝর্ণায়। কোমর পানিতে হাঁটবে মাইলের পর মাইল। দু'ধারে বাঁশবন। তারপর আবার পাহাড়। চড়াই উৎরাই। ঝর্ণা।

ও চলেছে কুকীদের গ্রাম, সাঁইচল। পাহাড়ী ভাষার মানে পুরুষ হাতী। গ্রামটার সুমুখে হাতীর পিঠের মত পাহাড়। এককালে হাতী ঘুরে বেড়াত। এখন কমলার বাগান।

পেছনে, দূরে লুসাই পাহাড়।

মাঝে ঘন কুয়াশার সমুদ্র।

সেখানে সাদা সাদা টুকরো মেঘগুলো যেন ঢেউ।

সম্রাটের ছবি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

সেকালের দামী সেগুন কাঠের চমৎকার বার্নিশ করা ফ্রেম ভিতরে সোনালি রঙের ছবি। কত দিন গেল, কত ধুলো ময়লা, ঝড় ঝাপটের ধাক্কা গেছে ছবিটার ওপর দিয়ে ; তবু না হয়েছে সেই অপরূপ রঙ ফ্যাকাশে, না হয়েছে সেই চমৎকার বার্নিশ ম্লান। সম্রাট যেন হাসছেন, জর্জ দা ফিফ্থ। ঋষিতুল্য দাড়ি. মাথায় চমৎকার মুকুট, আবক্ষ ছবিটায়, চেহারায়. বেশে, ব্যক্তিত্বে কি আশ্চর্য ব্যঞ্জনা, রাজকীয় পৌরুষ। সম্রাট যেন হাসছেন।

ভিজে ঝাড়ন দিয়ে ঘরের মেঝে মুছে, দেয়াল পরিষ্কার করে অবশেষে চাকর হাত দিল ছবিটায়। বারান্দা থেকে খানবাহাদুর চেঁচিয়ে উঠলেন, দেখিস, ভাঙিস না যেন।

—না, হুজুর, সাফ করছি।

কাঁধের গামছাটা ফ্রেমে একটু ঘষতেই বার্নিশের রঙটা আরও ঝকমক করে উঠল। খানবাহাদুর ততক্ষণে দরজার কাছাকাছি এসে গেছেন। হঠাৎ একেবারে হা হা করে উঠলেন, করছিস কি, করছিস কি হারামজাদা ?

চাকর হতবুদ্ধি। খানবাহাদুরের রাগ আরও বেড়ে গেল—তোর ময়লা গামছা লাগিয়েছিস ঐ ছবিতে। শালা জানিস ঐ ছবি কার, তোর বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ যার নিমক খেয়ে মানুষ। দৌড়ে যা, আমার টার্কিশ তোয়ালেটা নিয়ে আয়। তারপর ফের ধুয়ে রাখিস।

বাইরে আরও কয়েকজন লোক উঠোনের ঘাস ছেঁটে সমান করছে, ঝাড়ুদার বাড়ীময় ঝাঁট দিচ্ছে। পাড়ার ছেলেরা মিলে বাড়ির সমুখেই একটা গেট তৈরী করেছে। দুটো কলাগাছও দু'পাশে পুঁতে তার উপর পাতাবাহারের অর্ধচন্দ্রাকার বৃত্ত সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

ছোট ছেলে মজনু ছুটে এসে দাঁড়াল। খানবাহাদুর সেই সকাল থেকে ঘুরছেন। বললেন, কি চাই ?

—পয়সা দাও আব্বা, চীনে কাগজ কিনব।

—কেন ?

—গেটে ওয়েল কাম লিখে সাজাব।

—বেশ, বেশ। খানবাহাদুর খুশি হলেন।

রাস্তায় রোদ তেতে উঠেছে। বেলা এখন ক'টা ? এগারটা বেজে গেছে বুঝি। ইষ্টিমার আসবে সেই সন্ধ্যায়। পাড়াগাঁয় স্টেশন। কোনদিন বা জোয়ার না পেলে আসেই না। নদীটায় চড়া পড়ছে। যাক্ তবু লোকজন পানসি নিয়ে এগিয়ে গেছে। বড় ছেলে মনসুর আসবে আজ। সদরের নামকরা তরুণ উকিল. জেলা জজের ছোট জামাই। কত বছর পরে আজ সে গ্রামের বাড়িতে আসছে।

এদিকের কাজকাম প্রায় শেষ। উঠোনের ঘাস এখন নিপুণ কারিগরের হাতে বোনা সবুজ আস্তরণের মত হয়েছে। ছেলেরা গেট সাজিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে গেছে। খানবাহাদুর গড়গড়ার নল ঠোঁটে চেপে বৈঠকখানা ঘরের চারদিকটা দেখছিলেন। বেশ হয়েছে। দুপুরের স্তিমিত রোদের আমেজে ঘুমও এসেছিল একটু। দরজায় পায়ের শব্দ হতেই তা ছুটে গেল, কে ?

—আমি, আব্বা।

—ওহ মজনু, কি চাই বাবা ?

খানবাহাদুরের স্বর স্নেহ-কোমল। মজনু এসে কোল ঘেঁষে দাঁড়াল।

—আজ ভাবীও আসবে, না আব্বা ?

—হ্যাঁ। জবাব দিতে গিয়ে কথাটা আরও ভাল করে স্মরণ হল খান-বাহাদুরের। তাইতো, ওদের শোবার ঘরের কি ব্যবস্থা হল ?

মজনুকে বললেন, তোমার আম্মাকে একটু ডাক তো বাবা ?

মজনু বলল, আম্মা কি আসতে পারবেন, তাঁর যে বাতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে।

ওহ্। খানবাহাদুর নিজেই উঠলেন। হলঘর পার হতে হতে সাড়া দিলেন, বিবি, শুনছ ?

ভিতর থেকে একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ উঠল, এই যে আসছি।

—আরে না না তোমাকে উঠতে হবে না। খানবাহাদুর এগিয়ে গেলেন, বললেন, ওদের শোবার ঘরটা ঠিক হল ?

—হল আর কি এক রকম। সাবেক খাবার ঘরটাকেই ঝেড়ে মুছে দিয়েছি। নেয়ামতখানা সরিয়ে খাট বিছিয়েছি। ড্রেসিং টেবিলটাও এঘর থেকে ওঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। নিজে দেখবেন চলুন।

আর একবার যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে বিবি উঠে দাঁড়ালেন এক পায়ে, ডান হাতে মজনুকে ভর করলেন। খানবাহাদুর আমতা আমতা করলেন, তুমি আবার কষ্ট করছ কেন ?

ততক্ষণে বিবি এগিয়ে গেছেন।

আগে এত লোকজন ছিল না। লোক বলতে তো মাত্র স্বামী-স্ত্রী দুই ছেলে। মজনু তখন হাঁটতেও শেখেনি। মনসুর ওই বাইরের ঘরেই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ত। তাই অনাবশ্যক ঘরগুলোকে বিবি কোনটাকে ভাঁড়ার, কোনটাকে আসবাবপত্রের, কোনটাকে বা চাকর-বাকরের থাকবার ঘর করে রেখেছিলেন। তার মধ্যে দেখে শুনে সবচেয়ে ভাল আলো বাতাস খেলে এরকম ঘরটাকে মনসুরের শোবার ঘর করা হয়েছে। কি জানি মনসুরের বৌয়ের আবার কি মেজাজ। যা শহুরে মেয়ে বাবা। বৎসরও ঘোরেনি বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে বিবি তার মনের পরিচয় পেয়েছেন বহুদিন আগে মাত্র একবারের সান্নিধ্যের ফলেই।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই বিবি আচম্বিতে ফেটে পড়লেন, সরবতী !

ঝি। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল সরবতী, বাঁদি।

—ওই রানী মাগীর ছবি ওখানে কেন ?

সরবতী সন্ত মোছা ঝকঝকে ঘরের দেয়ালে তাকাল। খানবাহাদুরও তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেল। মজনুর দিকে আড়চোখে চেয়ে তিনি বললেন, ছিঃ ছিঃ চিল্লাচিল্লি করছ কেন ? নামিয়ে ফেললেই তো হয় ছবিটা।

সরবতী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা নামিয়ে ছুটল। খানবাহাদুর বিমর্ষ হলেন স্ত্রীর ব্যবহারে। তবু চুপ করে রইলেন। মেয়েদের মন। আজও পরিবর্তন হল না।

চল্লিশ বছর আগের কথা। বিবির বয়স তখন কত? আর এত মেদবহুল দেহ তাঁর তখন কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। খানবাহাদুরের দাড়ি কত তখন কাঁচা আর ঘন ছিল। তিনি তখন খানবাহাদুর নন, সিরফ উমর মিয়া, উমর আলী খান। বিয়ের রাতে প্রথম পাতা বিছানা পুরনো না হতেই বিবি একদিন তাঁর দাড়িতে হাত রেখে সন্দিহানভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ওই ছবিটা কার?

খানবাহাদুর বিবির অজ্ঞতায় স্নেহ প্রকাশ করলেন, চিনলে না? রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি। তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা হতেই ঘর সাজাব বলে নিয়ে এসেছিলাম। কেমন ভাল করিনি?

কিন্তু রানীর যুবতী বয়সের সেই স্মিত মুখ, উদ্ধত গ্রীবাভঙ্গী, স্বল্পবরণ দেহের দিকে চেয়ে বিবি কিছুই বললেন না। খানবাহাদুর অবশ্য তখন বিস্মিত হননি। বিস্মিত হলেন কিছুদিন পরে। ছবিটা দেয়ালে নেই। বিবিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছবিটা কই?

—পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

—ভেঙ্গেছে তো কাচ, কাগজের ছবি তো আর ভাঙ্গেনি।

—না সেটা ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছ? বিস্ময়ের পরিবর্তে প্রায় রাগে ফেটে পড়লেন খান-বাহাদুর। জান ছবিটা কার? রামা শ্যামা তোমার আমার নয়; রানীর—হার ম্যাজিষ্টি কুইনের; যার রাজ্যে বাস কর। আর তুমি.........

রাগে কথা শেষ করতে পারলেন না খানবাহাদুর। কিন্তু আশ্চর্য, যুবক স্বামীর কাছে সেই প্রথম অপ্রীতিকর ব্যবহার পেয়েও বিবি ব্যথিত হলেন না। বরং একটা দায় থেকে বেঁচে যেন খুশীই হলেন। তা সে রানীই হোক আর যেই হোক; রানী হও তুমি, সিংহাসন আর রাজ্য নিয়ে থাক, নিজের স্বামীর মনে তাকে ঢুক্ করতে দেবেন না বিবি। দেবেন না এদ্দিন পরে নিজের ছেলের উপরও ঢুক্ করতে। হোক রানী, বিশ্বাস নেই, আসলে মেয়েমানুষ তো।

ব্যাপারটা খানবাহাদুর বহুদিন পরে আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই আজ চোখের সামনে রানীর প্রতি বিবির অসম্ভ্রম দেখেও রাগ করতে পারলেন না। তাতে লাভ নেই। ছবিটা সত্যি সত্যিই ভাঙ্গেনি। বিবিই ফেলে রেখেছিলেন, সেই যৌবনেও স্বামীর রাগকে পর্যন্ত পরোয়া করেননি।

বিবিকে বুঝিয়ে লাভ নেই যে রানী আজ নেই, আর তার ছবিরও নেই অন্যের মনে তুক্ করার হীনতা। কারণ তিনি রানী।

রিজিয়ার ডান হাতটা মুঠোয় ভরে মনসুর বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল। দরজায় হুলস্থুল ভীড়। সকলের সামনে খানবাহাদুর আর বিবি দাঁড়িয়ে। পাড়ার মেয়েরা এসেছে দলবেঁধে শহুরে বৌ দেখতে। মজনু পর্যন্ত এক-পাশে দাঁড়িয়ে। ভাইকে দেখে বেশী ঘেঁষলনা, ভাবীর কাছে যেয়ে টিপ করে তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। মজনুর চিবুকে রিজিয়া ঠোঁট ছোঁয়াল, কে মজনু, না? দুষ্টু।

মজনু হেসে ঘাড় ফেরাল। খানবাহাদুর ও বিবিকে সালাম সেরে ভীড় সরিয়ে মনসুর এগিয়ে গেল, রিজিয়া পেছনে। অলক্ষ্যে হাতে টান পড়ল। ভীড় এখানটায় নেই-ই বলতে।

—দেখেছ? প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল রিজিয়া।

মনসুর চোখ তুলল। বসবার ঘরের দেয়ালে প্রকাণ্ড ফ্রেম। তার ভেতর সম্রাটের পোর্ট্রেট। জর্জ দা ফিফথ্‌। সেই ঋষিতুল্য সম্রাট। যেন হাসছেন। মনসুর জবাবে মুচকি হাসল মাত্র।

শোবার ঘরে একটু নিরিবিলি হতেই রিজিয়া ফের সেই কথাটা তুলল, তোমরা কি এখনও ইংরেজের রাজত্বে বাস কর নাকি?

অবশ্য কথাটা অবসর সময়ে স্বামীর সঙ্গে ইয়ার্কির ছলেই বলা। কারণ, রিজিয়ার বাবা এই সেদিনও বারের নামকরা উকিল ছিলেন, পলিটিক্সও এক আধটু করতেন। সম্প্রতি চাকুরি নিয়েছেন। রিজিয়া কলেজে পড়তে দল-বেঁধে স্ট্রাইক করে লাইব্রেরী ঘর থেকে রাজদম্পতীর ছবি সরিয়েছে। তাই স্বামীকে একটু খোঁচামারা। কিন্তু মনসুর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, জানই তো বাবা সেকালের, তার উপর গ্রামের লোক।

রিজিয়া কথাটা গায়ে মাখল না, তেমনি লঘু কণ্ঠে বলল, বেশ তো, জর্জ সিক্সথও তো ছিলেন, কিম্বা হালে তো যুবতী রানী পেয়েছ।

মনসুর এবার হেসে ফেলে বলল, কিন্তু বাবা খানবাহাদুর হয়েছেন জর্জ দা ফিফথের আমলেই।

কৌতুকের হাসিতে রিজিয়ার চোখের তারা দুটি বড় হয়ে গেল। স্বামীর চোখের উপর চোখ রেখে বলল, ও তাই বল...

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বুকের মধ্যে লুফে নিল মনসুর। তার ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে দিতে বলল, আর ছবিটা বাবা প্রেজেন্টেশন পেয়েছেন, তাই অতো মমতা।

মুখ সরিয়ে নেবার কৃত্রিম চেষ্টা করতে করতে রিজিয়া বলল, আহ্।

আসলে কথাটাও তাই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একবার বেড়াতে এলেন গ্রামে। বেড়াতে কি অন্য কাজে কে বলবে। জমিদার বাড়িতে একদিন পদধূলি দিলেন, প্রচুর খানাপিনা হল। শেষে রুমালে মুখ মুছে পাইপে টুবাকো পুরতে পুরতে বললেন, জার্মানীর রাজা কাইজারের সঙ্গে আমাদের লড়াই হচ্ছে, জান চওড্‌রী ?

যুবক জমিদার উদ্বিগ্ন হলেন, বললেন, এক আধটু শুনেছি। খোদা না করুন, কোন ভয় নেই তো ?

ম্যাজিষ্ট্রেট অভয় দিলেন, ওহ্ নো নো। উই আর ফাইটিং এগেইন্‌স্ট বারবারিজম। আমাদের পেছনে গড আছেন। তবে কথা হচ্ছে কি, যুদ্ধে টাকা দরকার প্রচুর। আহতদের সেবা, হাসপাতাল তৈরী, ঔষধপত্র আরও কত কি ?

—তা আমাদের বলছেন না কেন ?

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন, তোমার নাম তো আমি কবেই লিষ্টে টুকে রেখেছি চওড্‌রী। ওয়ার ফাণ্ডে তুমি পাঁচ হাজার টাকা ডোনেশন দেবে।

এমনি করে খানসাহেব। তারপর রেডক্রসে আড়াই হাজার, বিলেতের কোন শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষের স্মরণে কলেজ স্থাপনে পাঁচ হাজার, মিশনারী কাজে পাঁচশো......

এমনি করে বছর দুই না ঘুরতেই আবার একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট জানালেন, তুমি হিজ ম্যাজেষ্টির কাছ থেকে খানবাহাদুর উপাধি পাচ্ছ, কনগ্রাচুলেশন।

সেই সঙ্গে এল এই ছবিটা। রানীর ছবির দুঃখ ভুললেন খানবাহাদুর।

সরবতীর কানেও গেল ছবির কথাটা। বিবির হুকুমে ঠাণ্ডা পানির গ্লাস দিতে এসে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল। রিজিয়া পিষ্ট হচ্ছে মনসুরের দু'বাহুর

বন্ধনে। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েই সে দৃশ্যটা উপভোগ করল, রোমাঞ্চিত হল। আবেগে দুই চোখ মুদে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পর্দার এপাশ থেকেই মৃদুস্বরে বলল—ভাবী, পানি এনেছি।

চকিতে রিজিয়া সরে গেল, আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, নিয়ে আয়।

সরবতী কুণ্ঠিত পায়ে ঘরে এল। টেবিলে গ্লাসটা তশতরি ঢাকা দিয়ে রেখে খাটের কাছে সরে এল। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, এ ঘরে ছবি আমি টানিয়েছিলাম ভাবী, কিন্তু আম্মা রাখতে দিলেন না।

মনসুর বলল, কার ছবি?

সরবতী একছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর ছবি নিয়ে ফিরে এল। রিজিয়া হেসে ফেলল, ওঃ রানী ভিক্টোরিয়া! যেমন তোর আম্মা, তেমনি তুই। আমি ঘর সাজাতে ছবি নিয়ে এসেছি। ওই দেখ।

সরবতী ফ্রেমের স্তূপটার কাছে এগিয়ে গেল, তারপরই দু'হাতে চোখ ঢেকে বলল, ওমা এগুলি কি ছবি? তোবা, তোবা।

একছুটে সে ঘর থেকে পালাতে গেল। রিজিয়া হাসতে গিয়ে বিষম খেল। বলল, হারিকেনের সলতে একটু কমিয়ে রেখে যা সরবতী। আলোটা বড় চোখে লাগছে।

বিকেলে রিজিয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। আয়নায় কার ছায়া। রিজিয়া ফিরে তাকাল—ওঃ, আম্মা।

বিবি ততক্ষণে বাঁ পায়ে ভর করে মেদবহুল শরীরটাকে অতি কষ্টে স্থির রেখে দাড়িয়েছেন। চারদিকে নজর বুলিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, ঘর সাজাতে কি ছবি এনেছ মা?

রিজিয়া উল্লসিত হল। অনেক ছবি আম্মা। সে কত কষ্ট করে কেনা। সব তো আনিনি। কয়েকটা এনেছি। এই তো।

রিজিয়া দেয়ালের কাছে সরে এল, বলল, এটা ম্যাডোনা, এটা মোনালিসা, এটা ইলোরা কেইভের...

কথা শেষ হল না। একস্থানেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন বিবি। হঠাৎ বলে উঠলেন, বৌ।

রিজিয়া বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল।

—এগুলি কি ছবি বৌ! মেমসাহেবরা ন্যাংটা হয়ে নাচছে। এগুলি কি ছবি? এদের জাত, মান, পর্দাপুষিদা, ইজ্জৎ আছে?

বিরক্তিতে রিজিয়ার মুখ কুঁচকে উঠল। এক মুহূর্ত বিবি তাকে অনুভব করলেন। তারপর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, নিজের ভালমন্দ কি নিজের দেখতে নেই মা? শত হোক তোমার স্বামী যোয়ান, তোমারও ছেলেপিলে হয়নি।

এতক্ষণে রিজিয়া তার দিকে মুখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর হঠাৎ হাসি লুকোতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এতক্ষণে বুঝি মেয়েটার মতি ফিরেছে, নিজের সাংঘাতিক ভুল বুঝতে পেরেছে। বিবি খুশি হলেন। শহরের হও, আর গ্রামেরই হও, তুমিও মেয়ে, একজনের বিয়ে করা বৌ। স্বামীর মন খেলনা নয়। তাই তো বিবি দরবেশের মত স্বামী পেয়েও ভিক্টোরিয়ার ছবিকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেননি। আর তুমি তো কোন ছার। কথাটা বুঝতেই তো দেমাগ ভাঙল। হুঁ হুঁ বিবি আজকের মেয়ে নন্।

রাত্রে রিজিয়া মনসুরকে দেখে হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেল। মনসুর সার্ট খুলে হুকে রাখছিল, কিছু বলল না। কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে রিজিয়া নিজেই কথাটা পাড়ল।

আম্মা আজ এ ঘরে এসেছিলেন।

মনসুর ঘুরে দাঁড়াল, বলল, হুঁ।

—কি বললেন জান?

—কি?

—দেয়াল থেকে তোমার ওই সুরনটীদের ছবিগুলো সরাতে হবে। কারণ...

রিজিয়া এবার হাসি চাপতে পারল না। হাসতে হাসতে বলল, কারণ, তাতে তাঁর যোয়ান ছেলের মাথাটা ঘুরপাক খেতে পারে। বৌয়ের উপর টান কমে যেতে পারে। উঃ মাগো।

রিজিয়া হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য, মনসুর চুপ করে রইল। অন্যদিন হলে সে শুধু হাসত না, মায়ের পক্ষ নিয়ে রিজিয়ার সঙ্গে কৃত্রিম ঝগড়ার অভিনয়ে মেতে উঠত। আজ

তার এই উপেক্ষায় রিজিয়া তাই আহত হল। আহত হয়ে পাশ ফিরে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই চাঁদ উঠবে। আকাশ তাই ফিকে হয়ে উঠেছে। জানালার বাইরে গ্রামের নির্জন প্রকৃতি স্তব্ধ। কাপড় বদলে মনসুর বিছানায় উঠে এল। রিজিয়ার চুলের বুনোটে হাত ঢুকিয়ে বলল, ঘুমুলে ?

রিজিয়া সজাগই ছিল। দেখছিল চাঁদ ওঠার আগে আকাশের ফিকে রঙ। মনসুরের সাড়া পেয়ে চোখ মুদে ঘুমের ভান করল। মনসুর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ডাকল, রিজু।

রিজিয়া এবার নড়েচড়ে উঠল, বলল, ঘুমুচ্ছনা কেন ?

মনসুর তার কানের কাছে মুখ নামাল, দেখ চাঁদ উঠছে।

—বেশ, কবিতা লেখ। অন্যকে জ্বালিও না।

তার কথায় উষ্মা চাপা রইল না। মনসুর প্রায় জোর করে তাকে এপাশে ফেরাল, বলল, ঘাট হয়েছে, মাফ চাইছি।

রিজিয়া এবার রেগে গেল, বলল, ঘুমের সময় জোর খাটিয়ে সোহাগ করতে চাও নাকি ?

মনসুর ছোট হয়ে গেল। একটু সরে গিয়ে বলল, না, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ছিল, তাই বলছিলাম...

কথা শেষ না করেই সে থেমে গেল। রিজিয়া কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর নরম স্বরে বলল, কি পরামর্শ, বল !

মনসুর উস্‌খুস্‌ করল, থাক, তুমি আবার রাগ করবে।

রিজিয়া বিস্মিত হল, কেন ?

মনসুর হাসার চেষ্টা করল, বলল, বলছিলাম দেয়াল থেকে ছবিগুলো সরাবার কথা......

রিজিয়ার বিস্ময় উবে গেল। বলল, ওহ, এই কথা।

মনসুর আবার হাসার চেষ্টা করল, তোমাকে আসল কথাটাই বলছি। শুধু আম্মার জন্যই নয়। এর একটা প্রাকটিক্যাল দিকও আছে। ড্রয়িংরুমে জর্জ কিফথের ছবি দেখেছ, ওটা সরাতে হবে।

রিজিয়া উৎসাহিত হল, সারটেনলি।

—কিন্তু সেজন্য তোমাকে আমাকেও একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে।

—অর্থাৎ একটা 'কিং ফর শো'-এর ছবি সরাতে এই ফাইন ছবিগুলো নষ্ট করতে হবে। রিজিয়ার স্বর অনেকটা স্তিমিত।

মনসুর তার কাছে সরে এল, নিজের অজান্তেই রিজিয়ার ঘন চুলের গোছায় আঙুল চালাতে চালাতে বলল, তুমি বুঝছ না। আমরা আর এখানে কদ্দিন ?

তাই তো। রিজিয়ার মুখটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। মনসুরের মনের খবর সে জানে। প্রাকটিস জমছে না। অথচ চাকরি করারও ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে আপাততঃ গ্রামের দশ পাঁচটা জনহিতকর কাজে মিশে জনপ্রিয় হওয়া। এতে একদিকে ওকালতিতে পসার, অন্যদিকে ইলেকশন এলে......মনসুর কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল, একটা ইলেকশন যাক, তারপরই তো শহর। ইচ্ছে হয় ছবির জন্য প্যারিতে অর্ডার দাও। কয়েকটা দিন বইতো নয়। জানোই তো বাবা সেকালের। ওই জর্জ ফিফথের ছবিই তার সম্পদের সামিল। নিজে আবার খানবাহাদুর। ওটা সরাতে না পারলে পাবলিক সেন্টিমেন্ট......

কথা শেষ হল না, রিজিয়া ধীরে ধীরে প্রায় তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে এল, হাসি মুখেই বলল, বেশ, কাল সরবতীকে বলে দেব। এ ছবিগুলো সরালে যদি বাবা তার রাজার ছবি সরান, আপত্তি কি ?

মনসুর হাসল, বলল, আঘাত তিনি পাবেনই। তবু এতে কিছুটা খুশি মনেই আঘাত সইবেন।

কয়েকদিন পর। ভোরে উঠে যে দৃশ্যটা খানবাহাদুরের চোখে পড়ল, তা হচ্ছে, সরবতী মনসুরের ঘর থেকে একরাশ ছবি কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে। বিবি সলজ্জ ভংগীতে হেসে বললেন, দেখেছেন মেয়ের কাণ্ড। আপনি তো ভয়ে অস্থির। শহুরে মেয়ে! হোক, মেয়ে তো। মনটা তো আর শহরের ইট, কাঠ, পাথর নয়।

খানবাহাদুর রসিকতা করলেন, হুঁ। তাই বুঝি তুমি রানীর ছবিটা সরিয়ে ফেলেছিলে ? তা ভালই করেছিলে। যা কাঁচা বয়স ছিল তখন আমার।

বিবি এই বয়সেও লাল হয়ে উঠলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই খানবাহাদুর সচকিত হলেন। বসবার ঘর থেকে একটা শব্দ আসছে। তিনি উৎকর্ণ হলেন।

ইতিমধ্যে একদিন তিনি বসবার ঘরটা দেখেও এসেছিলেন। যা পরিবর্তন হয়েছে মনসুর আসার পর। অচিন্তনীয়। কোথায় সেই ঢালাও ফরাস, তাকিয়া? এসেছে ঝক্‌ঝকে চেয়ার, টেবিল, টুল। খুশি হয়েছেন আবার রাগও করেছেন খানবাহাদুর। হরেক রকম লোক আসে মনসুরের কাছে। আসবেই তো। মনসুর বড়লোক, শিক্ষিত, শহরের লোক। কিন্তু যারা আসে, তারা? খানবাহাদুরেরই ছোটলোক প্রজা সব। অথচ তাদের জন্য চা আসে অন্দর থেকে। তারা চুমুক দেয় সেই কাপে, যে কাপে খানবাহাদুরও চুমুক দেন। বসে সেই ঝকমকা চেয়ারে যা তারা কোনদিন সাহস করত না। অসহ্য, দুর্বিনীত স্পর্ধা। তিনি রেগে গিয়েছিলেন, এসব ছোটলোক কুকুর চেয়ারে বসার সাহস পেল কোথায়?

কিন্তু মনসুর বলে অন্য কথা, কুকুরকেও পোষ মানাতে হয়। নইলে তারা মানবে কেন? খাইয়ে দাইয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে ওরা কোনদিন বুঝতে না পারে, ওদের গলায় একটা শেকল আছে।

আর মনসুর তো তাই করছে। ছেলে বুদ্ধিমান বটে। তার যুক্তি শুনে খানবাহাদুর খুশি হন—শত হোক তাঁর ছেলে তো!

কিন্তু ড্রয়িং রুমের সেই উৎকট শব্দটা বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থেমে গেল কেন? মনে হল দেয়াল থেকে কিছু চুন পলেস্তারাও যেন খসে পড়ল। খানবাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একমুহূর্ত। তারপরই তিনি গর্জন করে উঠলেন, একি হারামজাদা, এ ছবি এখানে কেন?

চাকর বিমূঢ়। তার হাতে জর্জ ফিফথের ছবিটা বুঝি নিমেষের জন্য কেঁপে উঠল। গা থেকে চুনবালির দাগ মুছতে মুছতে সে ভীতস্বরে বলল, বড় সাহেব বললেন, তাই নামিয়ে এনেছি।

মনসুরের নামে খানবাহাদুর স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু তারপরই ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে গর্জন করে উঠলেন, তাই বলে তুই কেন হারামজাদা? মজনুকে বলতে পারিসনি। জানিস ঐ ছবি কার......

কথা শেষ হল না। কাঁপতে কাঁপতে দু'হাতে ছবিটাকেই টেনে নিলেন তিনি। সেই ছবি। সেই রাজা। ঋষিতুল্য দাড়ি। মুখে স্মিত হাসি। এখনও যেন হাসছেন।